শরৎচন্দ্র

(২য় খণ্ড—মৌখিক আলাপ-আলোচনা, হাস্ত-পরিহাস,
বৈঠকী গল্প ও মৌখিক অভিভাষণ।)

গোপালচন্দ্র রায়

সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—গোপালচন্দ্র রায়
সাহিত্য সদন
এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

২য় সংস্করণ
১৯৬৬

দাম—ষোল টাকা

মুদ্রাকর—গোপালচন্দ্র রায়
সাহিত্য মুদ্রণ
এ ১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

হাস্য-পরিহাস

বৈঠকী গল্প

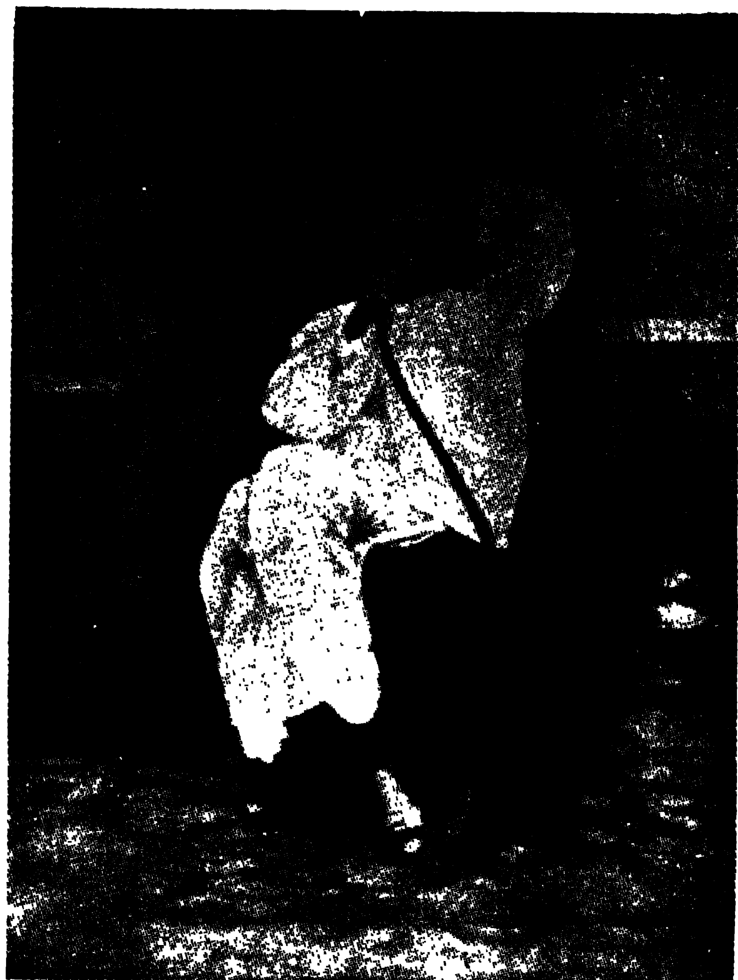
মৌখিক অভিভাষণ

সংযোজন

আলাপ-আলোচনা

হাস্য-পরিহাস

বৈঠকী গল্প



শরৎচন্দ্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

সাহিত্য সম্পর্কীয় এবং সাধারণের গ্রহণযোগ্য হতে পারে বা ভাল লাগতে পারে, এমন সব শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাস, বৈঠকী গল্প ও মৌখিক অভিভাষণ—এক কথায় শরৎচন্দ্রের নানারূপ মৌখিক কথা ও কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থটি রচিত।

মানুষের মুখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে কেউ যদি তখনই সে কথা লিখে রাখেন, তাহলে সে তো থাকেই ; তাছাড়া কেউ সে কথা স্মরণ করে রাখলে বা প্রচার করে থাকলেও তা অনেকাংশে থেকে যায়।

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যে সব প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সে সমস্তই আজ আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর মুখের কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়েছিলেন বা পরে তাঁদের স্মৃতি থেকে লিখেছেন, সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া শরৎচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহভাজন আজও যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা তাঁদের স্মৃতি থেকে শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু আমাকে বলেছেন।

অবশ্য এঁদের সকলেরই লেখা বা মুখের কথাকে নির্বিচারে গ্রহণ করাটাও সমীচীন নয়। কেননা দেখা গেছে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিছুদিন করে মিশেছিলেন, এমন তাঁর কিছু ভক্ত, তাঁর মৃত্যুর পর, শরৎদা আমার কাছে এই বলেছিলেন, এই বলেছিলেন করে বানিয়ে বানিয়ে নানা আলাপের কথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে সুরু করেছিলেন।

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ একবার দুঃখ করে দিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন—

"শরৎ আমার আগে চলে গিয়ে আমাকে শুধু ব্যথাই দেয়নি দিলীপ, ভয় পাইয়ে দিয়েছেও কম নয়।

…শরতের দুর্দশা দেখে মনে হয়, আজকাল যে ম'লেও বুঝি আমার হাড়

জুড়োবে না। আমার মুখেও না জানি কত শত লোক এইভাবে কত কথাই না চাপিয়ে দেবে—অথচ তখন আমার প্রতিবাদ করারও জো-টি থাকবে না। তাই মরতে আজকাল রীতিমত ভয় করে।" (স্মৃতিচারণ)

কবির বলা শরৎচন্দ্রের এই 'দুর্দশা'র কথা যে কিরূপ সত্য, তা আমি আমার 'রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে একাধিক উদাহরণ দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছি।

এখানে অন্য আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

হেমন্তকুমার সরকার তাঁর 'রহস্য-প্রিয় শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন—

"বরিশালে বি, পি, সি, সি-র মিটিংএ শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। ভীষণ হট্টগোল হওয়ায় সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে সভাস্থলে প্রশ্ন করেন—এটা সভা না বাজার ?

ইহাতে শ্যামবাবু ভীষণ চটিয়া শরৎচন্দ্রকে সভা হইতে বাহির করিয়া দেন। বাসস্থানে ফিরিয়া শরৎদার সে কি রাগ! পায়চারি করিতেছেন, আমাদের সাধ্য-সাধনা সব বিফল। শ্যামবাবুকে মারিয়া না ফেলিলে, তিনি আর মিটিংএ যাইবেন না। সেখানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বোস প্রভৃতি অনেকে ছিলেন।

শরৎদা বলিলেন—উপেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভোগ করেছে, কিরণ জমিদার মানুষ, সুভাষ পারবে না। হেমন্ত যাক্, গিয়ে শ্যামবাবুকে মেরে ফেলে আসুক।

তারপর আবার বললেন—ওহে দাঁড়াও, শ্যামবাবুকে 'নন্-ভায়োলেণ্ট'ভাবে কি করে মারবে ভেবে দেখি, আর তাতে যদি মারা যান তো তোমার ফাঁসি যাতে না হয়, সে সম্বন্ধে দেশবন্ধুর আইনের পরামর্শ একটু নেওয়া যাক্।" ('বাতায়ন'—শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই গল্পটি হেমন্তবাবু পরে অন্য কাগজেও লিখেছিলেন। তবে সেই লেখায় গল্পের শেষের দিকটা একটু অন্য রকম ছিল। তিনি লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র বললেন—উপেন, সুভাষ, কি কিরণ ওদের কারও গিয়ে

কাজ নেই। হেমন্ত যাও, গিয়ে শ্যামবাবুকে মেরে যেখানে সভা হচ্ছে, তার পাশে ঐ খালটার জলে লাশ ফেলে দিয়ে এস। যদি পুলিশ আসে, এসে লাশ খোঁজ করতে গিয়ে দেখবে, খালের জলে একটা দাঁড় কাক মরে পড়ে আছে। এতে তোমার কিছুই হবে না। কেননা, দাঁড় কাক মারলে তো আর ফাঁসি হয় না!

হেমন্তবাবুর এই লেখাটি অবশ্য আমি দেখিনি। সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্রিকায় হেমন্তবাবুর এই লেখাটি পড়েছিলেন। এই গল্পটি আমি একাধিকবার শরদিন্দুবাবুর কাছে শুনেছি।

এখন কথা হচ্ছে, সত্যই শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন কি না?

দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর প্রভৃতির সঙ্গে শরৎচন্দ্র বরিশালে সভায় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গেই সভায় একত্রে বসেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সভা না বাজার বলার কথাটা যদি সত্যও হয়, তাহলেও এই সামান্য কথা বলার জন্যই শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রের মত ব্যক্তিকে সভা থেকে বার করে দিলেন? অথচ তাঁর পাশেই বসে ছিলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি। তাঁরা এতে প্রতিবাদ করলেন না বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরাও বেরিয়ে এলেন না?

আসল ব্যাপারটা ছিল এই—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশের বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সভাপতি দেশবন্ধুর মতভেদ হয়। এবং বিরোধী দল সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। দেশবন্ধু সভাপতির পদ ত্যাগ করে কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই নিজের মতাবলম্বীদের নিয়ে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে টিকারীর মহারাজার বাড়ীতে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন। এই স্বরাজ্য দল গঠিত হওয়ার ক'মাস পরেই বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতারা সকলেই যাতে কাউন্সিল প্রবেশ নীতি মেনে নেন, সেজন্য দেশবন্ধু তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সদলে বরিশালে গিয়েছিলেন। বরিশাল সম্মেলনে দেশবন্ধু প্রস্তাব করেছিলেন—সভায় কাউন্সিল প্রবেশ

নীতি নিয়ে আলোচনা হোক, এবং এ সম্পর্কে সভায় গৃহীত প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।

বরিশাল সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশ নীতির ঘোর বিরোধী। তাই তিনি সভায় ঐ প্রস্তাব উত্থাপনই করতে দেন নি।

তখন দেশবন্ধু তাঁর দলবল (শরৎচন্দ্র সহ) নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সভা থেকে বেরিয়ে এসে শরৎচন্দ্র রাগে শ্যামসুন্দরবাবুর সম্বন্ধে কিছু বললেও বলতে পারেন। কিন্তু শুধু সভা না বাজার বলার জন্য শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন, এ কথাটা বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে বরিশালে বি, পি, সি, সি,র ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন, এমন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা সকলেই বলেছেন—শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন, এ কথা সত্য নয়।

আবার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে কেউ কেউ কোন কোন ব্যাপারে অতিরঞ্জনও করেছেন। যেমন —

হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'যাঁদের দেখেছি' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—

"…কত রকমের গল্পই যে তিনি জানতেন! গল্প বলতে বলতে মাঝে মাঝে খেলার মার্বেলের মতো বড় বড় আফিমের গুলি নিক্ষেপ করতেন বদন-বিবরে। সভয়ে ও সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে, একদিন তিনি আমাকে বললেন—হেমেন্দ্র, যদি আরো ভালো লিখতে চাও, আমার মতো আফিম ধরো।"

শরৎচন্দ্র হেমেন্দ্রবাবুকে এ কথা বলতে পারেন, কিন্তু তাই বলে গল্প বলতে বলতে মাঝে মাঝে খেলার মার্বেলের মত বড় বড় আফিমের গুলি খেতেন এ একেবারেই অসম্ভব। শরৎচন্দ্রের আত্মীয় ও বন্ধুরা যাঁরা তাঁকে আফিম খেতে দেখতেন, তাঁরা বলেন—তিনি কখনই একবারে অত পরিমাণ আফিম খেতেন না। আর অত ঘন ঘনও আফিম খেতেন না।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বানিয়ে লেখার লেখক বা বানিয়ে বলার বক্তার সংখ্যা খুবই কম। আর এও ঠিক যে, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যাঁরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁরা এঁদের লেখা দেখলেই ধরতে পারবেন, কোন্‌টা শরৎচন্দ্রের কথা আর কোন্‌টা নয়।

আমার দিক থেকে আর একটা কথা—কারও কথা বা লেখার উপরে প্রথমেই আমি কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস না করলেও, তবু এ সব আমি ভালভাবে যাচাই না করে বই-এ স্থান দিই নি।

সাধারণের গ্রহণযোগ্য হতে পারে বা ভাল লাগতে পারে, এমন সব শরৎচন্দ্রের আলাপ-আলোচনা এই গ্রন্থে দিলেও, কারও কারও সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দু একটা টুকরো আলোচনা বা কথা এই গ্রন্থে দেওয়া হয় নি। যেমন—

সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন, তিনি একবার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেদিন শরৎচন্দ্র কথায় কথায় হঠাৎ তাঁকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন।

এ সম্বন্ধে অচিন্ত্যবাবু তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"আমি একবার গিয়েছিলাম পানিত্রাস (সামতাবেড়ের পাশের গ্রাম ও ডাকঘর)। একা নয়, শৈলজা আর প্রেমেনের সঙ্গে। ভাগ্য ভালো ছিল, শরৎচন্দ্র বাড়ী ছিলেন।···সারাদিন আমরা ছিলাম তাঁর কাছে কাছে, কত-কী কথা হয়েছিল, কিছুই বিশেষ মনে নেই। শুধু তাঁর সেই সামীপ্যের সম্প্রীতিটি মনের মধ্যে এখনো লেগে আছে। আমাদের সেদিনকার বহুব্যঞ্জিত থালায় যে অদৃশ্য হস্তের স্নেহ-সেবা-স্বাদ পরিবেশিত হয়েছিল, তাও ভুলবার নয়।

কথায় কথায় তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—কার জন্যে, কিসের জন্যে বেঁচে আছ?

মন্দিরের ঘণ্টার মত কথাটা এসে বাজল বুকের মধ্যে।

—জীবনে কোথায় সেই জাগ্রত আদর্শ? কে সেই মানস-নিবাস? কার সন্ধানে এই সম্মুখ যাত্রা?"

শরৎচন্দ্র যেমন গুরুত্ব দিয়ে বা 'সিরিয়াস' হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লোকের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, তেমনি আবার তিনি হাল্‌কা কথাবার্তা বলায় বা পরিহাস-রসিকতা করায়ও অত্যন্ত-পটু ছিলেন।

শরৎচন্দ্র এমন মজলিসী মানুষ ছিলেন যে, একবার তাঁর কাছে গেলে, তাঁর হাস্য-পরিহাস ও গল্প ছেড়ে তাঁর কাছ থেকে ওঠা কঠিন হ'ত। একমনে তাঁর কথা শুনতেই হ'ত। তাঁর কথা বলার মধ্যে এমনই একটা যাদু ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন। আবার কখন কখন তিনি গম্ভীর হয়ে মিথ্যা করে কারও কারও বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলতেন যে, যে শুনত সে বিশ্বাস না করে থাকতে পারত না। তারপর শরৎচন্দ্রের এই কথাকে সে আবার যখন মিথ্যা বলে জানতে পারত, তখন সে হেসে উঠত।

শরৎচন্দ্র যে-সকল লোকের সঙ্গে মিশেছেন এবং সময় অসময়ে কথায় কথায় তাঁদের সঙ্গে যে সব পরিহাস-রসিকতা করেছেন, সে সবও আজ আর সংগ্রহ করা কখনই সম্ভবপর নয়। আমি যতটা পেয়েছি, তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তাঁর সেই হাস্য-পরিহাসগুলি সংগ্রহ করেছি।

ইতিপূর্বে কেউ কেউ অবশ্য শরৎচন্দ্রের পরিহাস-রসিকতার কথা কিছু কিছু কোথাও কোথাও লিখেওছেন। যেমন—দিলীপকুমার রায় 'দিশারী শরৎ-স্মরণী' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এবং ১৩৪৪ সালের ২৭শে ফাল্গুনের সাপ্তাহিক বাতায়নের 'শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা'য় 'রসালাপে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে, বাতায়নের ঐ সংখ্যাতেই হেমন্তকুমার সরকার 'রহস্যপ্রিয় শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে, হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'মাসিক পত্রে' 'শরৎচন্দ্রের রসালাপ' নামক প্রবন্ধে, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থে। এঁদের লেখা শরৎচন্দ্রের পরিহাসগুলিও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তবে যে পরিহাসটি সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে, সেটা বাদ দিয়েছি। দিলীপবাবুর লেখা শরৎচন্দ্রের পরিহাসগুলি তো এই গ্রন্থে দিয়েছিই, তাছাড়া আমি তাঁর মুখে শুনে শরৎচন্দ্রের আরও কয়েকটি মজার পরিহাসও এই গ্রন্থভুক্ত করেছি।

১৩৬০ সালের 'দৈনিক বসুমতী শারদীয়া সংখ্যা'য় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর এক লেখায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন—"অনেকেই হয়ত জানেন না যে, শরৎচন্দ্র

খুব ভাল গল্প-বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তাঁর লেখার থেকে তাঁর গল্প বলার কায়দা ছিল আরও মনোহর।"

শরৎচন্দ্রের এই মুখে বলা গল্প সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদারও লিখেছেন—"গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম—শুধু গল্প নয়, গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গীতেও।...শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের, তাহাতে ভাবের সংক্রামকতা আরো অব্যর্থ।"

বাস্তবিকই গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শরৎচন্দ্রের। গল্পের বিষয়বস্তু অভিনব তো ছিলই, তাছাড়া তাঁর বলার ভঙ্গীতে এমন একটা গুণ ছিল যে, শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়তেন।

বন্ধুমহলে বা কোন বৈঠকে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে নানা রকম হাস্য-পরিহাস ও খোসগল্প করে শ্রোতাদের জমিয়ে রাখতে পারতেন।

বাঙ্গলা, বিহার ও বর্মা এই তিনটি দেশ তিনি ব্যাপকভাবে ঘুরেছিলেন এবং সর্বত্রই বহু লোকের সঙ্গে তিনি মিশেওছিলেন। এই বিরাট অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী তিনি সুযোগ পেলেই বন্ধু-বান্ধবদের শোনাতেন। এর মধ্যে হাসি-কান্নার গল্প যেমন থাকত, তেমনি দেবদেবীর গল্প, মায় ভূতের গল্প কিছুই বাদ পড়ত না।

শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কিছু কিছু গল্প কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। যেমন—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৪২ সালের 'শারদীয়া দেশ' পত্রিকায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 'শরৎ-স্মরণিকা'য়, কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৩৩৪ সালের 'বাতায়ন শরৎ-স্মৃতি' সংখ্যায়। এঁদের রচনা ছাড়াও আরো কয়েকজনের রচনা আমি অন্যান্য পত্রিকায় দেখেছি।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেও তাঁর বৈঠকী গল্পের কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন—অধুনালুপ্ত 'পুষ্পপাত্র' পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথ বসুর 'মৃত্যুর পর' গল্পটি। গল্পটি ছাপা হবার আগে শরৎচন্দ্র নিজে নরেনবাবুর লেখাটি দেখে দিয়েছিলেন এবং নামকরণও করে দিয়েছিলেন। 'চরকা' গল্পটিও

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তখন 'সংকল্প' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের এই সব বৈঠকী গল্প তো পেয়েইছি, তাছাড়া তাঁর বৈঠকী গল্পের অনেক গল্প তাঁর শ্রোতাদের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছি। যেমন—বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) বলেছেন 'গুরুদেবের জাহাজ ভক্ষণ', গল্পটি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'বরযাত্রী', 'কালীসাধক হরিপদ', 'কাশীর ভূত' গল্প তিনটি, নরেন দেব বলেছেন 'ভালবাসার গভীরতা' ও রাজুর একটি গল্প, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন রাজুর অধিকাংশ গল্পই, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয়ভাগ্নে) বলেছেন 'ভাগ্যলিপি' গল্পটি, ইত্যাদি।

অনেক গল্প আমি একাধিক মুখে শুনেছি, আবার অন্যত্রও পড়েছি। যেমন—'অপারেশন' গল্পটি। এই গল্পটি আমি শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় ভাগ্নে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি। এই গল্পটিই আবার আমি ১৩৬০ সালের দৈনিক বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর একটি লেখাতেও পড়েছি। তবে এঁদের তিনজনের বলা ও লেখার মধ্যে মূল গল্প ঠিক থাকলেও কিছুটা তারতম্য দেখেছি।

এর কারণ, শরৎচন্দ্র অনেক সময় একই গল্প মূল আখ্যানবস্তু বজায় রেখে মেজাজ ও স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে কিঞ্চিৎ অদল-বদল করে বলতেন। এই জন্যই প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও তাঁর পূর্বোক্ত লেখাটিতে বলেছেন—

"একই ঘটনা বা কাহিনীকে শরৎচন্দ্র দিনের পর দিন ভিন্ন ভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তুলতেন—একদিনের বর্ণনার সঙ্গে এত তফাৎ থাকত যে, একই ঘটনাকে বিভিন্ন বলে মনে হ'ত। প্রতিভার লক্ষণই হচ্ছে 'মুড'। তিনি যেদিন যে রকম ভাবের খেয়ালে মশগুল থাকতেন, বর্ণনাও সেদিন সেই ভাবে রাঙিয়ে উঠত।"

শরৎচন্দ্রের এই বৈঠকী গল্পের অধিকাংশই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা নিজের চোখে দেখা ঘটনা। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করছি—

'বিধবা বিবাহ' গল্পটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়

চৌধুরীর কাছে বলেছিলেন। এই গল্পে দুলে-বৌ গঙ্গার মায়ের যে কথা আছে, তাকে আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর পাশেই তাঁর দিদিদের গ্রাম গোবিন্দপুর। সেই গোবিন্দপুরে তাঁর দিদিদের বাড়ীতে গঙ্গার মাকে ঝি থাকতে দেখেছি।

শরৎচন্দ্রের আলাপ-আলোচনা ও হাস্য-পরিহাসগুলির ন্যায় তাঁর বৈঠকী গল্পগুলি থেকেও শুধু মানুষ শরৎচন্দ্রই নয়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রেরও অনেক খবর পাওয়া যায়। তাই এই সমস্তগুলিরই সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রয়োজন ছিল।

শরৎচন্দ্র সভায় দাঁড়িয়ে ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন না। সভায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কেমন যেন একটু 'নার্ভাস' হয়ে পড়তেন।

তিনি মুখে ভাল বক্তৃতা দিতে তো পারতেনই না, এমন কি লিখিত অভিভাষণও পড়বার সময় সহজভাবে গড়্‌গড়্‌ করে পড়ে যেতে পারতেন না।

এমনও দেখেছি, তিনি সভায় সভাপতি হয়ে সভাপতির আসনে বসে আছেন, আর তাঁর লিখিত অভিভাষণ অন্য লোকে পড়ে দিচ্ছেন। সভায় মৌখিক বক্তৃতা দেবার সময় তাঁকে দেখেছি, দাঁড়িয়ে বলতে বলতে হঠাৎ চেয়ারে বসে পড়লেন। বসে বসে খানিকটা বললেন। আবার দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন। এইভাবে দাঁড়িয়ে ও বসে তিনি কোন রকমে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন।

বক্তৃতা দিতে পারতেন না বলে, শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ কোনও সভায় যেতে চাইতেন না। কিন্তু একজন বড় সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানের সভায় তাঁর ডাক পড়ত। তিনি যেখানে যেখানে একান্তই এড়াতে পারতেন না, শুধু সেই সেই সভায় যেতেন।

শরৎচন্দ্র সভায় যাবেন কথা দিয়েও শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভয়ে সভায় যান নি, এরূপ অনেক নজীর আছে। যেমন একটা—

শরৎচন্দ্র তখন তাঁর কলকাতার বাড়ীতে বাস করছেন। সেই সময় কলকাতার একটি লাইব্রেরী কি সাহিত্য-সংস্থার কর্মীদের অনুরোধে শরৎচন্দ্র তাঁদের প্রতিষ্ঠানের এক উৎসব সভায় যেতে সম্মত হন। ঠিক থাকে, সভার দিন দুপুরের পর সভার উদ্যোক্তাদের কেউ এসে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

সভার দিন দুপুরের পর যথাসময়ে দুজন উদ্যোক্তা শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে এসে তাঁকে কিন্তু বাড়ীতে দেখতে পেলেন না। তাঁরা বাড়ীর চাকরদের জিজ্ঞাসা করলে, চাকররা বললে—বাবু অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কিছু বলে যান নি।

যাঁরা শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বলে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সময় পার হয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র এলেন না দেখে তাঁরা অগত্যা ক্ষুন্ন মনে ফিরে গেলেন।

এদিকে ঐ সময় শরৎচন্দ্র করেছিলেন কি, দুপুরে তাঁর বাড়ীর অদূরেই কবি নরেন্দ্র দেবের বাড়ীতে গিয়ে বসেছিলেন।

শরৎচন্দ্র দুপুরে নরেনবাবুর বাড়ীতে গেলে, নরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—শরৎদা হঠাৎ এই দুপুরে, কি ব্যাপার?

—আর বল কেন! একটা সভায় যাবার কথা আছে। তারা এখনি নিতে আসবে। তাই পালিয়ে এলাম। এখন আর বাড়ী ফিরছি না। তারা চলে গেলে তবে বাড়ী যাব।

—কিন্তু তারা কি মনে করবে বলুন তো?

—মনে যা করে করুক, আমি তো আর তাদের সভায় যেতে চাই নি।

—যাবেন বলে তো মত দিয়েছিলেন?

—মত কি আর আমি দিয়েছি, তারা জোর করে মত আদায় করেছে।

রেঙ্গুনে থাকবার সময় সেখানেও শরৎচন্দ্রকে বন্ধু-বান্ধবরা সভায় ডাকাডাকি করতেন। তিনি কখন যেতেন, কখনবা যাব ব'লে লুকিয়ে থাকতেন।

রেঙ্গুনে একটি সভায় তাঁর এক প্রবন্ধ পড়ার কথা প্রসঙ্গে সেই সভার অন্যতম উদ্যোগী তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন—তাঁদের কয়েকজনের বিশেষ অনুরোধে শরৎচন্দ্র একবার কথা দেন 'নারীর ইতিহাস' নামে প্রবন্ধ তাঁদের সভায় পড়বেন। সভার দিন শরৎচন্দ্র কিন্তু সভায় এলেনই না। অগত্যা যোগেনবাবু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে জানতে পারলেন, শরৎচন্দ্র 'নারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি বাড়ীতে রেখে অন্যত্র সরে পড়েছেন। তখন যোগেনবাবু সেই প্রবন্ধটি এনে তিনিই সভায় পড়লেন।

আর একটি সভার প্রসঙ্গে যোগেনবাবু লিখেছেন—"এখানকার বেঙ্গল ক্লাবে একটি জাঁকালো গোছের সাহিত্য সভা হইল।...সভাপতি শরৎচন্দ্র।...সে সভায় শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি ভালই হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপ নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন সেদিন, সে কথা স্মরণ করিলে তাঁহাকে নিতান্তই দয়া করিতে ইচ্ছা হয়। সের দেড়েক ওজনের একটি প্রকাণ্ড ফুলের মালা তাঁহার গলায় চাপানো। তাহার ভারে না পারেন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে, না পারেন ভালো মত অভিভাষণ পড়িতে। আমাকে বলিয়াছিলেন কাছে বসিতে; কেননা যদি পড়িতে গিয়া তেমন বাধিয়া যায় কিম্বা ঠেকিয়া যায় তো তাঁহার বদলে অভিভাষণ আমিই পড়িয়া দিব। বহু কষ্টে তাঁহার কার্য সমাধা হইলে, তিনি তো বাঁচিলেনই, আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"—'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র'

বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্রের 'নারীর ইতিহাস'-এর পাণ্ডুলিপি রেঙ্গুনে তাঁর বাড়ী পুড়ে যাওয়ার সময় পুড়ে যায়। যোগেনবাবুর উল্লেখিত শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় অভিভাষণটিও সম্ভবতঃ সেই আগুনেই পুড়ে গিয়েছিল।

রেঙ্গুন ছেড়ে ফিরে আসবার পর শরৎচন্দ্র যে যে সভায় লিখিত অভিভাষণ দিয়েছিলেন, সে সবই তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই সেগুলি সবই রয়েছে।

কারও কারও লেখায়, সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্রের মৌখিক বক্তৃতার উল্লেখ পাচ্ছি। কিন্তু ঐ লেখকরা আজ আর জীবিত না থাকায়, শরৎচন্দ্রের সেই সব সভা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারছি না। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

যে 'রসচক্র' নামক বারোয়ারী উপন্যাসে শরৎচন্দ্রও লিখেছিলেন, সেই বারোয়ারী উপন্যাসের অন্যতম লেখক রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবর্তকে' লিখেছেন—'একদিন জানতে পেলাম যে, শরৎচন্দ্র হাজরা পার্কের একটা স্বদেশী সভায় সভাপতিত্ব করতে আসছেন।...যথাসময়ে সভায় গিয়ে হাজির হলাম। শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে হতাশ হলাম সেদিন অতি মাত্রায়। গুছিয়ে তিনি কিছুই প্রায় বলতে পারলেন না। ভাষা-লালিত্যে

সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর মুখে ভাষার দৈন্য দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হলাম।'

শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাস ও বৈঠকী গল্পগুলি সংগ্রহ করতে এবং সেগুলি যাচাই করে নিতে আমাকে যেভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছে, শরৎচন্দ্রের মৌখিক অভিভাষণগুলিও সঠিক ভাবে সংগ্রহ করতে ঠিক তেমনি পরিশ্রম করতে হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, শরৎচন্দ্র ছোট বড় বহু সভাতেই মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন। সেই সব সভার মধ্যে কোন কোনটিতে তাঁর ভাষণ তখনই কেউ কেউ অনুলিখনে লিখে নিয়েছিলেন। ঐ লিখে নেওয়া ভাষণগুলির মধ্যে কিছু ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এখনও যা অপ্রকাশিত ছিল, তা আমি আবিষ্কার করে, এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। যেমন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতিতে প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ বক্তৃতাটি। এটি তখনই অনুলেখক কর্তৃক লিখিত হয়ে, দীর্ঘ ৩০ বৎসর অপ্রকাশিত অবস্থায় অনুলেখকের কাছেই পড়েছিল।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের মৌখিক অভিভাষণগুলির মধ্যে আমার জানা একটি ভাষণ সংগ্রহ করতে পারলাম না। তাই সেটি এই গ্রন্থে দেওয়া গেল না। সেটি হ'ল, ১৩৪২ সালে মহালয়ার দিন কলকাতায় 'হোটেল ম্যাজিষ্টি'তে অনুষ্ঠিত 'শরৎ-সম্বর্ধনা' সভায় শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি। সেদিন সভায় শরৎচন্দ্রের মৌখিক অভিভাষণটি সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়েছিলেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সেই লেখাটি ঐ সময়কার পূজা সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সংখ্যা স্বদেশ কোন লাইব্রেরীতে বা অন্য কোথাও খুঁজে পেলাম না। স্বদেশ-সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিকের কাছে এক খানা আছে বটে, কিন্তু সেই বইএ সব পাতাই ঠিক আছে, কেবল যে দুটি পাতায় শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি ছাপা হয়েছিল, কে সেই পাতা দুটি কেটে নিয়ে গেছে, দেখলাম।

শরৎচন্দ্র সেদিন সভায় কি বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে কৃষ্ণেন্দুবাবু এবং শৈলজানন্দবাবু উভয়কেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা বললেন—আজ আর তার কোন কথাই মনে নেই।

শরৎচন্দ্র যে সব সভায় গিয়েছিলেন, তার যতগুলির সন্ধান করতে পেরেছি, সেই সভার উদ্যোক্তা বা শ্রোতা যাঁরা আজও এই প্রসঙ্গ লেখার সময়—বেঁচে আছেন, তাঁদের অনেকের কাছে গিয়ে, শরৎচন্দ্রের সেই সব সভায় বক্তৃতার কিছু কিছুও সংগ্রহ করেছি।

অবশ্য সেই সব সভার উদ্যোক্তা বা শ্রোতাদের অনেকেই বলেছেন—শরৎচন্দ্রের সেদিনের বক্তৃতায় কোন কথাই আজ আর মনে নেই।

যেমন—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রদের বার্ষিক সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেদিন সভায় শরৎচন্দ্র যে সব কথা বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে সেই সভায় অন্যতম উদ্যোক্তা বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত (পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফাইনান্স সেক্রেটারী) বলেন—শরৎচন্দ্রের সেদিনের বক্তৃতার কোন কথাই আজ আর মনে নেই।

আবার কেউ কেউ বলেন—সব ভুলে গেছি, শুধু একটি কথা মনে আছে মাত্র। যেমন—১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কলকাতায় অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে এক ছাত্র সভায় গিয়েছিলেন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র আর প্রধান অতিথি ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন সভায় শরৎচন্দ্র বক্তৃতা প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে সেই সভায় উপস্থিত একজন ছাত্র শ্রীরোহিতাশ্ব মণ্ডল (বর্তমানে ইনি ডায়মণ্ডহারবারে ফকিরচাঁদ কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক) বলেন—শরৎচন্দ্রের একটা কথা মাত্র মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—'তোমরা সকলেই কলেজের ছাত্র। তোমরা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছ। তোমাদের মত বয়সে অর্থের অভাবেই আমাকে কিন্তু একদিন পড়া ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল।'

অনেক সভায় শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্ব করার কথা এবং সেই সব সভায় তাঁর মুখের বক্তৃতা—এতদিন পরে আজ সবই বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যেতে বসেছে। এগুলির মধ্য থেকে কতকগুলি সভার বিবরণ ও বক্তৃতা অনেক কষ্টে আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। কিভাবে সেগুলি সংগ্রহ করেছি, তারই কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) কাঁটালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলেছিলেন—'আমি যখন ছেলেবেলায় উত্তরপাড়ায় আমার

মামার বাড়ীতে থেকে পড়তাম, তখন দেখেছিলাম, শরৎচন্দ্র কাজী নজরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরপাড়ায় এক সভায় গিয়ে ছিলেন। সভার তারিখ বা শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা কিছুই আমার মনে নেই।'

সন্তোষবাবুর কাছে এই সংবাদ পেয়ে আমি খুঁজে খুঁজে উত্তরপাড়ার সেই সভার উদ্যোক্তাদের একজনকে বার করি এবং তাঁর কাছ থেকে সভার বিবরণ ও শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা সংগ্রহ করি।

(২) শরৎচন্দ্রের দুই মামাতো ভাই সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র) ও রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র) এঁদের কাছ থেকে শুনি শরৎচন্দ্র একবার পুরুলিয়ায় গিয়েছিলেন। এঁরা শরৎচন্দ্রের পুরুলিয়ায় যাওয়ায় সন তারিখটা ঠিক না বলতে পারলেও, মোটামুটি একটা আন্দাজ দিয়েছিলেন। সেই হিসাবে পুরাতন সংবাদপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে সভার সন তারিখ ও সভায় শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা যা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তা উদ্ধার করি। পরে পুরুলিয়ার মণীন্দ্রমোহন মজুমদারের কাছ থেকেও ঐ সভা সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানতে পারি।

(৩) একজন বললেন—শরৎচন্দ্র একবার যশোহর জেলার কালিয়ায় সভা করতে গিয়েছিলেন। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটা চিঠিতেও দেখলাম, তিনি একবার কালিয়া গিয়েছিলেন বটে। এই শুনে ও দেখে আমি কালিয়ার অনেক লোকের সঙ্গে দেখা করি। শেষে সভার উদ্যোক্তাদের বার করে তাঁদের কাছ থেকে সভার বিবরণ-আদি সংগ্রহ করি। বই-এ দেখিয়েছি, শরৎচন্দ্রের কালিয়া যাওয়া সে এক নাটকীয় ব্যাপার।

(৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী জীবানন্দ ভট্টাচার্য একদিন আমাকে বললেন—

রামমোহন লাইব্রেরী হলে ব্রাহ্মদের এক 'রামমোহন স্মৃতি-সভা'য় আমি একবার গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, সেই সভায় সভাপতি শরৎচন্দ্র। সে সভার সন, তারিখ আমার কিছুই মনে নেই। শরৎচন্দ্র সেদিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটা গল্প বলেছিলেন। সেটা কিন্তু আজও মনে আছে। সভার সময়টা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি—সেটা বিলাতে কোন একটা গোল-টেবিল বৈঠকের সময় হবে। কেননা, একজন বক্তা সেদিন বলেছিলেন—আজ

গান্ধীজী দেশের দাবী নিয়ে গোল-টেবিল বৈঠকে যাচ্ছেন, ঠিক এক শ বছর আগে রাজা রামমোহনও দেশের দাবী নিয়ে বিলাত গিয়েছিলেন।

জীবানন্দবাবুর কাছে এই কথা শুনে, সহজে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, ব্রাহ্মরা শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের এক সভায় সভাপতি করেছিলেন। তাই ভাবলাম, শরৎচন্দ্র সভাপতি হয়ে রামমোহন স্মৃতি-সভায় গিয়েছিলেন, এটা যদি কোথাও লিখিত আকারে দেখতে পাই, তবেই এ সভার কথা বই-এ দোব।

যাই হোক্, জীবানন্দবাবুর কাছ থেকে সভার সময় সম্বন্ধে যেটুকু ইঙ্গিত পেলাম, সেই সূত্র ধরেই সভার সন, তারিখ বার করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে গিয়েছিলেন। (রাজা রামমোহনের জীবনীতেও দেখলাম, তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেই বিলাতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।) অতএব সালটা পাওয়া গেল। এবার তারিখটা। রামমোহনের স্মৃতি-সভা যখন, তখন নিশ্চয়ই হয় তাঁর জন্ম তারিখে, না হয় তাঁর মৃত্যু তারিখে সভা হয়েছিল। রামমোহনের জন্ম তারিখ জানা যায় না। তাঁর মৃত্যু তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর। তাহলে সভার তারিখটা দাঁড়াল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

এবার স্থির করলাম, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহনের ঐ স্মৃতিসভা সম্বন্ধে কোন সংবাদ ঐ সময়কার কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা দেখা যাক্।

পুরাতন সংবাদপত্র খুঁজতে খুঁজতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম—২৭শে তারিখে যে রামমোহন স্মৃতি-সভা হবে তারই একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখলাম—সভাপতি শরৎচন্দ্রই। অতএব নিঃসন্দেহ হয়ে সভার বিবরণ বই-এ দিলাম।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি নানাভাবে নানাজনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সকলের কাছেই আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আলাপ-আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া শহরে বাজে শিবপুরে বাস করছেন এবং দেশবন্ধুর অধীনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বাল্যবন্ধু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ঐ সময় হাওড়ায় বাজে শিবপুরের পাশেই শিবপুরে থাকতেন। এঁদের উভয়ের মধ্যে তখন প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হ'ত।

ঐ সময় প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর কলকাতায় আগমন উপলক্ষে সেদিন সারা বাঙ্গলায় পূর্ণ হরতাল হয়েছিল। হাট-বাজার, দোকান-পসার, যানবাহন সমস্তই বন্ধ ছিল।

ঐ হরতালের দিনে সকাল ৮টা নাগাদ শরৎচন্দ্র খালি পায়ে উপেনবাবুদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে বললেন—উপীন (উপেনবাবুর ডাক নাম), শুনছি হাওড়া স্টেশনে ভারি দুরবস্থা! ট্রেনে ট্রেনে বহুলোক না জেনে এসে পড়েছে। শিশুরা দুধ পাচ্ছে না। ছেলেমেয়েরা খাবার পাচ্ছে না। স্ত্রীলোকেরা বাড়ী যাবার গাড়ী পাচ্ছে না। যাবে? যদি কোন কাজে লাগতে পারি!

উপেনবাবু সম্মতি দিলে, দুজনে তখনই খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লেন।

শিবপুর থেকে হাওড়া স্টেশন অনেকটা পথ। দুজনে নানা গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগলেন।

হাওড়া স্টেশনের নিকট বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজের উপর এসে শরৎচন্দ্র উপেন বাবুকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, বলতো, আমাদের ভারতবর্ষের সকল কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কি? অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ থেকে আরম্ভ করে শততম পর্যন্ত একশ স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানটি তিনি অধিকার করে আছেন?

উপেনবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—ঠিক বলতে পারছি না। তুমি যখন প্রশ্নকর্তা, তখন উত্তর তুমি নিশ্চয় জানো। তুমিই বল রবীন্দ্রনাথের স্থান কি?

শরৎচন্দ্র বললেন—দ্বিতীয়। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ যদি দ্বিতীয় হন, তাহলে প্রথম কে বলতো?

উপেনবাবু একটু ভেবে বললেন—এ প্রশ্ন আরও কঠিন ঠেকছে। এর উত্তরও তুমি দাও।

শরৎচন্দ্র বললেন—প্রথম বেদব্যাস।

এই উত্তরে উপেনবাবু খুশী হয়ে এবং একটু চিন্তিত হয়েও বললেন—তাহলে বাল্মীকি?

—অনেক নীচে, অনেক নীচে। এঁদের দুজনের অনেক নীচে।

—কালিদাস?

কালিদাসও অনেক নীচে। প্রথম থেকে দ্বিতীয়ের যে দূরত্ব, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ের দূরত্ব তার অনেক গুণ বেশী।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মারা গেলে, তখন কলকাতায় যে শোকসভা হয়েছিল, সেই সভায় শরৎচন্দ্রকে সভাপতি স্থির করবার জন্য সভার কয়েকদিন আগে বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল একবার শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন।

অবিনাশবাবু গিয়ে শরৎচন্দ্রের বাইরের ঘরে বসলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি লক্ষ্য করলেন, রবীন্দ্রনাথের বইগুলি অতি সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে।

অবিনাশবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করলে, শরৎচন্দ্র বললেন—আচ্ছা তুমি কি মনে কর, আমি তোমাদের সভাপতি হ'লে, কোন ভদ্রলোক সে সভায় যোগ দেবেন?

অবিনাশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি বলছেন কি? আপনি কি মনে করেন, এই দুর্ভাগা দেশ আজও তার জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে নি?

শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি কি বলছ, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু জানি যে, জনকতক লোক আমায় চান না। তাঁরা বলেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে আমি নোংরা জিনিসের আমদানী করেছি।

অবিনাশবাবু বললেন—যদি জনকতক লোক এ কথা বলেই থাকেন,

জানবেন, তাঁরা সাহিত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নন। তাঁরা শত্রু। তাঁরা চিরদিনই থাকবেন। আপনি কি মনে করেন যে, জনকতক প্রত্নতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতই কেবল এই বাঙ্গলা সাহিত্যটাকে শাসন করছেন। তাঁরা যা বলবেন বা করবেন, তা অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে? বঙ্কিমচন্দ্রকেও তাঁরা ভাল বলেন নি, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁরা প্রশংসা করেন না। কিন্তু তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যদি সাহিত্য সেবা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতেন, আজ বাঙ্গলা সাহিত্য বলতে আপনি কি বুঝতেন? এর উত্তর দিন।

অবিনাশবাবুর এই কথায় শরৎচন্দ্র সেল্‌ফ থেকে একটি ছোট বই বার করে অবিনাশবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এটা পড়েছ?

অবিনাশবাবু বললেন—হাঁ।

শরৎচন্দ্র বললেন—এঁর মত তো তোমার কথার সঙ্গে মিলছে না। ইনি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত রেহাই দেন নি। আমি না হয় অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কি করে যে এঁরা অসম্মান করেন, তা আমি বুঝতে পারি না। তাঁর পায়ের তলায় বসে লেখবার মত লোক এ বাঙ্গলা দেশে কেউ আছে কিনা আমি জানি না। সেদিন আমার এক বন্ধু আমায় বলেছিলেন—আপনার লেখা তবুও বুঝা যায়, কিন্তু রবিবাবুর লেখা কিছু বুঝা যায় না। তার উত্তরে আমি তাঁকে বলি—আমি বই লিখি আপনাদের জন্যে, আর তিনি বই লেখেন আমাদের জন্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি-লিট্ উপাধি নেবার জন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ঢাকায় যান।

ইতিপূর্বে তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে মুন্সীগঞ্জে গিয়ে, সভার পর সেখান থেকে আর একবার ঢাকা শহরে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র দ্বিতীয়বার ঢাকায় গিয়ে তাঁর বাল্যবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলার অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি হিসাবে কয়েকদিন ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মালদহ জেলার চাঁচলের রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। চারুবাবুর দিদিমা ছিলেন, ঐ চাঁচলের রাণী। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মের সময় চারুবাবুর দিদিমা হাওয়া বদলের জন্য ভাগলপুরে গেলে, চারুবাবুও ঐ সময় দিদিমার সঙ্গে ভাগলপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করতেন। ঐ ভাগলপুরেই সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চারুবাবুর বন্ধুত্ব হয়।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র ঢাকায় চারুবাবুর বাড়ীতে থাকার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

চারুবাবু দেখতেন—ঐ সময় শরৎচন্দ্র অসুখের ঘোরে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের একটার পর একটা করে কবিতা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন।

চারুবাবু বলেন—রবীন্দ্রনাথের উপর শরতের এত গভীর শ্রদ্ধা ছিল যে, কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করত তো, তাহলে সে তার উপর ভীষণ চটে যেত।

চারুবাবু আরও বলেন—একবার মাসিক মোহাম্মদীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নিয়ে একটা বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছিল। ঐ প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ উঠলে, শরৎ তখন আমাকে বলেছিল—আরে ওরা ভুলে যায়, ওদের ঐ যে সমালোচনা করবার ভাষা, ওটাই বা ওদের শেখালেন কে? তিনি তো সেই রবীন্দ্রনাথই!

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। শরৎচন্দ্র তখন সামতাবেড়ে বাস করছেন।

সেই সময় হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে শরৎচন্দ্রকে সভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করতে অধ্যাপক কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে যান।

শরৎচন্দ্র কাননবাবুর প্রস্তাব শুনেই প্রথমে সভাপতি হ'তে অরাজী হলেন।

তারপর কাননবাবু বহু অনুরোধ করলে শরৎচন্দ্র শেষে রাজী হলেন। তখন তিনি বললেন—দেখ, তোমাদের এই সব বড় বড় সভা আমার মোটে ভাল লাগে না। সভাপতিত্ব করতে গিয়ে দেখেছি, ক'ঘণ্টা বসে রইলাম। না হ'ল গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ, না কারো সঙ্গে মেলামেশা। সভা করে দশটা প্রবন্ধ পড়ার কোন সার্থকতা বুঝি না। শ্রোতাদের মধ্যে খুব কম লোকই শোনে। তার চেয়ে ছোট ছোট বৈঠক কর, যাব—দশজনের সঙ্গে গল্প করব, আলাপ পরিচয় হবে, বেশ ভাল লাগবে।

ঐ সময় কথায় কথায় কাননবাবু শরৎচন্দ্রকে জানালেন—আমাদের এই সভায় রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধ পাঠাবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন—কবি শুনেছেন যে আমি সভাপতি হব! আমি বারবার সকলের কাছে বলি, তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক পেয়েছি। তাঁর সাহিত্যের তুলনা হয় না, আমাদের দেশে। তাঁর কাছে আমরা কিছুই নয়। অবাক হয়ে ভাবি, অত বড় প্রতিভা এদেশে জন্মালো কি করে!

শরৎচন্দ্র চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই রকম কথাই আর একবার বলেছিলেন।

সেদিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় প্রতিভা পৃথিবীতে আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ!

মধুসূদন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্ট সাহিত্যের উপর শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও, ব্যক্তি মধুসূদনের উপর কিন্তু তাঁর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না।

মধুসূদন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁর ঐ অমিতব্যয়ীতার ফলেই তাঁকে শেষ জীবনে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁর অভাব ছিল, তাঁর স্বেচ্ছাকৃত—মধুসূদন সম্বন্ধে এ কথা বলতে শরৎচন্দ্র আদৌ ইতস্ততঃ করতেন না।

মধুসূদনের ত্রিষষ্টিতম মৃত্যু বার্ষিকীর সময় শরৎচন্দ্রের এই ধরণের একটি মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

মধুসূদন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্যটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্নেহভাজন বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশ চন্দ্র ঘোষালের দেখা হয়।

সেদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'লে, অবিনাশবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে একটা কথা বলব।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—এমন কি মারাত্মক কথা বলবে, যাতে তোমার এত সঙ্কোচ হচ্ছে ?

অবিনাশবাবু বললেন—আপনি বলেছেন, মাইকেলের অভাব ইচ্ছাকৃত ছিল। আমার মনে হয়, এটা আপনি না বললেই পারতেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—কেন, এতে দোষ কি হয়েছে? তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিকট থেকে তিনি যে রকম অকাতরে সাহায্য লাভ করেছিলেন, আর কোন কবির ভাগ্যে তা ঘটেছে ? বল ? বিদ্যাসাগর মশাই কত টাকাই না তাঁকে দিয়েছিলেন !

বঙ্কিমচন্দ্র

শরৎচন্দ্র নিজেই বহুবার বলেছেন—ছেলেবেলায় আমি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চুরি করে লিখতাম।

এই কারণেই হয়ত শরৎচন্দ্রের বাল্য রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রকে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং বাঙ্গলা উপন্যাস-সাহিত্যের পথ-প্রদর্শক বলে স্বীকার করলেও, শরৎচন্দ্র কিন্তু পরে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য করতেও, দ্বিধাবোধ করেন নি—বিশেষ করে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী চরিত্রটি সম্বন্ধে। শরৎচন্দ্র লিখে এবং বন্ধুদের কাছে মুখে, রোহিণী চরিত্রটির পরিণতি সম্বন্ধে বহুবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর কটাক্ষ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের প্রায়ই বলতেন—রোহিণীকে গুলি করে মারাটা আমার খুব খারাপ লেগেছে। বেচারী রোহিণী! তার কি অপরাধ হয়েছিল, গোবিন্দলালকে ভালোবাসার জন্য! কিন্তু হিন্দু ধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়। তাই তার মৃত্যু ঘটাতে হ'ল।

উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।

[রোহিণী চরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমতই যে ঠিক, এ কথা কিন্তু অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে যেভাবে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন ও ঘটনা-বিন্যাস করেছেন, তাতে চরিত্রের ও ঘটনার পরিণতি হিসাবে গোবিন্দলালের গুলিতে রোহিণীর মৃত্যু মোটেই অস্বাভাবিক হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাপের শাস্তি ও সুনীতি প্রচারের জন্যই রোহিণীর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, এরূপ বললে ঠিক সঙ্গত হবে না।]

নিজের উপন্যাসের উপাদান

ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। এই চারুবাবুর কাছে শরৎচন্দ্র নিজের সাহিত্য-জীবনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একদিন বলেছিলেন—

চারু, আমার মতো ক'রে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'ত, তাহলে তোমরা উপন্যাস লিখতেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর খুব ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লী-সমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।

চারুবাবু বলেন—শরৎ প্রায়ই আমার কাছে বলত—যে জিনিস আমি নিজে কখনো ভাল করে দেখিনি, তা আমার সাহিত্যে স্থান পায় নি। নিছক কল্পনাকে আশ্রয় করে আমার কোন উপন্যাসই গড়ে ওঠে নি। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ আমি দেখেছি—সে-সবের কারণ আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি। তারপরে তাকে আমি উপন্যাসে রূপ দিয়েছি।

নূতন উপন্যাসের পরিকল্পনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট্ উপাধি দান করেছিল। ঐ উপাধি বিতরণের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাঙলার লাট সাহেব।

অনুষ্ঠানের পর শরৎচন্দ্র লাট সাহেবের সঙ্গে আহারে বসলে, তখন কথা-প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে লাট সাহেবের হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যের কথা ওঠে। সেই সময় লাট সাহেব শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—আপনি যদি আপনার উপন্যাসে মুসলমান সমাজের কথা দরদের সঙ্গে লেখেন, তাহলে এই মনোমালিন্যের অনেকটা সুরাহা হতে পারে এবং তাতে দেশেরও কল্যাণ হয়।

শরৎচন্দ্র লাট সাহেবের কথায়, লিখবেন বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট্ উপাধি নেবার পরেও শরৎচন্দ্র কয়েক দিন ঢাকায় ছিলেন। ঐ সময় ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে যে সব সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তাতে কোথাও কোথাও তিনি, মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখবেন, এ কথাও বলেছিলেন।

শুধু এই বলাই নয়, তিনি তখন ঢাকার কয়েকজন মুসলমান অধ্যাপক ও মুসলমান সাহিত্যিকের সঙ্গেও এ নিয়ে রীতিমত আলোচনা করেছিলেন।

কাজী মোতাহার হোসেন প্রভৃতির সঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁদের বলেছিলেন—বাঙলা দেশের মধ্যে আছে, হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ। তার কেবল একটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে সেটা ভাল দেখাবে না। তাই আমি তোমাদের সমাজ ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে লিখব ঠিক করেছি। কিন্তু, তোমাদের দোষ-ত্রুটি দেখে তোমরা আমার উপর চটে যাবে না তো?

—আপনি যে রকম সহানুভূতির সঙ্গে আপনার উপন্যাসের মধ্যে হিন্দু সমাজ ও পল্লী সমাজের দোষ গুণ দেখিয়েছেন, সে রকম ভাবে যদি আমাদের সমাজের কথাও লেখেন তো আমরা খুশীই হব এবং তাতে আমাদের মুসলমান সমাজ উপকৃতও হবে।

—তোমাদের সমাজ ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। একবার তোমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী আমাকে ভাল করে দেখাতে পার?

—নিশ্চয়।

শরৎচন্দ্র ঢাকায় কয়েকদিন থাকার পর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ সময় তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ছিলেন।

চারুবাবু বলেন—ঐ অসুস্থতার সময় প্রায়ই সে ইজিচেয়ারে চোখ বুজে বসে থাকত। একদিন বিকালে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতেই সে আমাকে বললে—চারু! জ্বরের ঘোরে আজ ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছিলাম যে, মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ করে কিভাবে সেটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাব। আজ সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন আমার মনের মধ্যে একটা পরিষ্কার প্লট আমি গড়ে তুলেছি—তার আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।

চারুবাবু শুনে বললেন—তুমি না লিখলে এ বিষয়ে হাত দেবার ক্ষমতা ও প্রতিভা আর কার আছে? তুমি শীঘ্র সেরে উঠে আমাদের সাহিত্যের এ অভাবটাকে দূর কর। এই তো আমরা চাই!

শরৎচন্দ্র ঢাকায় সাময়িক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেও, ঢাকা থেকে ফিরে এসে আবার অসুখে পড়লেন। কিছুদিন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। তাই তিনি আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। অল্পদিন পরেই তিনি দেহত্যাগ করলেন।

মুসলমানদের জীবন ও সমাজ নিয়ে শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা ছিল, তা আর সফল হ'ল না।

চরিত্র সৃষ্টি

চিত্র পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চিত্ররূপ দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে একবার সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। সেদিন শরৎচন্দ্র ও প্রমথেশবাবুর মধ্যে এইরূপ কথা হয়েছিল—

প্রমথেশবাবু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনি যে এই সব চরিত্র সৃষ্টি করেন, 'ইউনিফরমিটি' রাখেন কি করে?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—আমি 'ইউনিফরমিটি' চেষ্টা করে রাখি না—রাখবার প্রয়োজনও হয় না; কারণ আমার চরিত্রগুলিকে আগে চরিত্র হিসাবে কল্পনা করি, তারপর তাদের 'সিচুয়েশন'এ ফেলে 'রিঅ্যাক্ট' করাই।

এরপর শরৎচন্দ্র বললেন—প্রমথেশ, তুমিও কি দশজনের মত মন জোগাতে 'মাস অ্যাপীল' আনতে আমার গল্প ভেঙ্গে গড়বে নাকি? দেখো, আমার 'বিজয়া' বা 'অ্চলা'কে যেন নাচিয়ে ছেড়ো না।

—আশীর্বাদ করুন, যেন কখন দাসত্ব করতে না হয়।

—তোমাকে আশীর্বাদ করি যেন আর্টকেই মেনে চলতে পারো। যেদিন সেটা পারবে না, সেদিন ছবির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিও।

—আপনার আশীর্বাদ শিরোধার্য করলাম।

প্রমথেশবাবু বলেন—বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন গল্পে নূতন নূতন চরিত্র ও নূতন নূতন ঘটনার সমাবেশ খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের চরিত্রের মত এমন নিখুঁত চরিত্র অঙ্কন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই দেখা যায়, ঘটনা চরিত্রকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের চরিত্র ঘটনাকে মাথা পেতে নেয় না—তারা নিজেরা ঘটনা প্রবর্তন করে। তাই শরৎচন্দ্রের বই যখন ছবিতে রূপান্তরিত হয়, তখন সবার আগে ভেসে উঠে তাঁর চরিত্রগুলি—তারপর আসে কাহিনী। অন্যান্য ছবিতে লোকে ঘটনা মনে রাখে, অভিনয় মনে রাখে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছবি দেখে লোকের মনে গেঁথে থাকে তাঁর প্রাণবন্ত চরিত্রগুলি।

অনুবাদ

শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে থেকে কলেজে এফ-এ পড়তেন, সেই সময় ইংরাজী নভেল ও বিজ্ঞানের বই পড়ার দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল।

ইংরাজী নভেল পড়তেন তিনি ডিকেন্সেরই বেশী। তিনি বন্ধুদের বলতেন —ডিকেন্সের লেখা আমার খুব ভাল লাগে।

ডিকেন্সের লেখা ছাড়া তিনি হেনরি উড ও মারি কোরেলির লেখাও খুব পড়তেন। তখনকার দিনে হেনরি উড ও মারি কোরেলির খুব পশার ছিল।

শরৎচন্দ্র হেনরি উড-এর উপন্যাস পড়ে বন্ধুদের তখন বলতেন—ঘরোয়া ব্যাপার লেখায় এঁর চমৎকার হাত। কিন্তু সব উপন্যাসেই একটা করে খুন-খারাপি চালান। সেটুকু ভাল লাগে না।

আর মারি কোরেলির উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি বলতেন—লেখায় 'ফ্লারিশ' বড় বেশী। সে হিসাবে বস্তু কম।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় হেনরি উড-এর 'ইস্টলীন' উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে 'অভিমান' নামে একটি উপন্যাস এবং মারি কোরেলির 'মাইটি অ্যাটম' পড়ে তার ছায়া অবলম্বনে 'পাষাণ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এ দুটি উপন্যাসই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় বন্ধুদের হাতে ঘুরতে ঘুরতে শেষে কিভাবে হারিয়ে যায়। তাই এ দুটি বইয়ের একটিও ছাপা হয় নি।

শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে ভাগলপুরে তখন যে সাহিত্য সভা হয়েছিল, সেই সভায় শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর 'পাষাণ' উপন্যাসটি পড়েছিলেন। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-সভার অন্যতম সদস্য শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—আমাদের তখনকার সাহিত্য-সভায় এক রবিবারে এই বইটি তিনি সভ্যদের পড়ে শুনিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি আমাদের বারবার নিরস্ত করে বলতেন—ওতে লেখকের নিজের শক্তির বিকাশ হবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ও কাজটি করো না।

ফরাসী সাহিত্যিক মনীষী রম্যাঁ রঁলা 'কল্লোল'-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশকে একবার এক চিঠিতে লেখেন—আমরা যদি শরৎচন্দ্রের ভাল ভাল লেখাগুলিকে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করে ছাপাই, তাহলে ফরাসী এবং বাঙ্গলার চিন্তাধারার একটা আত্মীয়তা ঘটাবার সম্ভাবনা হয়, এটা আমরা করি না কেন ?

দীনেশবাবু রঁলার সেই চিঠিখানি নিয়ে একদিন সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে যান। গিয়ে নানা গল্পের পর দীনেশবাবু শেষে রঁলার সেই চিঠির কথা উত্থাপন করেন।

মনীষী রঁলার প্রস্তাব শুনেই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—দেখ হে, ওদের কাছে আমাদের যা শেখবার আছে, সেগুলোর অন্ততঃ অনুকরণও করি না। এত ভাল ভাল জিনিস, সত্যি এত উদারতা ওরা পেল কোথায় ? কোথায় কে বাঙ্গলার একপ্রান্তে দেশের লোকের নিন্দার ভারে জর্জরিত, ওদের দেশের একটি সামান্য লেখকের তুল্যও নয় যে শরৎচন্দ্র, তার লেখা নিয়ে নাকি এতবড় একটা লোকের মাথা ঘামচে ! কি ? না, লেখার ভেতর দিয়ে অন্তরের পরিচয় হবে। ভাবো দেখি, কতবড় সাহিত্যিকের কথা !

দীনেশবাবু বললেন—তাহলে তাঁকে লিখবো নাকি ?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—লিখে দাও যে, শরৎবাবু ইচ্ছা করেন না যে, তাঁর বাঙ্গলা লেখা কোনও বাঙ্গালীকে দিয়ে ফরাসীতে অনুদিত হয়। কারণ, ওতে ঠিক রসটি যথাযোগ্য থাকবে না। কোনও ভাষারই অপর ভাষায় অনুবাদ হ'লে, তা থাকে না। এতবড় শক্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ, এক তাঁর নিজের করা অনুবাদ ছাড়া অন্য কার হাতে করা অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলার রসটি বজায় রাখতে পেরেছে ? কত দুঃখেই না জানি শেষকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—ইংরাজী শিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। আর জেনো একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বলেই তা পেরেছেন। বলতো, 'ও আমার আমের মঞ্জরী' এটি কোন্ ভাষায় এমন করে বলা যায় ? এ যেন একেবারে আম্রমুকুলের তাজা গন্ধ নিয়ে, রূপ নিয়ে আমাদের কাছে হাওয়ার দোলায় দোল খাচ্ছে।

একটু থেমে আবার বললেন—আচ্ছা বলতো, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ভাষার অন্তরালে কতখানি ছবি যে অলিখিত থাকে, তা কি এক দেশের লোক, অপর দেশের লোককে মাথা খুঁড়লেও বুঝিয়ে বলতে পারে ? ভাবতো,

আমি লিখলাম—খালধারের শোভায় মধ্যে ক'টি অত্যুচ্চ নারিকেল বৃক্ষ। এটুকু লিখেই আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বাঙ্গলার পাঠক সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আসতে পারে নি। তার মনে ঐ নারকেল গাছ ক'টিকে ঘিরে বাঙ্গলার খালধারের একখানি মনোজ্ঞ ছবি ফুটে উঠেছে। তার মনে পড়ছে, খালধারের সঙ্কীর্ণ একটি ঘাটের কথা। সেখানে কোন তরুণী এসেছে ঘট পূর্ণ করতে, তার ছায়া পড়েছে জলের উপর। মনে হয়, কোন লীলারসময় না জানি জলের তলে লুকিয়ে থেকে ঐ তরুণীকে নিয়ে কেলি করছেন। চারদিকে হোগ্‌লা, কচু, আশ-শেওড়ার বন। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাদা বকগুলো এক ঠ্যাং উঁচু করে মাছ শিকারের চেষ্টায় রয়েছে। খানকয়েক নৌকা বাঁধা একটু দূরে। নৌকার ছইয়ের উপর মাঝিদের রঙীন কাপড় শুকুচ্চে, এখনও তোলা হয় নি। বস্তায় বস্তায় শস্য, টিনে টিনে তেল, ঝুড়িতে ঝুড়িতে নানা রকমের মসলা, আরও কত কি খালের ঘাটের খোলা মাঠে পড়ে আছে। বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ, অপরূপ এক নীলাভ আকাশের বুকের কাছে ঝাঁকড়া চুলের মাথা নেড়ে নারকেল গাছগুলো কাকে কি সংকেত করছে কে জানে! আরও কত কি পাঠক এক মুহূর্তে এঁকে ফেলে—আমরা তা জানি না।

দীনেশবাবু বললেন—তাহলে কি আপনার মত যে কোন ভাষার লেখা, অপর ভাষায় অনুবাদ করা উচিত নয়?

শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—ঐ স্থাখ! গোটা কয় কথা তোমাকে গুছিয়ে বলতে পারিনি বলে, তুমি আমার অন্তরের ভাবটি ধরতে পারলে না। আরে, যত যত ভাষায় অনুবাদ হয়, ততই ভাল। কিন্তু শুধু অনুবাদ নয়। 'আই মিট এ লেম ডগ'-এর মত নয়। যিনি চিন্তাশীল উভয় ভাষাতেই পারদর্শী, লেখার উপর যাঁর ভালবাসা আছে, এমন লোক যদি নিরপেক্ষ হয়ে নিজের কল্পনা ও পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে ভাষা ও ভাব এই দুই জিনিস নিয়ে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেন, তাহলে অনুবাদ করার সার্থকতা আছে—একশো বার আছে। তা নয়, তোমরা 'পিঠে'র ইংরাজী 'কেক' লিখবে, তাতে কি রসপুলির রস থাকে!

রোহিণী ও সাবিত্রী

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক মাসের ছুটি নিয়ে শরৎচন্দ্র একবার রেঙ্গুন থেকে দেশে এসেছিলেন। সেবার এসে তিনি হাওড়া ময়দানের কাছে একটা বাড়ীতে ছিলেন।

শরৎচন্দ্র এলে তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি লিখছিলেন।

উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি পড়বার জন্য এনে শরৎচন্দ্রকে না জানিয়েই, সেই পাণ্ডুলিপি সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে পড়তে দিয়ে আসেন।

সুরেশবাবু সেই পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান এবং 'চরিত্রহীন' সাহিত্যে প্রকাশ করতে ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করতে চান।

উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনও রকমে তাঁকে সুরেশবাবুর কাছে নিয়ে যান।

শরৎচন্দ্র উপেনবাবুর সঙ্গে সুরেশবাবুর কাছে গেলে, সুরেশবাবু অত্যন্ত আদরের সহিত শরৎচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে বললেন—আপনার লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। একেবারে পাকা হাতের নতুন ধাঁচের লেখা।

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—সামান্য লেখা, আপনার কি করে ভাল লাগল, তাই ভাবছি।

—না, না, সামান্য মোটেই নয়। আপনার লেখার মধ্যে সেই যাদু আছে, যা পাঠককে একান্তভাবে পেয়ে বসে। আপনার লেখার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম যে, শেষ পর্যন্ত শেষ না করে থাকতে পারলাম না।

এরপর সুরেশবাবু উপেনবাবুকে বললেন—'চরিত্রহীন' যাতে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কাল তোমাকে বলেছিলাম! কিন্তু পরে সে বিষয়ে মত বদলেছি। সাহিত্যে ও-লেখা বার করা চলবে না। ও-লেখা সাহিত্যে

বের হ'লে সাহিত্য উঠে যাবে। অবশ্য যে সব সাহিত্যিককে আমি কম্‌প্লিমেন্টারি কাগজ দিই, তারা আর তাদের সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবরা কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করে চরিত্রহীন পড়বে। কিন্তু তাছাড়া আর সব গ্রাহক 'সাহিত্য' ছেড়ে দেবে। পয়সা দিয়ে আমাদের দেশে যারা কাগজ কেনে, মেসের ঝিকে হজম করবার মত জোরালো পরিপাক শক্তি এখনো তাদের হয় নি।

শরৎচন্দ্র মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন—কিন্তু হয় না। যে, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যও তো একটা মেসের ঝি চাই সুরেশবাবু! বজরার রুটি আমার পাকস্থলীতে হজম হবে কি হবে না, সে সমস্যার সমাধান করতে হ'লে, প্রথমতঃ বজরার রুটি প্রস্তুত হওয়া দরকার। তারপর সে রুটি আমার খেয়ে দেখা চাই।

—আপনার যুক্তিতে কোন ভুল নেই। আপনি শক্তিমান সাহসী শিল্পী, আপনি উৎকৃষ্ট বজরার রুটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমরা যদি আমাদের পরিপাক শক্তির দুর্বলতা অনুমান করে সে রুটি উদরসাৎ করতে ভয় পাই, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি বলি শরৎবাবু, আপনি যখন বজরার রুটি এত চমৎকার প্রস্তুত করতে পারেন, তখন গমের ময়দার লুচিও করে দিন। আমরা পেট ভরে খেয়ে বাঁচি।

—কিন্তু আগেও তো আপনারা বজরার রুটি খেয়েছেন।

—কোথায়?

—কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর চরিত্রে।

—বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী চরিত্রের সঙ্গে আপনার সাবিত্রী চরিত্রের বেশ খানিকটা প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সমাজে তার প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না। তার একমাত্র অপরাধ সে বিধবা হয়ে গোবিন্দলালকে ভালবেসেছিল। আপনার সাবিত্রী চরিত্রের সেরূপ কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই। দ্বিতীয়তঃ, রোহিণী ও গোবিন্দলালের মধ্যে ভালবাসাকে অনিবার্য করবার জন্য অনেক কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। লজ্জা ও নৈরাশ্যের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, আর দৈবাৎ তা দেখতে পেয়ে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রাণরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। সমাজের চক্ষে রোহিণী ও

গোবিন্দলালের ভালবাসার যা যোক্ একটা কৈফিয়ৎ আছে, আপনার সাবিত্রী ও সতীশের ভালবাসার তেমন কোন কৈফিয়ৎ নেই। একটা ঘটনাক্রমে, অপরটা ইচ্ছাক্রমে।

এইভাবে সুরেশবাবু ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে অনেক কথা হ'ল। শেষে বর্মা দেশে শরৎচন্দ্রের প্রবাস-জীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা আলোচিত হ'ল।

শেষে শরৎচন্দ্র বললেন—এবার তাহলে আমরা উঠি। আমার লেখাটা দিন।

সুরেশবাবু শরৎচন্দ্রের হাতে পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে বললেন—এ লেখা আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি, একমাত্র এই সর্তে যে শীঘ্রই আপনি আমাকে অন্য লেখা দিচ্ছেন।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—আগে লুচি ভাজি।

—ভাজতে আরম্ভ করে দিন শরৎবাবু! দেরি করবেন না, আলস্যও করবেন না। ভাজা লুচি কিছু আপনার ভাণ্ডারে যদি থাকে, বাসি হলেও নিতে রাজি আছি।

সমাজ

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে একদিন তাঁর অফিসের সহকর্মী যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পথে বেড়াতে বেরিয়ে এইরূপ আলোচনা করেছিলেন—

যোগেনবাবু বললেন—দেখুন দেশে থাকতে আপনিও হয়ত কত বামুনাই ফলিয়েছেন, আর আমিও যে কম ফলিয়েছি, এমন কথা বলছি না। বরঞ্চ যথেষ্টই ফলিয়েছি ; কিন্তু এখন অভাবের তাড়নায় যখন এই সুদূর মগের মুলুকে এসে পড়তে হয়েছে, তখন বলুন তো, সে সব আচার অনুষ্ঠান কার কতখানি বজায় আছে ? আমার তো মনে হয়, যতই ব্যক্তিগত সংস্কারের শেকল ছিঁড়ে যায় ততই ভাল। সব চেয়ে ভাল হয় যদি সমাজেরও···

শরৎচন্দ্র শুনে যোগেনবাবুকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—সমাজেরও শেকল ছিঁড়তে বল ? সর্বনাশ ! শেকলের জোরেই সমাজ টিকে আছে। এই শেকল ছিঁড়ে গেলে যে, এক মুহূর্তেই সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন আর আমার সমাজ, অমুকের সমাজ বলে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সেটা কি ভাল ? কোটী কোটী মানুষ যেটাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছে, অন্তরের অনুভূতি দিয়ে পরখ করে নিয়ে মেনে চলেছে, বলতে চাও কি সেটা খুব খারাপ ? আমি হিন্দু, বর্ণাশ্রম ধর্ম মানি, তাই বলে যারা অসবর্ণে বিয়ে করে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে, তাদের তো আমি কোন মতেই নিন্দা করতে পারি না। বিবাহটা আমাদের শাস্ত্র-মতে খুব একটা ধর্মের কাজ, কেননা বিবাহিত জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে সংসারধর্ম পালন।

রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ যে কারণেই হোক, সমাজ যে তার দ্বারা উন্নত হয় নি, এ কথা আমি বলতে চাই না। এখন কোথায় রাঢ়ী, কোথায় বারেন্দ্র ? সবই প্রায় মিলে-মিশে যাবার যো হয়েছে। কনোজের পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর সবাই, তবে কেন আজ বল্লালী ব্যবস্থাকে অত উঁচু করে ধরি ? যে যার মতে নিজেকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে পরস্পরের মধ্যে একটুখানি ফাঁক রেখে যাচ্ছি, বিশেষতঃ এই যুগে ?

বর্মীদের প্রতি দরদ

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র চাকরির সন্ধানে ব্রহ্মদেশে যান। এবং এই চাকরির সূত্রেই ব্রহ্মদেশে তিনি প্রায় ১৪ বছর (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত) ছিলেন।

ব্রহ্মদেশ হ'ল স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ। এ দেশের মেয়েরা পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে অবাধে ঘুরে বেড়ায় এবং নানা রকমের পরিশ্রমের কাজও করে। ফলে এ দেশের পুরুষরা অনেকটা অলস প্রকৃতির।

আগে ইংরাজ রাজত্বের আমলে যখন ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একত্রে ছিল, দুইটি পৃথক দেশে পরিণত হয় নি, তখন বহু ভারতীয় ব্রহ্মদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করত।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকার সময় কোন বর্মী যদি কখনো সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে যেত, তাহলে তিনি নিজে না খেয়েও তাকে খাওয়াতেন ও সাহায্য করতেন।

বর্মীদের কথা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন—এ দেশটা হ'ল এদের, পয়সা নিয়ে যাচ্ছি আমরা। শুধু পয়সাও নয়, সামনের ভাতও জোর করে নিয়ে যাচ্ছি। এ জাতটা এত অলস যে, খেটে খেতে চায় না। জাতটাকে দেখে প্রাণে বড় মায়া লাগে। এরা যেদিন অন্নাভাবে হাহাকার করবে, যেদিন নিজেদের অবস্থার কথা ভালভাবে বুঝতে শিখবে, সেদিন এদেরও উন্নতি হবে।

পাখী পোষা

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে থাকতেন, তখন সতীশচন্দ্র দাস নামে সেখানে তাঁর এক স্নেহভাজন বন্ধু ছিলেন।

ঐ রেঙ্গুনেই সতীশবাবু একদিন সন্ধ্যার পর শরৎচন্দ্রের বাসায় গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র তখন তাঁর একটা পোষা পাখীকে খাওয়াচ্ছেন।

এই দেখে সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—রাত্রে আবার পাখীকে খেতে দিতে হয়?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—এরা যখন জঙ্গলে থাকে, ইচ্ছামত খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু যখন লোকালয়ে আবদ্ধ থাকে, ঠিক আমাদের মত করে নিতে হয়। যখন ভালবেসে পাখীকে জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে, সে ভালবাসাটা তাকে দেখাতে হবে। পাখী যখন তোমার আচার ব্যবহার শিখতে থাকে, তখন তুমিও পাখীকে নিজের করে নিয়ে ভাল না বাসলে তাদের প্রাণে লাগে। যতক্ষণ বনের পাখীকে নিজের করে নিতে না পারবে, ততক্ষণ এদের আটকে রাখবে কেন?

শরৎচন্দ্র একবার কলকাতায় একটি পথ দিয়ে যেতে যেতে এক বড়লোকের বাড়ীর ভিতরে একটি পাখীর আর্ত চীৎকার শুনতে পান। এই শুনে শরৎচন্দ্র তখনই সেই অপরিচিত বড়লোকের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। গিয়ে দেখেন, উঠানে একটি কাকাতুয়া পাখী তার দাঁড়ে ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে লম্বা চেনে তার গলা জড়িয়ে ফেলেছে এবং জড়ানো ফাঁস থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ঐভাবে কাতরকণ্ঠে চীৎকার করছে। শরৎচন্দ্র তখনই পাখীটির কাছে গিয়ে তার গলার ফাঁস খুলে দিলেন।

এই সময় বাড়ীর মালিক এসে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন—এ পাখী আপনার? জীবজন্তু পুষতে হ'লে অন্তরে মমতা থাকা চাই, বুঝলেন! পাখীটা কতক্ষণ থেকে যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে, সেদিকে কারুরই হুঁস নেই!

সঙ্গীত

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানী, মেগাফোন রেকর্ডে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নাটক অভিনয় প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর কর্মচারী জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অমিয়মাধব সেনগুপ্ত এঁরা এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'ষোড়শী' নাটকটাকে আগে রেকর্ডে তুলবার কথা বলেন।

ঐ সময় সঙ্গীত সম্পর্কে অমিয়বাবু ও জিতেনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মাঝে মাঝে আলোচনা হ'ত। শরৎচন্দ্র একদিন অমিয়বাবুকে বলেছিলেন—দেখ, গান আমি রচনা করবার চেষ্টা করি নি। আমার মতে বাঙ্গলা গানের সুরটাই সব নয়—তার ভাষাও বাদ দিলে চলে না। এইজন্যে যার তার লেখা কাঁচা রচনার গান আমার ভাল লাগে না—তা সে যতবড় গায়কই গান করুন না কেন।

শরৎচন্দ্র তাঁদের আরও বলেছিলেন—বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্তন এবং রামপ্রসাদী গানই আমার প্রিয়। আহা! শ্যামা সঙ্গীতের চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই!

শরৎচন্দ্র মেগাফোন কোম্পানীর অফিসে বসে জিতেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন তাঁকে বলেছিলেন—দেখুন কলকাতায় আমার যখন বাড়ী তৈরি হয়, তখন লক্ষ্য করেছি বাঙ্গালী হিন্দু শ্রমিকদের চেয়ে অন্য জাতীয় শ্রমিক বহুক্ষণ বেশী পরিশ্রম করে। এই শ্রম বিমুখতা যেন দিন দিন বাঙ্গালী শ্রমিক কেন, বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে—তাই তারা জীবন সংগ্রামে ক্রমশঃই হটে যাচ্ছে। বাঙ্গালী গায়কের মধ্যেও এটা দেখা যাচ্ছে। আজকাল আর পরিশ্রম করে গান অভ্যাস না করেই গায়ক হবার সাধ অধিকাংশ বাঙ্গালী গায়কের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে! এই তো আপনাদের এখানে বসে এত রেকর্ড শুনলাম, কিন্তু তার মধ্যে রীতিমত শিক্ষিত গায়কের কণ্ঠ ক'খানায় পেলাম?

এক ওস্তাদ গায়ক

বিখ্যাত গায়ক ও সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায় ছিলেন, শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন।

দিলীপবাবুর ডাক নাম মণ্টু। শরৎচন্দ্র দিলীপবাবুকে তাঁর ডাক নাম ধরেই ডাকতেন।

এই দিলীপবাবুর বয়স যখন সতের আঠার বৎসর, সেই সময় তিনি এক বাঙ্গালী ওস্তাদ গায়কের কাছে গান শিখতেন। এই ওস্তাদ লোকটি খুবই ভদ্রঘরের ছেলে ছিলেন। কিন্তু তিনি একটি মেয়েকে বিয়ে না করে, কেবল সঙ্গে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতেন। এজন্য তিনি জাতিচ্যুত হয়েছিলেন।

দিলীপবাবু এইরূপ লোকের কাছে গান শিখতেন বলে, তাঁর পরিচিত কেউ কেউ তখন তাঁকে ঐ ওস্তাদের কাছে গান শিখতে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

দিলীপবাবু তাঁর পরিচিতদের ঐ নিষেধ শুনে তখন তাঁদের বিদ্রূপ করে হেসেছিলেন।

শরৎচন্দ্র একদিন দিলীপবাবুর কাছে ঐ কথা শোনেন। শুনে তিনি দিলীপবাবুকে বলেছিলেন—এ হাসবার কথা নয় মণ্টু! ঐ যুবককে আমি শ্রদ্ধা করি। সে সমাজচ্যুত হ'ল, জাতিচ্যুত হ'ল, তবুও মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিল না। তার সঙ্গেই ঘরকন্না করল একনিষ্ঠভাবে। যারা তোমাকে তার কাছে গান শিখতে মানা করেছিল, তাদের কথা ভেবে আমার কান্না পায়, হাসি আসে না।

নিখুঁত পাষণ্ড

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ার বাজে শিবপুরে বাস করতেন, সেই সময় দিলীপ কুমার রায় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

দিলীপবাবু এইরূপ মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

দিলীপবাবু পণ্ডীচেরি আশ্রম থেকে (দিলীপবাবু তখন পণ্ডীচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে থাকতেন) কলকাতায় এসেছেন শুনলে, শরৎচন্দ্রও কলকাতায় গিয়ে দিলীপবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসতেন। শরৎচন্দ্র ও দিলীপবাবু উভয়ের মধ্যে দেখা হ'লে তখন সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হ্‌ত।

সেদিন এ-কথা সে-কথার পর শেষে উপন্যাস সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হ'ল।

শরৎচন্দ্র তখন কথা-প্রসঙ্গে একজনের উপন্যাসের একটি চরিত্রের উল্লেখ করে বললেন—অমুক ঔপন্যাসিক তাঁর অমুক চরিত্রকে একেবারে নিখুঁত পাষণ্ড করে এঁকেছেন। কিন্তু মানুষকে এ রকম নির্জলা মন্দ করে আঁকা উচিত নয়, মণ্টু! কাউকেই এভাবে অপমান করতে নেই। সংসারে যেমন নিখুঁত দেবতাও নেই, তেমনি নিখুঁত শয়তানও নেই। দোষে-গুণেই মানুষ। কম বেশী তার ত্রুটি গুণই দেখাতে হয়।

সংকীর্তনের দল

১৯২৩ কি ২৪ খ্রীষ্টাব্দ। পূজোর ছুটির ক'দিন আগে এক সকালবেলা প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন ছাত্র এসেছে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে। তাদের অনুরোধ—কলেজের সেবারকার সাহিত্য সভায় সভাপতি হতে হবে শরৎচন্দ্রকে।

শরৎচন্দ্র বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। খালি গা, গলায় পৈতা মালার মতো ঝুলছে, মুখে আলবোলার নল।

সভাপতি হবার প্রস্তাব শুনেই শরৎচন্দ্র সভয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন—হবে না, হবে না, কিছুতেই হবে না। বাঙ্গলাদেশে একেই তো আমার কোন প্রতিষ্ঠা নেই, তার ওপর আবার সাহিত্য সভার সভাপতি! ওসব বক্তৃতা-টক্তৃতা আমার আদৌ আসে না। আমাদের জলধর সেনমশাইকে বরং সভাপতি কর। তিনি রায় বাহাদুর, সাহিত্যিক, তার ওপর আবার ভারতবর্ষ-সম্পাদক, তাঁকেই মানাবে ভালো।

ছেলেরা কিছুতেই ছাড়ে না দেখে শরৎচন্দ্র অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, তোমরা আমার বই পড়?

সকলেই বলে উঠল—নিশ্চয়ই। আপনার বই আজকাল কে না পড়ে বলুন!

একজন বললে—আপনার যে কোন বই থেকে যে কোন পাতা বলতে বলুন, আমি বলে দেবো। এতবার পড়েছি যে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় আমার কম। তোমরা ছেলেরা আমার বই যে এমন করে পড় তা জানতাম না। আমার কাছে যাঁরা আসেন, তাঁদের সকলেই প্রায় প্রবীণ। তাঁরা আমাকে মাঝে মাঝে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে যান, তিরস্কারই করেন বেশী। বলেন, আমি নাকি সাহিত্যের বেজায় ক্ষতি করছি। আমার লেখা দুর্নীতিতে ভরা। এ-তো তাঁরা আমার বাড়ীতে এসে শুনিয়ে যান। সেদিন একদল করলে কি জানো? সভাপতি করে নিয়ে গিয়ে, এক সভার মধ্যে বসিয়ে অযথা আমাকে অপমান করলে!

চিৎপুরের এক লাইব্রেরী। সেই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে আমাকে সভাপতি করবার জন্য জনকতক ভদ্রলোক এই তোমাদেরই মতন অনুরোধ করতে এলেন। আমি তো কিছুতেই যাব না, তাঁরাও আমাকে ছাড়বেন না।

অবশেষে হার মানতে হ'ল। গেলাম তাঁদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি মস্ত বড় সভা, বহু লোক এসেছে। সময় মত সভা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে দুজন বেশ বক্তৃতা দিলেন। তারপরে যিনি উঠলেন, তিনি উঠেই আরম্ভ করলেন—আমরা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে লাইব্রেরী গঠনে আজ মন দিয়েছি বটে, কিন্তু এক একবার ভাবি, এই লাইব্রেরী করে কি লাভ? পড়বার মত ভাল বই কি বেরোচ্ছে আজ? লিখছেন কেউ? সাহিত্যে আজ না আছে নীতি, না আছে রুচি, সবই কেবল নোংরামিতে ভরা। আর এই নোংরামির জন্য মুখ্যতঃ দায়ী হচ্ছেন, আজকের আমাদের এই মাননীয় সভাপতিমশায়—বলে তিনি আঙ্গুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

দেখ দেখি, এদের ব্যবহারটা কি রকম! সকলেই ভদ্রলোক, কি আর বলি বলো! আর তাছাড়া ঐ ভিড়, অত লোকের মধ্যে কড়া কিছু বলে শেষে কি হাঙ্গামা বাধাব। তাই চুপ করে সব মেনে নিলাম। এইটুকু শুধু বললাম—দেখুন, ভালো বই যখন বেরোচ্ছে না, তখন আপনারা এক কাজ করুন, লাইব্রেরী বন্ধ করে দিন। লাইব্রেরী না করে বরং একটা সংকীর্তনের দল করুন। লাইব্রেরী করে দেশের লোককে নোংরামি না শিখিয়ে, হরিনামের দল করে পাড়ায় পাড়ায় নীতি প্রচার করুন—সত্যিকারের সৎ কাজ হবে।

ছেলেরা এই কথা শুনে খুব হেসে উঠল।

শরৎচন্দ্র বললেন—এদের অভিযোগ 'পল্লী-সমাজে'র নায়িকা রমা বিধবা হয়েও তার বাল্যসঙ্গী রমেশকে ভালবাসল কেন? হিন্দু সমাজে এ অনাচার কি করে সহ্য হবে? আরে, কেন যে কে কাকে ভালবাসে তার কি কোন জবাব আছে? বাইরে থেকে তুমি-আমি চোখ রাঙিয়ে কি করব? এই ফাঁকা নীতি নীতি করেই দেশটাকে এরা খেলে। রমা-রমেশের মতো ছেলে মেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে জন্মায় না, হিন্দু সমাজে এদের যদি মিলনের পথ থাকত, তাহলে কি হতে পারত, এরা কি তা বোঝে?

ব্যাকরণ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে শরৎচন্দ্রের এক স্নেহভাজন আত্মীয় একবার সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। হরিচরণবাবু গিয়ে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধূলো নিতেই, শরৎচন্দ্র বললেন—কখন এলে?

হরিচরণবাবু বললেন—এইমাত্র।

এরপর উভয়ের মধ্যে নানা কথা হ'ল। কথা-প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনার নিশ্চয়ই কোন ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি আছে। তা না হলে এত অল্প কথায় অল্প সময়ের ভিতর কি করে লেখেন।

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—না বে বাপু, এমন সময়ও আসে যে, একছত্র লিখতেই দুদিন কেটে যায়।

এমন সময় একজন এক তাড়া কাগজ নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে এলেন।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কি চান?

লোকটি বললেন—দেখুন, একটা গল্প লিখেছি, যদি সেটা কাইগুলি কারেক্ট করে দেন।

—আচ্ছা, আপনি ব্যাকরণ কৌমুদী পড়া কতদিন ছেড়েছেন?

—বছর কয়েক হ'ল।

—দেখুন, সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত আর কৃৎপ্রত্যয়গুলো বেশ ভাল করে পড়ে, তারপর আমার কাছে আসবেন। আমি সাধ্যমতো দেখে দেব।

লোকটি মুখ চুণ করে ফিরে গেলেন।

এই ব্যাপার দেখে হরিচরণবাবু বললেন—ভদ্রলোককে ঐভাবে অপমান করলেন? কি মনে করবেন। আচ্ছা, আপনি তো তাঁকে তদ্ধিত প্রত্যয় খুব ভাল করে পড়ে আসতে বললেন। আপনি কি সব নিয়ম মানেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—নিশ্চয়ই। সাধ্যমত যতটা পারি, মানি বই কি। আর মনে করার কথা, ওরা আমাকে সবাই চেনে, মনে কিছুই করে না।

যজ্ঞোপবীত

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বহু ব্রাহ্মণ আজকাল অনাবশ্যক বিবেচনায় পৈতা ত্যাগ করে থাকেন।

শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণদের এই পৈতা ত্যাগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

তিনি নিজে যজ্ঞোপবীতের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং যথারীতি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বাড়ী করেছিলেন। কলকাতার বাড়ীতে থাকার সময় তিনি তাঁর প্রতিবেশী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ীতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন।

এইরূপ একবার গিয়ে দেখেন, নির্মলবাবু খালি গায়ে তখন তাঁর বাগানে কাজ করছেন।

শরৎচন্দ্র নির্মলবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, নির্মলবাবুর গলায় পৈতা নেই।

তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার পৈতা কোথায়? কোমরে নাকি?

উত্তরে নির্মলবাবু বললেন—পৈতা নেই। ফেলে দিয়েছি।

শুনে শরৎচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—শুধু শুধু পৈতা ত্যাগ করতে গেলে কেন? আরে, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ধারণ না করলে পিতৃপুরুষকে অপমান করা হয় যে।

টাকাচুরির দায়

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু।

এই প্রমথবাবুর পুত্র পাঁচুগোপালবাবু যখন এক দৈনিক সংবাদপত্রে সহকারী-সম্পাদক, তখন প্রায়ই তিনি শরৎচন্দ্রের বাড়ী যেতেন। একদিন গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র কয়েকজনের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে কংগ্রেসে তখন যে ভাঙন ধরেছিল তাই নিয়েই আলোচনা চলছিল।

শরৎচন্দ্র বলছিলেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এতদিনে একটা মস্ত ভুল করে বসলেন। কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ভুলই করে থাকে, কংগ্রেসেব মধ্যে থেকে সে ভুল কি শোধরান চলত না? কংগ্রেস ছেড়ে মালব্যজী যে পথ বেছে নিলেন, তাতে কংগ্রেসকেই যে দুর্বল করা হবে! অথচ কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রদবদলের চেষ্টা কোনদিন সফল হবে না। তাহলে ন্যাশনালিস্ট পার্টি গড়ার সার্থকতা কি?

পাঁচুগোপালবাবু সাংবাদিক মানুষ। শরৎচন্দ্রের মুখে এই মন্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার এই অভিমতটা কি আমি আমাদের কাগজে ছাপতে পারি?

শরৎচন্দ্র বললেন—দিতে চাও দিতে পার, আমার আপত্তি নেই। তবে লিখে আমাকে একবার দেখিয়ে নিও।

পরদিন পাঁচুগোপালবাবু ঐ সংবাদের একটি খসড়া তৈরি করে নিয়ে এলেন। শরৎচন্দ্রের সেটি খুব পছন্দ হ'ল না। বললেন—মালব্যজীকে আমি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, সেই কথাটাই তোমার লেখার মধ্যে স্পষ্ট করে কোথাও নেই। দেখ, মান্য ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করি ক্ষতি নেই, কিন্তু যে কথাটা বলব তাতে যেন শ্রদ্ধার অভাব না ঘটে। এ লেখাটা তুমি রেখে যাও, আমি ঠিক করে লিখে কাগজে পাঠিয়ে দেব এখন।

সমালোচনা কর ক্ষতি নেই, তবে সমালোচনা করছ বলেই যে অশ্রদ্ধা

করতে হবে—এরও কোন মানে নেই। এই দেখ না, আমার লেখার যারা সমালোচনা করে, তাতে কি থাকে? শুধু গালাগালি আর বিষোদ্গার। যখন প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে এলাম, এদের আক্রমণটা আরো তীব্র ছিল। সেদিন এরা আমার অতীত জীবন নিয়ে কত আজগুবি গবেষণাই না করেছে!

একবার শরৎ চাটুজ্যে নামে কোথাকার কে একটা লোক টাকা চুরির দায়ে ধরা পড়ে। খবরটা ছাপা হতেই, আর সব যায় কোথায়, তারা ধরে নিলে—ঐ টাকাচোর শরৎ চাটুজ্যে লোকটা নিশ্চয় আমি। প্রচার করে দিলে—এই টাকা চোর আর নভেল-লিখিয়ে শরৎ চাটুজ্যে একই ব্যক্তি। এতে কোন ভুল নেই!

চারদিক থেকে চিঠি আসতে লাগলো। তার কি ভাষা, কি বক্তব্য! বোঝ দেখি, একবার অবস্থাখানা!

এ রকম অন্যায় অত্যাচার আমার উপর হয়েছে। আমি কিন্তু টলি নি। আক্রমণ যতই তীব্র হোক, নিজে আমি যা সত্য বলে বিবেচনা করেছি, তা বলতে কিছুতেই ভয় পাই নি।

প্রেমের ব্যর্থতায়

কলকাতার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সংস্থা 'রসচক্রে'র সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র।

এক সময় এই রসচক্রের বৈঠক বসত রসচক্রের অন্যতম সদস্য শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে। প্রতি রবিবারেই রসচক্রের বৈঠক হ'ত।

সতীশবাবুর বাড়ী ছিল শরৎচন্দ্রের কলকাতার বালীগঞ্জের বাড়ীর নিকটেই। তাই শরৎচন্দ্র কলকাতায় থাকলে সতীশবাবুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত রসচক্রের প্রতিটি বৈঠকেই যোগ দিতেন। তাছাড়া সতীশবাবুর ছবি আঁকা দেখতে ও ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে এবং অমনিও প্রায়ই তিনি সতীশবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন।

শরৎচন্দ্র এইরূপ একদিন সকালে সতীশবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছেন, এমন সময় পথে দেখলেন, দলে দলে লোক নিকটেই বালীগঞ্জের লেকের দিকে চলেছে।

শরৎচন্দ্র তাদের মুখ থেকেই শুনলেন—পুলিশ আজ সকালে লেকের জল থেকে দুটি মৃতদেহ তুলেছে। এই মৃতদেহ দুটি—একটি যুবক ও একটি যুবতীর। এরা উভয়ে পরস্পরের হাতে পায়ে বেঁধে এক সঙ্গে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

শরৎচন্দ্র দেখলেন—পথের অনেকেই ঐ আত্মহত্যার ব্যাপারটি নিয়ে হাসাহাসি ও নানা মন্তব্য করতে করতে চলেছে।

শরৎচন্দ্র কাকেও কোন কথা না বলে সিধা সতীশবাবুর বাড়ীতে চলে এলেন। সতীশবাবু তখন বাইরের ঘরেই ছিলেন। তাঁকে দেখে শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—লোকগুলো কি পাগল, না কি বল তো?

সতীশবাবু বললেন—কারা শরৎদা?

—ঐ যে গো, কারা লেকে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। তাদের সেই আত্মহত্যা নিয়ে লোকগুলো হাসাহাসি করতে করতে দেখতে চলেছে। ঐ লোকগুলোর কথাই বলছি।

—হ্যাঁ একজোড়া যুবক-যুবতীর লেকের জলে ডুবে মরার একটা খবর আজ কাগজে দেখলাম বটে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে, এই যে এরা আত্মহত্যা করল, এর হেতুটা কি? এটা যে ব্যর্থ প্রেমের ব্যাপার এ তো সবাই বোঝে। কিন্তু এই ব্যর্থতাটা হ'ল কেন? নিশ্চয়ই সামাজিক কি পারিবারিক কোন গুরুতর কারণ ছিল। হয়ত দুজনে দু জাতের ছিল, কিংবা দুজনের পিতার আর্থিক অবস্থায় তারতম্য ছিল, কিংবা অন্য কোন কারণও ছিল। যার জন্য সামাজিক বা পারিবারিক কারণে এদের মিলন ঘটল না। সেই বাধা থেকে রেহাই পাবার অন্য কোন পথ না পেয়েই তো এই কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হ'ল। ভালবেসে বাধা পেয়ে দুজনে মিলে এক সঙ্গে আত্মহত্যা করাটা কি অত সহজ! সমাজই বল আর অভিভাবকই বল, এদের মধ্যে ভালবাসাটা যে কত গভীর ছিল, তা কেউ ভেবে দেখল না। এদের সেই গভীর প্রেমকে সার্থক ও সফল হতে দিল না।

একটি গল্পের উপসংহার

সাগরময় ঘোষের লেখা 'সম্পাদকের বৈঠকে' নামে একটি বই আছে। সেই বই-এ শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সে তাঁর ভাগলপুরের কয়েকজন বাল্যবন্ধুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ও আলোচনার কাহিনী আছে। সেই কাহিনীটি এইরূপ :—

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন তিনি তাঁর কলকাতায় বালীগঞ্জের বাড়ীতে বাস করছেন।

সেই সময় শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের কয়েকজন বাল্যবন্ধু কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরাও সকলেই তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে থাকার সময় যে আদমপুর ক্লাবে অভিনয় করতেন, এঁরাও ছিলেন সেই আদমপুর ক্লাবেরই সদস্য।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের ডাক নাম ছিল ন্যাড়া। এই বন্ধুদের কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে ন্যাড়া বলে ডাকতেন।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের এই বন্ধুরা কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে এলে তিনি তাঁদেব সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বন্ধুদের নিয়ে ছেলেবেলার কত গল্পই না করলেন।

এক বন্ধু বললেন—ন্যাড়া তুই এখন কত বড় হয়েছিস্! তোর জন্যে আমরা গর্ব বোধ করি। তোর গল্প-উপন্যাস বেরুলেই আমরা তা পড়ি।

নানা রকমের কথা হতে হতে শেষে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের কথা উঠল। এক বন্ধু বললেন—দেখ ন্যাড়া, সেদিন এক নতুন লেখকের একটা গল্প পড়লাম—ওয়াণ্ডারফুল। যেমন গল্পের প্লট, তেমনি কন্‌ক্লুশান। আজকাল সমাজ নিয়ে প্রোগ্রেসিভ গল্প লেখার একটা ফ্যাসন হয়েছে। এ সে জাতের লেখা নয়। যেমন হাই-সিরিয়াস, তেমনি হাই-থিংকিং। তাছাড়া লেখক গল্পের মধ্যে এমন একটা মরাল তুলে ধরেছেন, যা আজকের দিনের ভেঙ্গেপড়া সমাজের শিক্ষণীয় বস্তু।

বন্ধুর মুখে এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—কি এমন গল্প যে তার এত প্রশংসা করছিস্! গল্পটা মনে আছে? বল তো শুনি।

বন্ধু বললেন—নিশ্চয় মনে আছে। তবে গল্পটা বলছি শোন—

পূর্ববঙ্গের একটি সম্পদশালী গ্রাম। সেই গ্রামের জমিদার কৃষ্ণনয়ন রায় চৌধুরী বিত্তশালী কিন্তু সাত্ত্বিক লোক। প্রজাদের সঙ্গে তিনি চিরকালই সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রেখে এসেছেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র কমলনয়নকে গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করে দিলেন—যাতে সে প্রজাদের ছেলেদের সঙ্গে মিলে-মিশে বড় হয়ে ওঠে এবং সহপাঠীদের প্রতি মায়া-মমতা, বন্ধুত্ব কৈশোর কাল থেকেই তার মধ্যে দেখা দেয়।

স্কুলের সহপাঠী গ্রামের এক চাষীর ছেলে বিষ্ণুচরণ দাস কমলনয়নের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল। দুজনে যাকে বলে হরিহর-আত্মা।

কমলনয়ন ও বিষ্ণুচরণ দুজনে একই সঙ্গে গ্রামের স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করল।

এনট্রান্স পাস করার পর কমলনয়ন উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে এল। বিষ্ণুচরণ আর পড়ল না, গ্রামেই রয়ে গেল।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল। কমলনয়ন এম-এ পাস করল। এম-এ পাস করে কলকাতায় নিজের বাড়ীতে বসেই গবেষণা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে কমলনয়নের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীর ভার তার উপরে পড়ে। কিন্তু সে গ্রামের বাড়ীর পুরাতন সরকারের উপর জমিদারী দেখাশুনার ভার দিয়ে কলকাতাতেই রয়ে গেল।

কমলনয়ন তখনও অকৃতদার। অকৃতদার কিন্তু আদৌ উচ্ছৃঙ্খল নয়। কেবল পড়াশুনা নিয়েই থাকে।

এই সময় একদিন কমলনয়নের বাল্যবন্ধু বিষ্ণুচরণ কলকাতায় কমলনয়নের বাড়ীতে এসে উপস্থিত।

কমলনয়ন বাল্যবন্ধুকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, বিষ্ণুচরণ! আরে এস এস—বলে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। তারপর বললে—তোমার মালপত্র কোথায়?

বিষ্ণুচরণ বললে—আমার সঙ্গে আমার ইয়েও এসেছেন।

—মানে তোমার স্ত্রী, আমার বৌদি। তা তিনি কোথায়?

—পথের উপর ঐ গাড়ীতে।

—আরে চল চল বৌদিকে নিয়ে আসি।—বলেই কমলনয়ন বিষ্ণুচরণকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীর কাছে গেল। গিয়ে বললে—নমস্কার বৌদি! আসুন, নেমে আসুন।

বিষ্ণুচরণ বললে—আমরা তোমার এখানে কিছুদিন থাকব। তাই কোথাও না গিয়ে শিয়ালদহে নেমে সিধা তোমার এখানেই এসেছি।

—আমার এখানে থাকবে সে তো খুব আনন্দের কথা। আমার এই মস্ত বড় বাড়ী, সবই তো খালি পড়ে আছে। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক। তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা বলতো!

এই সময় বিষ্ণুচরণের 'ইয়ে' গাড়ী থেকে নামলে, কমলনয়ন তাকে সম্বোধন করে বললে—দেখুন বৌদি, বিষ্ণু হতভাগা বিয়ে করল, তা আমাকে নেমন্তন্নও করল না। এবার তার শোধ নেব, আপনার হাতের শাক চচ্চড়ি খেয়ে। কতকাল যে দেশের রান্না খাই নি!

কিছুদিন কেটে যাবার পর, এদিকে কমলনয়নের গ্রামের সরকার মশায় জমিদারীর হিসাবপত্র দেবার জন্য একদিন কলকাতায় কমলনয়নের কাছে এলেন। তিনি এসে বাড়ীতে বিষ্ণুচরণকে এবং তার সঙ্গের মেয়েটিকে দেখে একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। তিনি তখনই কমলনয়নকে ডেকে বললেন—ঐ বিস্টু, আমাদের গ্রামের হারাণ ভট্‌চায্যির বিধবা মেয়েটাকে ফুসলে নিয়ে এখানে এসে উঠেছে! ওকে তাড়াও তাড়াও!

কমলনয়ন এই কথা শুনে তখনই বিষ্ণুচরণকে ডাকল। ডেকে বললে—তুমি গ্রামের হারাণ ভট্‌চায্যির বিধবা মেয়েকে ভাগিয়ে এনেছ?

বিষ্ণুচরণ বললে—ভাগিয়ে আনি নি। আশ্রয় দিয়েছি।

—তোমার মুখে ও-সব নাটক নভেলের বড় বড় কথা শুনতে চাই না। ও যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তা তুমিই স্বীকার করছ।

—মন্ত্রপড়া স্ত্রী নয়, তবে আমার আশ্রিতা।

—যাই হোক্, ওকে নিয়ে তোমার আর একদণ্ডও আমার এখানে থাকা চলবে না। তুমি পথ দেখ।

বিষ্ণুচরণ হারাণ ভট্‌চায্যির ঐ মেয়েটিকে নিয়ে কমলনয়নের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

বিষ্ণুচরণ চলে গেলে, কমলনয়ন রাজমিস্ত্রী ডাকিয়ে তারা যে ঘরে থাকত, সেই ঘরের দেয়াল ও ছাদের পলেস্তারা খুলে ফেলে চুণ সুরকি দিয়ে আবার নতুন পলেস্তারা লাগাল। মেঝের সিমেণ্ট চটিয়ে আবার নতুন করে সিমেণ্ট লাগান হ'ল। তারপর কলকাতার সেরা কীর্তনের দল এনে সেই ঘরে অষ্টপ্রহর করাল।—এই সব করে কমলনয়ন নিশ্চিন্ত হ'ল।—এইখানেই গল্পের শেষ।

গল্প শেষ করে বন্ধুটি শরৎচন্দ্রকে বললেন—গল্পটা তোর কি রকম লাগল বল্ ন্যাড়া ?

শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ ভালই তো মনে হ'ল। তবে আমি হ'লে গল্পের উপসংহারটা অন্যরকম করতাম।

—কি করতিস্ শুনি ?

—আমি হ'লে পলেস্তারা বদলানো নয়, বাড়ীটাই ভেঙ্গে ফেলতাম। বাড়ী ভেঙ্গে ভিত খুঁড়ে মাটি কেটে সেখানে একটা পুকুর কাটাতাম। তারপর সেই পুকুরে শ্বেত পাথরের ঘাট বাঁধিয়ে তার প্রত্যেক সিঁড়িতে লাল পাথর দিয়ে লিখে দিতাম—'সতীলক্ষ্মীর ঘাট'। পাড়ার কুললক্ষ্মীরা সেই ঘাটে স্নান করে পুণ্য অর্জন করত।

একজন বন্ধু বললে—অত বড় বাড়ীটা ভেঙ্গে পুকুর করে ফেলতিস্! সে কি কখন হয়!

শরৎচন্দ্র বললেন—ঐ বাড়ী বা জমি তোরও নয়, আমারও নয়। হাতে যখন কলম আছে, তখন সেই কলমের এক খোঁচায় বাড়ী ভাঙ্গতে কতক্ষণ, আর ঘাট বাঁধাতেই বা কতক্ষণ!

ভুল পথে

১৩৪১ কি ১৩৩২ সালের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস। একদিন বেলা দশটা নাগাদ ডক্টর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মশায় রাসবিহারী এভিনিউ ধরে বাড়ী ফিরছিলেন। পণ্ডিতিয়া রোড আর রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগস্থলে এসে তাঁর চোখে পড়ল রাস্তার ধারে শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে। হাতে ছাতা, মাথায় রোদ্দুর লাগছে, কিন্তু ছাতা খোলেন নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন।

স্থনীতিবাবু শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এক পাড়াতেই দুজনের বাড়ী। স্থনীতিবাবু নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—এত বেলায়, এই রোদে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে?

শরৎচন্দ্র বললেন—কাল রাত্রে এদিকে একটা দোকান থেকে টেলিফোন করেছিলাম, তার পয়সা দেওয়া হয় নি। তারা পয়সা হয়তো নেবেও না, কিন্তু আমার তো দেওয়া উচিত। তাই দিতে বেরিয়েছি।

বাড়ীতে ফোন থাকতে দোকানে এসে ফোন করেছেন শরৎচন্দ্র—একথা শুনে একটু বিস্মিত হলেন স্থনীতিবাবু। তাছাড়া রাত্রেই বা কি দরকার পড়ল!

শরৎচন্দ্র বললেন—কাল রাত্রে এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। সন্ধ্যের সময় নরেন দেবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। গল্প করতে করতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। ফেরার সময় তাই নরেন আর তার স্ত্রী রাধারাণী আমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সঙ্গে আসছিল। তিনজনে এই অবধি যখন এসেছি, দেখতে পেলাম ঐখানে, ঐ গাছতলায় জনচারেক লোক জটলা করছে। অনেক রাত হয়েছে, রাস্তায় লোক চলাচল কম, দেখে কৌতূহল হ'ল। ভাবছি কি করি, এমন সময় ওদেরই মধ্যে একজন আমাদের ডেকে বললে—আপনারা এদিকে একটু আস্থন তো!

আমরা এগিয়ে যেতেই পথের ধারে একটা রক্তমাখা কাপড়ের পুঁটলি দেখিয়ে তারা বললে—এর মধ্যে সদ্যোজাত এক শিশু রয়েছে। এইমাত্র কারা

যেন ফেলে দিয়ে গেছে। শিশুটি এখনো কাঁদছে। আমরা এ পথ দিয়ে যেতে যেতে শিশুর কান্না শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

শিশুটিকে দেখে আমার বড় মায়া হ'ল। রাধুও বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কি করে ঐ শিশুটিকে বাঁচানো যায়!

ঐ বন্ধ পুঁটলির মধ্যে শিশুটি তালগোল পাকিয়ে রয়েছে, এ আমার সহ্য হচ্ছিল না। একজনকে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলতে বললাম। খুললে পর রাস্তার আলোয় দেখা গেল, দিব্যি ফুটফুটে গোলগাল একটি শিশু। খোলা হাওয়া পেয়ে তার কান্না একটু কমল। রাস্তায় এমন জায়গায় তাকে ফেলেছিল যে, এরই মধ্যে তার গা বেয়ে সারি সারি লাল পিঁপড়ের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

বুঝলাম, বাঁচাতে হ'লে একে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। এত রাত, দোকানপাট সব বন্ধ, এখন ফোন করা যায় কোথা থেকে? নরেন খুঁজে খুঁজে এক দোকান বার করে সেখান থেকে ফোন করল হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে বললে, এ ধরণের রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে তারা নিতে পারে না, পুলিশে খবর দিতে হবে।

তখন পুলিশে ফোন করা হ'ল। তারাও আসতে চায় না। শেষে নরেন আমার নাম বলায়, তারা বললে—আচ্ছা, লোক পাঠাচ্ছি।

পুলিশ না আসা অবধি শিশুটিকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তখন সেই হ'ল আমাদের চিন্তা। রাধুকে বললাম—তুমি শিগ্‌গির বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়ে কিছু মধু আর দুধ যোগাড় করে পাঠিয়ে দাও। দেখি ছেলেটাকে খাওয়ানো যায় কিনা।

রাধু বাড়ী গিয়ে তখুনি মধু আর পাতলা কাপড়ের সল্‌তে পাকিয়ে পাঠিয়ে দিল। দুধও এল।

সল্‌তেয় মধু লাগিয়ে ছেলেটার মুখের কাছে ধরলাম। সে দিব্যি চুক্-চুক্ করে খেতে লাগল। তবে দুধ আর ওকে ও-রকম করে খাওয়ানো গেল না।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। নরেন, আমি আর সেই লোকগুলো ছেলেটিকে নিয়ে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পুলিশের লোক যখন এল, রাত্রি তখন প্রায় ২টা। তাদের মধ্যে একজন হিন্দুস্থানী রাইটার কন্‌স্টেবল। প্রবীণ লোক, মানুষটা মনে হ'ল মন্দ না।

তাঁর কথায় বেশ একটা দুঃখ এবং ক্ষোভের ভাব লক্ষ্য করলাম। একটু শ্লেষের সঙ্গে তিনি আমাদের বললেন—আপনারা বাঙালী ভদ্রলোক, যেভাবে মেয়েদের আজকাল শিক্ষা দিচ্ছেন, তাতে এ জিনিস না হয়ে যায় না। প্রতি সপ্তাহে কলকাতার মেইন ড্রেনের মধ্যে এ ধরণের সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ দুটি-পাঁচটি হরদম পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া পাড়ায় পাড়ায় রাস্তাঘাটে দু-চারটে যে প্রায়ই পাওয়া না যায়, তা-ও নয়। ইংরাজি শিখিয়ে সাবেক চাল, ঘর-সংসার, ধর্মপথে থাকা, এসব তো আপনারা মেয়েদের মন থেকে দূর করে দিচ্ছেন। তাই তারা না বিগড়িয়ে আর যায় কোথায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে শোনা ছাড়া উপায় ছিল না। ছেলেটিকে নিয়ে তারা চলে গেল।

সুনীতিবাবুকে শরৎচন্দ্র শেষে বললেন—কাল থেকে আমি কেবলই ভাবছি, স্কুল-কলেজে যে আধুনিক শিক্ষা আমরা মেয়েদের দিচ্ছি, তার জন্যই কি এত দুর্নীতি, এই সব হৃদয়হীনতা? তবে কি আমরা ভুল পথে চলেছি? আজ আবার এই জায়গাটায় এসে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা, আর পুলিশের সেই কথাগুলো বারেবারেই মনে পড়ছিল। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম। তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি সুনীতি, মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে আমরা কি তবে ভুল পথে চলেছি?

সুনীতিবাবু বললেন—আধুনিক শিক্ষাকে এর জন্য দায়ী করা হয়তো ঠিক হবে না। আমার বিশ্বাস, এর পিছনে রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক অবনতি। যার ফলে, সমাজে বিবাহযোগ্য বয়সের অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

সুনীতিবাবুর কথা শুনে শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে বললেন—যা বলছো, হয়তো তাই ঠিক। তবুও না ভেবে পারি না, আমরা কি ভুল পথে চলেছি?

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে উপন্যাস লিখন-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেদিন তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে সব কথা হয়েছিল, তা হচ্ছে এই :—

সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—'চরিত্রহীন' বইখানি তোমার বহুদিন ধরে লেখা। মনে পড়ে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তুমি যখন দিনাজপুরে গিয়েছিলে, (সুরেনবাবু ঐ সময় দিনাজপুরে তাঁর পিতার কাছে থাকতেন) তখন এই বইখানির সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে তোমার কথা হয়।

শরৎচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন—আমার তো কিছু মনে নেই!

—কিন্তু আমার অনেক কথাই মনে আছে। বোধ করি বইখানির নাম যে 'চরিত্রহীন' হবে, তাও তুমি তখন বলেছিলে।

—হবে বা। আমার স্মৃতিশক্তি একটুও ভাল নয়। যখন বলছো, তখন না-ই বা কি করে বলি। আচ্ছা বল তো, কি বলেছিলাম?

—সেদিন উপন্যাস লেখার পদ্ধতি নিয়ে কথা হয়েছিল। বাড়ীর ভিতরে বড় আম বাগানটির মধ্যে।

—এবার আমারও একটু একটু মনে পড়ছে যেন।

সুরেনবাবু বললেন—আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল, তোমার লেখা এত ভাল হয় কেন, আর আমরা কিছুতেই কেন তেমন লিখতে পারি নে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তারপর?

—তুমি বললে, তার প্রধান কারণ, তোমরা ঘটনা ধরে লেখ, আমি কিন্তু কোনদিন ঘটনা অবলম্বন করে লিখতে পারি নে। আমি লিখি চরিত্র অবলম্বন করে।

চরিত্র অবলম্বন কি করে করতে হয়, তা-ও বুঝিয়ে দেবার সময় এই চরিত্রহীনের সম্পর্কে বলেছিলে—আজ তিন চার বছর ধরে আমি তিন চারটে চরিত্র মনে মনে গড়ে তুলেছি। আরও তিন চারটে ঠিক হয়ে গেলে, একটা প্রকাণ্ড নভেল লিখতে আরম্ভ করবো। তার নামটা এখন ঠিক হয়ে গেছে—চরিত্রহীন।

আমাদের ও-নাম পছন্দ হয় নি। বলেছিলাম—কিন্তু ভারি অলক্ষুণে নাম। তুমি হেসে বললে—লক্ষণ অলক্ষণ মানি নে, যদি মনের মত করে কোনদিন লিখে উঠতে পারি তো বুঝবো যে একটা কাজ হলো।

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কতদিনে এই বই লেখা হবে?

—তা কে জানে—বলে তুমি হেসেছিলে।

স্থরেনবাবু বলেন—শরৎচন্দ্র অনেক চেষ্টা করেও সেদিনের সব কথা মনে আনতে পারলেন না। বললেন—ব্যাড্ মেমারি।

স্থরেনবাবু আরও বলেন—শরতের মেমারি সত্যই ব্যাড নয়। বললাম—চরিত্রহীন সম্বন্ধে একটা মজার কথা লোকে বলে, তাতে প্রমাণ হয় না যে, তোমার মেমারি খারাপ।

এই কথায় শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—ও-কথা কিভাবে রবিবাবুর কানে গিয়ে পৌঁচেছে। তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন—শরৎ, তুমি নাকি পিছন দিক দিয়ে চরিত্রহীন লিখেছ?

শুনে স্থরেনবাবু বললেন—তুমি কি বললে?

শরৎচন্দ্র বললেন—বল্লাম, না, তাই কি হয়! তবে শেষের দু-চার চ্যাপটার, হয়ত আগেই লিখে ফেলেছিলাম। তিনি তো সেই কথা শুনে অবাক্। বললেন—বল কি শরৎ!

এবার স্থরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক করে বল তো ব্যাপারটা কি?

শরৎচন্দ্র বললেন—চরিত্র অবলম্বন করে লিখতে আরম্ভ করে অমন ওলট-পালট খুবই করা চলে। তাছাড়া, এই লেখার বিষয়ে আমার মেমারি বড় স্ট্রং। আমার লেখা সম্বন্ধে আমি পাতার পর পাতা ভেবে রাখতে পারি। সেগুলো লেখার সময় আসতে থাকে। হারিয়ে যায় না।

স্থরেনবাবু হেসে বললেন—তার পরীক্ষা আমরা করেছি। সেটা তুমি জান না।

—কি রকম?

—সেবার তুমি কয়েকদিন ভাগলপুরে গিয়ে থাকার সময়, একখানি পত্রিকা থেকে লেখার তাগিদ বেশী হ'লে তুমি কয়েক ছত্র লেখ, কিন্তু চলে আসার সময়

সেটা নিতে তোমার মনে ছিল না। পরের মাসে যখন লেখাটা বা'র হলো, তখন দেখলাম যে, সেই ক'ছত্রের বিশেষ কোন কিছুই বদল হয় নি।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার ও-কথা ঠিক। নিজের লেখা সম্বন্ধে আমি পাতার পর পাতা ভেবে রাখতে পারি। সেগুলো লেখার সময় আসতে থাকে, হারিয়ে যায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শরৎচন্দ্র বললেন—আমার চরিত্রহীন বইখানা থেকে নূতন লেখকদের অনেক শেখার জিনিস আছে। ওতে গল্পাংশ যা আছে, সেটা ওর বিশেষত্ব নয়, চরিত্রগুলোকে কেমন করে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা যে অভিনিবেশের সঙ্গে পড়বে, সেই কিছু না কিছু পাবে।

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—চরিত্র সংগ্রহ কেমন করে করতে হয়?

শরৎচন্দ্র বললেন—সেটা শক্ত। তার পথ বলে দিতে পারি মাত্র, কিন্তু ওটি লেখকের সাধনার বস্তু।

সুরেনবাবু বললেন—সেই পথ তো আমরা জানতে চাই।

শরৎচন্দ্র উত্তরে বললেন—মনে কর, তোমার একটা কাছের মানুষকে তোমার ভাল লাগছে, তুমি তাকে ভাল করে স্টাডি করতে আরম্ভ করলে। এইখানে তোমার বাস্তবের সঙ্গে যোগ, কিন্তু বাস্তব মাত্রেই সাহিত্য নয়। যা কিছু ঘটে যাচ্ছে, তাই লিপিবদ্ধ করলে সাহিত্য হবে না। আমার মতে বাস্তব এবং আদর্শের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের পথটা চলে।

ধরে নাও, একটা ছোট গল্প লিখছ। প্রথমে গল্পের বিষয়বস্তুটা কি হবে মনে দৃঢ় ধারণা করে নিতে হয়। সেটা এমন বদ্ধমূল হওয়া চাই যে, গল্পের মধ্যে একটা প্যারাও যেন ঐ বিষয়বস্তুর বিরোধী বা অবান্তর না হয়। এই সব বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক না হলে লেখা কিছুতেই জমাতে পারা যায় না।

আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে ও-রকম সাবধানতা দেখতে পাই নে, কিন্তু বিদেশী, নাম আছে এমন সব লেখকদের লেখা পড়তে পড়তে তাঁদের লেখার প্রতি নিষ্ঠা, সাধনা দেখে মাথা যেন আপনিই ঘুরে আসে।

সুরেনবাবু বললেন—বিশেষ করে কার কথা বলছ?

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি ঐ জিনিস শিখেছিলাম, হারবার্ট স্পেন্সার পড়বার সময়—এমন অতিরিক্ত সাবধান, অ্যাকিউরেট! অবাক হয়ে যেতে হয়। মাথা নুয়ে আসে আমার গোর্কির লেখা পড়ে। যাক্, বিষয়বস্তুর কথা

বলছিলাম, খেই হারিয়ে গেলে চলবে না—তারপর ওজন করে কথা বলতে হবে।

কথার মোহ আছে, বেশ ভাল কথা মনে পড়ে গেল, আর সামলাতে না পেরে সেই কথাটা ধাঁ করে বসিয়ে দিয়ে গেলাম। এই করলে লেখা আলগা হয়ে যায়। ও আমি কিছুতে করি নে। একটা কথা, কি ভাব মনে এলে হয়তো টুকে রাখি, কিন্তু যতক্ষণ না সত্যিকার সময় আসে, ততক্ষণ আমি কিছুতেই ব্যবহার করি নি, আর করলেই দেখেছি সে রসভঙ্গ হবেই হবে।

ছোট গল্পের কথা বলছিলাম। ধরে নেওয়া যাক্, বিষয়বস্তুটা পিতৃভক্তি। এর সম্বন্ধে কারুর কিছু আপত্তি করবার নেই। পিতৃভক্তি আঁকতে হ'লে, পিতা কেমন হওয়া উচিত ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে—ধরে নাও রামের কথা। রামের পিতৃভক্তি আদর্শ, কিন্তু দশরথ একজন আদর্শ পিতা ছিলেন না। তাই রামের নিষ্ঠাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমনি করে হিসেব, ওজন, নিষ্ঠা, সাধনা দিয়ে যে লেখা লেখা যায়, তা ভাল হতেই হবে।

আমি কোনদিন কলম ছেড়ে দিয়ে লিখিনি. যা মনে এলো লিখে গেলাম, একটা কাটাকুটি হয় না। এসব বাহাদুরী যারা করে, তাদের কথা শুনে আমার হাসি পায়।

অনেকে কিছু একটা লিখে শেষ কালে বলেন—সময় কম, আরও যদি বেশী সময় পেতাম• তো আরও ভাল করে লিখতে পারতাম। এসব বড়াই করা নয় তো কি ?

সময় যদি না পাও তো লিখো না। যেটুকু সময় পেয়েছ, সেইটুকুতে এমন করে ততটুকুই লিখো, পরে যেন দুঃখ করতে না হয় যে, আমি আরও ভাল লিখতে পারতাম।

এই দেখ না, আমার লেখার তাগিদ তো কম নয়! কিন্তু আমি যা তা লিখে কিছুতেই দিই না। বলি যে এ মাসে পারলাম না। সাহিত্য লিখতে অবহেলা করলে তো সাহিত্য হয় না, হয় পাঁশ।

এবার সুরেনবাবু বললেন—তাহলে প্লট করে নেবার দরকার নেই ?

শরৎচন্দ্র বললেন—আছে বৈকি, চরিত্রটা তো তুমি সংজ্ঞা দিয়ে বোঝাবে না—সেটা তোমার গল্পের মানুষের কাজেকর্মে চিন্তায় ভাষায় প্রকাশ হবে।

সুসঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু আর চরিত্রকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পার তো প্লট আপনি ফুটবে।

সুরেনবাবু বললেন—তোমার কথা থেকে আর একজনের কথা মনে পড়ছে। সেক্সপীয়রের কোন দিন প্লটের চিন্তা যেন ছিল না। মানুষগুলোকে সত্য করে তুলেই খালাস।—তুমি একসময় খুব সেক্সপীয়র পড়তে না?

—হুঁ, তা পড়তাম বটে, কিন্তু সাহিত্যের বই পড়ে, সাহিত্য লিখতে শেখা যায় না। আমি এক সময় ইতিহাস, ভ্রমণ-কাহিনী—এই সব বই পড়েছি। মানুষের চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি না ফুটিয়ে তুলতে পারলে, ঠিক লেখা হয় না।

সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। সেকরার দোকানে তোমাকে সেকরা হতে হবে, ভিক্ষুকের সঙ্গে ভিক্ষুক হতে হবে।

সুরেনবাবু একথা শুনে বললেন—তাই কি সম্ভব?

শরৎচন্দ্র বললেন—সে অসম্ভব হলে, সাহিত্যও অসম্ভব।

শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে একবার সুরেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিজের জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন দেবানন্দপুর গিয়ে সুরেনবাবুকে তাঁদের বাড়ীটি দেখান। ঐ বাড়ীটি শরৎচন্দ্রের পিতা দেনার দায়ে অনেক আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন সুরেনবাবুকে বলেছিলেন—এক একবার ভাবি, যত টাকাই লাগুক, আমাদের বাড়ীটা কিনে নিই।

সুরেনবাবু বলেছিলেন—কেন কেনো না?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—আবার ভাবি, কি-ই বা হবে! বিস্মৃতির আড়ালে যে কথা চাপা পড়ে গেছে, তাকে জাগিয়ে তুলে কি লাভ হবে।

শরৎচন্দ্র নিজেদের বাড়ীটি দেখাবার পর সুরেনবাবুকে নিয়ে তাঁদের গ্রামের লাইব্রেরী বাড়ীতে যান। তারপর সেখান থেকে তিনি সুরেনবাবুকে একটি অট্টালিকায় নিয়ে গিয়ে বলেন—এই আমার সেই ছোট্দার বাড়ী।

শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বে অনেকবার তাঁর এই ছোট্‌দার বাড়ীর গল্প সুরেনবাবুর কাছে বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র সেবার দেবানন্দপুর থেকে চলে আসার কয়েকদিন পরে, দেবানন্দপুরের কয়েকটি যুবক তাঁদের গ্রামের লাইব্রেরীর জন্য শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে তাঁর কাছে কিছু বই চাইতে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন ঐ যুবকদের অনেক বই দিয়েছিলেন। ঐ সময় সুরেনবাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন দেবানন্দপুরের লাইব্রেরীতে ঐ বই দেওয়া নিয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে যে সব কথা হয়েছিল, তাতে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাস রচনার অনেক রহস্য প্রকাশিত হয়েছিল। সুরেনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সেদিনকার কথাবার্তা হয়েছিল এইরূপ :—

দেবানন্দপুরের যুবকরা বই-এর গাদা নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁর ইজিচেয়ারটির উপর শুয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র হাসছেন দেখে সুরেনবাবু বললেন—হাস্‌ছো যে?

—ওরা ভাবলে আমি খুব খুশী হয়েছি!

—আমিও তো তাই ভাবছি।

শরৎচন্দ্র বললেন—কেন?

—তোমার জন্মস্থান—তার ওপর তোমার তো কর্তব্যও বটে···

—সে ঋণ আমি বহুদিন আগে শোধ করেছি।

—কবে করলে? কৈ আমাকে তো বল নি কিছু, কোনদিন!

—কাউকে তো বলি নি।—বলে শরৎচন্দ্র হাসলেন।

—অসম্ভব চাপা মানুষ কিন্তু তুমি!

—সে কথা কাউকে বলা যায় না; কিন্তু তুমি জান।

—জানি? হেঁয়ালিতে কথা কইতে লাগলে যে!

—মনে করে দেখ, অনেকদিন সে কথা তোমায় বলেছি।

সুরেনবাবু চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন। বললেন—নাঃ, কৈ মনে তো পড়ে না।

—ধরিয়ে দিলে মনে পড়বে। 'চরিত্রহীন' রিভাইজ্‌ করার সময় তোমার

সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল আমার। তুমি কিরণময়ীর শেষের ব্যাপারটা বদলে দিতে বল নি?

—তা হবে; সে তো তোমাকে আগা-গোড়াই, চিরদিনই বলে এসেছি। কিন্তু তোমরা ভীষণ কন্‌সারভেটিভ!

—আমরা মানে?

—তুমি, রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র—তোমরা সমাজকে ভয় কর।

—ওটা তোমাদের ভুল।

—ভুল নয় শরৎ, একদিন এর জন্যে তোমরাও ক্ষমা পাবে না।

—কিরণকে বদলালে যে সুরবালাকেও বদলাতে হয়।

—কি দোষ করলে সুরবালা বেচারি?

—দুজনে একই!

—অবাক করলে তুমি!

—ঐ তো! তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না। দাদামশাই বলতেন একটা ভারি ঠিক কথা। ওদের ফিকস্‌ড্ মাইন্‌ড্। যা একবার ভেবে ঢুকেছে, তা থেকে এতটুকুও, একচুলও নড়বে না। ওইখানে আমাদের দুজনের ছিল ভারি মনের মিল!

—যাক্ তাঁর কথা এখন—আজকের বিষয়টা আগে শেষ কর।

খানিকটা চুপ করে শরৎচন্দ্র বললেন—অল্প বয়সী ছেলেরা তাদের চেয়ে ঢের বেশী বয়সের মেয়েদের কাছে,—ঐ সুরবালাই, আমার প্রবৃত্তির দিকটা জাগিয়ে দেওয়ার গুরু ছিলেন। ও চরিত্রটির বাইরের দিক আঁকতে আমার প্রায় কিছুই পরিশ্রম করতে হয় নি। সতী, সাধ্বী, স্বামীর উপর যেমনি ভক্তি, তেমনি ভালোবাসা, তেমনি আকর্ষণ। আর শেষও হ'ল তেমনি—চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। অমন আর হয় না! স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সুরবালাও চলে গেল! কিন্তু কিরণময়ীকে আমি তারই—মানে সুরবালার শিক্ষায় যে জ্ঞানলাভ করলাম, সেই উপকরণ দিয়েই গড়ে তুলেছি। ওতে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তো সে নিছক আমারই। সুরবালার আগা-গোড়া কন্‌ট্রাস্‌ট করতে গিয়ে, ঐ রকম করতে বাধ্য হয়েছি। মোট কথা, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যে সজাগ্রতা দেখতে পাও—সে ঐ সুরবালার জন্যে। তাঁকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি। গুরু-দক্ষিণা আমার ঐ চরিত্র-চিত্রন।

তাই বলেছিলাম—দেবানন্দপুরের জীবনের সব চেয়ে বড় কথা যাঁর কাছে শিখেছি—যাঁর জন্যে ও-দেশকে ভালবাসি—তাঁর ঋণ শোধ আমার করা হয়ে গেছে !······জন্মভূমি বলে হৈ-হৈ করা আমার স্বভাব নয়। নিজেকে বড় করে ভাবলে লোকে তার জন্মভূমিকে বড় করে তুলতে চায়। দেখলে না, এত বয়সেও আমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখার সাহস হ'ল না। ও ধৃষ্টতা আমি কোনদিনই করব না।

শরৎচন্দ্র আর একবার তাঁর এই 'চরিত্রহীন' রচনার প্রসঙ্গ নিয়ে সুরেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেদিনের আলোচনাটি ছিল এইরূপ :—

শরৎচন্দ্র সুরেনবাবুকে বললেন—দেখ, 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছু 'হাল্লা' করে চুকেছ ; কিন্তু আমি একেবারে 'আডাম্যাণ্ট'। তোমরা গল্পের দিকটায় জোর দাও—আমি কিন্তু চরিত্রের দিকটাই বড় মনে করি। চরিত্রহীনে আমার বিশেষ কিছু ভুল হয় নি—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর একদিন তোমাকে আরও কিছু বলবো।

সুরেনবাবু হাসতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার ও-হাসি আমি খুব চিনি ; কি ব্যাপার বলতো ?

—ব্যাপার খুব বড় কিছুই নয়—খুব সোজা। তুমি চালাক শয়তান, আর আমি বোকা শয়তান। তোমার আর আমার মধ্যে এই যা তফাৎ।

—এবার যে হেঁয়ালিতে কথা কইতে লাগলে।

—ওটা তো তোমার কাছেই শেখা।

—কি রকম ?

—তুমি আমাকে বহুবার বলেছ যে, চরিত্রহীন বইটার সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। ওর মধ্যে তোমার দেবানন্দপুরের অভিজ্ঞতাই আছে। তা থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। কেন না, যে বয়সে মানুষের সেক্স বুদ্ধি জাগতে থাকে, সেটা তোমার দেবানন্দপুরেই কেটেছে। সুরবালার কথা তুমি আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্যি-মিথ্যার মনোরম রস-সংস্রবে অনেক কিছু বলেছ।

তোমার পুরী পালানোর কারণও আমি জানি। সাবিত্রীর কথাও বলেছ। কিন্তু এগুলোর মধ্যে তোমার রসানগুলো তো বল নি; আর জানি, তাও কিছু খুলে বলাও তো যায় না।

—কেন?

—সে অসম্ভব বলে! এমন সব কথা মানুষের মনে আনাগোনা করে, যা কারুর কাছেই বলা যায় না। আর যদি বলতেই হয় তো, অনেক লুকোচুরি, অনেক রেখে ঢেকে বলতে হয়। তুমি সে বিদ্যেয় ওস্তাদ! তুমি অনেকবার বলেছ যে, ওটা দেবানন্দপুরের গল্প। তা আমি অস্বীকার করব না। কেন না ওর প্রথম পর্ব দেবানন্দপুরের ব্যাপার না হ'লে, তুমি পুরীই বা পায়ে হেঁটে পালাচ্ছিলে কেন? যখন তুমি স্পষ্টই বুঝেছিলে, সুরবালাকে তোমার সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হয়েছে—তখনই তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করে ছুটেছিলে পুরীতে জগন্নাথের কাছে দোষ ক্ষালনের জন্যে। পথে তোমার সাবিত্রীর সঙ্গে পরিচয়। ঠিক নয়?

শরৎচন্দ্র মুখ গম্ভীর করে বললেন—অনেকটা।

—সুরবালা নামটা কিন্তু তোমার ছোড়দারবৌ-এর নয়। ওটা শুধু দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার করেছ, অন্য একজনকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে। নয় কি?

—বোধ হয়।

—নাঃ, নিশ্চয়।

এই কথায় শরৎচন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে সুরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পরে সুরেনবাবু বললেন—কথা বলছো না কেন?

—ভাবছি···

—কি ভাবছো?

—তুমি ডিটেক্‌টিভ হও নি কেন?

—যে হেতু ওটা আমার পছন্দসই লাইন নয়; তাছাড়া আমি বেঁটে—পুলিশ-লাইনে ওদের আইনে আমার প্রবেশের দরজা বন্ধ।

—বটে! কেন?

—আমি হাইটে শর্ট। এখন সুরবালা কে তা কি তোমাকে বলে দিতে হবে? শান্তিপুরে কাকে পৌঁছে দিতে গিয়ে কুলিদের সঙ্গে মারামারি করেছিলে নৈহাটি স্টেশনে?

—তুমি জানলে কি করে সে কথা?

সুরেনবাবু উত্তরে বললেন—তোমার কোন এক অনবহিত মুহূর্তে গল্প করেছ, সেই বীরত্বের কাহিনীটি। সেটি আমার মনে দৃঢ় গাঁথা হয়ে আছে।

—ঠিক তো! আমি সে কথা কবে ভুলে গিয়েছি।

—তার কারণ আছে।

—কি কারণ?

—তুমি মহাবীর স্বামী! ওসব ছোট-খাট কথা তোমার মনে না থাকায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার যে ওটা মস্ত খুঁটো। তাছাড়া, তুমি গোড়ায় আমাকে বলও নি। দাদার কাছে প্রথম শুনি—তারপর সেজ-বৌদিদির কাছে।

—সে আবার কবে?

—ভাগলপুরে প্লেগ হওয়ার সময় তাঁদের আরেরিয়া নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি বলেছিলেন—শরৎটা গোঁয়ার।

শরৎচন্দ্র নাক মুখ উঁচু করে বললেন—যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর! ভগবান তুমি যে গত হয়েছ, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হ'ল।

শরৎচন্দ্র খানিকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রইলেন।

সুরেনবাবু বললেন—যতই না কেন বোকা সাজ কিম্বা ভুলে যাওয়ার ভান কর, ইউ আর কট্ রেড্ হ্যান্ডেড্।···আমাদের বাড়ীতে কিরণশশী বলে কি কেউ কোনদিন ছিলেন?

—মনে হচ্ছে না।

—তবে থাক, বলে লাভ নেই। তুমি তো অস্বীকার করবেই জানি।

—না না তুমি বল, তোমার দৌড়টা দেখছি।

—আচ্ছা শরৎ, কিরণশশীকে কিরণময়ী করলে, ব্যাপারটা কতখানি চাপা পড়ে?

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বললেন—কিছুটা তো পড়ে।

সুরেনবাবু বললেন—তবে চাপাই থাক। ও আলোচনার কি দরকার?

—বল, চুপ করে বসে বসে শুনি।

—লোককে বোকা বোঝাবার আর্টে তুমি সিদ্ধিলাভ যে করেছ, তা কেউ অস্বীকার করবে না।

শরৎচন্দ্র বললেন—ধরেছ অনেকখানি; তবে সবটা ধরা প্রায় অসম্ভব।

দেবানন্দপুরে ওর আরম্ভ বটে। পুরী পালানোও সত্যি। সাবিত্রী নিশ্চয় তার নাম নয়! তাকে হারিয়ে ফেলাও সত্যি। কিন্তু লেখকের কেরামতির কি কোন প্রশংসা নেই, বলতে চাও তুমি?

সুরেনবাবু বললেন—না। ষোল আনার জায়গায় বিশ আনা দিলেও সবটা দেওয়া হ'ল কিনা চিন্তার বিষয়। সেখানে আমি দাতাকর্ণ। এ বিদ্যে তুমি একদিন পাখী-পড়া করে শিখিয়েছ আমাদের; কিন্তু আমরা কেউ শিখতে পারি নি। সবাইএর 'কচে'র অবস্থা। প্রয়োগ করতে কেউ পারে নি। ঐখানেই তোমার প্রতিভা। আর আমাদের ল্যাজে-গোবরে!

শরৎচন্দ্র হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'পথের দাবী' লেখার সময় শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন যে, এই বইটি লেখার জন্য তাঁর জেল হবেই।

জেলে যেতে তাঁর ভয় ছিল না। তবে জেলে আফিং পাওয়া যাবে না, এটা তিনি জানতেন। এই ভেবে শরৎচন্দ্র আফিং খাওয়া ছেড়ে দিলেন। আফিং ছাড়লে সামান্য সামান্য জ্বর হ'তে হ'তে দিন কুড়ি বাইশের মধ্যে এমন জ্বর হ'ল যে, বিছানা নিতে হ'ল।

ডাক্তার এসে বললেন—টাইফয়েড।

ডাক্তারের চিকিৎসায় দেখা গেল জ্বর ওঠা-নামা করে না। ১০৩ ডিগ্রীতে দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকে।

ডাক্তার মহা চিন্তিত হলেন।—তাই তো ব্যাপার কি?

ডাক্তার শেষে একদিন সুরেনবাবুর কাছে জানতে পারলেন, আফিং ছাড়ার পর এই ব্যাপার ঘটেছে। তখন ডাক্তার শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদিন আফিং খান নি?

শরৎচন্দ্র বললেন—কুড়ি বাইশ দিন হবে।

ডাক্তার বললেন—আমাদের শাস্ত্রে একে 'ওপিয়াম ফিভার' বলে। আপনি আফিং ছেড়ে মিছে কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাকে বলছি আপনার জেল হবে না। আর যদিই হয় তো সেখানেও যাতে আফিং পান, আমি তার ব্যবস্থা করে দোব। আপনি এক কাজ করুন, আফিং না ছেড়ে, আফিং ভেজান জল খান। যেমন—এক ভরি এক গ্লাস জলে দিয়ে খানিকটা খেলেন।

যতটুকু জল খেলেন, ততটুকু জল দিয়ে সেটা আগের পরিমাণ করে নিলেন। আবার পরের দিন যতটুকু খেলেন পূরণ করে দিলেন। এই উপায়ে আফিং ছাড়া যায়।

ঐ সময় একদিন বিছানায় শুয়ে শুয়েই শরৎচন্দ্র সুরেনবাবুকে বলেছিলেন—দেখ, কি ভুলই জীবনে করেছি এই নেশা করে। যখন ক'দিন আফিং খেতুম না, তখন এই পৃথিবীর সব কিছু আমার কাছে অতিশয় স্বচ্ছ সুন্দরভাবে আসতো। যদি আমি নেশা না করতুম তো এর চেয়ে ঢের বড় লেখক হতে পারতুম।

সুরেনবাবু হাসলে তিনি বললেন—হাসছো যে?

সুরেনবাবু উত্তরে বললেন—এ পাপ তোমার স্বকৃত নয়।

—তবে?

—তোমার ঠাকুর্দার পাপ, তিনি নেশা করতেন শুনেছি। জান, তোমার বাবাও নেশা করতেন?

—জানি, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—দেখেছি। বড় দাদাকে তিনিই তো মদ ধরান। এ আমি জানি। 'তুমি কি করে জানলে' জিজ্ঞেস করলে?—দেখেছি দোরের ফাশা দিয়ে।

—বটে!

—'ব্রিত্ততে' এই কথা আছে।—তিন পুরুষ চলে।

—ঠিক ঠিক, এইবার আমারও মনে হয়েছে।

—তাই আমাদের শাস্ত্রে আছে—মদ্যম্ অদেয়ম্, অপেয়ম্, অগ্রাহ্যম্।

—মস্ত বড় কথা!

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর কিছুদিন আগে সুরেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গ্লোব নার্শারীর বাগান থেকে কিছু ফুলের চারা আনতে গিয়েছিলেন। সেদিন সেখানে কথা-প্রসঙ্গে গ্লোব নার্শারীর অমরবাবু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—দাদা, আপনার 'পথের দাবীর' সব্যসাচী কে?

—পরে একদিন বলবো।—বলে শরৎচন্দ্র সেদিন অমরবাবুর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই চলে এসেছিলেন।

ফিরবার সময় মোটরে সুরেনবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—ঘুমুলে?

—না।

—কি ভাবছো বল তো?

—ভাবছি যে, সব্যসাচী কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। কবির সাহিত্যের সৃষ্টি।

—ঠিক তা নয়।

—তবে?

শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি কি বলতে চাও যে 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ আর সব্যসাচী একই ধরণের দুটো সৃষ্টি?

—না।

—কিসে তফাৎ?

—নিখিলেশের মধ্যে কল্পনা আছে বারো আনা, আর সব্যসাচীর মধ্যে হয়তো ছ' আনা।

শরৎচন্দ্র বললেন—বোধ হয় আরো কম।

—কিন্তু সব্যসাচীর বাস্তবে কোন ব্যক্তি বিশেষ নেই। বহু ব্যক্তির বহু গুণের অদ্ভুত সমাবেশই কবির সৃষ্টির কৃতিত্ব! আমি সময় সময় সব্যসাচীর মধ্যে তোমাকেও পাই।

—তাহলে জানবে, সেটা আমার অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

—ওটা সেকালের মত।

শরৎচন্দ্র বললেন—ওটাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত। দেখো, শকুন্তলার মধ্যে কালিদাসকে খুঁজে বার করতে পারা যায় না।

—তার মানে আছে।

—কি?

—উপন্যাস আর নাটকের টেক্‌নিক্ আলাদা।

—যাকৃগে কূট তর্ক; আজ কিন্তু দিনটা ভারি চমৎকার কাটলো।

—আরো চমৎকার কাটবে।

—কিসে?

—মাটি ঠিক করাই তো আছে—চারাগুলো আজই বসিয়ে দিতে হবে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পৌষ মাসের ঠাণ্ডায় বাইরে বসে গোটা চারেক চাকর সঙ্গে করে শরৎচন্দ্র ও সুরেনবাবু ফুলের চারা গাছগুলো বসালেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। শরৎচন্দ্র তখন কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছেন এবং ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে থাকেন। ঐ সময় তিনি কলেজের সহপাঠী বন্ধু ইন্দুভূষণ ভট্টদের বাড়ীতে নিজের লেখার ও পড়ার একটা আস্তানা করে নিয়ে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই সেখানে কাটান।

সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ সময় ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে এফ-এ পড়তেন। ইন্দুভূষণ ভট্টর ছোটভাই বিভূতিভূষণ ভট্ট তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে সৌরীনবাবুর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। সৌরীনবাবু একদিন বিভূতিবাবুদের বাড়ীতে গেলে, সেখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়।

সৌরীনবাবু ইতিপূর্বে একদিন বন্ধু বিভূতিভূষণের কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের একটি গল্পের খাতা পেয়ে সেটি পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের গল্প পড়ে সৌরীনবাবু সেদিন বিভূতিবাবুর কাছে শরৎচন্দ্রের গল্প সম্বন্ধে ভালমন্দ দু রকম কথাই বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সৌরীনবাবুর প্রথম পরিচয়ের দিনে, বিভূতিবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সৌরীনবাবুর পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন—এই আমার বন্ধু সৌরীন, তোমার গল্প পড়ে সেদিন সেই সমালোচনা করেছিল।

এই কথায় শরৎচন্দ্র সৌরীনবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। দু চার সেকেণ্ড তাকিয়ে বললেন—তুমি গল্প লেখ?

সৌরীনবাবু সভয়ে বললেন—না।

বিভূতিবাবু বললেন—ও কবিতা লেখে।

শরৎচন্দ্র সৌরীনবাবুর দিকে চেয়েই ছিলেন। বললেন—গল্প লেখো না কেন?

সৌরীনবাবু বললেন—লিখতে পারি না।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—পদ্য লেখো, আর গল্প লিখতে পার না। গল্প লিখবার চেষ্টা করো। গল্প কাকে বলে, কিসে গল্প হয়, সে জ্ঞান তোমার

আছে। পুঁটুর (বিভূতিবাবু) কাছে তুমি আমার গল্পের যে সমালোচনা করেছ, পুঁটু আমায় বলেছে। সেই সমালোচনা শুনে আমি বলেছি—গল্প সম্বন্ধে তোমার 'আইডিয়া' আছে। তুমি গল্প লেখ।

শরৎচন্দ্রের এই কথায় সৌরীনবাবু সহর্ষে ও সগর্বে সেদিন বলেছিলেন—গল্প লিখব।

এরপর সৌরীনবাবু গল্প লিখতে সুরু করেন এবং কয়েক বছরে অনেকগুলি গল্পও লেখেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে শরৎচন্দ্র চাকরির আশায় কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁর মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় এসে ওঠেন। লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। লালমোহনবাবু কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। এই লালমোহনবাবুরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনবাবু তাঁর এই দাদার কাছে থেকে তখন কলকাতায় লেখাপড়া করতেন।

শরৎচন্দ্র চাকরির আশায় যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে, মাতৃবিয়োগ অনেক আগেই হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র লালমোহনবাবুর কাছেই একটা চাকরি পেলেন। সে চাকরিটি হ'ল—ভাগলপুর থেকে লালমোহনবাবু হাইকোর্টে যে সব 'আপীল কেস' পেতেন, সেই সব কেসের পেপার-বুক-এর হিন্দী থেকে ইংরাজীতে তর্জমা করে দেওয়া। এই কাজের জন্য শরৎচন্দ্র লালমোহনবাবুর বাড়ীতে থাকা-খাওয়া ছাড়া মাহিনা পেতেন মাসিক তিরিশ টাকা।

সৌরীনবাবু এই সময় ভাগলপুর ছেড়ে তাঁদের কলকাতায় ভবানীপুরের বাসায় ফিরে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্র ভবানীপুরে এলে সৌরীনবাবুর সঙ্গে এখানে আবার তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল।

সৌরীনবাবু বলেন—ঐ সময় আমাদের অভ্যাস ছিল, সন্ধ্যার পূর্বে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে যাওয়া। শরৎচন্দ্রও আমাদের সঙ্গে বেরোতেন। আমাদের তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শুধু সাহিত্য আলোচনা নয়, নানা

বিষয়ে আলোচনা হ'ত। সে আলোচনায় পৃথিবীর কোন বিষয় বাদ পড়তো না।

স্টার থিয়েটারে ঐ সময় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সাবিত্রী' অভিনয় হাচ্ছিল—সে অভিনয় দেখে এসে সৌরীনবাবু তার সুখ্যাতি করেছিলেন। সেই সুখ্যাতি শুনে শরৎচন্দ্র একদিন অভিনয় দেখতে গেলেন। অভিনয় দেখে এসে পরের দিন তিনি সৌরীনবাবুকে ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করে তুললেন। বললেন—বাপ্‌রে, কি ব'লে তোমার ভাল লাগলো! সত্যবান মারা যাবার আগে পর্যন্ত এক রকম মন্দ লাগছিল না। ভালো লেগেছে বটে অমৃত মিত্রের মাণ্ডব্য! সত্যবান যে সেজেছে, তাকে দেখাচ্ছিল সাবিত্রীর ছোট ভাই যেন! তারপর টেক্কা পড়লো যখন সত্যবান বেচারা মারা গেল, সাবিত্রী তার মৃতদেহ কোলে তুলে গান ধরলো! এমন অবস্থাতেও মানুষকে গানে পায়!

সৌরীনবাবু তর্ক তুললেন—ওটাকে ঠিক সুর-লয়ে গড়া গান ব'লে ধরছো কেন? ও-অবস্থায় মানুষ চীৎকার করে কাঁদে—'ওগো তুমি কোথায় গেলে গো! আমার কি হলো গো!' এই সব ব'লে; শোকের সেই আবেগটুকু নাট্যকার প্রকাশ করেছেন গানের ছন্দে সুরে!

শরৎচন্দ্র বললেন—তা ব'লে দু-দুটো গান! একটা হ'লেও রক্ষা ছিল!

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র অর্থের সন্ধানে বর্মা যান। বর্মায় থাকার সময় মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। কলকাতায় এসে আত্মীয় ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আবার বর্মায় চলে যেতেন। এইরূপ একবার এসে চলে যাওয়ার সময় সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রকে জাহাজে তুলে দিতে গেলে, সেদিন শরৎচন্দ্র সৌরীনবাবুকে বলেছিলেন—ছোট গল্প অনেক লিখেছো। এবারে উপন্যাসে হাত দাও সৌরীন!

শরৎচন্দ্র সেদিন সৌরীনবাবুকে আরও বলেছিলেন—যা লিখবে চরিত্রগুলো যেন মানুষ হয়, দেখো—রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আর কারো লেখা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর আদর্শে বা নকলে কখনো তারা তৈরি না হয়। উপন্যাসের ঘটনা সংস্থাপন যেন পাঁচখানা উপন্যাস থেকে ধার করো না। দোষেগুণে ভরা মানুষের কথা লিখবে।

শরৎচন্দ্রের বর্মা যাওয়ার আগে থেকেই তাঁর লেখা 'বড়দিদি' গল্পের একটা কপি সৌরীনবাবু নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। সৌরীনবাবুর উদ্দেশ্য ছিল, ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত তাঁদের হাতের লেখা পত্রিকা 'তরণী'তে ঐ বড়দিদি গল্পটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা হয় নি। তাই শরৎচন্দ্র বর্মা চলে গেলেও 'বড়দিদি'র কপি সৌরীনবাবুর কাছেই থেকে যায়।

সৌরীনবাবু 'ভারতী' পত্রিকায় যোগ দিয়ে ১৩১৪ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন সংখ্যা 'ভারতী'তে বড়দিদি গল্পটি প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম দু সংখ্যায় লেখকের নাম ছিল না, শেষ সংখ্যায় লেখকের নাম সহ প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র তখন বর্মায়। ভারতীতে বড়দিদি প্রকাশের কিছুই তিনি জানতেন না।

ভারতীতে বড়দিদির প্রথমাংশ প্রকাশিত হলে তখন অনেকে ঐ লেখাটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে করেছিলেন। এমন কি কবির কাছে অনেকে এ লেখাটির সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতীতে 'বড়দিদি' পড়েন। পড়ে সবিস্ময়ে তাঁদের বলেছিলেন—বড়দিদি আমার লেখা নয়। তবে বড়দিদি যিনি লিখেছেন, তিনি অসাধারণ শক্তিশালী লেখক। তাঁর ঐ একটি মাত্র গল্প প্রকাশ করে নিঃশব্দে নেপথ্য বাস শুধু অনুচিত নয়, নিষ্ঠুর হবে।

এরপর রবীন্দ্রনাথ একদিন সৌরীনবাবুর কাছ থেকে বড়দিদির লেখক শরৎচন্দ্রের পরিচয় পেয়ে সৌরীনবাবুকে বলেছিলেন—যেমন করে পারো তাঁকে আনাও সৌরীন, তাঁকে ধরে এনে লেখাও। বাঙ্গলা দেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।

'ভারতী'তে বড়দিদি প্রকাশের কয়েক বছর পর শরৎচন্দ্র একবার রেঙ্গুন থেকে বলকাতায় আসেন। সেবার কলকাতায় এসে তিনি সৌরীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, সৌরীনবাবু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন—তুমি লেখা ছেড়েছো কি ব'লে বুঝতে পারি না। তুমি নিজে বোঝো না যে তোমার লেখায় বাঙ্গলা সাহিত্য কতখানি সমৃদ্ধ হবে। ভারতীতে বড়দিদি ছাপা হলে সে লেখা রবীন্দ্রনাথের বলে অনেকে বেশ হৈ-চৈ করেছিলেন।—এই বলে,

রবীন্দ্রনাথ সে গল্প পড়ে যা বলেছিলেন, সে কথাও সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন।

শরৎচন্দ্র হাসলেন। হেসে বললেন—যেখানে গিয়ে পড়েছি এবং পয়সা রোজগারের চেষ্টায় যেভাবে বিব্রত থাকি, তাতে মন ভেঙ্গে গিয়েছে।

তারপর তিনি এলেন সৌরীনবাবুর সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে। বললেন—'বড়দিদি' গল্পটি একবার পড়ো, শুনবো। প্রায় ভুলে গিয়েছি, কি গল্প লিখেছিলুম।

সেদিন ছিল, কালীপূজার দিন। বেলা তখন প্রায় দুটো বেজে গিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা ভুঁই-পটকা তৈরি করে পথে দুমাদুম আছাড় মারছিল। শরৎচন্দ্র বিরক্ত হচ্ছিলেন। দু-একবার মন্তব্য করলেন, পথে এ-রকম বাজি ছোড়া রীতিমত বাঁদরামি!

সৌরীনবাবুর গৃহে এসে বাইরের ঘরে তক্তাপোষে পাতা শয্যায় শরৎচন্দ্র শুয়ে পড়লেন। শুয়ে বললেন—গল্পটা তুমি পড়ো, আমি শুনি।

সৌরীনবাবু 'বড়দিদি' গল্পটি পড়তে লাগলেন।

ঐ আসরে যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিও ছিলেন।

সৌরীনবাবু গল্প পড়ছেন, শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে অভিভূতের মতো উঠে বসেন, বলেন—থামো, থামো!—তাঁর দু চোখে সজল-আবেশ-ভাব।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমার লেখা? নেহাৎ মন্দ লিখি নি তো! লেখা শুনে বুক দুলে ওঠে! এ-গল্প আমি এই আমার হাতে লিখেছি! আশ্চর্য!

সৌরীনবাবু বললেন—তাই! এমন লেখা যে লোকে লিখতে পারে, সে যদি লেখা ছেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার সে অপরাধের ক্ষমা নেই। তুমি যদি না লেখো, তাহলে বুঝবে, তুমি আত্মহত্যা করছো! রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তুমি যদি না লেখো, তাহলে সেটা হবে নিষ্ঠুরতা।

সৌরীনবাবু বলেন—আজো মনে আছে, 'বড়দিদি' গল্পে যে জায়গায় রুগ্ন-শয্যায় শায়িত সুরেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী শান্তিকে বলছেন, দেয়ালে টাঙ্গানো সুরেন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়ে, শান্তি কি ভাবতে পারেন চারজন বামুনের কাঁধে-পিঠে ও-ছবি তুলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আনবার কথা, নামের

দাম বোঝাবার জন্য—এ জায়গাটা যখন আমি পড়ছি, শরৎচন্দ্র চোখ বুজে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে শুনছিলেন, এ জায়গাটায় তিনি পাগলের মতো উঠে বসলেন। বসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—থামো। তাঁর স্বর গাঢ়। শুনে আমি তাঁর পানে চেয়ে দেখি, শরতের দু চোখের কোণে জল। অনেকক্ষণ তিনি চুপ করে বসে রইলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—পড়ো এবার।

সৌরীনবাবু পড়া সুরু করলেন। শরৎচন্দ্র আবার শুয়ে পড়লেন। শুয়ে চোখ বুজে গল্পের শেষটুকু শুনলেন।

গল্প শেষ হ'লে তিনি বললেন—ভালো লেখা হয়েছে তো! হ্যাঁ লিখবো, তোমাদের বিশ্বাস, আমি ভাল গল্প লিখি?

এ কথায় সৌরীনবাবুরা হেসেছিলেন।

এরপর সৌরীনবাবু ফণীন্দ্র পালের 'যমুনা'র কথা তুলে বললেন—এ ভদ্রলোক বি-এ পাশ করেছেন এবং সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যমুনা সম্পাদনায় জীবন সমর্পণ করবেন, এঁর বাসনা। এঁর কাগজে তোমাকে লিখতে হবে।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি লিখবো, তোমরা যদি লেখো—মানে, বুড়ী (নিরুপমা দেবী), সুরেন, গিরীন, পুঁটু, তুমি, তোমার ছোটদিদি, উপেন—তাহলে আমি লিখবো নিশ্চয়!

তারপর বললেন—একটা চমৎকার জিনিষ লিখেছিলুম—'নারীর ইতিহাস'। প্রায় পাঁচশো পাতা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ। ঘর পুড়ে সে লেখা ছাই হয়ে গিয়েছে। গল্প নয়, কিন্তু সে লেখাটি গল্প-উপন্যাসের চেয়ে ঢের বেশী ইণ্টারেস্টিং। অনেক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ঘেঁটে, অনেক জীবন অনুশীলন করে লেখা। সেটা পুড়ে যাওয়ায় মনে ভারী আঘাত লেগেছে।

সৌরীনবাবু বললেন—তার কিছু মনে নেই? কোন পয়েণ্ট?

শরৎচন্দ্র বললেন—কিছু কিছু আছে।

সৌরীনবাবু বললেন—যতটা মনে আছে, তা থেকে লেখো।

শরৎচন্দ্র বললেন—লিখবো। আর একটা লেখা আছে—গল্প। সেটা প্রকাণ্ড উপন্যাস হবে। সিকি ভাগ লেখা হয়েছে মাত্র, তারপর পড়ে আছে—সে লেখাটাও তোমাদের পড়াবো। সে গল্পটির নাম দিয়েছি 'চরিত্রহীন'। যদি লিখে শেষ করতে পারি, দেখবে, সে এক নতুন জিনিষ হবে।

'ভারতী'তে শরৎচন্দ্রের বড়দিদি যখন ছাপা হয়, তখন ভারতীর সম্পাদিকা ছিলেন সরলা দেবী। তিনি লাহোরে তাঁর স্বামীর কাছে থাকতেন। সেখান থেকেই ভারতী সম্পাদনা করতেন। অবশ্য মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন।

দূরে থেকে ভারতী সম্পাদনায় সরলা দেবীর অসুবিধা হতে থাকায় তাঁর মাতা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৩১৫ সাল থেকে ভারতী সম্পাদনার ভার নেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এর আগেও একবার ভারতীর সম্পাদিকা হয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সময়ও সৌরীনবাবু ভারতীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

এই সময় শরৎচন্দ্র একবার রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এলে তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের যতটা লেখা হয়েছিল, প্রায় ৭০৷৮০ পৃষ্ঠা সৌরীনবাবুকে পড়তে দিয়েছিলেন। দিয়ে বলেছিলেন—এটা বহুদিন আগে লিখতে সুরু করি। প্রকাণ্ড উপন্যাস হবে। পড়ে দেখো, চলে কিনা। তাহলে শেষ করে ফেলবো। যতটা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে নায়িকা এখনো দেখা দেয় নি। এ-বইয়ের নায়িকা কিরণময়ী। সে এক নতুন জিনিস হবে।

সৌরীনবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন 'চরিত্রহীন' নিয়ে ভারতীতে ছাপতে দেবেন। কারণ, সৌরীনবাবু ভেবেছিলেন—ভারতীর দাবী সর্বাগ্রে। তাছাড়া যমুনার অল্পপরিসর পৃষ্ঠায় অত বড় উপন্যাস ছাপতে সুরু করলে বহু বৎসরে তার সমাপ্তি ঘটবে এবং পাঠকের দল খাপ্পা হবেন। তাতে ব্যবসার দিক দিয়েও সুবিধা হবে না।

সৌরীনবাবু চরিত্রহীন পড়লেন। স্বর্ণকুমারী দেবীকেও সৌরীনবাবু পড়তে দিলেন। পড়ে স্বর্ণকুমারী দেবী বললেন—কত বড় উপন্যাস হবে, শেষ না হলে বোঝা যাচ্ছে না। লেখা চমৎকার! শেষ করিয়ে নিয়ে এসো। এর জন্য আগাম একশো টাকা আমি এখনি দেবো।

এ কথা শরৎচন্দ্রকে বলাতে শরৎচন্দ্র বললেন—এ জিনিষ তাড়া দিয়ে শেষ করাবার নয়। তার উপর আমি লিখি খুব ভেবে-চিন্তে—তাতে সময় লাগে। তাছাড়া এর নায়িকা কিরণময়ী এখনো দেখা দেয় নি। তার কথা যা লেখা হবে, সে কথা মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকায় ছাপা হয়তো ঠিক উচিত হবে না।

শরৎচন্দ্র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ছ মাসের ছুটি নিয়ে রেঙ্গুন থেকে সস্ত্রীক কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে তিনি চোরবাগানে একটা বাড়ীতে থাকতেন।

ইতিপূর্বে 'যমুনা'য় তাঁর 'রামের সুমতি' 'নারীর লেখা' প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়ায় যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তাঁর ভক্ত ও অনুগত হয়ে পড়েন।

ফণিবাবু ঐ সময় প্রতিদিন বিকালে শরৎচন্দ্রের বাসায় যেতেন। ফণিবাবু গেলে শরৎচন্দ্র ফণিবাবুর সঙ্গে সৌরীনবাবুর কাছে তাঁর কোর্টে যেতেন। সৌরীনবাবু তখন পুলিশ কোর্টে ওকালতি করতেন।

ঐ সময়ে পুলিশ কোর্টের একটা ভাগ ছিল জোড়াবাগানে। এখন (এই লেখার সময়) যেখানে জোড়াবাগান থানা এবং নর্থ ডিস্ট্রিক্টের অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনারের কোয়ার্টার প্রভৃতি তখন ঐ স্থানে পুলিশ কোর্টের একটা ভাগ ছিল। পুলিশ কোর্ট হওয়ার আগে ঐ বাড়ীতেই ছিল ডাফ কলেজ।

ফণিবাবু কোর্টের ভিতরে গিয়ে সৌরীনবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন। শরৎচন্দ্র ভিতরে না গিয়ে কোর্টের সামনে পায়চারি করতেন।

একদিন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। সৌরীনবাবু কেস শেষ করে নীচে এলেন। কেসটি ছিল এক দাগী চোরের। হাকিমের হুকুমে তার দু বছর জেল হ'ল। কোর্ট তখন প্রায় জনহীন। কোর্টের কম্পাউণ্ডে জেলের গাড়ী দাঁড়িয়ে। কয়েদীদের সেই গাড়ীতে তোলা হবে তখনি। সৌরীনবাবু লাইব্রেরী ঘরে গাউন রেখে কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর জেল-গামী মক্কেলের রক্ষিতা স্ত্রীলোকটি কেঁদে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে পড়লো। সে জেল-ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে তার প্রণয়ীর বিদায় দেখছিল। কেঁদে সে সৌরীনবাবুকে বললে—আজই রাত্রে আমি টাকা নিয়ে আপনার কাছে যাবো, আপনি আর্জেণ্ট নকল নিয়ে হাইকোর্টে আপীলের ব্যবস্থা করবেন। সব চেয়ে বড় উকিল দেবেন।

সৌরীনবাবু তাকে বোঝালেন—আপীলে কোন ফল হবে না, মিথ্যা টাকাগুলো নষ্ট হবে।

তবু তার জিদ—ফল না হয়, না হবে। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, তার সমস্ত গহনা বেচেও টাকার জোগাড় করবে, সে চুপচাপ থাকবে না।

বেশ খানিকক্ষণ তার সঙ্গে সৌরীনবাবুর কথা হ'ল। সৌরীনবাবু যুক্তি-পরামর্শ দিলেন।

মেয়েটি কিন্তু সৌরীনবাবুর কোন যুক্তি, কোন কথাই শুনতে চাইল না। বললে, সর্বস্ব খুইয়েও সে হাইকোর্ট করবে।

এই সময় পুলিশ আসামীদের এনে জেল-ভ্যানে এক একজন করে পুরতে লাগলো। মেয়েটির প্রণয়ীকেও ভ্যানে তোলা হ'ল।

ভ্যানের পাশে পড়ে মেয়েটির সে কী কান্না—পুলিশের হাতে সে দু-চার টাকা গুঁজেও দিয়েছিল। তারা বাধা দেয় নি।

আসামী ভ্যানে ওঠবার সময় বারবার তাকে নিষেধ করলে—হাইকোর্ট করিস নে, বাবুর কথা শুনিস। অনর্থক টাকা নষ্ট করিস নে, টাকা গেলে তোর চলবে কি করে দু-দু বছর!

ভ্যান চলে গেল কয়েদীদের নিয়ে। স্ত্রীলোকটি তবু সৌরীনবাবুকে ছাড়ে না। বললে, সে রাত্রে সৌরীনবাবুর বাড়ীতে টাকা নিয়ে যাবে। আসামী বারণ করেছে, সে বারণ ও শুনবে না। ওর কর্তব্য আছে, সে কর্তব্য ও করবেই।

শরৎচন্দ্র কোর্টের ফটকে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফণিবাবু ও সৌরীনবাবু ফটকে এলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—কি কেস? ও-স্ত্রীলোকটি কে?

সৌরীনবাবু পরিচয় দিলেন। বললেন—দাগী আসামী, বহুবারের দাগী। কেস বেশ প্রমাণ হয়েছে, তবু ওর জেদ—আপীল করবে।

তাদের ইতিবৃত্ত শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—খাশা মেয়েটি! মনের পরিচয় পেলে তো! সমাজের চোখে এরা নোংরা আবর্জনা, অথচ এদের মনের মধ্যে যে মানুষটি বিরাজ করছে—কত মহৎ সে মানুষ! অনেক সাধ্বী স্ত্রীও তার স্বামীর এমন বিপদে এতখানি বিচলিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে না। আর এই পতিতা নারী! এদের কথা কবে আমাদের সাহিত্যে স্থান পাবে!

দেশবন্ধুর সহিত আলোচনা

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। সেই সময়েই শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর আহ্বানে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করলে, দেশবন্ধু তাঁকে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করে দেন। শরৎচন্দ্র এই সভাপতি পদে বহু বৎসর ছিলেন। তিনি তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন—অসহযোগকারীদের আইন সভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। অসহযোগকারীরা আইন সভায় প্রবেশ করলে, অসহযোগ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে, এ ধারণা ভুল। তাঁরা যদি আইন সভার সদস্য হতে পারেন, তাতে বরং অসহযোগ কাজেরই বেশী সুবিধা হবে। কারণ তাঁরা তখন ভিতর থেকে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারবেন।

রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় দেশবন্ধুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। দেশবন্ধু তখন কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই 'স্বরাজ্য দল' নামে একটি আলাদা দল গঠন করেন।

কংগ্রেসের বৃহত্তর দল দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর পক্ষে।

গয়া কংগ্রেস থেকে ফিরে আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও মনোমালিন্যে দেশবন্ধু ও তাঁর সমর্থকদের চারদিক যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল এবং বাঙ্গলা দেশের ইংরাজী, বাঙ্গলা সকল সংবাদপত্রগুলিই যখন সমস্বরে দেশবন্ধুকে আক্রমণ করতে লাগল, তখন একাকী দেশবন্ধুকে তাঁর মত ও যুক্তি নিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে বেড়াতে হয়েছিল।

দেশবন্ধুর এই অবস্থা দেখে তাঁর অন্যতম সমর্থক ও সহকর্মী শরৎচন্দ্র

একদিন তাঁকে বলেছিলেন—সংসারে কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাতে পারে না ?

উত্তরে দেশবন্ধু বলেছিলেন—তা হ'লে আর কি রক্ষা ছিল ? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মধ্যে অহর্নিশি জ্বলছে, সে তো এক মুহূর্তে আমাকে ভস্মসাৎ করে দিত।

ঐ সময় দেশবন্ধুর দলে একরূপ লোকই নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজও নাই। অতি ছোট যারা তারাও গালিগালাজ না করে কথা কয় না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা !

দেশবন্ধু ও তাঁর মুষ্টিমেয় সমর্থকদল অর্থের অভাবে খুবই অস্থির হয়ে উঠতেন, কিন্তু দেশবন্ধু আদৌ বিচলিত হতেন না।

একদিনের কথা। রাত্রি তখন ৯।১০টা। বৃষ্টি হচ্ছে। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে শিয়ালদহের নিকটে এক বড়লোকের বাড়ীতে কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য যান। দেশবন্ধু এক সময় এই বড়লোকটিকে জেলের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র ঐ বড়লোকটির বৈঠকখানায় বহুক্ষণ বসে থেকেও যখন বড়লোকটির কোন সাড়া পেলেন না, তখন শরৎচন্দ্র অসহিষ্ণু হয়ে দেশবন্ধুকে বললেন—গরজ কি একা আপনারই ? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে ওঠে তো তবে থাক।

শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য শুনে দেশবন্ধু বললেন—এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই। আমরাই কাজ করতে জানি নে। আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারি নে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত ! বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার সর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে।

দেশবন্ধুর এই কথায় আর কোন উত্তর না দিয়ে শরৎচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে সম্মেলন হয়, তাতে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে গিয়ে সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

যাওয়ার পথে স্টীমারে রাত্রে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দেশের রাজনীতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনাগুলি এই :—

দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

—কেন করেন না?

—বোধ হয়, অনেকদিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন—এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটী লোকের পাঁচ কোটী লোকও যদি সুতো কাটে তো ষাট কোটী টাকার সুতো হতে পারে।

শরৎচন্দ্র বললেন—পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটা বাড়ী তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হতে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

—এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু, তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারি ইচ্ছা হয় যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

—ভগবান আপনকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসলেন। তারপর বললেন—আপনি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—না।

—কিন্তু এছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারেন? এর মধ্যেই তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে, আর দশ বছর পরে কি হবে বলুন তো?

—বছর দশেক পরের কথা কল্পনা করে আপনার মুখ যেমন সাদা হয়ে উঠেছে, তাতে আমার নিজের সঙ্গে আপনার খুব বেশী তফাৎ মনে হচ্ছে না। তা সে যাই হোক্, কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিস নয়। তাহলে চার কোটী ইংরাজ দেড়শো কোটী লোকের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন। দেশের

মধ্যে, দশের মধ্যে এদের একটা মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন। মেয়েদের প্রতি যে অন্যায় নিষ্ঠুর সামাজিক অবিচার চলে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন; ওদিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

দেশবন্ধু ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন—আপনারা দয়া করে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে দিন। আমি ঐ ওদের মধ্যে থাকিগে। আমি এর কাজ করতে পারব। হিন্দু সমাজ দীর্ঘকাল ধরে এদের উপর কত অত্যাচার করে আসছে। এদের অনেকের ধোপা নাপিত নেই। ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না। অথচ এরাই মুসলমান খ্রীষ্টান হয়ে গেলে, আবার তারাই এসে এদের কাজ করে। অর্থাৎ হিন্দুরাই প্রকারান্তরে বলছে, হিন্দুর চেয়ে মুসলমান খ্রীষ্টানই বড়। এ রকম 'সেন্সলেস' সমাজ মরবে না তো মরবে কে?

এই বলে বহুক্ষণ স্থির থেকে দেশবন্ধু সহসা শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন—আপনি আমাদের অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন তো?

—না, অহিংস সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।

দেশবন্ধু সহাস্যে বললেন—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দেখছি, কোথাও লেশমাত্র মতভেদ নেই।

শরৎচন্দ্র উত্তরে বললেন—একদিন কিন্তু যথার্থই লেশমাত্র মতভেদ থাকবে না, আমি এই আশাতেই আছি। ইতিমধ্যে যতটুকু শক্তি, আপনার কাজ করে দিই। আর শুধু মত নিয়েই বা হবে কি, বসন্ত মজুমদার, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এঁরা তো দেশের বড় কর্মী, কিন্তু ইংরাজের প্রতি বসন্তর বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষুর অহিংস দৃষ্টিপাত এবং শ্রীশের প্রেমসিক্ত বিদ্বেষবিহীন মেঘগর্জন—এ দুটি বস্তু দেখলে এবং শুনলে আপনারও সন্দেহ থাকবে না যে, মহাত্মাজীর পরে অহিংস অসহযোগ যদি কোথাও স্থিতিলাভ করে থাকে তো, ঐ দুটি বন্ধুর চিত্তে। অথচ এত বেশী কাজই বা কয়জনে করেছে? অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা তো জনসাধারণ, অর্থাৎ 'মাস'এর জন্য? কিন্তু এই 'মাস' পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সেবার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে

ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন, নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কেউ কোনদিন যদি দেশ স্বাধীন করতে পারে তো, শুধু এরাই পারবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দেশবন্ধু বললেন—এ দুরাশা আমার কোনদিন নেই যে, দেশ একেবারে এক লাফে পুরো স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু আমি চাই স্বরাজের একটা সত্যকার ভিত্তি স্থাপন করতে। আমি তখন জেলের মধ্যে, বাইরে বড়লাট প্রভৃতি এঁরা, ওদিকে সবরমতি আশ্রমে মহাত্মাজী—তাঁর কিছুতেই মত হ'ল না। অত বড় সুযোগ আমাদের নষ্ট হয়ে গেল। আমি বাইরে থাকলে কোন মতেই এত বড় ভুল করতে দিতাম না। অদৃষ্ট! তাঁর লীলা!

এইভাবে দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছিল, এদিকে তখন রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল। তাই শরৎচন্দ্র বললেন—শুতে যাবেন না?

—চলুন।—বলে দেশবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা এই রিভোলিউশনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সামনের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে আসছিল। দেশবন্ধু রেলিং ধরে কিছুক্ষণ উপরের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন—এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তাছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও, এ জিনিষ যাবে না। তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে। সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি শরৎবাবু!

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যখন পুরা দমে চলতে ছিল, তখন এই অহিংস আন্দোলনে যাঁদের বিশ্বাস ছিল না, এমন সব সহিংস রিভলিউশনারীরা কিন্তু চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁরাও গোপনে গোপনে তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই সময় বাঙ্গলা দেশের এই রিভলিউশনারী ও গুপ্তসমিতির অস্তিত্বের জন্য বাঙ্গলা দেশের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নেতারা নানা দিক থেকে নিজেদের বিপন্ন মনে করছিলেন। সবচেয়ে বেশী মুস্কিল হয়েছিল দেশবন্ধুর। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা বলি স্বরূপ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁর পক্ষে তেমন অসম্ভব ছিল। তাঁদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করে, তিনি অত্যন্ত ভয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই গুপ্তসমিতিকে উদ্দেশ করে দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে একদিন বাঙ্গলায় একটা 'অ্যাপীল' লিখে দিতে বলেছিলেন।

দেশবন্ধুর কথায় শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—"যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করতেও না পারো তো, অন্তত ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কাযপদ্ধতি স্থগিত রেখে আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থচিত্তে কাজ করতে দাও। ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

শরৎচন্দ্র এই লেখাটি নিয়ে দেশবন্ধুর কাছে গেলে, দেশবন্ধু পড়ে 'যদি' কথাটায় ঘোরতর আপত্তি করে বললেন—'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে 'অ্যাসুইমিং বাট্ নট্ অ্যাডমিটিং' করে এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

দেশবন্ধুর কথায় আপত্তি করে শরৎচন্দ্র বললেন—আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করে বললেন—না। সত্য কথা বলার ফল, কখনও মন্দ হয় না।

শরৎচন্দ্র কিন্তু আবেদন থেকে 'যদি' তুলতে কিছুতেই রাজী হলেন না। ফলে আবেদনও আর প্রকাশিত হ'ল না।

শরৎচন্দ্র একবার দেশবন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় এক সভায় যান। সভা থেকে ফেরার পথে গাড়ীর মধ্যে দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে বললেন—অনেকে আমাকে আবার প্র্যাকটিস করে দেশের জন্য টাকা রোজগার করে দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন। আপনি কি বলেন?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—না। টাকার কাজের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়েই থাক। এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড়।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে দেশবন্ধু আর একদিন শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—লোকে ভাবে আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়ে ঝোঁকের মাথায় প্র্যাকটিস্ ছেড়েছি। তারা জানে না যে, এ আমার বহুদিনের একটা বাসনা। শুধু ত্যাগের ছল করেই ত্যাগ করেছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখব, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নয়, তখন এই আমার ভাল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা

১৩৪১ সালে ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে দেশবাসী তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জলধর-সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র।

জলধর-সম্বর্ধনা শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে জলধর-সম্বর্ধনার অন্যতম উৎসাহী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁর বাড়ীতে একদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

সেদিন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের বাড়ীতে কথা-প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে সব কথা হয়েছিল, সেগুলি হচ্ছে এই :—

শরৎচন্দ্র—বাঙ্গলার গৌরব আশুতোষের পুত্র তুমি। তোমার পিতার আকাঙ্ক্ষা তোমার দ্বারা চরিতার্থ হবে। আমরা সকলেই আশা রাখি তুমি বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করতে পারবে।

শ্যামাপ্রসাদ—আপনারাই তো বাঙ্গলা সাহিত্যকে স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেখানে আমরা কি করতে পারি, আর আমাদের করণীয় কি থাকতে পারে?

শরৎচন্দ্র—অনেক কিছু করার আছে তোমার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাব হয়েছ তুমি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গলা সাহিত্যকে নানাভাবে প্রয়োগ করতে পারলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির পথ আপনা থেকে প্রশস্ত হবে।

শ্যামাপ্রসাদ—আমি তো নানাভাবে চেষ্টা করছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের সাহায্যে বাঙ্গলার অনেক লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের প্রকাশে অগ্রসর হয়েছি। বাঙ্গলা পাঠ্য পুস্তকের সংস্কার ও উন্নতিসাধনেও হাত দিয়েছি। এখন আপনাদের আশীর্বাদ।

শরৎচন্দ্র—শুধু আশীর্বাদ করলেই কি কাজ হবে? চাই সকলের সমবেত চেষ্টা ও সহযোগিতা। কত ভাল বই বাঙ্গলা ভাষায় আছে, আরও কত ভাল

বই রচনা হতে পারে। সেইজন্য দরকার আজ পর্যন্ত যত ভাল বই বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হয়েছে, বিষয় অনুসারে ভাল করে তার একটা তালিকা প্রণয়ন। প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকবে। সেই তালিকাটি পুস্তকের আকারে ছাপিয়ে খুব কম দামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বাঙ্গলা সাহিত্যের যারা অনুরাগী, গবেষক তাদের খুব উপকার হবে। এ ছাড়া বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলনে অনেকে এগিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাবে। এরপর যে সব বিষয় বাঙ্গলা ভাষায় লেখা হয় নি, সেই সব বিষয় উপযুক্ত লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য অবশ্য পরিভাষার কাজটাও খুব ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাওয়া দরকার। আমার মনে হয়, আরও অনেক বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যকর্মী দলে নিয়ে এ কাজ করলে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

শ্যামাপ্রসাদ—আপনার এই পরিকল্পনার কথা আগেই চিন্তা করেছি। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অনেক মূল্যবান বাঙ্গলা বই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেছি এবং এখনও করছি।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে এবার বললেন—সেই সঙ্গে দু একখানা গল্প উপন্যাসের বইও প্রকাশ ক'রো। তা না হ'লে গল্প-উপন্যাসের লেখকরা খাবে কি?

শ্যামাপ্রসাদ—গল্প-উপন্যাসকেও বাদ দোব না। গল্প-উপন্যাসই তো সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

শরৎচন্দ্র—গল্প-উপন্যাসই জাতির প্রাণ। জীবন আর মন যখন নানা সমস্যায় ও তত্ত্ব আলোচনায় শুকিয়ে আসে, তখন এই গল্প-উপন্যাসই মানুষকে সঞ্জীবনী রস ধারায় তাজা রাখে।

শ্যামাপ্রসাদ—এ কথা আমি সব সময় স্বীকার করি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আপনার লেখা আমার খুবই প্রিয়। মনে যখন বিষাদ আসে, নানারূপ অশান্তিতে যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন গল্প-উপন্যাসই আমাকে আনন্দময় জগতে নিয়ে যায়। সেইজন্য গল্প-উপন্যাসকেও সাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ বলেই মনে করি।

শরৎচন্দ্র—আর একটা বিষয় আমি সব সময় চিন্তা করি। সেটা হচ্ছে বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের দুরবস্থার কথা। বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগীর সংখ্যা

বাড়লেই তবে দেশের সাহিত্যিকরা দুটো পয়সা পাবে। বর্তমানে যাওবা কিছু বই বিক্রি হয়, তার চৌদ্দ আনাই প্রকাশক, প্রেস, আর দপ্তরীর পেটে যায়। লেখক পায় দু আনা। কি খাবে তারা? কি খেয়ে তারা চিন্তা করবে আর লিখবে? এ সব কথা ভেবে সাহিত্য আর সাহিত্যিক দুটোকেই বাঁচাবার উপায় ঠিক করতে হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শক্তি আছে, আমার মনে হয়, তার পক্ষেই এ সব কাজে হাত দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে তুমি হচ্ছ তার উপযুক্ত দিক্‌পাল। সেই জন্যে অনেক আশা রাখি আমরা তোমার উপর।

এই কথায় শ্যামাপ্রসাদ একটু চিন্তামগ্ন হলেন। পরে বললেন—আমার পিতৃদেবের মনেও এই আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই তিনি চলে গেলেন। আমার কাছে তাঁর সেই পরিকল্পনার খসড়া আছে, আপনাকে দেখাব একদিন। এখন আশীর্বাদ করুন যাতে সেই পরিকল্পনাকে আমি সফল করে তুলতে পারি।

শরৎচন্দ্র—আমি সর্বান্তকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি এবং সেই সঙ্গে এই বিশ্বাস ও আশা পোষণ করছি, তোমার দ্বারাই এই কাজ একদিন সার্থক হয়ে উঠবে। তুমিই তার উপযুক্ত কর্মী।

এরপর নলিনীবাবুর বাড়ীতে আহার সেরে শরৎচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ অনেক রাত্রে যে যার বাড়ী ফিরলেন।

যদুনাথ সরকারের সহিত আলোচনা

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের শ্যামবাজারের বাড়ীতে সেবার তাঁর জন্মতিথি উৎসব। সেই উৎসবে শরৎচন্দ্র, আচার্য যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জলধর সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত। উৎসবান্তে নানা কথাবার্তা হচ্ছে। শরৎচন্দ্র যদুনাথবাবুর সামনেই বসেছিলেন। যদুনাথবাবু বললেন—আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনাব সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনার অনেক বই আমি পড়েছি, আর সব সময় ভেবেছি—সাহিত্যের দরবারে উপন্যাস বড়, না ইতিহাস বড়।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমিও তো আপনার লেখা পড়ে ঐ একই কথা চিন্তা করেছি। তবে খুব বেশী মাথা ঘামাই নি। তার কারণ, আমি জানি যার যা কাজ, তিনি তাই করবেন। আমি যা পেরেছি, তাই লিখেছি। লিখেছি গল্প-উপন্যাস, কিন্তু সারা জীবন ধরে পড়েছি ইতিহাস আর বিজ্ঞান। বিশেষ করে আপনার বই আমাকে সাহিত্যচর্চায় খুব প্রেরণা দিয়েছে—প্রেরণা দিয়েছে লিখবার। তা উপন্যাস-গল্প হ'লেও একটা কিছু লেখা তো বটে।

যদুনাথবাবু বললেন—একটা কিছু কেন? অনেক কিছু—গল্প-উপন্যাসও তো ইতিহাস।

দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন—কি রকম? একটু পরিষ্কার করে বলুন। বুড়ো বয়সে একটু নতুন করে জ্ঞান লাভ করি।

এই কথায় যদুনাথবাবু, শরৎচন্দ্র এবং আরও অনেকে হেসে উঠলেন।

যদুনাথবাবু বললেন—এ কথা আমি একদিন রবীন্দ্রনাথকেও বলেছি। এক এক যুগের সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, আচার ও ব্যবহার, মানুষের মনোবৃত্তি ফুটে ওঠে সেই সেই যুগের গল্প-উপন্যাসে। আর তা এত সুন্দর সাবলীল ও সরসভাবে প্রকাশ হয়, যা গ্রহণ করতে পাঠককে মোটেই কষ্ট পেতে হয় না। আগেকার ইঙ্গ-বঙ্গ যুগের লেখকরা যে সব গল্প লিখেছেন, তাতে তখনকার মানুষের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে। যুগে যুগে এই যে পরিবর্তন, ভাঙ্গাগড়া সবই তো ভালভাবে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে গল্প-

উপন্যাসে আঁকা হয়। গল্প-উপন্যাস খুব সূক্ষ্ম ইতিহাস, কিন্তু খুব স্পষ্ট আর আনন্দদায়ক। আমাদের লেখা ইতিহাসের মত 'ড্রাই' নয়। আমার মুখে এ কথা শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমিও খুব খুশী হলুম। অবশ্য এ কথা আমিও আগে ভেবেছি, এমন কি আমার লেখাতেও মাঝে মাঝে তার ইঙ্গিত দিয়েছি। কিন্তু তেমন জোর পাই নি। আজ আপনার মত একজন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথায় আরও শক্তি পেলাম, সাহসও বেড়ে গেল।

যদুনাথবাবু বললেন—আপনার লেখা পড়ে আমার যা ধারণা, তাতে মনে হয়, আপনার সাহস তো কিছু কম্‌তি নেই।

শরৎচন্দ্র বললেন—ছোটবেলা থেকেই আমি দুঃসাহসী। তা কাজেই হোক্, আর লেখাতেই হোক্।

যদুনাথবাবু বললেন—দুঃসাহস নয়, সৎসাহস, তা যতই দুর্বার হোক্ না কেন। আর একটা কথা এই সঙ্গে বলছি, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা যখন জাতির আর যুগের ইতিহাস লিখবেন, তখন তাঁরা বিভিন্ন যুগের গল্প-উপন্যাসকে বাদ দিতে পারবেন না।

এরপরেও কয়েক জায়গায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যদুনাথবাবুর দেখা হয়েছিল।

যদুনাথবাবু বলেন—শরৎচন্দ্র একবার আমাদের কাছে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্য প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—আমি গরীবের ছেলে ছিলাম। বই কিনবার সঙ্গতি আমার ছিল না। সহপাঠীদের কাছ থেকে ধার করে বই এনে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে তা ফিরিয়ে দিতাম, যেন সে বই আর চাইতে না হয়। এতে আমার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছিল। তার ফলে যে দৃশ্য একবার পর্যবেক্ষণ করতাম, তা মনের ভিতর পুঁজি করে রাখবার ক্ষমতা আমার ছিল।

যদুনাথবাবু বলেন—ঐটাই শরৎচন্দ্রের অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র কারণ নয়। ভাষার উপর তাঁর ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা ছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের সহিত আলোচনা

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র, আর ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ একটি স্কুল বাড়ীর একই কক্ষে শরৎচন্দ্র ও রমেশবাবু উভয়ের বাসস্থান ঠিক করেছিলেন।

সভার পর রাত্রে আহারাদি সেরে শরৎচন্দ্র ও রমেশবাবু পাশাপাশি দুই খাটে বিছানার উপর বসে অনেক গল্প করলেন। শেষে রাত্রি ১০টা ১১টার সময় শরৎচন্দ্র রমেশবাবুকে বললেন—চল বাইরে যাই।

উভয়েই বাইরে এলেন। স্কুল বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি ছিল। তাতে দুজনে পাশাপাশি বসলেন। পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় চারিদিক তখন প্লাবিত হচ্ছিল।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে কত কথা বলে যেতে লাগলেন। রমেশবাবু মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

রমেশবাবু এক সময় শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার উপন্যাস-গুলির মধ্যে কোন্‌খানা আপনি ভাল মনে করেন?

শরৎচন্দ্র কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—গৃহদাহ। আর্টের দিক থেকে এ একেবারে নিখুঁত।

রমেশবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—জবাবটা বুঝি মনের মত হয় নি?

রমেশবাবু বললেন—আপনার অনুমান সত্য।

এরপর এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেক আলাপ হ'ল।

রমেশবাবু পরে আবার প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকে মনে করে যে, আপনার বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকটা একই ধরণের এবং এই বৈচিত্র্যের অভাব আপনার উপন্যাসের অঙ্গহানি করেছে।

শরৎচন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বললেন—সৈন্যরা যখন প্যারেড করে, তখন দূর থেকে সকলকে একই রকম দেখায়, অথচ প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে। সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে সেই স্বাতন্ত্র্য দেখানই আর্টের বৈশিষ্ট্য।

সেদিন মাঠে বসে রাত্রি প্রায় ১টা ২টা পর্যন্ত উভয়ে এইরূপ গল্প করেছিলেন।

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের পরে রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে ঢাকা যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁকে বিপুল সমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে রমেশবাবুর অতিথি হয়েছিলেন। রাত্রে আহারের পর শরৎচন্দ্র রমেশবাবুর বাড়ীর পুকুরের বাঁধানো ঘাটের উপরে রোয়াকে বসে মজলিস্ জমাতেন। এই মজলিসে শরৎচন্দ্র ছাড়া, রমেশবাবু, রমেশবাবুর স্ত্রী এবং বাড়ীর আরও দু-একজন থাকতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনের অনেক গল্প বলতেন। আর মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির কথা বলতেন।

তিনি একদিন বলেছিলেন—রেঙ্গুনে থাকার সময় বহু নারীর জীবনকথা নিয়ে আমি একটি বড় বই লিখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি আগুনে পুড়ে যায়।

তারপর শরৎচন্দ্র মেয়েদের সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী বলে, শেষে রমেশবাবুর স্ত্রীকে বলেছিলেন—দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনই সুবিচার করে নি। আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্রকে যাতে অনারারী ডিগ্রী—ডি-লিট্ দেওয়া হয়, সেজন্য রমেশবাবু বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রমেশবাবুর প্রস্তাব গ্রহণ করলে, ঐ উপলক্ষে কন্‌ভোকেশনের সময় শরৎচন্দ্র পুনরায় দ্বিতীয়বার ঢাকায় যান।

ঢাকায় গিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর বাল্যবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন এবং রমেশবাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলেন। ঐ সময় একদিন রাত্রে রমেশবাবুর বাড়ীতে আহারের পর নিরালায় বসে শরৎচন্দ্র ও রমেশবাবুর মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, সেগুলি এই :—

কথা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিজয়া নাটকের কথা উঠলে, রমেশবাবু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—বিজয়া নাটকে বিলাসের চরিত্রের ভাল দিকটা তেমন দেখানো হয় নি কেন?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি। বিলাসের প্রতি দর্শকের মনে সহানুভূতি জাগলে, নাটকের মূল প্রস্তাব থেকে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নাটকের উদ্দেশ্য বিফল হবার এবং নাটকের মধ্যে যে কেন্দ্রগত ঐক্য থাকা আবশ্যক, তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা।

আলোচনা প্রসঙ্গে 'পথের দাবী'র কথায় শরৎচন্দ্র বললেন—ব্রহ্মদেশে গোপনে কোকেনের ব্যবসা চালাতো, এরূপ একটি দলের কথা আমি শুনেছিলাম। দলের কর্ত্রী ছিল একটি স্ত্রীলোক। এরা সুমাত্রা ও যবদ্বীপে ব্যবসা চালাত। এ থেকেই 'পথের দাবীর' সুমিত্রার সৃষ্টি। আর সন্ত্রাসবাদী (টেরোরিস্ট) দলের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। তাঁদের জীবনের ভিত্তির উপরেই আমার সব্যসাচীর সৃষ্টি।

এরপর শরৎচন্দ্র, রমেশবাবুর কাছে নির্ভীকভাবে মহাত্মা গান্ধীর মতামতের প্রতিবাদ করলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য করলেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আলোচনা

সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কাশীতে বাস করছেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার কাশী বেড়াতে যান। এই কাশীতেই তখন উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

পরিচয়ের পর একদিন উভয়ে কাশীর পথে বেড়াতে বেরোন। শরৎচন্দ্র কথা-প্রসঙ্গে কেদারবাবুকে বললেন—মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন?

কেদারবাবু বললেন—সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অলাভ নেই তো! তবে ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা। ওই সঙ্গে দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়, তা-ও নয়।

—এইটি ঠিক বলেছেন।—বলে শরৎচন্দ্র হাসলেন।

ক্রমে কথায় কথায় উভয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের কালীবাড়ীর সামনে এসে পড়লেন।

কেদারবাবু কালীকে প্রণাম করলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তখন তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন। আপনিও জানেন বোধ হয়?

কেদারবাবু বললেন—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে, আপনি পরম আস্তিক।

—কে বললে? কোথায়? ভুল কথা…

—যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, সেই 'চরিত্রহীনে'ই রয়েছে। দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারে নি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ী ফিরতে পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হ'ত না। আপনি পারেন নি…

—ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবান্তরের সাহায্য নিতে হয়। ঐ একটাই তো?…

—বহুৎ আছে। জগতে অবান্তরও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই নেয়। ওই বই থেকেই বলি—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি 'ইন্‌টেলেক-চুয়েল জায়েন্ট' বানিয়েছেন, আবার সুরমাকে (পশুটিকে) হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল। এটা করলেন কেন?…

—আমার লেখা অমন করে কেউ দেখে বলে জানতাম না। তাহলে সাবধান হতাম।

—অনেকেই দেখেন, যাঁর ভাল লাগে তিনিই। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়। সুরমাতে মাধুর্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।

এবার শরৎচন্দ্র আর কোন উত্তর না দিয়ে কেদারবাবুকে বিদায় দিয়ে শুধু বললেন—যান, যান, বেলা হয়েছে, নমস্কার। আবার যেন দেখা পাই।

এই বলে তিনি নিজে দ্রুত চলে গেলেন।

কেদারবাবু সেবার কাশীতে গিয়ে উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ীতে উঠেছেন।

শরৎচন্দ্রও ঐ সময় কাশীতে বেড়াতে যান। কেদারবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আবার সাক্ষাৎ হ'ল।

শরৎচন্দ্র কেদারবাবুর সঙ্গে গল্প করবার লোভে সুরেশবাবুর বাড়ীতে দিনের পর দিন আড্ডা জমান। কাশীর বাঙ্গালী, বিশেষ করে তরুণের দল, দুই সাহিত্যিককে একত্র দেখবার ও তাঁদের কথা শুনবার আশায়, সুরেশবাবুর বাড়ীতে এসে জমত।

একদিন শরৎচন্দ্র কেদারবাবুকে বললেন—আপনি ম্যালেরিয়ায় অনেক দিন ধরে ভুগছেন। আপনাকে নিয়ে একটু বাইরে বেড়ানো দরকার। কাল সকালে বেরোব। এই বলে তিনি টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে বলে দিলেন—কাল ঠিক আটটায় আসা চাই, দেখিস। খবরদার, বিলম্ব না হয়, বুঝতা?

টাঙ্গাওয়ালা সেদিন, হাঁ হুজুর বলে চলে গেল।

পরদিন ঠিক আটটায় হাজির হয়ে সেলাম জানাল।

বেলা ৯টার সময় টাঙ্গাওয়ালা দ্বিতীয় সেলাম জানালো।

তখন সকলের চা খাওয়া চলছে মাত্র। শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ভোলা তাওয়া চড়াচ্ছে। শরৎচন্দ্র টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন—এই দ্যাখ্ না চট্ করে নিচ্ছি—সত্বরই যাতা হ্যায়।

ক্রমে তরুণের দল আসতে লাগল। তাওয়াও ফিকে মারল। শরৎচন্দ্র বললেন—ভোলা কর্‌চিস্ কি, বাবুরা এসেছেন—কোন আক্কেল নেই।···

এদিকে টাঙ্গাওয়ালা অপেক্ষা করে করে বেলা ১১টার সময় আবার এক সেলাম জানাল।

শরৎচন্দ্র তখন কেদারবাবুকে সম্বোধন করে বললেন—তাই তো কেদারবাবু, এ বেটা যে ছাড়ে না দেখছি। এ বেলা কি যেতে পারবেন?

কেদারবাবু বললেন—এঁরা সব দূর থেকে এসেছেন, এঁদের ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—তাই তো, তা ও-বেটা বোঝে না কেন!—তারপর টাঙ্গাওয়ালাকে ডেকে বললেন—ওহে! এগারটা তো বাজ গিয়া, এখন খাওদাও গিয়ে। তোমাদের আবার 'পাকাতে' হয়। কাশীতে তো কষ্ট দিতে আসতে নেই। যাও—ঠিক চারটে বাজলেই আও কিন্তু···

টাঙ্গাওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, কিছু বলতে না দিয়েই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—হাঁ হাঁ বুঝা হায়। তোমার ক্ষতি নেই করে গা—ভাড়া ঠিক পাবে গো।

টাঙ্গাওয়ালা চলে গেলে শরৎচন্দ্র কেদারবাবুকে বললেন—আচ্ছা বলুন তো বড়লোকেরা এত সেলাম সয় কি করে! উঃ তিন সেলামেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আজ কিন্তু বিকালে দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু। কাজ থাকে তো সেরে রাখুন। তখন যেন···দেখুন চা খাওয়াটা একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট, ভারি সময় নষ্ট করে দেয়। ও কাজটা ফেলে না রেখে, এ বেলাই সেরে রাখলে কি হয়!

কেদারবাবু শুনে বললেন—সময় বাঁচাবার এমন সহজ উপায় ফস্ করে মাথায় এলো কি করে। আপনি উপন্যাসের দিকে মাথাটা দিলেন

কেন? এই সব শক্ত আবিষ্কারের দিকে লাগালে যে অনেক কিছু পাওয়া যেত।

শরৎচন্দ্র উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগলেন।

টাঙ্গাওয়ালা যথাসময়ে বিকালে এল। কিন্তু এবারও যাওয়া হ'ল না। তাকে পরদিন সকালে আবার আসতে বলা হ'ল।

সে সকালে এল। সকালেও বেরোনো হ'ল না। আবার তাকে বিকালে আসতে বলা হ'ল।

সে বিকালেও এল। শরৎচন্দ্র এবার দলবল নিয়ে এমনি আসর জমিয়ে বসলেন যে, উঠবার নামই করলেন না। টাঙ্গাওয়ালাকে আশায় আশায় বসিয়ে রেখে, শেষে রাত্রি ১১টার পর সাত টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন।

এই দেখে কেদারবাবু বললেন—শরৎবাবু, কাশীতে এসে কাজটা ভাল হচ্ছে কি? আপনি ধর্মভীরু মানুষ। ঘোড়াটার যে ইহকাল পরকাল গেল। বাতে ধরে মরবে যে।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, কাল আর কারো কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি সকাল সকাল উঠবেন, পারবেন তো? যার রোগ তার চিন্তা নেই। সেটা ভাল নয়···

তৃতীয় দিনও সকালে বেরোনো হয়ে উঠল না। বৈকালে কেদারবাবুকে নিয়ে মরিয়ার মত হয়ে উঠে পড়লেন। বললেন—আপনি বাইরের হাওয়া লাগান না, ঐ আপনার দোষ। চলুন, হাওয়ায় খানিকটা ঘোরা যাক্।

এই ব'লে শরৎচন্দ্র কেদারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন এবং এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে কিছু না পেয়ে শেষে বেঙ্গল কেমিকেলের দু শিশি 'পাইরেক্স' কিনে নিয়ে কেদারবাবুকে বললেন—এইটা খান দিকি, একদম ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবান।

হরিদাস শাস্ত্রীর সহিত আলোচনা

কাশীর কবিরাজ হরিদাস শাস্ত্রী শরৎচন্দ্রের একজন বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্র হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকার সময় একবার কাশী বেড়াতে গেলে, সেই সময়েই কাশীতে উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল।

হরিদাসবাবু কাশী থেকে কলকাতায় এলেই শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতেন। এইরূপ একবার গেলে, সেদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হরিদাসবাবুর অনেক কথা হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হরিদাসবাবুর সেদিনের সেই কথাগুলি, হরিদাসবাবু শরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন। হরিদাসবাবুর সেই লেখাটিই এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হরিদাসবাবু লিখেছিলেন—

একদিন অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে সকালবেলায় দাদার বাজে শিবপুরের বাসা বাড়ীতে হাজির হইয়াছি।···

চা খাইতে খাইতে দাদা বলিলেন—শ্রীরামপুর থেকে সোদন একটি মেয়ে এসেছিল, নাম···। অদ্ভুত মেয়ে—চেন কি?

—না, কি রকম অদ্ভুত মেয়ে?

—এসেই আমায় বললে কি না, 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করছি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আত্মীয় বন্ধু যাকেই বলি, সে-ই বলে—তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, তুমি যাবে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—তোমার সাহস তো কম নয়, তা আপনি কি এমনি যে কোনও যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?'—শুনে বেশ কৌতুক বোধ হ'ল—বলিয়া দাদা হাসিতে লাগিলেন।

আমিও হাসিলাম। বলিলাম—আপনি কি জবাব দিলেন?

—হাঁ জবাব একটা দিলাম বই কি। বললাম—তাঁরা যদি দশ বছর আগেকার শরৎবাবু সম্বন্ধে এ কথা বলে থাকেন তো আমি কিছু বলতে চাই নে। কারণ তখন আমি দিন রাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না; সর্বদাই মদের নেশায় চুর। তবুও বলতে পারি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও কখনও

কোন নারীর অমর্যাদা করি নি—আর এখন তো আমি তোমাদের বড়দা—নির্ভয়ে আসবে।

—খুব বুঝি মদ খেতেন দাদা?

—হাঁ ভাই! কিন্তু একদিনে ছেড়ে দিলাম, অর্থাৎ মাতাল আর হই নি।

—কি করে ছাড়লেন?

—আচ্ছা বলছি শোন। আর এক চাটুজ্জে ও আমি, আর আমাদের একটি বর্মী বন্ধু একসঙ্গে মদ খেতাম, বর্মী বন্ধুটির হঠাৎ হ'ল হার্টের অসুখ, ডাক্তার একেবারে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে চিকিৎসা করাতে লাগলেন।

একদিন—রাত্রি তখন ১১টা হবে, চাটুজ্জে এসে আমার দরজা ভাঙতে লাগলো—ও শরৎবাবু! ও শরৎবাবু! বুঝলাম দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, পিপাসা বেড়েছে, কিছু মদ চাই। আমার ঘরে যা ছিল, তাতে পিপাসার শান্তি হ'ল না। আরও চাই—চাটুজ্জে বললে, চল বর্মী বন্ধুর বাড়ী। প্রথমটা আমি যেতে রাজি হই নি, শেষে যেতেই হ'ল তার সঙ্গে।

রাত্রি তখন ১টা হবে। অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধু-গৃহিণী জানালা দিয়ে জানালেন—তাঁর স্বামী অসুস্থ, আমরা যেন দয়া করে চলে যাই। ডাকহাঁকে বন্ধুটিও জেগেছিল, এসে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করতে লাগলো—দাও না খুলে, ঘরে তো একটা বোতল রয়েছে। ওরা থাক না—আমি তো আর খাচ্ছি না।—আমার কতকটা জ্ঞান ছিল, ফিরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাটুজ্জে রাজি হ'ল না। একটা ছোট বেতের টেবিলের পাশে তিন জন পাশাপাশি বেতের চেয়ারে বসেছি, সামনে মেটিঙের উপর বন্ধু-পত্নী বসে স্বামীকে পাহারা দিচ্ছেন, আমরা মদ খাচ্ছি।

বন্ধু-পত্নীটি দিনের শ্রমে বোধ হয় ক্লান্ত ছিলেন, ঝিমুতে লাগলেন দেখে চাটুজ্জে বর্মী বন্ধুটিকে ইসারায় এক পেগ নেবার অনুরোধ জানাল। আমি মানা করলাম, বর্মী বন্ধুটিও পত্নীকে দেখিয়ে অস্বীকার করলো। আরও দু-একবার মদ খাবার পরে দেখা গেল বন্ধু-পত্নী মেটিঙের উপর ঘুমিয়ে পড়েছেন। চাটুজ্জে আবার অনুরোধ জানাল—এবার সে আর অস্বীকার না করে টেনে নিলে। দু-বারের পর তৃতীয় বারে নিজ হাতে পাত্র টেনে নিয়ে এক চুমুকে যখন নিঃশেষ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আঁ—আঁ—একটা বিকট শব্দ করে ঢলে পড়ল।

ঐ শব্দে স্ত্রী ছেলেপিলে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সকলেই তার বুকের উপর লুটোপুটি করে এমনই কলরব তুললো, কোথায় গেল নেশা ছুটে।

সেই রাত্রে থানা পুলিশ করে পরদিন তার শেষ গতি করে বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর মাতাল হব না। চাটুজ্জেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু রক্ষা করতে পারে নি।—বল তো হরিদাস, একটি ভদ্রলোক—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে, তবে আর কিসে আসবে?—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।

অনেকক্ষণ বাদে আমি বলিলাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো দাদা?

—কি বলো!

—অনেক লোকে আপনার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলে, সব দিকেই আপনি নাকি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন?

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তোমার কি মনে হয়?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন?

—কারণটা ঠিক বলতে পারবো না, মন বিশ্বাস করতে চায় না।

—আমি বলি কারণটা আমায় ভালবাসো ব'লে তোমার মনের আদর্শ থেকে আমায় খাটো করে দেখতে ইচ্ছা হয় না তোমার। কিন্তু কোন্ সাহসে তুমি আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করলে? এমনও তো হ'তে পারে যে, আমার সম্বন্ধে লোকের যা কিছু ধারণা, সব সত্যি। আমার মুখের স্বীকারোক্তি শুনলে তোমার কিছু শান্তি হবে কি?

—না। কিন্তু আমার মন বলে সবই মিথ্যা। লোকে ঠিক কথা জানে না ব'লেই বলে।

দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কতক ক্ষণ বাদে বলিলেন—দেখ হরিদাস, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি—তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। অন্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কোন জবাবই পেত না, তার কারণ সাধারণ লোকের ধারণায় কি আসে যায়? আর সে ধারণা কত দিনের জন্যেই বা। একদিন আমি থাকবো না, তারাও থাকবে না, লোকে হয়ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের

পরিচয়ই জানতে চাইবে না। তখনও যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে, তা নিয়েই আমার বিচার করবে তারা, আমার চরিত্র নিয়ে নয়। তবুও তোমার যখন জানতে ইচ্ছা হয়েছে, জানাব। বাস্তবিকই তাদের ধারণা মিথ্যা। অর্থাৎ নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোন কালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনও লালসা হয় নি, তার কারণ এ নয় যে আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ—কারণ এই যে ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারি নে, তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠে নি কখনও। আরও কিছু—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।

প্রশ্ন করিলাম—আর কিছু, কি ?

—বিশ্বকবির গানটা তোমার মনে আছে কি ?

কখনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি সরমেতে হই সারা।

প্রশ্ন করিলাম—তার মানে ?

—তার মানেও শুনতে চাও ? আচ্ছা শোনো। প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিষ্ফল হ'ল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয়, সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধ হয়।

—না। তারপর ?

—তারপর, তার পরিচয় চাও তো ? না, তা দেবো না। আজ শুধু আর একটি কথা তোমায় বলবো—এ সব কথা নিয়ে তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করতে যেয়ো না—এইটি আমার আদেশ রইলো তোমার উপর।

হরিদাসবাবু শেষে লিখেছেন—এমন লোক থাকা অসম্ভব নয়, যিনি মনে করিবেন, আমি গল্প লিখিতেছি। তাঁহাদের বলিতে চাই যে, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে—তা

তাঁর প্রশংসারই হউক, নিন্দারই হউক—আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতাম না। তত্ত্বান্বেষীগণকে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল ছিল সর্বদা জাগ্রত। নারীর কলঙ্ক সম্বন্ধে তিনি সাধারণতঃ বিশ্বাস করিতেন না। এবং তাহাদের ভুলের জন্য সর্বদাই তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন। (সাহানা—১৩৪৬)

[হরিদাসবাবুর সহিত শরৎচন্দ্রের এই আলাপ-আলোচনার প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র শ্রীরামপুর থেকে আগতা মেয়েটিকে বলেছিলেন—দশ বছর আগে আমি দিনরাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না। সর্বদাই মদের নেশায় চুর হয়ে থাকতাম।

ঐ সময় থেকে দশ বছর আগে রেঙ্গুনে থাকার সময় শরৎচন্দ্র মদ খেলেও, তখন দিনরাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতেন না, এ কথা সত্য নয় বলেই মনে হয়। কেননা সর্বদাই মদের নেশায় চুর থাকলে, তিনি অফিসে চাকরি করতেন কি করে?

শরৎচন্দ্র একজন ভাল গল্প বলিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর বলা গল্পকে শ্রোতার কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও জোরদার করে তুলবার জন্য নিজেকে হেয় করতেও বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতেন না। এখানে 'সর্বদাই মদের নেশায় চুর থাকতাম' এই কথাটাও ঐ ধরণেরই একটা কথা বলে মনে হয়।]

অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত আলোচনা

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন তাঁর বাসার অদূরবর্তী শিবতলা লেন নিবাসী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। অক্ষয়বাবু অত্যন্ত আদর্শবাদী ও নীতিবাগীশ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে যে অধ্যাপক অক্ষয়ের চিত্র এঁকেছেন, এই অক্ষয়বাবুই নাকি তার মূল। অবশ্য উপন্যাসে মূলের উপব তিনি প্রচুর কল্পনার তুলি বুলিয়েছেন।

যাই হোক্‌, শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে থাকার সময় এই অক্ষয়বাবু অনেক সময় বন্ধু শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, আবার শরৎচন্দ্রও অনেক সময় অক্ষয়বাবুর বাড়ীতেও আসতেন। উভয়ে মিলিত হ'লে, তখন তাঁদের মধ্যে যে সব আলোচনা হ'ত, অক্ষয়বাবু তাঁর একটি খাতায়, সে সবের অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহকালে এই অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ এবং আলোচনা করবার জন্য আমি অনেকদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়েছি। অক্ষয়বাবু তাঁর 'শরৎ-স্মৃতি'র খাতাটি আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে তাঁর লেখাগুলি নকল করে তাঁর খাতাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিই।

অক্ষয়বাবুর 'শরৎ-স্মৃতি'র খাতা থেকে শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁর আলোচনাগুলি এখানে দেওয়া গেল। অক্ষয়বাবু লিখে গেছেন—

"শরৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে এবং সাধারণ বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। সব মনে নাই। কিছু কিছু যাহা মনে আছে, লিখিবার চেষ্টা করিতেছি।

বোধ হয়, তাঁহার সহিত প্রথম সাহিত্যের আলাপ হয়, 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে। তাঁহার বইগুলির মধ্যে ঐ খানিই আমি প্রথম পড়ি। উহা পড়িয়া উহার অজ্ঞাতনামা লেখকের কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া যাই।

এই সকল কথা উঠাতে তিনি বলিলেন, বাস্তবিকই 'বিরাজ বৌ' আমার ভাল বই।

তাহার পর বিরাজের মানসিক বিকৃতির কথা তুলিয়া আমি বলিলাম, 'সাইকোলজিক্যালি' ইহা কতটা সম্ভব? যে-বিরাজ স্বামীভক্তি-পরায়ণা, একদিন মুহূর্তের উত্তেজনায় সে যে একটা অঘটন ঘটাইয়া বসিল, তাহা সম্ভব কিনা।—তখন আমার মনে হইয়াছিল, বিরাজের পক্ষে লম্পট জমিদার পুত্রের নৌকায় গিয়া উঠা কোনরূপে সম্ভব নহে।

শরৎবাবু বলিলেন—দিনের পর দিন অনাহারে, মনোকষ্টে যাহার শরীর ও মন দুইই বিকল হইয়া গিয়াছিল, তাহার ক্ষণিক উন্মত্ততার অবস্থায় কিছুই অসম্ভব নহে। আমি ওরূপ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

এই কথা আর একদিন পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমক্ষে ওঠাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সাইকোলজি'র দোহাই দেওয়া চলে না।

অনেকদিন পরে আবার কাল (২৪-১-৩০) হাওড়া 'সি-এস-পি-সি-এ অফিসে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এখন ঐ সমিতির সভাপতি। অবোল পশুর দুঃখে তাঁহাকে অনেক সময় অত্যন্ত ব্যথিত হইতে দেখিয়াছি। হাওড়ার পুলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহাকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া, কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া দেখি যে, একটি মহিষ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অতিরিক্ত ভার বহন করিতে না পারিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার নাক দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে এবং শকটচালক তাহাকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করিতেছে।

তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, রেঙ্গুনে তাঁহার একদল বিড়াল ছিল এবং যখন অগ্নিতে তাঁহার পুস্তকাদি মূল্যবান পদার্থ পুড়িতেছিল, তখন সে সকল দিকে তাঁহার মন কিছুমাত্র যায় নাই, কেবল বিড়ালগুলিকে বাঁচাইবার ব্যগ্রতাতেই তিনি পুনঃপুনঃ পতনোন্মুখ দাহ্যমান গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত সহস্রাধিক পতিতার আত্মকাহিনী পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই অপূর্ব সংগ্রহের বিনাশের কথা এখনও মাঝে মাঝে তাঁহার মনকে ব্যথিত করে।

পশুক্লেশ নিবারণী সভার সভাপতি হওয়া তাঁহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক এবং উপযুক্ত হইয়াছে।

মূক জীব-প্রীতি তাঁহার অসাধারণ ছিল। দ্বিপ্রহরে শকটবাহী মহিষের ক্লেশ দেখিয়া হাওড়ার্‌-পুলের উপর তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। বাজে শিবপুর রোডে কালীবাড়ীতে ছাগ বলি হইতেছে, শুনিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত হইয়া কটুভাষা ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি।

অনেক রকম কথা হইল। একজন আই-বি ইনেস্‌পেক্‌টর বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শরৎবাবুর পরিচয় করাইয়া দিবার পরে আমার এক সহপাঠী সি-আই-ডির (বাবু ভবনাথ চক্রবর্তীর) কথা হইল।

আমি বলিলাম—শরৎবাবু, তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে? আমার মনে হচ্ছে, আপনার দল কিছু কু ভাবিতে পারে।

তিনি বলিলেন—এত সহজে কারও 'রেপুটেশন' নষ্ট হয় না।

তিনি উপস্থিত 'আই-বি'র নিকট হইতে কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে গিয়া বলিলেন—২৬শে তারিখে (ইন্‌ডিপেনডেন্স ডে) গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন?

আমি বলিলাম—আপনি আই-বি হ'লে মন্দ হ'ত না। ওঁর উপরও চেষ্টা করছেন।

শরৎবাবু বলিলেন—যদি তেমন কড়া বন্দোবস্ত হয়, তাহলে আমরা কাণা খোঁড়া কতকগুলিকে দিয়ে শোভাযাত্রা বার করব, বেচারিরা জেলে গিয়ে খেয়ে বাঁচত।

আমি বলিলাম—কোথায় যেন শুনেছি এক নারী দলকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধযাত্রার মতলব হয়েছিল।

আই-বি বলিলেন—এঁদেরও ত্রুটি নেই। ছোট ছেলেদের শুইয়ে দিয়ে…

আমি বলিলাম—বিশুদ্ধানন্দ পাঠশালার দুগ্ধপোষ্যদের প্রেসিডেন্সী কলেজ আক্রমণের দৃশ্য মনে পড়ছে।

হুগলী কলেজ, সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজের স্ট্রাইক-এর কথা থেকে সাধারণত ছেলেদের ঔদ্ধত্য, অবিনয় এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ ও ছাত্র-সমস্যার কথা উঠিল।…

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের ত্যাগের কথা উঠিল। শরৎবাবু বলিলেন—'সেন্টিমেন্ট' একটা খুব বড় জিনিস। না হ'লে বড় কাজ হয় না।

আমি বলিলাম—দাশ মহাশয়ের আত্মত্যাগের মূলে খুব বড় একটা 'রিজন্' ছিল মনে হয়। তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঐরকম একটা ত্যাগের ফলে একটা খুব বড় দল গড়ে উঠবে। সেইটাই তাঁর 'রিজন্'।

শরৎবাবু স্বগতভাবে বলিলেন—আশ্চর্য! দারিদ্র্যের কষ্টতেই যে তাঁর অকাল মৃত্যু হ'ল, তা কেউ বুঝলো না। একদিন আমাকে তিনি বলেছিলেন—শরৎবাবু, মাসে ৩০০৲ টাকা না হলে আমার চলে না দেখছি। এই রকম বাঁধা আয় যদি আমার একটা থাকত।—আমি মনে করেছিলুম বলি, আমি নিজেই তো সে রকম ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু বলতে ভরসা করি নি।

শরৎবাবু আবার বলিলেন—কি অপরিসীম ছিল তাঁর বিশ্বাস (ফেথ্)। স্কট লেনে কোন উপকৃত বড় লোকের (যাকে তিনি জেল থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন) কাছ থেকে দেশের জন্য টাকা আদায় করতে তাঁর সঙ্গে গিয়ে, যখন সে লোকটির ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছিলুম, তিনি বলেছিলেন—অন্য প্রদেশে যাই হউক, বাঙ্গালী সম্বন্ধে আমি এ বিষয়ে হতাশ নই। তাদের হয়ত ভাল করে বুঝাতে পারছি না। নিশ্চিত বুঝতে পারলে তারা টাকা ঢেলে দেবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শরৎবাবুর নারী-চরিত্র

শরৎবাবুর উপন্যাসগুলিতে নারী চরিত্রের যে সব মনোরম বিশ্লেষণ আছে, তাহা সাহিত্য-রসিক মাত্রেই উপভোগ করিয়াছেন এবং সমালোচকের কঠিন কষ্টিপাথরেও নিয়ত পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমি তাঁহার নিজের মুখ হইতে নারী-চরিত্রের যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শুনিয়াছি, তাহাও কম অপূর্ব নয়।

'মোটেই অবলা নয়', একদিন তিনি বলিলেন। নারীকে লোকে এবং কাব্য সাহিত্যে অবলা বলে কেন? তাহারা অনেক বিষয়ে যাহা করিতে পারে, তাহা অনেক দুঃসাহসিক পুরুষের পক্ষেও অসম্ভব। শাস্ত্রকারেরা তাদের কাম-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ঠিক সত্য না হইতেও

পারে। তবে ক্রোধে উত্তেজিত বা কামনায় উন্মত্ত রমণীকে যাহা করিতে দেখিয়াছি, পুরুষকে কখনও সেরূপ করিতে দেখি নাই।

১৩।১৪ বৎসরের একটি মেয়ে কুপথে আসিবার এক সপ্তাহের মধ্যে চারি পাঁচ জন মাতালের মধ্যে নিরুদ্বেগে রাত্রি কাটাইতে পারে। কিন্তু ঐ বয়সের কোন ছেলে বিদেশে নিরাপদ স্থানে লজ্জায় এবং উদ্বেগে অতি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। চিরকালের গৃহস্থ রমণী ঘটনাক্রমে একবার পতিতা বা ধর্ষিতা হইলে, অতি অল্পকালের মধ্যেই লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া নূতন জীবনে যেরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যে সেরূপ হয় না। এরূপ একজন প্রৌঢ়াকেও এক সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ স্থানে, পথে ঘাটে মাতলামি করিতে বা নির্লজ্জ কুকথা বলিতে দেখিলেও আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

আবার প্রণয়াস্পদের জন্য ইহাদের অকরণীয় কিছুই নাই। বর্মার কথা। একজন বাঙ্গালী মেয়ে এক বস্তীতে একজন রুগ্ন, কৃশ, কদাকার পুরুষকে লইয়া থাকিত। সে নানাভাবে······প্রণয় নিবেদন করিল।······তাহার সঙ্গলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েকদিন একত্র কাটাইবার পর সে অন্তর্ধান হইল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাগলের মত ঘুরিতে লাগিলাম। বাড়ীউলি একদিন সহানুভূতিতে বলিয়া ফেলিল—কাহার জন্য এমনভাবে শরীরপাত করিতেছ। সে কেমন তোমাকে ঠকাইয়া তাহার বন্ধুর জন্য টাকা রোজগার করিতেছিল। এখন তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তোমার উপর তাহার কখন কিছুমাত্র দরদ ছিল না।—আশ্চর্য! মেয়েটি কিন্তু বাস্তবিকই অত মন্দ নয়। শুধু প্রণয়াস্পদের হিতের জন্যই সে এমন হীন প্রতারণা করিয়াছিল।

তিন চারি ছেলের মা, ভদ্রঘরের মেয়ে, লজ্জাসরম ত্যাগ করিয়া সকলের সাক্ষাতে নিঃসঙ্কোচে পরপুরুষের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, দেখিয়াছি।
(শেষের পরিচয়)

৪-৯-৩২

গ্রীষ্মের ছুটির মধ্যে একদিন সামতাবেড় গিয়াছিলাম। কয়েক ঘণ্টা আবার আগের মতই আনন্দে কাটিল।···

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বইখানি দেখাইয়া যেন এই রকম কথা বলিলেন—আইনস্টাইন লিখিয়াছেন, যিনি যে কার্য করেন, তাহা পূর্ব হইতে বিধিনির্দিষ্ট।

করিব বলিলেই করা যায় না এবং করিব না মনে করিলেও অদৃষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করা যায় না।

জুলাই, ১৯৩৫

সেদিন শরৎবাবুর মনোহরপুকুরের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন ইজিচেয়ারে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। নিকটের তক্তপোষের উপর ফরাসে দুইটি তরুণ।···

কথায় কথায় নারী-প্রগতি সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ হইল, তরুণ দুইটি ও শরৎবাবুর মধ্য। আমি শুনিতে লাগিলাম। শরৎবাবু বলিলেন—এই স্থানে অল্পদিন আসিয়াছি। ইহার মধ্যে নারী-প্রগতি যে কিরূপভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি—

১। এ অঞ্চলে মহিলাদের এক ক্লাব আছে। সেখানে নাকি স্ত্রী-পুরুষের অসঙ্কোচ আলাপের ব্যবস্থা। আমি একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে যাই। দেখলুম, নামে অসঙ্কোচ হলেও সঙ্কোচ অধিকাংশেরই একেবারে কাটে নাই।

২। কোন এক মহিলা এই অঞ্চলে (বালিগঞ্জ) শিক্ষকতা করেন। বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। আমায় সেদিন বলিলেন—দাদা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি দৈহিক প্রয়োজনে কেহ গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা করিয়া পুরুষ সঙ্গ করে, তাহাতে সামাজিক বা নৈতিক কি দোষ হইতে পারে? আমার এক ভগিনী মফঃস্বলে এক প্রফেসারের স্ত্রী, এখানে প্রসব হইতে আসিয়াছেন। আয় অল্প। দুই চারিটি পুত্রকন্যা হইলে তাহাদের কত অসুবিধা বলুন তো?

সেই মহিলাটি তাঁহার নিজের বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন—বিবাহের বয়স আমার অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বিবাহের বয়স ২০ বৎসরের মধ্যে বা তাহার কাছাকাছি। ৩০।৩২ বৎসর বয়সে বিবাহ বিবাহই নয়। না থাকে রোমান্স না থাকে···

তিনি মিষ্টভাষী ও সুরসিক ছিলেন। তিনি সকলকে লইয়া রহস্য করিতেন। কিন্তু কখনও কাহাকেও বিদ্রূপ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে নাই। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ সকলের উপরই তাঁহার

রহস্যধারা বর্ষিত হইত। রবীন্দ্রনাথ, জলধরবাবু, রামানন্দবাবু প্রভৃতির উপর তাঁহার রহস্যের ধারা যেমন বর্ষিত হইত, এই তুচ্ছতম বন্ধুর উপর তাঁহার স্রোত তেমনিই বহিত। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন—অনেকে 'শেষ-প্রশ্নে'র ইতিহাসের অধ্যাপক অক্ষয়কে আপনি বলিয়া মনে করিতেছেন। সুতরাং এবারকার সংস্করণে ফুটনোটে লিখে দিতে হবে, 'ইনি আমার বন্ধু অক্ষয়বাবু নহেন।'

আর একবার তাঁহার বাড়ী যাইতেই তিনি তাঁহার পাচককে ডাকিয়া বলিলেন—ঠাকুর, রামানন্দবাবু তোমার কে হন?

ঠাকুর উত্তর করিল—খুড়া।

শরৎবাবু বলিলেন—রামানন্দবাবু আমার উপর বড় চটা, সেইজন্য তাঁহার ভাইপোকে রাঁধুনি রাখিয়াছি। এটি চাটুয্যে এবং বাঁকুড়ায় বাড়ী।

তাঁহার রহস্য অনেকে না বুঝিয়া বিদ্বেষ মনে করিত। একদিন সুরেন্দ্রবাবু (ডাক্তার দাশগুপ্ত) কিছুক্ষণ আলাপের পর উঠিয়া গেলে বলিলেন—দাশগুপ্তের চেয়ে আপনার রহস্যবোধ বেশী আছে। আমার রহস্য না বুঝিয়া উনি প্রতিবাদ করিলেন। কথাটা 'সিরিয়াস' মনে করিলেন, আপনি কিন্তু সেরূপ করেন না।

তাঁহার কতকগুলি রহস্যের কথা মনে হইতেছে। একদিন বলিলেন—আপনি একটু দেরিতে আসিয়াছেন। একটু আগে আসিলে দেখিতেন, কত সহজে আজ একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলাম। আজ কয়েকটি ব্রাহ্ম মহিলা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার সাহিত্য-ভক্ত, কিন্তু তাঁহাদের মনে একটু কষ্ট হইয়াছে, 'অচলা'র চরিত্র অঙ্কণ সম্বন্ধে। আমি নাকি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে অচলার চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত করিয়াছি যাহাতে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অপমান করা হইয়াছে।

আমি বলিলাম—আপনি আপনার ভক্তগণকে কি কৈফিয়ৎ দিলেন?

তিনি বলিলেন—আমি বলিলাম যে, আমি কোনকালেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের পক্ষপাতী নহি। আপত্তিজনক অংশ নূতন সংস্করণে নিশ্চয় পরিবর্তন করিয়া দিব।

আমি বলিলাম—কিরূপ পরিবর্তন?

তিনি বলিলেন—অচলার সম্বন্ধে যেখানে 'আজীবন তৃষ্ণা' আছে, সেখানে 'আজীবন পিপাসা' লিখিতে হইবে।

বাস্তবিক রামানন্দবাবুর উপর তাঁহার স্থায়ী বিদ্বেষ ছিল কিনা জানি না, তবে একবার শরৎবাবু রামানন্দবাবু সম্বন্ধে একটু অনুযোগ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি (১৩৪৬ আষাঢ়-আশ্বিন মধ্যে) শরৎবাবু সম্বন্ধে রামানন্দবাবু (প্রবাসী-সম্পাদক) ও নরেন্দ্র দেবের (শরৎবাবুর জীবনী-লেখক) মধ্যে বেশ বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছে। তাহার বিষয় এই যে, শরৎবাবুকে প্রবাসী ও মডারন্ রিভিয়ুতে লিখিবার জন্য রামানন্দবাবুর পুত্র জামাতা প্রভৃতি সামতাবেড়ে গিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না এবং রামানন্দবাবুর শরৎবাবুর লেখা প্রকাশ করিতে কোনকালে অনিচ্ছা ছিল কিনা।

এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবু (······প্রবাসীতে) যে টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি যেন বলিতে চান যে, কোনকালেই শরৎবাবুর লেখা তাঁহার কাগজে প্রকাশিত হইবার কোনরূপ বাধা ছিল না। কিন্তু আমার কাছে রামানন্দবাবুর স্বহস্ত লিখিত এক পত্রাংশ আছে, যাহা তিনি তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় সবজজ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন—'যিনি ব্রাহ্ম মাত্রই বদ্‌মাইস বলিয়া থাকেন, তাঁহার লেখা আমার কাগজে ছাপিতে পারি না। ইহাতে যদি আপনার বন্ধু আমাকে অনুদার মনে করেন, আমি অনুদার।'

১৮-১০-৩৯

শরৎবাবুর মুখে একবার শুনিয়াছিলাম, 'আপনারা কি এখনও বঙ্কিমবাবুকে 'সাহিত্য-সম্রাট' বলিবেন।' বহরমপুর কলেজের লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত অতুল দত্তের সহিত শরৎবাবুর তর্কের পর একবার অতুলবাবু যেন বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার পরে বঙ্কিমবাবুর সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে শরৎবাবুর প্রতিকূল মতের উপর তীব্র আক্রমণ 'শনিবারের চিঠি'তে দেখিয়াছি।

শরৎবাবু আর একবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, একমাত্র 'কপালকুণ্ডলা'তেই বঙ্কিমবাবুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই আমরা কপালকুণ্ডলা পড়িতাম।"

[অক্ষয়বাবুর শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপ-আলোচনামূলক এই লেখাটির মধ্যে, এই গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় দু জায়গায় '……' আছে। অক্ষয়বাবু ঐ দু জায়গায় শরৎচন্দ্রের নিজের কথা বলে ইচ্ছা করেই, যথাক্রমে 'আমার কাছে' ও 'আমার' এই কথা দুটি লেখেন নি।

যাই হোক্, অক্ষয়বাবুর এই লেখাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এক সময় একটি রুগ্ন, কৃশ ও কদাকার লোকের প্রণয়িনীর সহিত কিছুদিন একত্রে কাটিয়েছিলেন।

এই কাহিনীটির সত্যতা সম্বন্ধে অক্ষয়বাবুর কি মত, তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন—সত্য হ'লেও হতে পারে। তবে কিন্তু মিথ্যা বানানো গল্প বলেই আমার মনে হয়।

এই কাহিনীটি সম্বন্ধে আমারও বক্তব্য এই যে, ঘটনাটি সত্য হ'লেও হ'তে পারে। তবে ঘটনাটি সত্য নয় বলেই আমারও মনে হয়।

শরৎচন্দ্র একবার এক পত্রে জীবন্ত সাহিত্য-সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন—

"সব চেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মত বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্গলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে, এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।"

শরৎচন্দ্র যেমন জ্যান্ত লেখা লিখতেন, তেমনি গল্পও বলতেন জ্যান্ত গল্প। তাঁর মুখের গল্প শুনলে, সেই গল্পকে এতটুকুও অবিশ্বাস করবার উপায় থাকত না। আর তিনি তাঁর গল্পকে জীবন্ত করে তুলবার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলেও চালিয়ে যেতেন। এতে তিনি শ্রোতার কাছে খেলো হবেন কি, ভাল হবেন, সেদিকে খেয়ালই রাখতেন না।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই জানতেন যে, শরৎচন্দ্রের গল্প বলার কিরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আর তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতেও এমন একটা যাদু ছিল যে, শ্রোতারা তাঁর কথা শুনলে অভিভূত হয়ে যেতেন।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন—গল্প শুনিয়া অভিভূত হইয়াছিলাম। শুধু গল্প নয়, গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গীতেও। শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের, তাহাতে ভাবের সংক্রামতা আরও অব্যর্থ।

শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীও লিখেছেন—অনেকেই হয়ত জানেন যে, শরৎচন্দ্র একজন ভাল গল্প বলিয়ে ছিলেন। তাঁর লেখার চেয়ে তাঁর গল্প বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর।

শরৎচন্দ্র বন্ধুমহলে সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে গল্প বলতেও খুব দক্ষ ছিলেন।

তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র অক্ষয়বাবুর কাছে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, নারী প্রণয়াস্পদের জন্য কি-না করতে পারে, এই গল্পটিকে জ্যান্ত গল্প করবার জন্য ঐভাবে নিজেকে জড়িয়েই হয়ত এই কাহিনীটি বিবৃত করেছিলেন।

৯৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'রামানন্দবাবুর স্বহস্তলিখিত পত্রাংশ'টির একটি ইতিহাস আছে। তা এই :—

রামানন্দবাবুর বন্ধু সাবজজ জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়বাবুরও বন্ধু ছিলেন। রামানন্দবাবুর সঙ্গে জ্ঞানবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব থাকায়, অক্ষয়বাবু এক সময় জ্ঞানবাবুকে বলেছিলেন—আপনি রামানন্দবাবুকে বলে শরৎবাবুর কিছু লেখা প্রবাসীতে ছাপাবার ব্যবস্থা করুন না!

শরৎচন্দ্র কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুই জানতেন না। অক্ষয়বাবু তাঁকে না জানিয়েই জ্ঞানবাবুকে ঐ কথা বলেছিলেন।

অক্ষয়বাবুর কথামত, জ্ঞানবাবু এক সময় রামানন্দবাবুকে প্রবাসীতে শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপানোর কথা বললে, তখন রামানন্দবাবু শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপাতে কেন অক্ষম তার কারণ জানিয়ে জ্ঞানবাবুকে এক চিঠি দিয়েছিলেন।

জ্ঞানবাবু রামানন্দবাবুর চিঠির মধ্য থেকে, শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপাতে রামানন্দবাবুর আপত্তির কারণটুকু কেটে নিয়ে, এক চিঠির সঙ্গে অক্ষয়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এইটাই অক্ষয়বাবুর বর্ণিত রামানন্দবাবুর স্বহস্তলিখিত পত্রাংশ।]

কালিদাস রায়ের সহিত আলোচনা

শরৎচন্দ্রের তখন সবেমাত্র 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ' প্রভৃতি খানকয়েক বই প্রকাশিত হয়েছে।

কবি কালিদাস রায় ঐ সময় কলেজের ছাত্র। কালিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' পড়ে সেই সময় একদিন 'যমুনা' অফিসে শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—স্বামীর উপর অভিমান করে বিরাজ বৌ-এর আত্মহত্যাই করবার কথা। আত্মহত্যা করবার জন্য জলে সে ঝাঁপও দিতে গিয়েছিল। মাঝ থেকে জমিদার পুত্রের বজরায় তাকে নিয়ে গিয়ে তার সতী-বুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করলেন কেন? 'সাইকোলজি'র বিধি অনুসরণ করতে করতে 'প্যাথোলজিক্যাল কন্‌ডিশনে'র সাহায্য নিলেন কেন?

শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে সেদিন তাঁকে বলেছিলেন—উপন্যাসের মূল কথাটাই বোঝ নি। পারিবারিক অশান্তির জন্য হিন্দুনারীর আত্মহত্যার সুলভ চিত্র-অঙ্কনই আমার উদ্দেশ্য নয়। নারী অভিমানে আত্মহত্যা করে। অতিরিক্ত অভিমানিনী ও অতিবিড়ম্বিতা নারী অভিমানে তারও বেশী করতে পারে। সতীর পক্ষে প্রকৃত আত্মহত্যা তার সতীব্রতের হত্যা। আমি তাও তো করাই নি। মুহূর্তের উত্তেজনায় অভিমানিনী লাঞ্ছিতা সতী ভুল করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হওয়া মাত্র তার অন্তর্নিহিত সতীধর্ম তাকে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে। আমি তাই দেখাতে চেয়েছি। আর তুমি যে 'প্যাথোলজি'র কথা বললে—তা 'সাইকোলজি'রই অন্তর্গত। যেমন, সুস্থ অবস্থা আর ব্যাধিত অবস্থা, দুই-ই জীবনের অন্তর্গত। মন যার আছে, মনের ব্যাধিও তার ঘটতে পারে। উপন্যাস গল্পে মনের সুস্থ সজীবতার স্থান আছে, মনের ব্যাধির স্থান নেই, এ আমি মনে করি না। তাছাড়া মানব চরিত্র অত্যন্ত জটিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিচয় হলে দেখবে, যা আজ অস্বাভাবিক বলে মনে করছ, যাকে প্যাথোলজিক্যাল কন্‌ডিশন বলে তোমার মনে হচ্ছে, দেখবে তা সাইকোলজির গণ্ডী অতিক্রম করেনি। মানব

সংসারের যা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানি না, কথা-সাহিত্যে তার ঠাঁই দিই নি। এইটাই আমার প্রধান সমর্থন।

পরে এই সাহিত্যের সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কালিদাসবাবুর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজনদেরও একজন হয়েছিলেন।

কালিদাসবাবু পরে শরৎচন্দ্রকে একদিন বলেছিলেন—আমি একটা আবিষ্কার করেছি দাদা। আপনি লিখবার প্রেরণা ও দীক্ষা পেয়েছেন 'চোখের বালি' পড়ে।

কালিদাসবাবুর এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি ঠিক ধরেছ ভায়া, আমি ঐ চোখের বালি খানা পড়েছি ২৪ বার। আর রীতিমত ওর ওপর দাগা বুলিয়েছি। তবে আর একখানা বই-এর নাম করলে না কেন? আমি 'নষ্টনীড়ে'র কথা বলছি। ওখানাও অন্ততঃ ২০ বার পড়েছি। আমার সাহিত্য রচনার দীক্ষা ঐ বই দুখানা থেকে।

এরপর শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক একজন ঔপন্যাসিকের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন—দেখ, অমুক প্লট প্লট করে রবীন্দ্রনাথকে জ্বালাতন করে। সে মনে করে, একটা প্লট পেলেই বুঝি একখানা উপন্যাস লেখা হয়ে গেল। সে প্লটের জন্য বিলিতি নভেলগুলো পড়েও অনেক সময় নষ্ট করে। আবার শুনেছি, প্লটের জন্য প্রত্যেক সন্ধ্যায় বায়স্কোপও দেখে। লিখতে জানলে কি প্লটের জন্য আটকায়? আমি কোন প্লট ভেবে লিখতে বসি না। একটা কোন চোখে দেখা সত্য ঘটনা অথবা একটা ঘর-সংসারের চিত্র নিয়ে সুরু করে দিই—তারপর কলম চলতে থাকে। তাতে যা হোক একটা কাঠামো দাঁড়ায়। তারপর যা স্বাভাবিকভাবে আসবার কথা তাই আসে। কোন একটা বিচিত্র ব্যাপার বা ঘটনা জানি বলেই সেটাকে জোর করে ঢুকোবার চেষ্টা করি না। এতে যদি কোন প্লট না দাঁড়ায় তাতেই বা কি আসে যায়। আর কিছু হোক বা না হোক—বাঙ্গালী জীবনের একটা চিত্র তো ফুটে ওঠে। তা হলেই সাহিত্য হলো। যেখানে বাইরের ঘটনা জোটে, সেখানে ঘটনাকেই অবলম্বন করা যায়। যেখানে জোটে না, সেখানে মুখের কথায়, আচরণে, ব্যবহারে, হাবভাবে, চালচলনে চরিত্র ফোটে—জীবনও ফোটে। চরিত্রগুলি যে আমাদের মতই জীবন্ত। তাদের মননশক্তি আছে, মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় আছে।

তাদের মনের ভিতরে ভিতরে কি মহামারী কাণ্ডই না হচ্ছে! সেখানে ভায়ের সঙ্গে ভায়ের, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের কি কুরুক্ষেত্রই না হচ্ছে! মনের ভিতরকার যে ঘটনাগুলো বাইরের ঘটনার চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত, সেগুলোর কথা লিখলেই তো প্লটও হয়—সাহিত্যও হয়।

শরৎচন্দ্রের এই কথার উত্তরে কালিদাসবাবু বলেছিলেন—তাতে 'গুড্ নভেল' হয়, 'গ্রেট নভেল' হয় না। গ্রেট নভেল লিখতে হলে, একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আগে হতে মনে তৈরি থাকা চাই।

কালিদাসবাবুর কথার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—তোমাদের ঐ কলেজে পড়া কতকগুলো তোতাপাখীর মত বুলি আছে। আমার গ্রেট নভেলে কাজ নেই, রবীন্দ্রনাথ তা লিখুন। (কালিদাসবাবু বলেন—শরৎচন্দ্র 'রবীন্দ্রনাথ তা লিখুন' বলে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের ইঙ্গিত করেছিলেন।)

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ৩য় পর্ব প্রকাশিত হ'লে, কালিদাসবাবু একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—একি হলো দাদা, আপনি শেষে সমাজ-ভীরু গোঁড়া হিন্দুর মত রাজলক্ষ্মীকে কাশীবাসিনী করে গুরুর চরণে সমর্পণ করলেন। তাকে একেবারে থেরী অম্বপালী বানালেন, আর শ্রীকান্তকে দিলেন বিদায়?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—আমি তোমাদের বর্ণাশ্রমী হিন্দু নই, কিন্তু সমাজের বাইরের লোকও নই। শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী এটা, তোমরাই তো বলো, এটা মামুলি ধরণের নভেল নয়। ভ্রমণ-কাহিনীই যদি হয়, তবে ভ্রমণ-কাহিনীর শেষ দেখাতে হয়। (অবশ্য যদি বেঁচে থাকি কিছুদিন) শেষ দেখাতে হবে—এখানেই শেষ হলো না। তাতে দেখ্‌বে, আমি কোন্ শ্রেণীর হিন্দু।

কালিদাসবাবু বললেন—দাদা, আমার মনে হয়, শ্রীকান্ত নভেলও নয়, ভ্রমণ-কাহিনীও নয়। এটা কাব্য—এটা রীতিমত একটা এপিক কাব্য! এটা যদি না বুঝে থাকি, তবে শ্রীকান্ত বুঝি নি।

শরৎচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ হে ভায়া, নিজ মুখে সেটা আর বললাম না, সেটা

বলা আমার স্পর্ধার কথাই হতো। কাব্যের শেষ পরিচ্ছেদ এখনও লেখা হয়নি।

শরৎচন্দ্রের বইগুলি সম্বন্ধে কালিদাসবাবু নিজের মন্তব্য মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রকে জানাতেন। অবশ্য, প্রতিকূল মন্তব্য কোনদিন জানান নি।

শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুকে একদিন বললেন—তোমাকে আমার সম্বন্ধে লিখতে হবে, তবে আমার জীবদ্দশায় নয়। আমার জীবদ্দশায় লিখলে, স্বাধীন অপক্ষপাতভাবে লিখতে পারবে না। ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমার দিন তো ফুরিয়ে এলো!

শরৎচন্দ্রের এই কথার উত্তরে কালিদাসবাবু বললেন—না-না, আপনার শরীরে কোন রোগ নেই, ডায়াবেটিস নেই, ব্লাডপ্রেসার নেই। চুল পাকা ছাড়া বার্ধক্যের কোন লক্ষণ নেই। কর্মক্ষমতা ও দৈহিক সামর্থ্য অটুট রয়েছে,—দেখবেন, আশি বছর পর্যন্ত বাঁচবেন। তাছাড়া কেউ কি বলতে পারে দাদা, কবে কার দিন ফুরবে?

শরৎচন্দ্র বললেন—তা ঠিক, তবে তোমার সঙ্গে আমার বয়েসের যে তফাৎ তাতে প্রত্যাশা করি, তুমি আমার কথা লিখতে যথেষ্ট সময় পাবে। রোগ রোগ করা আমার অভ্যাস নয়, তাই বুঝতে পার না। আমার শরীরটা ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে গেছে। যাক্ সে কথা!

কালিদাসবাবু, শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে সুরু করেন নি বটে, তবে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কিছু কিছু নোট রাখতেন, একদিন তাঁর সম্বন্ধে লিখবেন এই ভরসায়। কিন্তু কালিদাসবাবুর পক্ষে মুস্কিল ছিল, তিনি কিছুতেই শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যের আলোচনায় নামাতে পারতেন না। কালিদাসবাবু যখনই কোন সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুলতেন, তখনই শরৎচন্দ্র বলতেন —ও থাক ভাই, একটা গল্প শোন।

কালিদাসবাবু বলতেন—তা না হয় শুনছি। কিন্তু আমাকে যে আপনার কথা লিখতে হবে, আপনি আপনার সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠলেই থামিয়ে দেন, লিখব কি তবে?

শরৎচন্দ্র বলতেন—আমার যা কিছু বলবার, তার সবই আমার বই-এ

আছে, এত বেশী আত্মকথা ও অভিজ্ঞতার কথা কারো লেখায় পাবে না। আমার কাছে গল্প ছাড়া, বাজে কথা ছাড়া কিছুই শোনবার নেই ভাই! আমার বই থেকে যদি কেউ আমার অন্তর্জীবনের সব কথা উদ্ধার করতে না পারে, তাহলে সে আমার কথা লিখতে পারবে না। লেখকের জীবন-কথার যা প্রকাশযোগ্য তা কি তার লেখার বাইরে বিশেষ কিছু থাকে? আর সাহিত্যালোচনা মানে তর্ক বা বাদানুবাদ। তর্ক করার ক্লেশটা আমি এড়াতেই চাই।

কলকাতায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সংস্থা 'রসচক্রে'র সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র এবং সম্পাদক ছিলেন কালিদাসবাবু। শরৎচন্দ্র কলকাতায় থাকলে রসচক্রের অধিবেশনে যোগ দিতেন। প্রতি রবিবারে তখন এই রসচক্রের অধিবেশন বসত। কালিদাসবাবু 'রসচক্রে'র বৈঠকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার বা তাঁকে প্রশ্ন করবার কোন অবকাশ পেতেন না। কাজেই সপ্তাহে ২।৩ দিন অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে সকাল বেলায় কালিদাসবাবু যেতেন। কালিদাসবাবু গিয়ে দেখতেন, শরৎচন্দ্রকে চটিয়ে দিলে কিছু কিছু কথা বার করা যায়। শ্রীকান্তের ৪র্থ পর্ব বেরোনোর পর একদিন কালিদাসবাবু বললেন—'শ্রীকান্ত' নিয়ে নানাজন নানাকথা বলছে। 'ভারতবর্ষে' শ্রীকান্ত যখন বেরোতে সুরু করে, তখন এর নাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী'। একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন—আপনার উদ্দেশ্য ছিল, আপনার ভবঘুরে জীবনের ভ্রমণ-কাহিনীই লিখবেন। অবশ্য পুরোপুরি তা হ'ল না, তবে বিশেষ করে প্রথম পর্বটা অনেকটা ভ্রমণ-কাহিনীই হয়েছে, ঠিক নভেল হয় নি। পিয়ারী না এসে পড়লে পুরোপুরি ভ্রমণ কাহিনীই হ'ত।

কালিদাসবাবু দেখলেন—এতে শরৎচন্দ্র চটলেন না, হেসে বললেন—কেউ যদি তা বলে থাকে, তবে অন্যায় কিছু বলে নি। শ্রীকান্ত ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া আর কি? দেশে দেশে বেড়ানোও ভ্রমণ, মানুষের মনে মনে ঘুরে বেড়ানোও ভ্রমণ। বেশ তো, শ্রীকান্ত নানা শ্রেণীর নর-নারীর মনোরাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। যা দেখেছে, তাই লিখেছে। ভ্রমণ-কাহিনীই যদি হয়ে থাকে, তাতেই বা ক্ষতি কি?

কালিদাসবাবু বললেন—এ কথাও তো বলতে পারেন শ্রীকান্ত একজন

মুসাফির—দূর জীবন-পথে লক্ষ্যহীন হয়ে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পথের ধারে এক একটা সরাইখানায় বা মুসাফিরখানায় বিশ্রাম করছে, আর নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে। একটি নারী কেবল তার পিছু নিয়েছে, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পথে যেতে যেতে ব্যারাম পীড়া হলে সে কোথা থেকে আবার একখানা তালপাতার পাখা আর একটা জলের পাত্র নিয়ে এসে জুটছে। এমনি করে চলতে চলতে তারা ডেরা বাঁধল এক জায়গায় গিয়ে। সেই পথের বৃত্তান্তই ৪র্থ পর্ব শ্রীকান্ত।

শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন। হেসে বললেন—তা যা হয় বলো। আর কে কি বলে?

কালিদাসবাবু বললেন—কেউ কেউ বলে—শ্রীকান্ত আপনার স্মৃতিকথা, ঠিক নভেল নয়। আপনি নিজেই লিখেছেন—এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় একটি অধ্যায়ের কথা বলিতে গিয়া আমার কত কথাই মনে পড়িতেছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—এ কথা কে বলেছে? যখন শ্রীকান্ত প্রথম ভারতবর্ষে বেরোয়, তখন কি আমার জীবনের অপরাহ্ণ বেলা? জীবনের অপরাহ্ণ বেলা আমার নয়, শ্রীকান্তের।

কালিদাসবাবু বললেন—যাই হোক্, সে একই কথা। শ্রীকান্তের মধ্যে আপনি তো অনেকটাই আছেন। তাই তারা এ কথা বলে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তারাই বা অন্যায় কি বলেছে! সকল উপন্যাসই তো লেখকের স্মৃতিকথা, ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত চরিত্রের মুখে বসানো। সেই সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে, জেনেছে তাদের কথাও থাকে। লেখক তার অভিজ্ঞতার বাইরের কথা কি উপন্যাসে ঠাঁই দেয়? ঠাঁই দিলে তা রূপকথা হয়, রোমান্স হয়, উপন্যাসের ছদ্মবেশে প্রবন্ধের বই হয়, উপন্যাস হয় না। আমি আমার স্মৃতিকথা শ্রীকান্তের মারফতে—সবটা নয়, অনেকটা বলেছি বৈকি! এ জন্যই সাধারণ পদ্ধতি ত্যাগ করে 'ফার্স্ট' পারসন্ সিঙ্গুলার নাম্বার'এর জবানীতে গোটা বই লিখেছি। এতে মাঝে মাঝে মন্তব্য করবার সুবিধা হয়েছে।

গোড়াটা তো আমার ভাগলপুরের কৈশোর জীবনের স্মৃতিকথা। তোমরা জানো ভাগলপুরে ছোটবেলায় মামার বাড়ীতে থাকতাম।

কালিদাসবাবু বললেন—হ্যাঁ, তাতো জানি। এবং সবাই জানে,

ইন্দ্রনাথ তো দুরন্ত জল-জিয়ন্ত জলন্ত বালকই ছিল। একটু 'এম্ফাসিস্' দেওয়া আছে হয়ত ঐ চরিত্রে।

শরৎচন্দ্র ঈষৎ কুপিত হয়ে বললেন—একটুকুও এম্ফাসিস্ দেওয়া নেই। তবে একাধিক রাত্রির গঙ্গাবক্ষে অভিযান হয়ত এক রাত্রিতেই দেখানো হয়েছে। ইন্দ্রনাথ যে কত বড় মানুষ ছিল, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না—আমি তার চরিত্র পুরাপুরি এঁকে দেখাতে পারি নি, আমি তার আভাষ দিয়েছি মাত্র। তবে নতুনদাতে একটু এম্ফাসিস্ দেওয়া হয়েছে। নতুনদাও একেবারে কল্পিত যুবক নয়।

কালিদাসবাবু বললেন—ইন্দ্রনাথের মাছ চুরিটা হয়েছে অন্নদা দিদির সঙ্গে 'কনেক্টিং লিংক'। অন্নদা দিদির সমাগমের অনিবার্য হেতু ছিল কি ?

শরৎচন্দ্র বললেন—নিশ্চয়ই ছিল। বাপ্ রে, স্মৃতিকথায় তাঁকে বাদ দিতে পারি ? (এই বলে তিনি অন্নদা দিদির উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।)

কালিদাসবাবু বললেন—অন্নদা দিদি তবে 'রিয়াল ক্যারেক্টার' ? এরূপ চরিত্র তো সচরাচর দেখা যায় না, দাদা !

শরৎচন্দ্র বললেন—আমিও ঐ একটি দেখেছি। কোন অত্যুক্তি নেই। তোমরা সভ্য সমাজের বাইরের মানুষের কতটুকু খোঁজ রাখ ? সাপের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। সাপুড়েদের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবেই মিশেছি। কোন জড়িবুটি মন্ত্র-তন্ত্র ওদের সত্যই আছে কিনা তা জানবার কৌতূহল ছিল আমার খুবই।

কালিদাসবাবু বললেন—'বিলাসী' গল্পটাতেও আপনার সাপের সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখা যায়, কি চমৎকার, কি 'প্যাথেটিক' গল্প !

শরৎচন্দ্র বললেন—সাপের সঙ্গে আমার কতবার যে দেখা, তার ইয়ত্তা নেই। কতবার যে সাপের দাঁত থেকে বেঁচে গেছি, তারও হিসাব নেই। তোমরা আমার যে পুরানো লাঠিটাকে ফেলে দিতে বলো, ঐ লাঠিটা দিয়ে আমি অনেক সাপ মেরেছি। সেজন্য ওটাকে ছাড়তে পারি না।

কালিদাসবাবু বললেন—আচ্ছা অন্নদা দিদিকে কোথায় দেখেছিলেন, দেবানন্দপুরে—না ভাগলপুরে ?

এই প্রশ্নে শরৎচন্দ্র একটু চটে গেলেন। বললেন—তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য

আমি বুঝেছি। তুমি কি মনে কর, আমি ডায়েরি বা রিপোর্ট লিখছি যে স্থান, কাল, পাত্র সম্বন্ধে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে মিলিয়ে লিখব? স্মৃতিকথার সূত্র এক, রিপোর্টের সূত্র আর। খণ্ড খণ্ড স্মৃতি-চিত্রকে কথা-সাহিত্যের সূত্রে 'আর্টিস্টিকেলি' গাঁথতে হয়েছে। বেশী 'ডিটেল'এর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি চালিয়ো না।

কালিদাসবাবু বললেন—অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে রাত্রি যাপন—এ-ও কি আপনার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু?

শরৎচন্দ্র বললেন—নিশ্চয়ই! মনে রেখো, শ্রীকান্ত ছিল ইন্দ্রনাথের বেপরোয়া চেলা। তার অসাধ্য কাজ কিছু ছিল না।

কালিদাসবাবু বললেন—আমি ভেবেছিলাম, আপনার অসাধারণ প্রতিভার সর্বশক্তিমতী কল্পনার সৃষ্টিটাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। ভেবেছিলাম, শ্মশানের অন্ধকার পটটা রাজলক্ষ্মীর সদ্যোজাত হৃদয়াবেগের একটা পট-ভূমিকা মাত্র।

শরৎচন্দ্র বললেন—সত্য না হলে ঐ চিত্রের গ্রন্থে ঠাঁই পাবার কোন দাবী ছিল না।

কালিদাসবাবু বললেন—সখের সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আপনার আছে, তা জানি। কিন্তু ভবঘুরে জীবনের ওখানেই কি শেষ?

শরৎচন্দ্র বললেন—ভবঘুরে জীবন আমার সন্ন্যাসেই শেষ হয় নি। অনেক দিনই নানা দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তা চলেছিল। কিন্তু শ্রীকান্ত বেচারাকে আর ঘুরাই নি। ৩য় পর্বে যে অগ্রদানী-বাড়ীর আতিথ্যের কথা আছে, সেটা আমার জীবনে ভবঘুরে অবস্থাতেই ঘটেছিল। পোড়ামাটি গ্রামের ডোমের বাড়ীর ঘটনাটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, আমার গ্রামেই ছোট বেলায়। গ্রাম্য জীবনের স্মৃতি সমস্ত বই-এ ছড়ানো আছে, ৪র্থ পর্বেই বেশী।

বেহারে বাঙ্গালী বালিকা বধূর শোচনীয় দৃশ্য সন্ন্যাস অবস্থাতেই স্বচক্ষে দেখা, একটুও অতিরঞ্জিত নয়।

কালিদাসবাবু বলেন—আমি জানতাম পিয়ারী সম্পূর্ণ কল্পিতা রমণী। ও-প্রসঙ্গ তোলাও যায় না, তুলবার প্রয়োজনও ছিল না। আমি রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গ না তুলে সটান সমুদ্রবক্ষে সাইক্লোনের দৃশ্যে চলে গেলাম।

কালিদাসবাবু বললেন—সাইক্লোনের সঙ্কটের যে আপনি নিজে ভুক্তভোগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাক্তার কল্পনার পক্ষে সমুদ্রের ঐ দৃশ্য বর্ণনা অসাধ্য। ব্রহ্মদেশে তো আপনি ছিলেনই। ওদেশ সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনার তিনখানা বই-এ আছে।

কালিদাসবাবু অভয়ার কথাও না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা মোটামুটি কি ?—কালিদাসবাবু এই প্রশ্ন করে কৌশলে অভয়ার কথা জানতে চেষ্টা করলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—ব্রহ্মদেশ তখন বাঙ্গালী বেকারদের চাকরি সন্ধানের রাজ্য। বাঙ্গালী পদস্থ লোকেরা বেকারদের চাকরি যোগাড় করে দিত। বাঙ্গালীদের গা-ঢাকা দেওয়ার এমন জায়গা কোথাও ছিল না। বহু অপরাধীই ব্রহ্মদেশে পালাত। বাঙ্গালী যুবকদের চরিত্র রক্ষা করা কঠিন হ'ত সেখানে, কেউ কেউ বর্মী, কেউ কেউ অন্য জাতির মেয়ে বিয়ে করত। বাঙ্গলা থেকে পরস্ত্রী (সধবা, বিধবা) নিয়ে ঐ দেশে পালাত, নিরুদ্দেশ অথবা পলাতক স্বামীর খোঁজে কোন কোন কুলবধূও ব্রহ্মদেশে যেত। বাঙ্গালীদের অনেকে ওকালতি, ডাক্তারী ও চাকরি করে ওদেশে গিয়ে বড়লোক হ'ত। নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঙ্গালী কাঠ মিস্ত্রীর সংখ্যা ছিল খুব বেশী। নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুড়িওয়ালী ও ঘুঁটেওয়ালী। ওদেশে জাত বিচার ছিল না। ধর্মবিচারও ছিল না।

কালিদাসবাবু বললেন—আচ্ছা দাদা, শ্রীকান্তে সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র কি একেবারে নেই ?

শরৎচন্দ্র বললেন—তা আবার নেই ! তা না থাকলে অতবড় একখানা বই গড়ে ওঠে ? কোন্ চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ কল্পিত, তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

কালিদাসবাবু বললেন—পিয়ারী, সুনন্দা, কমল, রোহিণী, বজ্রানন্দ এ সবই কল্পিত। একটি মুসলমান চরিত্র ইচ্ছা করেই বই-এ সন্নিবিষ্ট করেছেন। এর একটা কারণও ছিল।

শরৎচন্দ্র বললেন—যেমন, গহর।

শরৎচন্দ্র পরে বললেন—গহর পুরা কল্পিত নয়—প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রের উপর রঙ চড়ানো ও রসান দেওয়া। কমললতাও তাই। যাক্ ও প্রসঙ্গ থাকুক। লোকে শ্রীকান্তকে নভেল বলে না ?

কালিদাসবাবু বললেন—সবাই একে পুরাপুরি নভেল বলে না।

শরৎচন্দ্র বললেন—কেন?

কালিদাসবাবু বললেন—বলে—কতকগুলি চমৎকার চিত্র, কতকগুলি অপূর্ব ঘটনা, কতকগুলি জলন্ত দৃশ্য, কতকগুলি চলন্ত চরিত্র শিথিলভাবে গাঁথা। এর ভিতর কোন সুনির্দিষ্ট প্লটের সঙ্গতি নেই। এতে চরিত্রের উন্মেষসাধন করা হয় নি,—ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, বজ্রানন্দ, গহর, সুনন্দা ইত্যাদি সবই 'রেডিমেড ক্যারেক্টার'। উত্তর পুরুষীয় জবানীতে গোটা বইখানা লেখা, সাব-প্লটগুলি মূল আখ্যানের সঙ্গে শ্লথভাবে গ্রথিত। অতএব নভেলের যে সব লক্ষণ সে সব এর সঙ্গে মেলে না।

তারা বলে—নভেল না হলেও অপূর্ব সৃষ্টি, এর চিরন্তন মূল্য মর্যাদা আছে। কেউ কেউ বলে—নভেলের জন্য ৪র্থ পর্বের প্রয়োজন ছিল না, ৩য় পর্বটাকে আর একটু বাড়ালেই চলত।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাদের বোলো, খুব প্রয়োজন ছিল—যে বৈঁচিফলের বনে গল্পের যাত্রাপথের সূত্রপাত—সেই বৈঁচিফলের বনে ফিরে না এলে তার সমাপ্তি হতে পারে না। তিনপর্ব বাইরে বাইরেই কেটেছে, যে অঞ্চলের জীবনকথা সে অঞ্চলে তাদের ফিরিয়ে আনার দরকার ছিল,—আখড়ার গোঁসাই ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুলেরও দরকার ছিল। আমি তোমাদের 'নেচার'-এর খুব ভক্ত নই, তবু বইখানাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করার জন্য ওতে বাঙ্গলার নেচারকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যদিও আমি কবি নই।

কালিদাসবাবু বললেন—কবি নন? ৪র্থ পর্বে কি কবিত্বেরই না ছড়াছড়ি করেছেন। আমার তো মনে হয়, আপনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর বড় কবি, তাই জানাবার জন্যই ৪র্থ পর্ব লিখেছেন। ছন্দে না লিখলে কি কবি হওয়া যায় না? ৪র্থ পর্বে বৈষ্ণবের আখড়ার চিত্রটি তো একখানি অপূর্ব কাব্য। কমললতাকে তো রূপ গোস্বামীর নাটকের চরিত্র বললেই হয়। শুধু গদ্যে কবিতা লেখেন নি। একটি কবিকেও আমদানি করেছেন। গহর তো জীবন্ত কবিতা।—আর আউশফুলের গন্ধে ভরা যশোদা বৈষ্ণবীর পড়োভিটের কথা?

শরৎচন্দ্র বললেন—আমি তো সেজন্যই ৪র্থ পর্ব বেরোলে তোমাকে একখানা বই উপহার লিখে দিয়ে বলেছিলাম,—অন্যের কেমন লাগবে জানি না—তোমার ভালো লাগবেই। যাক্—আর কে কি বলে বলো—

কালিদাসবাবু বললেন—কেউ কেউ বলে—রাজলক্ষীর সঙ্গে শিকারের শিবিরে শ্রীকান্তের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আসল নভেল সুরু হয়েছে—বই-এর বাকিটা রীতিমতো নভেল।

আবার কেউ কেউ বলে—শ্রীকান্তের রসসৃষ্টিই সকল ঘটনা, সকল দৃশ্যের যোগসূত্র। উত্তরপুরুষীয় জবানীতে লেখা নভেল বিদেশে স্বদেশে আরো আছে। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন। রজনী, ঘরে-বাইরে এই ভঙ্গীতেই লেখা। ডিকেন্স-এর 'ডেভিড কপারফিল্ড' বই এই ভঙ্গীতে লেখা। আপনার 'স্বামী'ও তাই। এটাই হ'ল সর্বোৎকৃষ্ট ভঙ্গী। এই জবানীই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সংহতি, সংগতি ও সামঞ্জস্য দান করেছে। এটা নতুন টেকনিকে লেখা নভেল।

বিবিধ চিত্র ও উপ-কাহিনীগুলি এই নভেলের পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সৃষ্টি করে একে সম্পূর্ণাঙ্গতা দান করেছে,—'ভাইটালিটি' বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে জীবনদর্শনেরও গভীরতা আছে। চরিত্রের উন্মেষ একেবারে নেই তা নয়—শিকার পার্টিতে প্রথম-দেখা রাজলক্ষী আর ৪র্থ পর্বের শেষে অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধা রাজলক্ষীর মধ্যে ঢের তফাৎ। শ্রীকান্তের চরিত্রেরও কম বদল হয় নি। মেঘে মেঘে অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—বুঝতে পারছি এটা তোমার অভিমত। নভেল হোক্, ভ্রমণ-কাহিনী হোক্, স্মৃতিকথাই হোক্, কথা-সাহিত্য তো। একটা শ্রেণীতে ভর্তি না করলে পণ্ডিতদের ও মাস্টারদের স্বস্তি নেই, রসজ্ঞ পাঠকদের তাতে কিছু যায় আসে না। কোন শ্রেণীতে না পড়ে ওটা নিজেই একটা শ্রেণী তৈরি করুক না কেন? কোন্ শ্রেণীতে পড়বে, সেকথা না ভেবেই আমি লিখেছি। সকলের পড়তে ভালো লাগলেই হ'ল।

কালিদাসবাবু পরে আর একবার শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের কাহিনী কতটা আছে, এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন।

উত্তরে শরৎচন্দ্র সেদিন কালিদাসবাবুকে বলেছিলেন—তা কিছু আছে বৈকি! তবে উপন্যাসে বর্ণিত কোন একটি সময়ের ঘটনাই যে, আমারও জীবনের সেই একটা সময়েরই ঘটনা তা নয়; জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা খণ্ড খণ্ড অনেক ঘটনাকেই, লিখবার সময় এক সময়ের একটি

সম্পূর্ণ ঘটনা করে লিখেছি। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে আনতে গেলে, তাকে হয় কল্পনা দিয়ে, নয়ত অন্যান্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা কাহিনী দিয়ে পূরণ করে, সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। তোমাকে দিয়েই একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—তুমি শিক্ষকতা করছ। ধর, তুমি একটি ছেলেকে তার নিজের গ্রাম সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দিলে। মনে কর, ছেলেটির গ্রামে লিখবার মত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। গ্রামে নদী নেই, এমন কি একটি দেবমন্দির পর্যন্ত নেই। ছেলেটিকে এখন রচনায় নম্বর পেতে হ'লে, তার আশপাশের গ্রামে দেখা নদী, দেবমন্দির প্রভৃতির কথাও তার নিজের গ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে লিখতে হবে। তবেই তো তুমি তাকে নম্বর দেবে, নাকি? সাহিত্যের বেলায়ও তাই। একটা পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টি করতে হ'লে, ঐরূপই করতে হয়।

কালিদাসবাবু তাঁর ছাত্রপাঠ্য একটি পুস্তক 'রচনাদর্শ' শরৎচন্দ্রকে একবার পড়তে দিলে, শরৎচন্দ্র সেই বইটি পড়ে কয়েকদিন পরে কালিদাসবাবুকে বলেছিলেন—তোমার বই-এ আছে, 'স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত যায় না ধুলে।' ওটা হবে 'ইল্লত যায় ধুলে, স্বভাব যায় না ম'লে।' 'না'-টা হবে না।

কালিদাসবাবুর বই-এ ছিল—'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' এটার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—ওটা হবে—'ঘরের খেয়ে বনের মশা তাড়ানো।'

শরৎচন্দ্র আর বলেছিলেন—খেলাধূলা, ধূমপান ইত্যাদির বানানে 'ধূ' লিখবার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্মীছাড়া বানানে 'ক্ষ্ম' না লেখাই উচিত। সংস্কৃত লক্ষ্মীর সঙ্গে ছাড়া না লাগিয়ে বাঙ্গলা লক্ষীর সঙ্গেই লাগানো উচিত। দ্বাদশ বৃহস্পতি—দ্বাদশে বৃহস্পতি, এরূপ ইডিয়ম হবে।

শরৎচন্দ্র আরও বলেছিলেন—ওহে, বাক্যে ঘন ঘন আমি 'ইয়া' লাগাই ব'লে দোষ ধরেছ, তোমার বই-এ।

কালিদাসবাবু রচনাদর্শে বাক্যে ঘন ঘন ইয়া প্রয়োগ দূষণীয় এই মন্তব্য করে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' থেকে ২টা বাক্য তুলেছিলেন। যথা—

(ক) একদিন ভাত খাইতে বসিয়া উঃ আঃ করিয়া বার দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল।

(খ) তারপর নারায়ণী মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া লইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, মার্জিত ভাষায় লিখতে গেলে এ অসুবিধা হবেই। আমি ঘন ঘন ইয়া ব্যবহার এড়াতেই চাই। কিন্তু অনেক স্থলে নিরুপায় হয়ে ব্যবহার করি—অনেক স্থলে অনবধানতাও যে নেই তা নয়—বাক্যগুলি ভেঙে ছোট ছোট করে নিলেই চলে। রবীন্দ্রনাথ এইজন্যই বোধ হয় মার্জিত ভাষা ছেড়ে চল্‌তি ভাষা ধরেছেন। চল্‌তি ভাষাতে কোন অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন মার্জিত ভাষায় লিখতেন, তাঁরও এ বিপদ হতো। এই বলে তিনি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আনালেন এবং তা থেকে দুটি জায়গা কালিদাস বাবুকে দেখালেন। সেই জায়গা দুটি এই :—

(ক) যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া অভ্রান্ত ও সতর্ক কৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া এক একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া নিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

(খ) অনুকূলের স্ত্রী কোন প্রশ্ন কোন বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

কালিদাসবাবু এ দুটি অংশও নোট করে নিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, তুমি বড় বেশী সর্বনাম ব্যবহার কর। বারবার তিনি, তাঁহার, শুনতেও বিশ্রী লাগে। তার চেয়ে নামটাই বারবার ব্যবহার করা ভালো। একাধিক লোকের কথা থাকলে তিনি, তাঁহার, সে ইত্যাদি কাকে বুঝাচ্ছে তা ধরাই কঠিন হয়। আমার মতে—গোড়ায় নামটা করে 'অল্টারনেটলি' নাম আর সর্বনাম চালালেই ভালো হয়।

শরৎচন্দ্র আরও বললেন—মার্জিত ভাষায় লেখার জন্য আর একটা অসুবিধা হয়, বাঙ্গলা ইডিয়ম অনেক ছেড়ে দিতে হয়। অনেক সময় বাঙ্গলা ইডিয়মকে মার্জিত করে নিতে হয়—তাতে ইডিয়মের ঠিক 'সেন্স'টা থাকে না—এ কথাও তুমি বই-এ বলেছ। আমি আমার নিজের বিবৃতিতে তাই ইডিয়ম

বড় চালাই না—পাত্র পাত্রীর মুখের জবানে অজস্র ইডিয়ম চালাই, এটা বোধ হয় লক্ষ্য করেছ।

কালিদাসবাবু বলেন—শরৎচন্দ্রের সমাদর দেশে যা হয়েছিল, তা আমাদের দেশে খুব বড় লেখকরাও জীবদ্দশায় পান নি। তাঁর বই বিক্রির আয়ের দ্বারাও তিনি তা বুঝতেন। তাছাড়া দেশের লোক তাঁকে নানাভাবে অভিনন্দিত করেছে। সভাসমিতি তিনি এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু যে কোন সাহিত্যিক সভায় সভাপতিত্বের জন্য লোকে আগে তাঁর কাছেই যেত। কিন্তু তাঁর দুই একটা বিষয়ে ক্ষোভ ছিল। একটা ক্ষোভ দেশের বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করে নি। এ ক্ষোভ তাঁর মিটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ উপাধি পেয়ে।

আর একটা ক্ষোভ ছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্যক সমাদর করেন নি। এ বিষয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে কালিদাসবাবুর কথা হয়েছিল। তাতে কালিদাসবাবু বলেছিলেন—তিনি তো আপনাকে একখানা বই উৎসর্গ করেছেন।

শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—যে বই তিনি উৎসর্গ করেছেন—সে বই এতই নগণ্য যে, সে বই-এর নামও লোকে জানে না। একেবারে উৎসর্গ না করলে আরো খুশী হতাম। যাই হোক, সে দান আমি গুরুর আশীর্বাদ বলে মাথায় তুলে নিয়েছি। কিন্তু তাতে আমার অভিমান ঘুচে নি।

কালিদাসবাবু বলেন—তবে শরৎচন্দ্রের শেষ পর্যন্ত এ অভিমান ছিল না। কেননা রবীন্দ্রনাথ পরে শরৎচন্দ্রকে যে সমাদর করেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাতে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের আর একটা ক্ষোভ ছিল—দেশের কবিরা তাঁর যে সমাদর করেছেন, কথা-সাহিত্যিকরা সেরূপ সমাদর করেন নি। কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী চালনাও করেছেন।

শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুকে একদিন বলেছিলেন—সেদিন একজন বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক অন্য একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে এসেছিলেন। কথা-সাহিত্যিকটি রাস্তায় মোটরে বসে রইলেন—আমার বাড়ীতে এসে দেখাও করলেন না।

এর উত্তরে কালিদাসবাবু বলেছিলেন—প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা প্রকাশ্যভাবে

আপনার সমাদর যা করেছেন তা হয়ত আশানুরূপ নয়, কিন্তু মনে মনে তাঁরা যে সমাদর করেন—তার সিকিও আমরা করতে পারি নি। বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের অনুকারক নন—তাঁরা আপনারই অনুকারক। আপনি কথা-সাহিত্যে যে রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন—তাঁরা সেই রচনা-ভঙ্গীর অনুসরণ করে। তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র। কেউ গল্পের আবেষ্টনী গঙ্গাতীর হ'তে পদ্মাতীরে বা অজয় ময়ূরাক্ষীর তীরে নিয়ে গিয়েছেন—কেউ বা বাঙ্গালীর সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজে রচনার উপজীব্য খুঁজেছেন—কেউ বা আপনার কল্পিত পাত্রপাত্রী সংগ্রহ করেছেন—কেউ বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা তথ্য ও সমস্যার অবতারণা করেছেন, কিন্তু আপনি যে রচনাভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন, তাঁরা জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তারই অনুসরণ করেছে। যে দরদী দৃষ্টি দিয়ে আপনি বাঙ্গলার দুঃস্থ-দুর্গত নরনারীদের দেখেছেন—এঁরাও সেই দরদী দৃষ্টিরই অনুসরণ করেছেন। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে উদার সংস্কারমুক্ত নৈতিক আদর্শের আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এঁরাও তারই অনুসরণ করেছেন, কেবল প্রকৃতি সম্বন্ধে 'অ্যাটিচিউড'টা এঁরা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ হ'তে।

সংস্কৃত ভাষা হতে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি—তা হতে হয়েছে বাঙ্গলা। বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ, এদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার সেই সম্বন্ধ। আর বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃত ভাষার যে সম্বন্ধ, এঁদের রচনার সঙ্গে আপনার রচনার সেই সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের, আপনি বাঙ্গলার। বর্তমান যুগের কথা-সাহিত্যিকের দৃষ্টি কারো বিশ্বের পানে নয়, বাঙ্গলার পানেই—কাজেই রবীন্দ্রনাথ এঁদের গুরু, আর আপনি এঁদের অগ্রজ। এঁরা যদি সর্বপ্রকারে আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন—তবে তার চেয়ে সমাদর আর কে করেছে!

শরৎচন্দ্র বললেন—অনুজ কি শুধু অগ্রজের অনুসরণ করে—তাকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না?

কালিদাসবাবু বললেন—দেখুন, তাঁদের পক্ষ থেকেও তো অভিমানের কিছু থাকতে পারে। এ অভিমানও তো অস্বাভাবিক নয়—এ অভিমান অগ্রজের প্রতি অনুজেরও থাকতে পারে।

শরৎচন্দ্র বললেন—কি অভিমান ?

কালিদাসবাবু বললেন—রবীন্দ্রনাথ আপনার যথাযোগ্য সমাদর করেন নি বলে আপনি অভিমান প্রকাশ করতেন, সেই অভিমান তো এঁরাও আপনার প্রতি পোষণ করতে পারেন ? আপনি তো তাঁদের শক্তি স্বীকার করে তাঁদের বুকের কাছে টেনে নেন নি। আমি যদি বলি অমুক বেশ ভাল গল্প লিখছে —আপনি বলেন, অমুক ছোকরাটি বেশ ভদ্র, বড় অমায়িক। এ তো 'রেকগনাইজেশন' নয়। তাঁদের কোন বই পড়েছেন কিনা যদি জিজ্ঞাসা করি, তাতে হয় বলেন—না পড়ি নি, নয়ত বলেন—কই ও বই তো আমাকে দেয় নি। কাজেই তাঁদেরও তো অভিমান হ'তে পারে। কাউকে কাউকে আপনি যে 'সার্টিফিকেট' দেন নি তা নয়, কিন্তু তা বই পড়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ও রকম 'সার্টিফিকেট' আমি নির্বিচারে দিই বলে আমাকে তিরস্কারই করেছেন।

কালিদাসবাবু বলেন—শরৎচন্দ্র সত্যই সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। এই কথায় তিনি একটু লজ্জিতই হলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, এদের বই নিয়ে আমি পড়তে গিয়ে কিছুদূর পড়েই যখন মনে হয়েছে, এ লেখা আমিও অক্লেশে লিখতে পারতাম, তখনই আর আগাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত আর পড়া হয় নি।

কালিদাসবাবু বললেন—আপনি যদি ধৈর্য্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখতেন, তাহলে এমন জিনিস অনেক পেতেন যাতে মনে হতে পারত—বাঃ, এটা তো নতুন কথা, এটা তো আমার মনে আসে নি, এটা তো আমি লিখতে পারতাম না। তাছাড়া যদি কিছুদূর আগিয়েই মনে হয়ে থাকে—এ লেখা আমিও লিখতে পারতাম, তাহলে সেটা তো উপেক্ষণীয় নয়—প্রশংসনীয়। আপনি যা লিখতে পারতেন, তা-ও যদি কেউ লিখে থাকেন—তাঁকে উৎসাহ দেওয়া কি আপনার কর্তব্য ছিল না ?

কালিদাসবাবু বলেন—মোটকথা নিজের রচনার সময় শরৎচন্দ্রের ধৈর্যের অভাব ছিল না, অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। একই অংশ কতবার কেটেকুটে লিখতেন, সহজে তাঁর মনস্তুষ্টি হত না। অনেক সময় আট দশ পাতা নির্মম ভাবে কেটে ফেলে নতুন করে লিখতেন। কিন্তু অন্যের পুস্তক পাঠে তাঁর

ধৈর্যের অভাব ঘটত। গোড়া হতেই খুব ভাল করে না জমে উঠলে তিনি কোন বই পড়ে উঠতে পারতেন না। 'আইভ্যানহো'র মত বই তিনি যৌবন কালেও পড়তে পারেন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন—ওহে, শুনেছি বঙ্কিম বাবু 'আইভ্যানহো' হতে 'দুর্গেশ নন্দিনী'র আখ্যানবস্তু পেয়েছেন। তাই শুনে আইভ্যানহো পড়তে গেলাম। কয়েক পাতা পড়ে মনে হ'ল—এ কথা কখনো সত্য নয়। বঙ্কিমবাবু কখনো আইভ্যানহো শেষ করে পড়তে পারেন নি। (বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি আইভ্যানহো পড়েন নি।)

একদিন কালিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনার ডি-লিট্ পাওয়া উচিত।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—কি হবে ভাই ও-উপাধি পেয়ে! দেশের লোক তো আমাকে তার চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে।—একটু ভেবে শেষে বললেন—বোধ হয়, সাহিত্য সেবার জন্য কোন উপাধি দেওয়ার প্রথা নেই।

কালিদাসবাবু বললেন—তা নয়। 'থিসিস সাব্‌মিট' করলে এরা 'ডক্টরেট' দেয়। যারা 'থিসিস সাব্‌মিট' করে, তারা এই উপাধির জন্যই করে। যারা উপাধি পাওয়ার উপলক্ষ না করে স্বাধীনভাবে যে কোন ক্ষেত্রে সারস্বত সাধনা করে, তাদের আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দিয়ে 'রেকোগনাইজ' করে না। তা করলে—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি মণীষীরা ডক্টরেট পেতেন। এঁরা জগতের যে কোন দেশের পক্ষে গৌরব। যে সব থিসিস-এ লোকে ডক্টরেট পায়—সে সব থিসিস-এর কাজের তুলনায় ঢের বেশী কাজ এঁরা করেছেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যখন হবে, তখন তা দেশের মনীষীদের গৌরব দান করবে। আমি আর তখন থাকব না—তোমরা পাবে।

কালিদাসবাবু বলেন—এর অল্পদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত করলেন। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর দু বৎসর আগে আমাকে বলেছিলেন—আমরা শরৎবাবুকে ডি-লিট্ দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোন কোন পক্ষ হতে আপত্তি হচ্ছে। সে আপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে।

হয়। সে আমাকে খুব বিশ্বাস করে। আমার 'বামুনের মেয়ে'তে প্রিয় মুখুজ্যের মায়ের যে চরিত্র, তা আমি এ থেকেই পেয়েছি। অবশ্য, এর ছেলে সরকারী বড় চাকুরে, আর এর আত্মীয়-স্বজনেরা জানে যে, এ পাগল হয়ে বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছে বা মারা গেছে।"

যাদবপুরের যক্ষ্মা হাসপাতাল চালু করবার সময় ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় বেঙ্গল কেমিকেলের তৈরি কিছু ঔষধ ও যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে পাওয়ার আশায়, শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বেঙ্গল কেমিকেলের অন্যতম ডিরেক্টর সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর কাছে গিয়েছিলেন। সেদিন ঔষধাদি নিয়ে চলে আসবার আগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাজশেখরবাবুর সাহিত্য নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেদিন কথায় কথায় তাঁর 'বামুনের মেয়ে' রচনার গল্পও রাজশেখরবাবুকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

ছেলেবেলায় একবার আমি ঘুরতে ঘুরতে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এক বৃদ্ধা বিধবার বাড়ীতে আমি একদিন ছিলাম। বৃদ্ধাটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। তাঁর কেউ ছিল না। আমি যে ব্রাহ্মণ, বিধবাটি আমার এই পরিচয় পেয়ে, তাঁর রান্না অন্ন-ব্যঞ্জন আমায় আর দিলেন না। হাঁড়ি কড়া ধুয়ে আমার আলাদা স্ব-পাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও কেন আমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করলেন, এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বড় দুঃখে তাঁর অতীত জীবনের কথা বলেছিলেন। তাকেই অবলম্বন করে আমি আমার 'বামুনের মেয়ে' লিখি।

(পানিহাটিতে বেঙ্গল কেমিকেলে এক বৈঠকী সাহিত্য সভায় আমি রাজশেখরবাবুকে বলেছিলাম—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয়ের কিছু গল্প বলুন শুনি।

সেদিন রাজশেখরবাবু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের গল্প বলতে গিয়ে, শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' রচনার ঐ প্রসঙ্গটিও বলেছিলেন।)

এখানে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র তাঁর 'বামুনের মেয়ে' রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে এক এক জনের কাছে এক এক রকম বলেছেন। শরৎচন্দ্র বানিয়ে গল্প বলতে খুবই দক্ষ ছিলেন। তাই 'বামুনের মেয়ে'র উপাদান সম্বন্ধে সত্যই তাঁর এত অভিজ্ঞতা ছিল, না এগুলো তাঁর বানানো গল্প তা বলা যায় না।]

চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘের কর্মীদের সহিত আলোচনা

১৩৩৭ সালে শরৎচন্দ্র একবার চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘে আমন্ত্রিত হয়ে যান। সেদিন প্রবর্তক সংঘের আলাপ সভায় কয়েকজন শরৎচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্য-সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেদিন আলাপ-আলোচনা যা হয়েছিল, তা এই :—

শরৎচন্দ্র প্রথমে বললেন—ছেলেবেলায় এখানে একবার আসি। খুব 'ফেন্ট' মনে আছে—আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ। বোড়াই চণ্ডীতলায়—একতলা বাড়ী, কাছে পুকুর—কুণ্ডু মশাইয়ের বাড়ী—এমনি দু-চারটা কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে নেই। ঠাকুর-মা রাগ করে এখানে চলে আসেন। আমিও তাঁর সঙ্গে আসি। সে অনেক দিনের কথা। এখন আমার বয়স ৫৫ বৎসর। অ্যাবাউট্ ফিফ্‌টি ইয়ারস্—প্রায় ৫০ বৎসর আগেকার কথা। এই দিক দিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তা থাকার কথা বলা যায়। এখন একেবারে বাইরে গিয়ে পড়েছি।

এই সময় বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে প্রবর্তক সংঘের একজন কর্মী শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনি আপনার বংশ-পরিচয় ও সাহিত্যিক ক্যারিয়ার-এর 'ল্যাণ্ডমার্কস্'-এর কথা কিছু আমাদের বলুন।

শরৎচন্দ্র বললেন—শুনলে দুঃখ বোধ হবে—বংশের কোনও গৌরবই আমি রাখি না। যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে, পাথর খুঁড়ে বা'র করছেন আর বলছেন—এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল—আমি তাঁদের কথায় খুশী হই না। আমার বুক তাতে ফুলে ওঠে না। আমি বলি—আমাদের কিছুই ছিল না। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। নিজের জীবনের পরিচয় দিই না। দু-হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল না-ছিল—তার কথা পাথর মাটি খুঁড়ে আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই। আমার কথা—পুরান জিনিস নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নূতন গড়ে তোল। জাত সম্বন্ধেও তাই,—যাই বা থাকল জাত—এমন ছেলে দেখা যায়, যার বংশ-পরিচয় দেবার

কিছু নেই—সে নিজের জোরে বড় হয়েছে, 'সাক্‌সেসফুল' হয়েছে—আমারও মনের ভাব তাই। আমার একখানা বই বন্ধ হয়ে আছে—'শেষ-প্রশ্ন', তাতে এই সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। যা কিছু বর্তমানে চলছে তার অনেক কিছুর উপর তাতে কটাক্ষ আছে, 'অ্যাটাক্‌' আছে।—মতিবাবু (প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা) হয়ত খুবই রাগ করবেন—তিনি তো রেগেই আছেন—বইখানা এখনও শেষ হয় নি—বোধ হয় দু-চার দিনের মধ্যে লেখা শেষ হবে। শেষ হলে, তা পড়ে হয়ত তিনি খুশী হবেন না।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের বংশের একটা খ্যাতি আছে। আমাদের বংশে আট পুরুষ ধরে একজন করে সন্ন্যাসী হয়ে আসছে। আমার মেজ ভাই সন্ন্যাসী। আমার মাতুল-বংশ ধর্মভীরু বংশ। মাতামহ খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। আমিও খুব···এমন কি চার-পাঁচবার সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল ভাল সন্ন্যাসীরা যা করে থাকেন—অর্থাৎ গঞ্জিকা সেবনাদি—তা অনেক করেছি। এখন একেবারে উল্টো। এই ধর্ম নিয়ে চলার যে একটা পথ—মতিবাবু যা করেন—তিনি যে লাইন নিয়ে চলেছেন—বোধ হয় এ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে শোভন হবে না। ও-পথ আমার মোটেই নয়।

মতিবাবুর বই আমি খুবই পড়ি—ওঁর যা কিছু লেখা খুব মন দিয়েই পড়েছি! এই দেশটাকে তিনি আবার পুরাতন ধর্মের উপর দাঁড় করাতে চান—নতুন জাত গড়তে চান, কিন্তু 'বেসিস্‌' হ'ল ধর্ম—ভগবদ্ভক্তি—এই সমস্ত। শাস্ত্রে-টাস্ত্রে অনেক সাধনার কথা আছে—আমার 'আন্‌ফরচুনেট্‌লি' মনটা একেবারে উল্টা দিকে গেছে—সাধনার আর কোন মূল্য খুঁজে পাই না। শাস্ত্র-সাধনা যা ছিল, সবই যদি এত বড় ছিল, আমরা এত ছোট হলাম কেন? নানা লোকে নানা কথা বলবে। চোখের উপর দেখছি সব জাতিই—যাদের আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী—তারা স্বাধীন বলে পৃথিবীতে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। আমরা এতবড় হয়েও একবার পাঠান, একবার মোগল, একবার ইংরাজের জুতার তলায় পিষে মরছি! কেন—তার কোন জবাব দিতে পারি না। আমরা বলি—আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন খুব বড়—কিন্তু বাইরের লোক সে কথা বিশ্বাস করে না। মনে মনে হাসে কিনা জানি না। এতই যদি বড় তো ছোট হয়ে যাচ্ছি কেন? এই যে দেশটা ত্যাগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, আমার মনে হয়, ঠিক এর মধ্যে কোথায় একটা গলদ ঢুকে আছে—সেটা

খুঁজেও পাচ্ছি না। ক্রমশঃ অবনতির স্তরে নেমেই যাচ্ছি। আমার বইখানা শেষ হয়ে গেলে দেখবেন, তাতে এই সব মতের আলোচনা করেছি। পাঁচজনকে আহ্বান করে বলছি—বলে দিন—এই হাজার বছর ধরে আমাদের দুর্দশা কেন হ'ল? এটা কেমন করে সম্ভব হ'ল—কেউ যদি বা'র করতে পারেন—দেশের মহা উপকার হবে। কোন উপায় চোখের উপর দেখতেও পাই না। নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, কিছু বিশ্বাস নেই—এটাই যদি বড় জিনিস হয়, কি আশা আছে? আপনারাই বলুন—এর ভিতর কি গলদ আছে? মতিবাবুকেও বলি, এই আলোচনা-সভায় বলুন—কোনখানটায় গলদ আছে—যার জন্য এত বড় শাস্তিভোগ করছি? আমিও মনে করেছি—পলিটিক্স-এ আর থাকব না। কোনদিনই বেশী সম্বন্ধ ছিল না। আমি এই লাইনই নেব—ধ্বংস করার কাজ নেব। সমস্ত জিনিস ছোট করে দেখব। খুব বড় ছিলাম অথচ 'রেজাল্ট নীল'! আমাদের কিছুই ছিল না। তার জন্য দুঃখও নেই। বড় হয়ে ওঠ, যে পথে আর দশ জনে বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না—তারাই বড়—এ কথা বললেই চলবে না—আমরা যা বলি, তা করি না—মিথ্যাবাদী—এটা বড় অসত্য বটে, তবু এটাই একমাত্র কারণ নয়। এ সম্বন্ধে আলোচনা হোক্। আমি এই পন্থাই নেব। আমাদের কিছুই ছিল না। ২০০০ বছর আগে কি ছিল তা নিয়ে গর্ব করব না। যাদের ছিল তাদের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই—রক্তেরও যোগ নেই, ধর্মেরও যোগ নেই—শুধু এক দেশে বাস করি, এই মাত্র। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মৌখিক পড়ি, যোগ দেখতে পাই না। যদি কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেন—এইটা এই রকমই বটে, তা হ'লে আলাদা কথা। নইলে মনে হতে পারে, আমার লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষতি হতে পারে। বছর তের-চৌদ্দ আগে অনেকেই মনে করেছিলেন যে, আমি সাহিত্য নষ্ট করে দিলাম। এমন কি বড় বড় লোকের মনেও ধারণা জন্মেছিল যে, আমি যা লেখা আরম্ভ করেছি, তাতে বুঝি সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন সে মত নেই—এখন অনেকে বলেন—বিশেষ 'ইয়ং ম্যান'রা—'আপনি ভাল পথই নিয়েছেন—আপনার কথা মেনে নেব।'

যে জিনিসটা বললাম, জানি হয়ত তার প্রতিবাদ উঠবে। স্পষ্টই বললাম—রেখে ঢেকে নয়। যদি আপনারা বলেন—এ পথটা ঠিক নয়—কেন, যদি দেখিয়ে

দিতে পারেন, তাহলে আবার ভেবে দেখব। মতিবাবুকেও এ কথা বলছি। মোট কথা এই, আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরান জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিসটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিস অনেক দিন চ'লে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করানো। যেমন গভর্ণমেণ্টের শাসন-সংস্কার—রিফর্মস্—আর এক দল যারা রিভলিউশন চাইছে—রিভলিউশন মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান রিফর্মস্ অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয়—মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়। যেটা অচল হয়ে পড়েছে, যেটা 'নেগ্লেক্ট' দ্বারা হয়ত আপনি ধ্বংস হয়ে যেত—সেটা শক্ত মজবুত করে আবার খাড়া করা হয়। যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করান উচিত নয়। মতিবাবুও মনে করেছেন—আমাদের ধর্মটাকে সংস্কার করে মেরামত করে সেইটাকেই আবার দাঁড় করাবেন। আমি বলি—মেরামত নয়, ঐটিকেই বাদ দাও। আবার তাকে মেরামত করে খাড়া করার দরকার কি? ছ-সাত-শ' বছরের পুরান জিনিসটা আবার যদি দাঁড় করাও, আবার সেটা হাজার বছর ধরে চলবে। আচ্ছা, মতিবাবুই বলুন—এ সম্বন্ধে উনি কি মনে করেন।

মতিবাবু—শরৎবাবু আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চেয়েছেন। তবে ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা আমি না বলে পারি না। ধর্মকে তিনি নাকচ করতে চেয়েছেন। ফরাসী জাতও ধর্মকে নাকচ করতে চেয়েছিল, তবু তার পরিবর্তে তারা দিয়েছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। নেগেশানের পর একটা পজিটিভ কিছু দেওয়া তো চাই। শরৎবাবু ধর্মকে নাকচ করে তার পরিবর্তে কি দিয়ে যাবেন? এটা জিজ্ঞাসা করার আমার অধিকার আছে। আমি ধর্মকে মেরামত করে, ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়ে দাঁড় করাতে চাই না। আমার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমি এইটাই বলেছি—ধর্ম আমরা পাই নি। আমাদের দেশ ধর্মকে ঠিক অধিকার করতে পারে নি—ধর্ম অর্থে মোক্ষবাদকেই পুরোভাগে ধরে রেখেছে। ভারতের ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসী এই মোক্ষের আকাঙ্ক্ষী হয়ে বনে-জঙ্গলে গিরি-কন্দরে বাসা নিয়েছে। এই ৬০

লক্ষ সন্ন্যাসীকে বাদ দিয়েও ভারতের বাকি ৩২ কোটী ৪০ লক্ষ (যদি ৩৩ কোটী মোটামুটি অধিবাসীর সংখ্যা ধরা হয়) মানুষ যারা সংসারে বাস করছে, তারাও ধর্মের পরিণাম মোক্ষবাদই জানে। কর্মক্ষয় হ'লে মানুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হবে—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে। ধর্ম বলতে যদি মোক্ষবাদই একমাত্র বুঝায়, জীবনকে বাদ দিয়েই ধর্ম হয়, তবে ধর্ম বস্তু খুব অসার হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ এ নয়। ধর্ম বলতে রিয়েলাইজেশান। যা ফ্যাক্ট, যা রিয়েলিটি, তারই উপর দাঁড়াতে হবে। ধ্বংসের রুদ্র হয়ে যদি আপনি এসে থাকেন, আপনি সব ভেঙ্গে যেতে পারেন ; কিন্তু আমার মনে হয়, ধ্বংসের গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠার চিন্তাও আপনার মধ্যে রয়েছে। উদীয়মান জাতির পক্ষ থেকে, আপনার কাছ থেকে একটা 'পজিটিভ্ সাম্‌থিং' চাইছি। আপনি আঘাত দিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাসকে 'না' করাতে পারেন না। আপনারও যেমন একটা বিশ্বাস আছে, আপনার 'হাঁ'-কে আমি 'না' করাতে পারব না, তেমনি আমারও একটা বিশ্বাস আছে।

ধর্মকে মেরামত নয়, আমি ধর্মের নূতন রূপ দিতে বলি। ধর্ম মোক্ষবাদ নয়। হিন্দু আজ ধর্ম বলতে (জীবনকে বাদ দিয়ে ?) আত্মপ্রতারণা করছে। এত বড় ইন্‌সিনসিয়ারিটি হিন্দুর মত আর কোথাও নেই। অক্ষমতা যার মূল ভিত্তি, সে জাতি কখনও প্রতিষ্ঠা পায় না। আপনার লেখার মধ্যে যে বাস্তবতার পরিচয় পাই—ধ্বংসনীতিরও মধ্য দিয়ে সেই রকম একটা পজিটিভ্ কিছুর সন্ধান আপনাকে দিতে হবে। 'শেষ-প্রশ্নে'র পরও আপনাকে লেখনী ধরতে হবে। শেষ আলো আপনাকে দিয়ে যেতেই হবে—বলতে হবে—'ধ্বংসের পর কি দিয়ে গেলেন!'

শরৎচন্দ্র—মতিবাবুর কথায় আমার কথার ঠিক উত্তর পেলাম না। আমার কথাটা বোধ হয় ধরতে পারছেন না। আমি এই কথাই বলতে চাই—মেরামত করে কিছু দাঁড় করাচ্ছেন, এটা ভাল নয়।

মতিবাবু—বলেছি, ভারতের ধর্ম মোক্ষ নয়। মুক্তির অর্থ—বাসনা ও অহঙ্কার থেকে মুক্তি—জীবন থেকে মুক্তি নয়। মুক্তি—মুচ্ ধাতু থেকে, অহং ও বাসনা গেলে, এই জীবনেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে—জীবনকে লয় করে নয়। বাসনা-অহঙ্কার-মুক্ত মানুষ 'ইন্‌ফাইনাইট পাওয়ার'-এর সঙ্গে যুক্ত হবে—ব্লিস্ এণ্ড লাইট-এর রিফ্লেক্‌শান জীবনকে অধিকার করবে। মুক্তির

আস্বাদ ইহজীবনেই লাভ না করতে পারলে ধর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শ্রদ্ধা-বস্তুর একটা সনাতন রূপ আছে—সে জিনিসটার উপর কোটী কোটী লোকের শ্রদ্ধা আছে, সেটাকে ভাঙবার চেষ্টা না করে, তার যোগ্য ব্যবহার করতে পারলেই আমরা অধিকতর ফললাভ করব। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পরে হবে। এই সভায় অধিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আপনার মহামূল্য উপদেশ থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।

শরৎচন্দ্র—মহামূল্য উপদেশ কিছু দিতে পারব না। আমি যেটা করব বললাম।

অহঙ্কার ও বাসনা হতে মুক্তির কথা যা বললেন—সেগুলির দরকার। তবে আর আর জাত—যারা আমাদের মাথায় পা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা সব যে ভাবে বড় হয়েছে, সেই ভাবে আমাদের বড় হতে হবে।

মতিবাবু—তাদেরই মত হতে বলছেন! রোমও একদিন খুব বড় সভ্য জাতি হয়েছিল, কিন্তু তাদের সে সভ্যতার কতটুকু অস্তিত্ব আছে!

শরৎচন্দ্র—দেখুন এ কথায় আমি সান্ত্বনা পাই না! তাদের মত করেও যদি আমরা বড় হতে পারি তাতে ক্ষতি কি?

মতিবাবু—তাতে নিশ্চিহ্ন হবার আশঙ্কা আছে।

শরৎচন্দ্র—পৃথিবীর সমস্ত জাতি নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াচ্ছে—বড় হয়ে উঠছে। আমরা পারি না, নিতান্ত নিরুপায়। সেই অবস্থায় আরও ৫০০ বছর পরে কি হবে, ভাবতে যাব না। রোমের মত ধ্বংস হয়ে গেলেও এখন কি ভাবে উন্নতি হবে, তাই ভাবতে চাই। আমার বলবার উদ্দেশ্য—আমি বড় চিন্তায় পড়েছি। পলিটিক্স-এ যোগ দিয়েছিলাম। এখন তা থেকে অবসর নিয়েছি। ও-হাঙ্গামায় সুবিধা করতে পারি নি! অনেক সময় নষ্ট হ'ল। এতটা সময় নষ্ট না করলেও হ'ত। যা গেছে তা গেছে—খানিকটা অভিজ্ঞতা জমা হয়ে রইল। এখন থেকে আমি আবার লেখা নিয়েই থাকব।

এই সময় ব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুললেন—আমাদের যে কিছু ছিল না, তার প্রমাণ কি?

শরৎচন্দ্র—প্রমাণ আমাদের অবস্থা।

গোস্বামী—কি রকম প্রমাণ! আচ্ছা ধরুন—আমার বাপ পিতামহ বড়লোক ছিলেন, খুব ঘটা করে দোল-দুর্গোৎসব করে গেছেন। আমি আজ

গরীব হয়েছি বলেই কি বলব, আমার বাপ পিতামহ দোল-দুর্গোৎসব করেন নি? সেটা কি সত্য হবে?

শরৎচন্দ্র—আমি তা বলব না। কিন্তু এ কথা বলব যে, তাঁরা তাঁদের ঐ দোল-দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়েই আমাকে এই দুর্দশায় এনে ফেলেছেন।

এবার সভার একজন শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনি এবার আপনার সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।

উত্তরে শরৎচন্দ্র রহস্য করে বললেন—আপনারা ভুল করেছেন। আমি সাহিত্যিক নই—পেটের দায়ে সাহিত্যিক।

প্রশ্নকর্তা বললেন—আপনার এ কথা আমরা বিশ্বাস করব না। আপনার সাহিত্য-জীবনের সূত্রটা কি করে ক্রমবিকাশের ফলে উচ্চ শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে, সেইটা বলুন।

শরৎচন্দ্র বলতে আরম্ভ করলেন—সাহিত্যের গোড়ার কথা হ'ল সহিত থেকে—অর্থাৎ সকলের সহিত সহানুভূতি দরকার। এইটাই মূলকথা।

আমার কি রকমে কি হ'ল তা জানি না। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার একটা ঝোঁক ছিল। মনের ভিতর থেকে একটা বাসনা হ'ত—যা বাইরে পাঁচ রকম দেখছি শুনছি, তার একটা রূপ দেওয়া যায় না? হঠাৎ একদিন লিখতে সুরু করে দিলাম। প্রথমটায় অবশ্য এর ওর চুরি করেই অধিকাংশ লিখতাম। অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র, শান্তশিষ্ট জীবন হবে, আর সমস্ত অভিজ্ঞতা-লাভ হবে—তা হয় না।

ঐ সময় খানকতক বই লিখে ফেললাম। দেবদাস প্রভৃতি ঐ সময়ের লেখা। তারপর গান বাজনা শিখতে লাগলাম। পাঁচ বছর ঐতে গেল। তারপর পেটের দায়ে চলে গেলাম নানা দিকে। প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা হ'ল তাই থেকে। তখন এমন অনেক কিছু করতে হ'ত, যাকে ঠিক ভাল বলা যায় না। তবে সুকৃতি ছিল, ওর মধ্যে একেবারে ডুবে পড়ি নি। দেখতে থাকতাম। সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বেড়াতাম। অভিজ্ঞতা জমা হ'ত।

বর্মা, জাভা, বোর্নিয়ো সমস্ত দ্বীপগুলো ঘুরে বেড়াতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভাল নয়—স্মাগ্‌লার। এই সব অভিজ্ঞতার ফল—'পথের দাবী'।

বাড়ীতে বসে, আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, অনুকরণ করা যেতে পারে; কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না। অনেক সাহিত্যিকই করেন কি—বই থেকে একটা 'ক্যারেক্টার' নিয়ে তাকেই একটু অদল বদল করে আর একটা ক্যারেক্টার সৃষ্টি করেন। মানুষ কি, তা মানুষ না দেখলে বুঝা যায় না। অতি কুৎসিৎ নোংরামির ভিতরও এত মনুষ্যত্ব দেখেছি, যা কল্পনা করা যায় না। সে সব অভিজ্ঞতা আমার মনের ভিতর থাকতে লাগলো।

আমার স্মৃতিশক্তিটা বড্ড ভাল। ছেলেবেলা থেকে 'ইন্‌ট্যাক্ট' আছে, নষ্ট হয় নি। জানবার ইচ্ছা আমার বরাবর আছে। মানুষের ভিতরকার সত্তাটা 'রিয়েলাইজ' করাই আমার উদ্দেশ্য। যার একটা স্খলন হ'ল, মানুষ তাকে একেবারে বাদ দেবে—এ কেমন কথা?

আমি মানুষের ভেতরটা বরাবর দেখি। এ বললে, সে বললে, পরের মুখে ঝাল খাওয়া, পরের অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নেওয়া—এ আমার কোন দিন ছিল না। অতি বড় দুর্ভাগাই এ করবে। সত্যিকারের জীবন দেখতে গেলে শুচিবাইগ্রস্ত হ'লে চলবে না। 'কংক্রিট' রচনা করতে গেলে কল্পনা চলে না, নিজের অভিজ্ঞতা চাই।

পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভাল লাগে না। আমার বাড়ীতে যে বই আছে, তার অধিকাংশই সায়েন্সের বই। সেই জন্যই আমার বইয়ে যুক্তির অবতারণা বা 'সিন্থেটিক রেজাল্ট' বেশী। রূপের বর্ণনা, স্বভাবের বর্ণনা বইয়ের মধ্যে প্রায় নেই। ও আমি দু-এক কথায় সেরে দিই, বেশী নজর দিই না।

অনেকে বলে থাকেন এবং 'রাইটলি' বলে থাকেন—'আপনার সৃষ্ট চরিত্রগুলি পড়লে মনে হয়, যেন এরা কল্পনার বস্তু নয়।'

আমার চরিত্রগুলির 'নাইন্‌টি পারসেণ্ট বেসিস্‌' সত্য। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য নয়। এমন অনেক সত্য আছে, যা সাহিত্য হতে পারে না। কিন্তু সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। বনেদ নিরেট হ'লে আর ভয় নেই—যাই বললে অস্বাভাবিক, অমনি বদলে ফেলতে হয় না। আমি যে চরিত্র দেখেছি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার যে পরিণতি দেখেছি, তাই লিখেছি। তাই

আমার ভয়ের কারণ নেই। লোকে সেগুলোকে অস্বাভাবিক বললেই আমি মানবো না। এই করে আমার সাহিত্য-জীবন গড়ে উঠেছে।

এই সময় একজন প্রশ্ন করলেন—আপনার যেটা গভীরতর সাহিত্যিক বস্তু, সেটা কেমন করে গড়ে উঠল? ভাবকে আপনি রূপ দেন কি করে? বলবার যে ভঙ্গী, যে গড়ন, আগাগোড়া যে রস, যে লালিত্য—এ ভাষা কোথায় পেলেন? আপনার মুখের ভাষার সঙ্গে আপনার বইএর ভাষার কোন মিল নেই—না এ 'পথের দাবী'র ভাষা, না অন্য কোন বইএর ভাষা।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—সেটা বলতে পারি না। ভাষাটা আপনিই আসে। যার আসে না, তার বড় মুস্কিল। কি করে কথা যোগায়, তা বলাও মুস্কিল। আর স্টাইল, ওটা নিজেরই হয়—অনুকরণ করে হয় না।

আমার লেখার ধরণটা সাধারণ থেকে আলাদা। প্রথমে চরিত্রগুলি আমি ঠিক করে নিই—এক দুই তিন করে। গল্পের আরম্ভ করা বা চরিত্র গুলিকে ফোটানো আমার পক্ষে অতি সহজ। অনেকে বলে—'আমরা প্লট পাই না বলে লিখি না।' আমি অবাক্ হই, এত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, এত বৈচিত্র্য—আর এরা প্লট খুঁজে পায় না। তার কারণ, তারা মানুষটাকে খোঁজে না, গল্প নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

আমি ভাষা ভাল জানি না—'ভোকাবুলারি' খুব কম। তবু আমার লেখা লোকের কেন ভাল লাগে জানি না।

লেখা অনেক ঘষামাজা করতে হয়। স্বতঃ উৎসের মত বেরোয় না। যারা বলে—যা লিখে যাব, তাই ভাল—তারা প্রকাণ্ড ভুল করে। মানুষের বলার মতন লেখাতেও অনেক 'ইর্রেলিভেন্ট' কথা থাকে। সেদিকে নজর রাখতে হয়। আমি যা-তা করে কোন কাজ করি না। সেইজন্য ভূমিকা করে আমার মত বুঝাতে হয় না। আমার কোন বইয়ে ভূমিকা নাই। চারশ' পাতা বই পড়ে যে বুঝলে না, সে চার পাতা ভূমিকা পড়ে বুঝবে? আমি বইয়ের মধ্যেই বুঝাবার চেষ্টা করি—কোন কথা দ্ব্যর্থক না হয়, সেদিকে নজর রাখি। আমার সঙ্গে মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু কেউ বল্‌বে না যে, আপনার লেখা বুঝতে পারলাম না।

আর একটা জিনিস বরাবর দেখেছি—সাহিত্য রচনার গোটাকতক নিয়ম

কানুনও আছে। দেখতে হয়, রসবস্তু অশ্লীলতা পর্যায়ে না এসে পড়ে। শ্লীলতা অশ্লীলতার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্মরেখা আছে, যার এক ইঞ্চি ওদিকে পা পড়লেই সব 'ভাল্গার'—নষ্ট হয়ে যায়। একটু পা টলেছে তো আর রক্ষা নেই। অবশ্য আমি রসিক লোকের কথাই বলছি। 'ভাল্গার' সাহিত্য সর্বদা বর্জনীয়। মনোরঞ্জনের জন্য আমি কখন মিথ্যা বল্‌ব না, এ জিনিসটা আমি পারতপক্ষে করি না। কঠোর সমালোচনা আমি খুবই পেয়েছি। গালাগালির বন্যা বয়ে গেছে। দেশ বুঝে না, গ্রন্থকার, কবি, চিত্রকর এঁদের জীবন সাধারণ থেকে ভিন্ন। এখানকার লোকে তা জানে না। জানে না যে, এঁদের স্নেহের প্রশ্রয় দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মানুষ চায়—এঁদের অভিজ্ঞতালাভও হোক্, আর আমাদের মত শান্তশিষ্ট ভদ্রজীবনও যাপন করুক। তা হয় না। আর ব্যথার বিষয়, আমাদের দেশের সমালোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত ইঙ্গিতটাই থাকে বারো আনা। এ সব সমালোচনা হয় মানুষটার, বইটার নয়। এই জন্যে অনেকে ভয় পেয়ে যায়। 'বামুনের মেয়ে' ব'লে আমার একখানা বই আছে। অনেকে হয়ত পড়েন নি। লেখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়, তাঁকে বলি, এই রকম একখানা বই লিখতে ইচ্ছা হয়, এ সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত 'এক্সপিরিয়েন্স' আছে। তিনি বললেন—'এখন তো আর কৌলিন্য নেই, একজনের ১০০টা বিয়ে নেই, প্লটের তো ভাবনা নেই—তবে আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে, লেখো, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা ক'রো না।

পুরানো ছাই ঘাঁটা আমারও উদ্দেশ্য নয়। কৌলিন্য প্রথাটা আমার বড় লেগেছিল। যাঁরা ব্রাহ্মণ বলে নিজেদের ভারি গৌরববোধ করেন, আর ভাবেন—ব্রাহ্মণের রক্ত অবিমিশ্রভাবে বয়ে এসেছে, তাঁদের সেটা মস্ত ভুল ধারণা। ইংরাজীতে যাকে 'ব্লু-ব্লাড' বলে তা আর নেই। কৌলিন্য নিয়ে গোলমাল নিজের চোখে কত দেখেছি। ইতিহাসের কথা নয়—নিজে যা দেখেছি, তাই লিখেছি। এক আধটা নয়, অনেক। অমন এক বাড়ীতে নেমন্তন্ন পর্যন্ত খেয়ে এসেছি। কৌলিন্য ভাল কি মন্দ সে বিচার আমার নয়, ও আমি বলিও না। আমি এ কথা বলি না যে, বৈদ্যের সঙ্গে কায়েতের বিয়ে দাও। তবে কেউ যদি দেয়, কালচার্ (শিক্ষাদীক্ষা) মেলে, তাহলে এটা বলি—'তাকে বাধা দিও না।' সে ভাল করলে কি মন্দ করলে, সে

আমার কথা নয়। অন্ততঃ সে মিথ্যাচারী নয়, এটা তো বলবো। সে যেটা ভাল বুঝেছে, করেছে—সামাজিক তর্ক তুলে তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। অনেকে মুখে বলেন, মেয়ের বিধবা বিবাহ দাও, কিন্তু যেমনি নিজের মেয়ে বিধবা হ'ল, অমনি বলতে সুরু করেন—দেখুন, ও আমি পারব না, আমার আর পাঁচটা মেয়ের বিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রকম মিথ্যাচার ভাল বলি না। রবীন্দ্রনাথ, যাঁর মত অতবড় প্রতিভা পৃথিবীতে আর জন্মাবে কিনা সন্দেহ—উনিও তাই বলেন—লেখো, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিও না—কুলীন ব্রাহ্মণ আমি, আমারও লাগবে, ও-রকম করো না।

মিথ্যা করে চরিত্র গড়াও যায় না, যেখানে গড়া হয়, সেইটাই মিথ্যা হয়, অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। বইখানা বেরুলে, উঃ সে কি আক্রমণ! চারদিক থেকে বেয়ারিং চিঠি আসতে লাগলো!

এরপর নিজের লেখা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বললেন—

লেখার সময়ে যেন 'ট্রান্সপোর্টেড' হয়ে যাই। বাড়ীতে বলে রেখে দিয়েছি—যখন লিখব, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করো না। করলে যা উত্তর পাবে, তা বিশ্বাস করো না।

এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কথা তুলে বললেন—আপনি মুখে যাই বলুন, আপনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়, আপনি সনাতন ধর্মের মর্যাদা হানি করতে চান নি। যখন দেখি 'চরিত্রহীন' বইখানার সেই মেয়েটি স্টীমারের উপর একটি বালকের সহিত এক বিছানায় থেকেও নিজের দেহকে নষ্ট হতে দিলে না, তখনো কি আমরা বলবো—আপনি সনাতন ধর্মটা মানেন নি? আপনার অন্তরের অলৌকিক ধর্মবিশ্বাসটাই কি ঐ মেয়েটির চরিত্র রক্ষার কারণ নয়?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—আপনি আমার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারেন নি। আপনি যা বলছেন, ও-ভাবে আমি কিছুই করি নি। মেয়েটি যদি দেহ নষ্টই করতো, তাতেও আমার কিছু ক্ষতি ছিল না কিন্তু ঐ চরিত্রটা অসত্য হয়ে যেত। অমন লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিতা মেয়ে, আর যে বালকের সঙ্গে সে কেবল একটা জিদের বশে পালিয়ে এল, সে একটা অপোগণ্ড শিশু বললেই হয়, যাকে সে কোন দিক দিয়েই নিজের সমকক্ষ মনে করে না, তাকে দিয়েই যদি সে নিজের দেহটা নষ্ট হতে দিত, তাহলে ও চরিত্রটাই মাটি হয়ে যেত।

এরপরে শরৎচন্দ্র বললেন—আজকের এই আলোচনায় আনন্দ পেলাম। শুধু আমোদের জন্য নয়, এ রকম আলোচনার একটা সত্যিকার প্রয়োজনও আছে। দেশটাকে কিভাবে বড় করে তোলা যায়, নানা লোকের নানা মত রয়েছে। মাঝে মাঝে এই রকম পাঠক ও লেখক জড় হয়ে বিভিন্ন চেষ্টার একটা সামঞ্জস্য করা দরকার। এতে লাভ আছে। আজকাল অনেকেই লিখছে। কিন্তু তাদের অনেককেই লেখক বলা চলে না। তাদের লেখায় সংযম দেখা যায় না। যৌন সম্বন্ধ নিয়ে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য কিনা সন্দেহ। এ-সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাইরে থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই, তাই পরের ধার করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুলেছে। কেউ কিছু বললে, তারা জিদের বশে বলে—'খুব করব, লিখ্‌ব, বল্‌ব।' কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই রকম সভা-সমিতি করে যদি তাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তা থেকে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

সব শেষে শরৎচন্দ্র বললেন—আমি মানুষকে খুব বড় বলে মনে করি। তাকে ছোট করে আমি মনে করতে পারি না।

হাস্য-পরিহাস

ভাত খেয়েছেন তো ?

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সভা-ভীরু মানুষ ছিলেন। সভায় যেতে হবে এবং বক্তৃতা করতে হবে, শুনলেই তিনি সর্বদাই পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেন।

তিনি বলতেন—সভায় গিয়ে বক্তৃতা করতে হবে মনে হলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

শরৎচন্দ্র সভা-ভীরু হলেও লোকে কিন্তু তাঁকে সভায় দেখবার জন্য এবং তাঁর মুখের বাণী শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। তাই তারা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁকে ডাকাডাকি করত।

শরৎচন্দ্র একান্ত যেখানে যেখানে এড়াতে পারতেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেই সেই সেই সভায় যোগ দিতেন।

এইরূপ একবার তিনি ১৩৪১ সালের ১০ই আশ্বিন তারিখে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন।

বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভূমি এই কৃষ্ণনগর। তাই শরৎচন্দ্র কৃষ্ণনগর যাওয়ার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র তাঁর স্নেহভাজন দিলীপকুমার রায়কেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দাদা সুরেন্দ্রলাল রায় ঐ সময় কৃষ্ণনগরে তাঁদের পৈতৃক বাসভবনে বাস করছিলেন।

শরৎচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গিয়ে দিলীপবাবুদের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন।

সেখানে গেলে দিলীপবাবু তাঁর জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দিলীপবাবুর পরিচয় করিয়ে দেবার পালা শেষ হ'লে, শরৎচন্দ্র সুরেন বাবুকে নমস্কার করে হাত জোড় করেই বললেন—আপনি প্রাতঃস্মরণীয় দ্বিজেন্দ্রলালের দাদা! আপনাকে দেখলেও পুণ্য হয়! তা আপনি ভাত খেয়েছেন তো?

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ভাত খেয়েছেন তো?—শরৎচন্দ্রের এই ধরণের অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে সুরেনবাবু তো অবাক!

তারপর বিস্ময়ের ভাব কিছুটা কাটিয়ে সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ এ ধরণের প্রশ্ন করলেন যে?

শরৎচন্দ্র এবার বললেন—কি জানি মশায়! আমাকে এখানে এনে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে। তা ঘরে বসে বসেই দেখছিলাম—পথ দিয়ে যত লোক যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে কেউ তার পরিচিত কাউকে দেখলেই জিজ্ঞাসা করে—ভাত খেয়েছ তো?—এই দেখে আমিও ভাবলাম—প্রথম সাক্ষাতে এই রকম প্রশ্ন করাই বুঝি এখানকার রীতি! তাই আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'লে, আমিও আপনাকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করলাম।

এরপর শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—এই ধরণের প্রশ্নের কারণটা অবশ্য আমি পরে জেনে নিয়েছি। আপনাদের দেশে যা ম্যালেরিয়া মশায়! এখানকার লোকে তো কেবল জ্বরেই ভুগছে শুনলাম। ভাত খেতে পাওয়াটা তাদের কাছে একটা মস্ত বড় ব্যাপার। তাই কেউ তার পরিচিত কাউকে দেখলেই প্রথমেই খোঁজ নেয়—ভাত খেয়েছ তো?

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সুরেনবাবু ও দিলীপবাবু দুজনেই হাসতে লাগলেন।

ব্যাসকাশী

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকেন। সেই সময় তিনি একবার কাশী বেড়াতে যান।

কাশী যাওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী অমুরূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দু-একজন তাঁর সঙ্গী হন।

কাশী গিয়ে একটি বাড়ী ভাড়া করে সকলেই একত্রে থাকেন। কয়েকদিন যাবার পর শরৎচন্দ্র একদিন তাঁর সঙ্গীদের বললেন—চল আজ বিকালে কাশীর অপর পারে রামনগর অর্থাৎ ব্যাসকাশী বেড়িয়ে আসি।

শরৎচন্দ্রের কথামত বিকালে একটা নৌকায় করে সকলে ব্যাশকাশী রওনা হলেন।

ব্যাসকাশী সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, কেউ যদি সেখানে মরে, তাহলে পরের জন্মে সে গাধা হয়ে জন্মাবে।

শরৎচন্দ্র বিকালে সদলে নৌকায় করে ব্যাসকাশী চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন—ব্যাসকাশীতে গঙ্গার তীরে কয়েকজন লোক একটা মড়া পোড়াচ্ছে। আর যেখানে মড়া পোড়ান হচ্ছে, তার অদূরেই একটা বাচ্ছা গাধা চরে বেড়াচ্ছে।

এই দেখেই শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গীদের বলে উঠলেন—দেখ, দেখ! ব্যাসকাশী সম্বন্ধে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তা কত সত্য! লোকটা মরতে না মরতেই গাধা হয়ে গেছে!

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন।

দেখা হয় নি

গোলকনাথ, প্রিয়নাথ ও অনাথনাথ তিন ভাই। তিন জনেই পৃথক অন্ন। গোলকনাথের মৃত্যুর পর তার নিঃসন্তান স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরী অনাথনাথের সংসারে আশ্রয় নেয়। কিছুদিন পরে আবার প্রিয়নাথের মৃত্যু হ'লে প্রিয়নাথের স্ত্রী দুর্গামণিও কুরূপা অরক্ষণীয়া কন্যা জ্ঞানদাকে নিয়ে অনাথনাথের সংসারে আশ্রয় নিল।

ছোট দেওরের সংসারে দুর্গামণির বড় কষ্টেই দিন কাটত। কষ্ট দিত প্রধানতঃ বড় বৌ স্বর্ণমঞ্জরীই।

স্বর্ণমঞ্জরীর এক প্রতিবেশী বোন-পো অতুল ছেলেবেলা থেকেই এ-বাড়ীতে যাতায়াত করত। জ্ঞানদার সঙ্গে অতুলের একটা প্রীতির সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। এমন কি, অতুল জ্ঞানদার ভার নেবে, এ কথা প্রিয়নাথের মৃত্যুর সময়ও অতুল প্রিয়নাথকে বলেছিল। কিন্তু জ্ঞানদা কুরূপা বলেই অতুল পরে তার কথা রাখে নি।

এই সময় দুঃখে কষ্টে জ্ঞানদার মা দুর্গামণির মৃত্যু হয়। অনাথনাথের আহ্বানে অতুল মৃতদেহ দাহ করতে শ্মশানে গেল।

ইহ জগতে একমাত্র আশ্রয়স্থল মায়ের মৃত্যু হওয়ায় অভাগী জ্ঞানদা শ্মশানের নিকটে বর্ষার ভরা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে মনস্থ করে। এই সময় অতুল অনুতপ্ত হয়ে জ্ঞানদার কাছে গিয়ে বলে—আমি যত অপরাধই করি না কেন, আমাকে তোমায় ফিরে নিতেই হবে। আমাকে ত্যাগ করে শান্তি দেবে. এ-সাধ্য তোমার কিছুতেই নেই।—এই বলে অতুল জ্ঞানদাকে বুঝিয়ে শ্মশান থেকে ফিরিয়ে আনে।

সংক্ষেপে এই হ'ল শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গ্রন্থের কাহিনী। এই অরক্ষণীয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র লেখাটি ভারতবর্ষে পাঠাবার সময় জ্ঞানদাকে না বাঁচিয়ে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

'অরক্ষণীয়া' ভারতবর্ষে প্রকাশিত হবার জন্য এলে ভারতবর্ষের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় গল্পটি পড়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—দাদা, যেভাবে বিয়োগান্ত করে বই শেষ করছেন, ঐভাবে না করে, জ্ঞানদাকে বাঁচিয়ে অতুলকে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

হরিদাসবাবুর এই নির্দেশটি শরৎচন্দ্রের মনোমত হওয়ায় তিনি বইয়ের উপসংহারটি বদলে দেন। এবং পরে ঐভাবেই ছাপা হয়। অরক্ষণীয়া বইও প্রকাশ করেন হরিদাসবাবুদেরই প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

অরক্ষণীয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরের ঘটনা।

একদিন মফঃস্বলের এক ক্লাব থেকে হরিদাসবাবুর কাছে একটি চিঠি আসে। চিঠিতে তারা লেখে—অরক্ষণীয়ার উপসংহার নিয়ে আমাদের ক্লাবে সেদিন এক তুমুল তর্ক। এমন কি বাজি রাখা পর্যন্ত হয়েছে। আমাদের মধ্যে একদলের মত—জ্ঞানদাকে শ্মশান থেকে নিয়ে যাওয়ার পর অতুল তাকে বিয়ে করবে, শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। অপর দল বলছে—না, তা কখনই নয়।—আপনি যদি দয়া করে শরৎবাবুর কাছ থেকে তাঁর নিজের অভিমতটি জেনে দেন তো বড় ভাল হয়।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে এই চিঠির কথা শোনালে শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—আপনার কথা শুনেই তো এই বিপদ। বেশ তো জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ছিলাম। তাতে অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত, আর লেখক ও প্রকাশকও বাঁচত। এখন কি জবাব দিই বলুন তো। এই ভাবে আরো চিঠি এলেই তো গেছি আর কি!

পরে একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা, ওরা তো জানতে চেয়েছে, জ্ঞানদা আর অতুল শ্মশান থেকে যাবার পর কি হ'ল? আপনি লিখে দিন—শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—তারপর অতুল কি জ্ঞানদা কারো সঙ্গেই আর তাঁর দেখা হয় নি। সুতরাং তাদের কি হ'ল তিনি আর বলতে পারেন না।

আফিং

শরৎচন্দ্র সেদিন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে এসেছেন। এসে অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। তখন বিকাল বেলা। শরৎচন্দ্রের আফিং খাওয়ার সময়। তাই তিনি পকেট থেকে আফিং-এর কৌটা বার করে একটা আফিং-এর পাকানো বড়ি মুখে ফেলে দিলেন।

অফিসের কর্মচারীরা তাঁর আফিং খাওয়া দেখছেন দেখে শরৎচন্দ্র তাঁদের বললেন—কি আফিং দেখে বুঝি সবার লোভ হচ্ছে?

তারপর তিনি পাশের একজনকে বললেন—দেখ, তুমি একটু আফিং খাও, তাহলে দেখবে, তুমি আমার মতই সাহিত্যিক হয়ে গেছ।—এই বলে শরৎচন্দ্র শুধু তাঁকেই নয়, নানাভাবে বুঝিয়ে এবং আফিং-এর অশেষ গুণ-মহিমা বর্ণনা করে অফিসসুদ্ধ সকলকেই একটু একটু করে আফিং খাইয়ে দিলেন।

ঐ সময় ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে কি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, আর কি তাঁর ছোট ভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, উভয়ের কেউই অফিসে ছিলেন না। তাঁরা তখন বাড়ী চলে গিয়েছিলেন।

এই দেখে শরৎচন্দ্র আরো মজা করবার জন্য হরিদাসবাবুকে এক চিঠি লিখে অফিসের দরোয়ানের হাত দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখলেন—ভায়া, আফিং-এর রূপের মোহে, আর কেউ কেউ আফিং ধরে আমার মত সাহিত্যিক হবার লোভে, আপনার অফিসসুদ্ধ সমস্ত লোকই আমার কাছ থেকে জোর করে আফিং কেড়ে নিয়ে খেয়ে বসে আছে। এখন তারা আফিংএর নেশায় ঝিমোচ্ছে। এখনই যদি না তাদের মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, ঝিমুনি কাটবে না। তাহলে কি হবে বুঝতেই পারছেন! আপনার হাতে পুলিশের হাতকড়া পড়বে। অতএব পত্রপাঠ কিছু পাঠিয়ে দিন।

হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রের পত্র পেয়ে তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। এবং দরোয়ানের হাতে তখনি দশটা টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র টাকা দশটা নিয়ে অফিসের কর্মচারীদের দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় অল্পই ছিলেন, তাই বিকালের জলযোগটা তাঁদের সেদিন মন্দ হ'ল না।

দাড়ি

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত দাড়ি রেখে ছিলেন। তারপর কেন যে দাড়ি ফেলে দিলেন, সে সম্বন্ধে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি একদিন একটা গল্প বলেছিলেন। সেই গল্পটা এই :—

আমি তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকি। সেই সময় একবার সেখান থেকে হাওড়া জেলার এক গ্রামে আমার দিদিদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে দু-একদিন থেকে আমার বাজে শিবপুরের বাড়ীতে ফিরে আসবার সময়, ট্রেনে একজন মুসলমান আমার পাশেই বসে আসছিল। সে আমার দাড়ি দেখে তো আমাকে মুসলমান ভাবে। এই ভেবে সে আমাকে আর কিছু না বলেই—ভাই সাহেব, পান নিন—বলে এক খিলি পান দিতে আসে।

এই ঘটনার পর বাড়ী এসেই আমি সঙ্গে সঙ্গেই দাড়ি কামিয়ে ফেলি।

শরৎচন্দ্র কখনো কখনো একই কথাকে বানিয়ে বানিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকমের গল্প করতেন। তাঁর এই দাড়ি ফেলার গল্প কংগ্রেসকর্মী হেমন্তকুমার সরকারের কাছে আবার অন্যভাবে বলেছিলেন। তা এই—

হাওড়ায় একবার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়। সেই সময় হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তো অনেকের সঙ্গে আমাকেও তলব করলেন।

আমার দাড়ি দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ভাবলেন, আমি মুসলমান।

আমি তখন ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম—হুজুর, হাওড়ায় মুসলমানের অভাব কি? আপনার যত ইচ্ছা গ্রেপ্তার করতে পারেন। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিয়ে টানাটানি কেন?

এরপর কোর্ট থেকে ফিরেই আমার বহুদিনের পোষা দাড়িটাকে কামিয়ে ফেললাম।

দাড়ি সাদৃশ্য

'রসচক্রে'র আড্ডায় একদিন রবীন্দ্রনাথের দাড়ির কথা উঠলে, শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই বানিয়ে এই গল্পটি বলেছিলেন—

রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট বন্ধু (তাঁরও পাকা দাড়ি ছিল) একবার বিলেত গেলে, সেখানে অনেকে তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ বলে ভ্রম করেন। রবীন্দ্রনাথ কার মুখে এই কথাটা শুনে, বন্ধুটি ফিরে এলে তাঁকে ডাকিয়ে বললেন—দেখুন, আপনি বিলেত গেলে অনেকে যে আপনাকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল, তার মূলে আপনার ঐ দাড়ি। অতএব লোকে যাতে আর না ভুল করে, সেজন্য আপনি অনুগ্রহ করে দাড়িটি এবার কামান।

বন্ধুটি বললেন—তা কি করে হয়! আমার এতদিনের সযত্ন-বর্ধিত দাড়ি, কামাই কি করে!

তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন—তাহলে এক কাজ করুন, কামাতে যদি সত্যিই মায়া হয়, তবে অন্ততঃ মেহেদি দিয়ে দাড়িটা ছোপান।

বন্ধুটি এই কথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন—অ্যাঁ, আমি কি মুসলমান যে, দাড়ি ছোপাতে যাব?

রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন যে, বন্ধুটি দাড়ি না কামাতে, না ছোপাতে কিছুই চাইছেন না, তখন তিনি রেগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আড়ি করে বাক্যালাপই বন্ধ করে দিলেন।

হিন্দু-মুসলমান মিলন

কংগ্রেস একদিকে যেমন স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, তেমনি সে বরাবরই তার অনেকখানি শক্তি নিয়োগ করেছিল হিন্দু-মুসলমান মিলনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদেরও স্বাধীনতা আন্দোলনে নিয়ে আসার। এজন্য হিন্দু-প্রধান কংগ্রেস মুসলমানদের সঙ্গে মিলনের আশায় তার অনেক স্বার্থ ত্যাগ করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্যায় দাবীও মেনে নিয়েছে।

শরৎচন্দ্র বরাবরই কংগ্রেসের মুসলমানদের সঙ্গে মিলনের জন্য এই তোষণ করে হাত বাড়ানোটাকে আদৌ প্রীতির চোখে দেখতেন না।

এমন কি মুসলমানদের দলে আনবার জন্য কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা যখন খিলাফৎ আন্দোলনের মুসলমান নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করেন, শরৎচন্দ্র তখন কংগ্রেসের ঐ চেষ্টাকে একটা ঘুষের ব্যাপার ও গোঁজামিল বলেছিলেন।

একবার কংগ্রেস তখন হিন্দু-মুসলমান মিলন নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে।

সেই সময় শরৎচন্দ্র একদিন দেশবন্ধুকে বললেন—আপনারা এত চেষ্টা করেও তো হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলনের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি কিন্তু একটা পথ বাৎলে দিতে পারি। একবার চেষ্টা করে দেখুন দেখি।

দেশবন্ধু আগ্রহ সহকারে বললেন—কি বলুন শুনি!

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলে যেতে লাগলেন—যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, সেখানে একটা করে ইংরাজি স্কুল খুলে দিন। ইংরাজির ছাব্বিশটি অক্ষর ও বানান সমস্যা ডিস্পেপ্সিয়া এসে মুসলমানদের এমন কাবু করবে যে, হাতের লাঠি আপনি খসে পড়বে এবং বার্লি খাওয়া নাড়ীতে গরু আর হজম হবে না। তখন গো-বধ আপনিই বন্ধ হবে। আর গো-বধ বন্ধ হলেই হিন্দু-মুসলমান বিবাদ আপনা হতেই মিটে যাবে।

শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব শুনে দেশবন্ধু হো হো করে হেসে উঠলেন।

সূতোকাটা

অসহযোগ আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের সকল প্রকার গঠনমূলক কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কংগ্রেসের একটা নির্দেশ ছিল চরকা কাটা ও খদ্দর পরা।

শরৎচন্দ্র নিষ্ঠার সহিত চরকা কাটলে এবং খদ্দর পরলেও কংগ্রেসের চরকা-খদ্দরের প্রোগ্রামে কিন্তু তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না।

চরকা কাটলে যে স্বরাজ ত্বরান্বিত হবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। তবুও তিনি খদ্দর পরতেন এবং যত্ন করে চরকা কাটাও শিখেছিলেন। তার কারণ কংগ্রেস চরকা-খদ্দরের প্রোগ্রাম নিয়েছিল বলে।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়েও চরকায় যে অবিশ্বাসী, এ কথা মহাত্মা গান্ধীও জানতেন।

মহাত্মা গান্ধী একবার কলকাতায় এসে তখনকার অন্যতম জাতীয়তাবাদী দৈনিক 'সার্ভেণ্টে'র কার্যালয় দেখতে যান।

সার্ভেণ্টের সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ছিলেন তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

মহাত্মাজী কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। দেশবন্ধুর বাড়ী থেকে সার্ভেণ্ট অফিসে যাওয়ার সময় অনেকেই মহাত্মাজীর সঙ্গে গেলেন। শরৎচন্দ্রও গেলেন।

সার্ভেণ্ট কার্যালয়ে গিয়ে মহাত্মাজী সকলকে নিয়ে সেখানে বসে চরকা কাটতে চাইলেন।

অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলো চরকা আনা হ'ল।

অনেকেই মহাত্মাজীর সঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন। শরৎচন্দ্রও চরকা কাটায় যোগ দিলেন।

শরৎচন্দ্রের সূতো খুব মিহি হচ্ছিল। শ্যামসুন্দরবাবুর সূতো কিন্তু মোটা হচ্ছিল।

মহাত্মা গান্ধী শ্যামসুন্দরবাবুকে দেখিয়ে পরিহাস করে বললেন—লুক্ লুক্, দি প্রেসিডেণ্ট অফ্ দি বি-পি-সি-সি ইজ স্পিনিং রোপ্।

মহাত্মাজীর এই কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—নিয়ারার দি চার্চ, রিমোটার ফ্রম্ গড্।

এবার মহাত্মাজী, শরৎচন্দ্র চরকায় বিশ্বাস করেন কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে শরৎচন্দ্র জানালেন যে, চরকায় তাঁর একবিন্দুও বিশ্বাস নেই।

মহাত্মাজী তখন শরৎচন্দ্রকে বললেন—বাট্ ইউ স্পিন্ বেটার দ্যান্ ম্যানি লাভারস্ অফ্ চরকা।

শরৎচন্দ্র বললেন—আই হ্যাভ্ লার্নট স্পিনিং, বিকজ্ আই হ্যাভ্ লাভ্ ফর ইউ।

মহাত্মাজী মৃদু হেসে বললেন—বাট্ হোয়াই ডোণ্ট্ ইউ বিলিভ্ দ্যাট্ দি অ্যাটেন্ম্যাণ্ট অফ্ স্বরাজ উইল্ বি হেল্পড বাই স্পিনিং।

উত্তরে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—নো, আই ডোণ্ট্ বিলিভ্। আই থিংক্ অ্যাটেন্ম্যাণ্ট অফ্ স্বরাজ ক্যান বি ওনলি বি হেল্পড বাই সোল্জারস্ এণ্ড নট্ বাই স্পাইডারস্।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে মহাত্মাজী হাসতে লাগলেন।

খদ্দর

অসহযোগ আন্দোলনের সময়কার কথা।

সারা ভারতে তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ।

ঘরে ঘরে লোকে চরকা-খদ্দর নিয়ে মেতে উঠেছে।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্রও তখন খুব চরকা কাটছেন এবং খদ্দর পরছেন।

ঐ সময় দিলীপকুমার রায় একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে হাওড়ায় বাজে শিবপুরে তাঁর বাড়ীতে যান।

শরৎচন্দ্র তখন বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে আরও দু-একজন ছিলেন। দিলীপবাবু গেলে শরৎচন্দ্র তাঁকে আদর করে বসালেন।

নানা রকমের কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় রাজনীতির কথা উঠল। রাজনীতি থেকে এল খদ্দরে।

খদ্দরের কথা উঠলে শরৎচন্দ্র দিলীপবাবুকে বললেন—দেখ মণ্টু, খদ্দর আর পরা চলে না দেখছি!

—কেন বলুন তো?

—আরে বাড়ীতে চাকর-বাকর আদৌ থাকতে চায় না। তারা বলে, কাপড় ধুতে গিয়ে ডোবাই বেশ, কিন্তু তুলবার সময় আর তুলতে পারি না।

চাকর-বাকরের কথা তো গেল। আর আমিও দেখেছি—তোমাদের ঐ চটের মত মোটা খদ্দরের ঘর্ষণে কোমরটা আমার একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল হে!

খদ্দরে বৈচিত্র্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে সেদিন কংগ্রেসেরই কিসের একটা সভা। সভা আরম্ভ হতে তখনও কিছুটা দেরি আছে। ইতিমধ্যে অনেকেই এসে গেছেন। শরৎচন্দ্র বসু এবং অনিলবরণ রায়ও এসেছেন।

শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। তাই তিনিও এসেছেন।

চরকা কাটা এবং খদ্দর পরা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীরই অবশ্য কর্তব্য বলে কংগ্রেস কর্মীরা সকলেই খদ্দর পরে এসেছেন।

অনিলবরণ রায় এই সময় খুব মোটা খদ্দরের খাটো বহরের আর লম্বাতেও ছোট, এমন কাপড় পরতেন। তাঁর কাপড়ের বহর তাঁর হাঁটুর উপর থাকত।

একেবারে অনিলবাবুর মত না হ'লেও অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মীই তখন খুব মোটা খদ্দরের কাপড় পরতেন।

শরৎচন্দ্র বসুর ছিল কিন্তু এর বিপরীত। তিনি পরতেন মিহি খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী। আর পাঞ্জাবীর উপর নিতেন তেমনি মিহি চাদর। তাঁর ধুতির বহর পড়ত পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লুটিয়ে, পাঞ্জাবীর ঝুল ছিল খুব লম্বা, আর চাদরে থাকত মুগার পাড়।

সেদিন সভায় আগত কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একজন অনিলবরণ রায়ের ও শরৎচন্দ্র বসুর এই পোষাকের তুলনা করে শরৎচন্দ্র বসুকে একটু ঠাট্টার সুরেই বললেন—শরৎবাবু, আপনার এ মিহি খদ্দরটি কোথাকার তৈরি?

শুনে শরৎবাবু একটু উষ্মার সঙ্গেই উত্তর দিলেন—ভাগলপুরের।

এই বিদ্রূপের ফলে একটু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবার প্রায় উপক্রম হ'ল।

এই দেখে শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—ওহে, আমাদের এখানে সব রকম আছে। একটু বৈচিত্র্য থাকা ভাল। অনিলবরণ হচ্ছে খদ্দরের মাদার টিংচার, আর শরৎ হচ্ছে টু-হান্‌ড্রেড ডাইল্যুশন, বুঝলে?

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলেন এবং যে অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল, সকলের হাসির চোটে তা কেটে গেল।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের গদি

দিলীপকুমার রায়ের বাড়ীতে সেদিন সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা এসেছেন। শরৎচন্দ্রও উপস্থিত আছেন। হাল্কা আলাপ হচ্ছে।

এমন সময় দিলীপবাবু সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন—সুভাষ, তোমার শরীর এখনও তো দুর্বল। তা একটু বিশ্রাম নিলে ভাল হয় না? বিশেষতঃ ডাক্তার যখন বলেছেন।

উত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন—উপায় কি ভাই, কংগ্রেস প্রভৃতির কাজে লোক তেমন আর কই?—বলেই একটু হেসে শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—তবে শরৎবাবু যদি বাঙ্গলা কংগ্রেসের ভার নিতে রাজী হন তো, আমি একটু বিশ্রাম নিতে পারি।

শুনে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—দেখ সুভাষ, আমি দেখতে বোকা বটে, কিন্তু আসলে আদৌ বোকা নই। তুমি ভেবেছ, বি-পি-সি-সি-র গদিতে আমাকে বসিয়ে তোমার বদলে জেলে পাঠাবে। আরে, তাতে কি আমি রাজী হই!

সুভাষচন্দ্র হেসে উঠে বললেন—আপনাকে জেলে যেতে হবে কেন? আপনাকে কেউ ধরবে না তা বলে দিচ্ছি।

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে তুমি তো বলেই খালাস। তারপর? যখন হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তুমি দলবল নিয়ে এসে বড় জোর গলায় একগাছি মালা পরিয়ে দিয়ে বলবে 'বন্দে মাতরম্ শরৎবাবু'। তোমার সুধামুখে একবার বন্দেমাতরম্ শোনবার জন্য, আর তোমাদের ঐ অশ্রুনিসিক্ত একগাছি মালা পাবার লোভে, আমি কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা বছর জেল খাটতে আদৌ রাজী নই।

জেলে যাওয়া

অসহযোগ আন্দোলনের সুরু থেকেই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই থেকে একটানা বহু বৎসর ধরে হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

কিন্তু কখনো তিনি জেলে যান নি।

কংগ্রেস-কর্মীরা আইন অমান্য ঘোষণা করে যখন দলে দলে জেলে যাচ্ছিলেন, সেই সময় সুভাষচন্দ্র বসু একদিন শরৎচন্দ্রকে বললেন—শরৎবাবু, আপনাকে একবার জেলে যেতেই হবে।

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—আরে সুভাষ, আমারও তো খুবই ইচ্ছে। আর জেলে যেতে সব সময়েই প্রস্তুত আছি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানো—সেখানে যে আফিং দেবে না! আফিং ছাড়া যে আমি বাঁচব না!

সুভাষচন্দ্র বললেন—সে আমি যোগাড় করে দেবার ব্যবস্থা করব। আপনাকে সেজন্য কিছু ভাবতে হবে না।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি যে আমার সঙ্গে সব সময়েই জেলে থাকবে তার কি মানে আছে? তুমি যদি আগে জেল থেকে বেরিয়ে এস, তাহলে কি হবে? না! ওতে সুবিধা হবে না হে! দেখ দেখি! আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শুধু ঐ আফিংএর জন্যই জেলে যাওয়া হচ্ছে না। এ কি কম দুঃখ!

শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকেও একবার বলেছিলেন—শুনি জেলে গেলে নাকি আফিং দেয় না, তামাকও দেয় না। তাই আমার জেলে যাওয়া হ'ল না। নাঃ, দেখছি জেলখানাটা আদৌ ভদ্রলোকের জায়গা নয়!

মুসলমান ও শিখ বন্ধুদের প্রতি

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রতিহত করবার জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সকল রকম দমন-নীতিই অবলম্বন করেছিল। এমন কি মুসলমানদের হাত করে ভেদনীতিরও অনুসরণ করেছিল।

তার ফলে অধিকাংশ মুসলমানই তখন কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয় নি।

শরৎচন্দ্র তাই তাঁর মুসলমান বন্ধুদের পরিহাস করে তখন বলতেন—তোমাদের গায়ে এত জোর, তোমরাই স্বরাজের জন্য ঘানি ঘোরাবার ও গুলি খাবার ভার নাও না কেন? তোমরা বাদশা ছিলে, তোমরাই আবার না হয় বাদশা হবে। আমরা যেমন কেরাণী ছিলাম, তাই থাকব।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে লোকে তখন দলে দলে জেলে যাচ্ছে।

সেই সময় কংগ্রেসকর্মী হেমন্তকুমার সরকার একদিন গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তদানীন্তন কার্যালয় ফরবেশ ম্যানসন থেকে বেরোবেন কি, এমন সময় শরৎচন্দ্র সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

ঐ সময় সুভাষচন্দ্র বসুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হেমন্তবাবু জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন দেখে, শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে বললেন—আচ্ছা সুভাষ, এই ভদ্রলোকের সন্তানকে তুমি কোথায় পাঠাচ্ছ? এত জোয়ান জোয়ান দাড়িওয়ালা শিখ মুসলমান থাকতে একে কেন? ওদের চেহারা দেখে বুঝছ না, ভগবান যেন ঘানি ঘোরাবার জন্যই ওদের এত-বল দিয়েছেন।

দেশবন্ধুর ত্যাগ ও দুঃখ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু।

এই গয়া কংগ্রেসে আইন সভায় প্রবেশের নীতি নিয়ে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতার সহিত দেশবন্ধুর মতবিরোধ হয়।

তখন দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের মধ্য থেকেই তাঁর সমর্থকদের নিয়ে 'স্বরাজ্যদল' নাম দিয়ে আলাদা একটা দল গঠন করেন।

এর জন্য তখন বাঙ্গলা দেশের ইংরাজী বাঙ্গলা সব ক'খানা সংবাদপত্রই মিলিতকণ্ঠে দেশবন্ধুকে আক্রমণ করেছিল।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যারা তারাও গালিগালাজ না করে কথা কয় না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!

সেই সময় শরৎচন্দ্র একদিন দেশবন্ধুর বাড়ীতে যান। গিয়ে বলেন—ত্যাগ ও দুঃখ বরণ ব্যতীত যখন স্বরাজ লাভ হবেই না, আর সবই যখন ত্যাগ করেছেন এবং দুঃখেরও যখন চরম হয়েছে, তখন এইবার একখানা পা কেটে ফেলুন। তার ফলে আপনার যে ত্যাগ ও দুঃখ তাতে স্বরাজ নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।

এই বলে শরৎচন্দ্র মোটা টাকার একখানা চেক দেশবন্ধুর হাতে দিলেন।

শিক্ষক

দেশবন্ধুর বাড়ীতে সেদিন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস-কর্মীদের গল্প হচ্ছিল।

সেই বৈঠকে দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ কথা উঠল, কোন্ বাঙ্গালীর সঙ্গে কবে মহাত্মাজীর প্রথম আলাপ হয়।

শুনে কিরণশঙ্কর রায় বলে উঠলেন—ও গৌরবটা আমার পাওনা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য আমি যখন বিলেতে ছিলাম, মহাত্মাজী তখন বুয়র যুদ্ধে এ্যাম্বুলেন্স কোরের কার্যোপলক্ষে বিলেতে এসেছিলেন। মহাত্মাজীর তখন খেয়াল হয়েছিল বাঙ্গলা শেখবার। উনি তখন আমাকে মাস্টার রেখেছিলেন।

দেশবন্ধু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—তাই নাকি? তা ছাত্রটিকে কতখানি বাঙ্গলা শিখিয়েছিলে কিরণ?

কিরণবাবু হাসতে হাসতে বললেন—ছাত্রটি যে তেমন ধারালো ছিল না, তাই তো শিক্ষা তেমন হ'ল না!

শরৎচন্দ্র এবার এ সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করলেন—মহাত্মাজী! ইংলণ্ডে কিরণ কি আপনার গুরু ছিল?

মহাত্মাজী ঈষৎ হেসে বললেন—হ্যাঁ, ওর কাছে আমি বাঙ্গলা শিখতাম।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে এবার বললেন—ঐ জন্যই আপনি বাঙ্গলা শিখতে পারেন নি।

বন্ধু-বিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্র ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়ে ফিরবার সময় দিল্লী থেকে বৃন্দাবনে যান।

দিলীপকুমার রায় এবং কাশীর উত্তরা-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এঁরাও শরৎচন্দ্রের সঙ্গী হন।

শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যৌবনেই রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর নাম হয় স্বামী বেদানন্দ। ঐ সময় তিনি বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্র সঙ্গীদের নিয়ে মেজভাইয়ের আশ্রমে গিয়েই উঠলেন।

একদিন শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গী দুজনকে নিয়ে বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড দেখতে গেলেন। তিনজন পাণ্ডা তাঁদের কুণ্ড দেখাল।

ফিরবার সময় পাণ্ডারা তাঁদের টাঙ্গা ঘিরে, এক আনা দিজিয়ে, দো আনা, নেহি নেহি তিন আনা, করতে লাগল।

পাণ্ডাদের যে কত দেওয়া যায়, দিলীপবাবু বা সুরেশবাবু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। এমন সময় শরৎচন্দ্র পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে তাদের কারো হাতে না দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন।

একেবারে দুটো টাকা! নেবার জন্য পাণ্ডারা হুড়াহুড়ি ফেলে দিল। এদিকে টাঙ্গা ততক্ষণে পাণ্ডাদের আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে আরোহিদের নিয়ে ছুটে চল্‌ল।

দিলীপবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—দু-এক মিনিট ঘুরিয়ে একটা কুণ্ড দেখানোর জন্য একেবারে দু-দুটো টাকা দিলেন।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ওরা যেমন, ওদের মধ্যে তাই বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলাম অনন্তকালের জন্য। এতক্ষণে কার টাকা, এই নিয়ে ওরা নিশ্চয়ই হাঙ্গামা জুড়ে দিয়েছে।

ওস্তাদী গান

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ভাগলপুরে থাকার সময় কিছুদিন গান-বাজনার চর্চা করেছিলেন। পরে তিনি রেঙ্গুনে থাকাকালেও অনেকদিন গানের চর্চা করেন।

গানের মধ্যে কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতই ছিল তাঁর প্রিয়। এ সব গান তিনি ভালই গাইতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল সুমিষ্ট।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে গান একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে কোন কোন গানের আসরে মাঝে মাঝে যেতেন। কিন্তু ওস্তাদী গান বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে তিনি যেতে চাইতেন না।

দিলীপকুমার রায়ের কলকাতার বাড়ীতে একবার সঙ্গীত-সম্মেলন। বিখ্যাত গায়ক আব্দুল করিম সাহেব সেদিন সম্মেলনে গান করবার কথা।

সঙ্গীত-সভায় যোগ দেবার জন্য দিলীপবাবু তাঁর সঙ্গীত-পিপাসু বন্ধুদের অনেককেই নিমন্ত্রণ করলেন। দিলীপবাবু ঐ সঙ্গে শরৎচন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করা স্থির করলেন।

সঙ্গীত-সম্মেলনের দিন সকালে দিলীপবাবু নিজেই শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন।

গিয়ে বললেন—আজ আমাদের বাড়ীতে একটা গানের আসর আছে। এখনকার ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক আব্দুল করিম সাহেব তাতে গান করবেন। আপনাকে যেতেই হবে, তাই নিমন্ত্রণ করতে এলাম।

শরৎচন্দ্র শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—তুমি যদি একটা ভরসা দাও তো যেতে পারি।

দিলীপবাবু বিস্মিত হয়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের ভরসা বলুন তো?

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, শুনেছি আব্দুল করিম সাহেবের ওস্তাদী গান নাকি খুব চমৎকার! ভদ্রলোক খুবই ভাল গান করেন। তা আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি, গান করেন তো ভাল, কিন্তু থামতে জানেন তো?

অজুতো বল

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়ীতে তখন প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য ও শিল্পের আসর 'বিচিত্রা'র অনুষ্ঠান হ'ত। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উপস্থিতিই ঐ আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল।

বিচিত্রার আসরে বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন প্রায় সকল সাহিত্যিক ও শিল্পীই যোগদান করতেন। শরৎচন্দ্রও সেই আসরে যেতেন।

ঘরের মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপর বিচিত্রার আসর বসত। তাই সকলেই ঘরের বাইরে জুতো খুলে ফরাসে এসে বসতেন।

সভাভঙ্গের পর প্রত্যেকবারই খবর পাওয়া যেত, কারও না কারও জুতো হারিয়েছে। এইভাবে প্রতিবারেই দু-একজনের করে জুতো হারাতে থাকলে, সকলেই জুতো-সমস্যায় পড়লেন।

কবি সত্যেন দত্ত তো ছেঁড়া জুতোই পায়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

সেদিন বিচিত্রার অধিবেশনে শরৎচন্দ্রও এসেছেন। তিনি সেদিন তাঁর সখের নতুন জুতো জোড়াটি পায়ে দিয়ে এসেছেন। তিনি জুতো চুরির কথা শুনে, বারান্দার একদিকে গিয়ে হাতে যে কাগজটা ছিল, তাই দিয়ে জুতো জোড়াটি মুড়লেন। তারপর মোড়কটি হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে এবং অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের পাশে গিয়ে বসলেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু শরৎচন্দ্রের পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি ক্ষিতিমোহন বাবুর খবর নিয়ে, তাঁকে চুপে চুপে বললেন—আজ মনে অজুতো বল নিয়ে গুরুদেবের কথা শুনবো।

ক্ষিতিমোহনবাবু শরৎচন্দ্রের 'অজুতো'কে 'অযুত' শুনেছিলেন। তাই তিনি বললেন—হঠাৎ অযুত বল কেন?

ক্ষিতিমোহনবাবু কথাটা ধরতে পারেন নি দেখে, শরৎচন্দ্র ইঙ্গিতে হাতের মোড়কটি দেখিয়ে চুপে চুপে সভায় জুতো চুরির কথাটা বললেন।

ক্ষিতিমোহনবাবু এবার শরৎচন্দ্রের 'অঁজুতো বলে'র কথা বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন।

ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি

শরৎচন্দ্র তাঁর 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের শেষে লিখেছেন—

"(ষোড়শী) জীবানন্দের যে হাতটা স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—নৌকা প্রস্তুত, কোন মতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এই সকল কাজের বড় কাজটা সারা হয়।

শুনিয়া জীবানন্দ কহিল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল—যেখানে আমার দু'চোখ যাবে।

—কখন যেতে হবে?

—এখনই। সাহেব এসে পড়ার আগেই।

...জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।"

শরৎচন্দ্র তাঁর এই 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে 'ষোড়শী' নাটক লেখেন।

শরৎচন্দ্র ষোড়শী নাটকের শেষটাও দেনা-পাওনা উপন্যাসের শেষের মতই রাখেন।

এই 'ষোড়শী' নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর নাট্য মন্দিরে।

শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। এই শিশিরবাবুই সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেছিলেন।

ষোড়শী মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন আগের কথা।

শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে ষোড়শী নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে পড়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে একদিন গিয়ে তাঁকে বলেন—শরৎদা, নাটকের শেষটা একটু বদলাতে হবে। জীবানন্দকে মেরে ফেলতে হবে। তা না হ'লে নাটক জমবে না।

শরৎচন্দ্র বদলানোর কথা শুনেই বলে উঠলেন—কিচ্ছু বদলানো চলবে না।

উপসংহার কেন, একটা ডায়ালগ পর্যন্তও বদলাতে দেব না। আমার দেওয়া ডায়ালগ মানুষের মুখে কেন, কুকুরের মুখ দিয়ে বেরোলেও লোকে শুনবে।

শরৎচন্দ্রের এই কথায় শিশিরবাবুও উত্তেজিত হয়ে বললেন—না, শরৎদা তা নয়। ডায়ালগ যত ভালই হোক, ভাল অভিনয় করতে না পারলে, লোকে তা শুনবে না। ভাল অভিনেতা চাই। এই শিশির ভাদুড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন ডায়ালগ না বলে, যদি শুধু এ, বি, সি, ডি, বলেও যায়, তাহলেও লোকে মন দিয়ে শুনবে। যাক্‌গে, ডায়ালগের কথা নয়, কিন্তু উপসংহার বদলাতেই হবে। না হ'লে আমার দ্বারা হবে না।

শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, তোমাকে নিতে হবে না। আমি এ বই স্টার থিয়েটারকে দোব।

শিশিরবাবু বললেন—শরৎদা, আপনি যতই বলুন স্টার থিয়েটারকে দেবেন, কিন্তু আপনাকে আমি বলে যাচ্ছি—এই নাটক হাতে নিয়ে ছাতা বগলে করে একদিন আপনাকে আমার কাছে যেতেই হবে। যাক্‌, আমি চললাম।—এই বলে শিশিরবাবু চলে এলেন।

শরৎচন্দ্র কয়েকদিন পরে ষোড়শী নাটক নিয়ে স্টার থিয়েটারে গেলেন। স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ কোন কারণে তখন কিন্তু ঐ নাটকটি নিতে পারলেন না।

অগত্যা শরৎচন্দ্র নাটকটি নিয়ে নাট্য মন্দিরে শিশিরবাবুর কাছেই গেলেন। গিয়ে শিশিরবাবুকে ডেকে বললেন—শিশির, নাটকটা নিয়ে আমি এসেছি। তবে ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি।

শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রের এই কথায় হেসে শরৎচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

হাতদেখা

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্ররা তাঁদের বাড়ী থেকে 'বঙ্গবাণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেছিলেন। স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদবাবুই এই পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন।

এই বঙ্গবাণীতে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময় একদিন দুপুরের দিকে শরৎচন্দ্র হঠাৎ বঙ্গবাণী অফিসে এসে উপস্থিত হলেন।

বঙ্গবাণী অফিসে তখন রমাপ্রসাদবাবুর তৃতীয় ভ্রাতা উমাপ্রসাদবাবু এবং উমাপ্রসাদবাবুর এক বন্ধু, দুজনে মিলে হাত দেখার আলোচনা করছিলেন।

শরৎচন্দ্রও এসে তাঁদের এই আলোচনায় যোগ দিলেন।

এই সময় উমাপ্রসাদবাবু বললেন—তবে এক কাজ করা যাক্। নির্মলকে ডেকে পাঠাই। সে আমার এক বন্ধু, এই কাছেই থাকে। সে ভাল হাত দেখতে জানে। কোন্ এক সাধুর কাছে নাকি সে হাত দেখা শিখেছে।

উমাপ্রসাদবাবু তখনি একটি চিঠি লিখে বঙ্গবাণী অফিসের একজন কর্মচারীর হাতে দিয়ে নির্মলবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

কিছুক্ষণ পরেই নির্মলবাবু এসে, ঘরে উপস্থিত সকলের দিকে একবার তাকিয়ে উমাপ্রসাদবাবুকে বললেন—কি ব্যাপার, হঠাৎ এই দুপুরে ডেকে পাঠিয়েছ?

উমাপ্রসাদবাবু বুঝলেন, নির্মলবাবু শরৎচন্দ্রকে চেনেন না।

তখন তিনি নির্মলবাবুকে বললেন—তোমাকে একবার এই ভদ্রলোকের হাতটা দেখতে হবে। তাই তোমাকে এখনই ডাকা।

—এই জন্য। তা আমি কি তেমন হাত দেখতে জানি!

—যা জানো, তাই দেখ।

এবার শরৎচন্দ্র নির্মলবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটু মজা করবার জন্য গম্ভীর হয়ে বললেন—দেখ তো, একটা চাকরির জন্য খুব চেষ্টা করছি। সেই চাকরিটা হবে কিনা!

নির্মলবাবু বললেন—চাকরি? না, না, চাকরি নয়, ওসব কোন সম্ভাবনা নেই ; কিন্তু এই রেখাটা—

শুনে শরৎচন্দ্র দুঃখ প্রকাশের ভান করে বললেন—সে কি! চাকরির সম্ভাবনা নেই! ওটা হবে বলে যে খুব আশা করে আছি। না হ'লে, আমার চলবে কি করে?—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

উমাপ্রসাদবাবুও শরৎচন্দ্রের কথায় যোগ দিয়ে বললেন—নির্মল, ভুল করছ বোধ হয় তুমি। চাকরিটা পাওয়া তো প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। ভালো করে দেখ দিকি।

নির্মলবাবু তখনও একমনে দেখেন। একটু জোর দিয়েই বললেন—চাকরি এঁর হবে না। সে রেখা নেই। চাকরির যোগ বহুদিন আগে ছিল, সে হয়ে গেছে। এখন আর হবার নেই।

তারপর গম্ভীরভাবে শরৎচন্দ্রকে জানালেন—চাকরি না হলেও আপনার অভাব থাকার কথা তো নয়। কিন্তু, আপনার হাতের এই রেখাটা অতি অদ্ভুত! আপনি কিছু লেখেন-টেকেন নাকি?

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—বেশ বল্‌ছো তুমি! চাকরি হলে তবে তো কলম পিষবো। বলছো চাকরি নেই, তো লিখবো কোথা থেকে?

নির্মলবাবু বললেন—আপনার লেখা থেকেই টাকা পাবার কথা। শুধু অর্থ নয়, বিপুল যশও। আপনি সত্যিই লেখেন না? লিখুন না কেন! দেখবেন, আমার কথা সত্যি কি না। এই যে রেখাটা—অদ্ভুত,—এমন রেখা আমি কখনো দেখি নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের হাতে কি আছে জানি না।

এই সময় উমাপ্রসাদবাবু বললেন—আরে নির্মল, ইনিই তো শরৎবাবু। আগে তোমাকে বলি নি। না বলেই হাত দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।

এই কথা শুনেই নির্মলবাবু চমকে উঠে শরৎচন্দ্রের হাত ছেড়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সজল-চোখে বললেন—আমায় ক্ষমা করুন। আমি সব কি বলেছি। আপনাকে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয় নি।

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—আরে, তুমি তো বেশ ভালই হাত দেখতে জানো দেখছি। কোথা থেকে শিখলে এ সব। আমায় শিখিয়ে দেবে?

খেলেই আনন্দ

শরৎচন্দ্র কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একদিন বেড়াতে যান। গিয়ে কথায় কথায় যখন জানতে পারলেন যে, বসন্তবাবু দাবা খেলা জানেন এবং তাঁর বাড়ীতে দাবা খেলার সাজ-সরঞ্জাম আছে, তখন তিনি বসন্তবাবুর সঙ্গে এক হাত দাবা খেলায় বসে গেলেন।

খেলতে বসেই বসন্তবাবু শরৎচন্দ্রের একটা নৌকা মেরে দিলে, শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, ওটা আমার একটা ফুটো নৌকো ছিল। ভালই হ'ল।

একটু পরেই বসন্তবাবু আবার যখন একটা ঘোড়া জিতলেন, তখন শরৎচন্দ্র বললেন—ওটা একটা বেতো ঘোড়া ছিল। যাক্, আস্তাবল ফাঁকা হ'ল, বাঁচা গেল।

শরৎচন্দ্রের এই ধরণের কথা শুনে বসন্তবাবু হাসতে থাকেন।

খেলতে খেলতে বেলা হয়ে যাওয়ায়, বসন্তবাবু শরৎচন্দ্রকে কিছু খাওয়ার কথা বললেন। খাওয়ার কথা শুনেই শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি তো জানো যে, আমার খেলেই আনন্দ।

বসন্তবাবু এবার বললেন—না দাদা, আমি ঠিক জানি না। আপনি পরিষ্কার করে বলুন, 'খেলেই' বলতে আপনি কি বলতে চান। খেলা করে না খেয়ে।

শরৎচন্দ্র বললেন—দুয়েই।

—ঠিক আছে।—বলে বসন্তবাবু খেলা চালাতে লাগলেন এবং খাবারও আনালেন।

পাখা

শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ী সেই সবেমাত্র শেষ হয়েছে।

কলকাতায় বাড়ী হ'লে শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে সপরিবারে এসে কলকাতায় তখন বাস করছেন।

কলকাতায় এলে তাঁর কলকাতার বন্ধু ও ভক্তরা একরূপ প্রতিদিনই দলে দলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

শরৎচন্দ্রের কয়েকজন স্নেহভাজন বন্ধু তাঁরা প্রায় রোজই সন্ধ্যার সময় আসছেন।

তখন সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় তখন পাখা না থাকায় তাঁরা শরৎচন্দ্রকে প্রায়ই বলতেন—বাড়ী হ'ল, লাইট এল, কিন্তু পাখা আনছেন না কেন? বৈঠকখানায় কবে পাখা লাগাবেন বলুন?

শরৎচন্দ্র বন্ধুদের এই কথায় একরূপ নির্বিকার থাকতেন।

একদিন বন্ধুরা পাখার জন্য জোর তাগাদা দিলে, শরৎচন্দ্র মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—দেখ, পাখা সম্বন্ধে একটা কাজ করব স্থির করেছি।

সকলেই আশা ও উৎসাহ নিয়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুর নাম করে—যাঁকে উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই চিনতেন—বললেন—ঠিক করেছি, এ বছর গ্রীষ্মটা ওর মত পাখার দর করে করেই কাটিয়ে দেব।

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সকলেই হাসতে লাগলেন।

জানালা

শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় যে বাড়ী করেছিলেন, সেই বাড়ীর জানালা, কপাট সরবরাহ করেছিলেন, কলকাতার প্রখ্যাত কাঠের আসবাব-পত্র ব্যবসায়ী 'প্রবর্তক ফার্নিশার্স'। এই প্রতিষ্ঠানটি 'প্রবর্তক সংঘে'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠান।

প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় মশায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তাই শরৎচন্দ্র মতিবাবুদের প্রতিষ্ঠান থেকেই জানালা, কপাট আনিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তখন কলকাতায় নতুন বাড়ী করে, সেই বাড়ীতে সপরিবারে বাস করছেন।

সেই সময় শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে একদিন রবিবার সকালে কলকাতার কয়েকটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক নিজ নিজ কাগজের পূজা সংখ্যার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে লেখা চাইতে আসেন।

শরৎচন্দ্র তাঁদের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা বলছিলেন।

এমন সময় আকাশে মেঘের ফলে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার দেখালে শরৎচন্দ্র একজন সম্পাদককে একদিকের একটা বন্ধ জানালা খুলে দিতে বললেন।

যিনি জানালা খুলতে গেলেন, তিনি জোরে টেনেও জানালা খুলতে পারলেন না। বর্ষার জলে ভিজেই হোক্ বা নতুন রং করার ফলেই হোক্, জানালার পাল্লাটা শক্ত হয়ে আট্‌কে ছিল।

এই দেখে শরৎচন্দ্র বললেন—ওহে, আরও জোর দাও, তবে খুলবে। এ হচ্ছে 'প্রবঞ্চক সংঘে'র জানালা।

টিকি

শরৎচন্দ্র কলকাতায় বালীগঞ্জে বাড়ী করে, তখন সপরিবারে কলকাতায় বাস করছেন।

সেই সময় তিনি একদিন নিজের মোটরে করে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলেন।

বন্ধুর এক পুত্র এবং এই বন্ধুপুত্রটির আর এক বন্ধু, এঁরা এসে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন।

পথে ট্রাফিকের ভীড়ে এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্র তখন গাড়ীর একপাশে হেলান দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব এনে হঠাৎ বলে উঠলেন—একি ব্যাপার!

শরৎচন্দ্রের গাড়ীর সঙ্গীরা সকলেই কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

শরৎচন্দ্র তেমনি বিস্মিতভাবেই কয়েকটি পথচারীর মাথার পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন—ওরা হঠাৎ টিকি অত ছোট করে ফেলেছে কেন বলো তো?

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা হেসে বললেন—কি জানি।

শরৎচন্দ্র বললেন—টিকির ভিতর দিয়ে মগজে যে ইলেকট্রিসিটি পাস করে না, এটা বোধ করি এতদিন পরে বুঝতে পেরে এখন উইথ্ ভেন্‌জেন্স ওর ওপর কাঁচি চালিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে গাড়ীর মধ্যে সকলেই হেসে উঠলেন।

মুদিখানা

শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়ীতে তখন প্রতি সপ্তাহেই 'রসচক্রে'র বৈঠক বসছে।

শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীর কাছেই ছিল সতীশবাবুর বাড়ী। তাই শরৎচন্দ্র রসচক্রের বৈঠকে প্রায়ই যোগ দিতেন।

শরৎচন্দ্র একদিন রসচক্রের বৈঠকে গেলে একজন নতুন সভ্য হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলেন—আপনি কেন এবং কিভাবে সাহিত্য করতে নামলেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—সে শুনে কি হবে?

—জানতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।

—শুনবে, তবে শোন,—বলেই শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বলে গেলেন—রেঙ্গুনে থাকার সময় শুধু চাকরিতে কুলোচ্ছিল না বলে, ঐ সঙ্গে আরও কিছু একটা করা ঠিক করি। প্রথমে আমি ঠিক করেছিলাম, একটা মুদিখানা দোকান করব। কিন্তু আমার স্ত্রী বললেন, আমার দ্বারা নাকি দোকান হবে না। তিনি আমাকে পরখ করবার জন্য কত টাকা করে মণ হ'লে কত জিনিসের যেন একটা দাম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলতে পারলাম না। তাই আর দোকান হ'ল না। তখন আর কি করি, অবশেষে বাধ্য হয়ে সাহিত্য করতেই নামলাম।

শরৎচন্দ্রের এই উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্য সকলে কিন্তু তখন হাসছেন।

একটু মজা

কলকাতায় বাড়ী করে শরৎচন্দ্র তখন কলকাতাতেই বাস করছেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ীর অদূরে কানাইবাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। কানাইবাবু কোন এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের কাছে যেতেন। শরৎচন্দ্রও তাঁকে বেশ স্নেহ করতেন।

এই কলকাতায় থাকার সময় শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই কবি নরেন্দ্র দেবের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। কানাইবাবু, নরেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী কবি রাধারাণী দেবীর সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলে, শরৎচন্দ্র একদিন কানাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নরেনবাবুদের বাড়ীতে যান।

শরৎচন্দ্র কবি-দম্পতির সঙ্গে কানাইবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসঙ্গ উঠল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসঙ্গ উঠলে কবি-দম্পতি তো রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এত উচ্চ প্রশংসা শুনে কানাইবাবু কিন্তু কিছু কিছু বাধা দিতে লাগলেন।

তিনি বললেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নিম্নবিত্ত ও শোষিত জনগণের চিত্র তেমন কই ? তাঁর মত অতবড় একজন বিশ্বকবির কাব্যে এদের চিত্র তুলনায় কোথায় ?

এই সময় শরৎচন্দ্র কানাইবাবুকে সমর্থন করতে থাকায় তিনি তো আরও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন।

এদিকে কবি-দম্পতিও কানাইবাবুর যুক্তির অসারতা প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

যাই হোক্, সেদিন এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা তর্কাতর্কির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নরেনবাবুদের বাড়ী থেকে ফেরার পথে শরৎচন্দ্র কানাইবাবুকে বললেন—

দেখ কানাই, তুমি একটা কাজ বড় ভুল করে ফেললে! আর আমারও তখন অত খেয়াল ছিল না।

—কি ভুল করেছি দাদা?

—আরে নরেন আর রাধু ওরা যে রবি ঠাকুরের গোঁড়া ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ ওদের গুরুদেব। ওদের গুরুদেবের বিরুদ্ধে অমন করে বলে এলে! ওরা কি আজ আর ঘুমোতে পারবে, না আজ আর কিছু খাবে।

—তা তো জানতাম না! তাহলে কি হবে দাদা?

—এখন আর কি করবে? এখনি ফিরে যাওয়াটাও তোমার পক্ষে কেমন দেখাবে! তার চেয়ে কাল সকালে গিয়ে আবার রবীন্দ্রনাথের খানিকটা প্রশংসা করে বরং ওদের খুশী করে এসো। আর তেমন যদি বোঝ তো একটু ক্ষমা-টমা চেয়ো।

পরের দিন সকালেই কানাইবাবু নরেন দেবের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং গত রাত্রির আলোচনার কথা উল্লেখ করে নরেনবাবু ও রাধারাণী দেবীর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

বললেন—আমার কথায় আপনারা যে এতখানি আঘাত পাবেন তা আমি জানতাম না।

—আঘাত আর কি? আপনি যেমন বুঝেছেন, তেমন বলেছেন। তাতে আর মনে করবার কি আছে?

—শরৎদা বলছিলেন, সারা রাত হয়ত আপনারা···

—ও! এবার বুঝেছি, শরৎদাই বুঝি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ, কাল ফেরার পথে তিনি বললেন—তুমি রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে অমন করে বলে এলে, রবীন্দ্রনাথ যে ওদের গুরুদেব। ওরা আজ আর খাবে না, সারারাত ঘুমোতেও পারবে না।

নরেনবাবু বললেন—এই জন্যই বুঝি আপনি ছুটে এসেছেন? শরৎদা আপনাকে নিয়ে একটু মজা করেছেন। তাই আমাদের কাছে আপনাকে আবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সব শুনে কানাইবাবু বললেন—তাই নাকি! শরৎদার এ রকম মজা করার স্বভাব আছে, তা তো জানতাম না!

বই উৎসর্গ

১৩৭১ সালে কলকাতার 'ছ'য়ের পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব' কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় সাগরময় ঘোষের 'সম্পাদকের বৈঠকে' নামে একটি লেখা ছিল। সাগরময়বাবুর এই লেখাটি তাঁর 'সম্পাদকের বৈঠকে' নামক বইয়েও কিছুটা বিস্তৃতভাবে আছে। সাগরময়বাবুর পত্রিকার সেই লেখাটি এই :—

"আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি তা নিছক গল্পই, বাঙ্গলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল চরিত্রকে নিয়ে। একজন জলধরদা, সম্পাদক জলধর সেন। অপরজন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র জলধরদাকে নিয়ে একবার মারাত্মক রসিকতা করেছিলেন, যার ফলে বেশ কিছুকাল দুজনের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গল্প বলার আগে গল্পের ভূমিকাটি বলে নিই। বর্মণ স্ট্রীটে 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরটি ছিল একেবারে নিরিবিলি জায়গায়। নিত্য শনিবার সমবেত সাহিত্যিক বন্ধুরা সমবেত হতেন। জোড়া দেওয়া টেবিলের উপর খবরের কাগজ পেতে সের খানেক মুড়ি ঢেলে নারকেল-বাতাসা-ছোলা-চিনেবাদাম সহযোগে আড্ডা বসতো। গল্পটা শুনেছিলাম সেই বৈঠকের এক গাল্পিক সাহিত্যিকের মুখে। আমি শুধু পুনরাবৃত্তি করছি।

একদিন দুপুরে জলধরদা বিষণ্নমুখে 'ভারতবর্ষ' অফিসে চুপচাপ বসে আছেন। টেবিলের উপর তাঁর সদ্য লেখা উপন্যাস 'উৎস'র ছাপা ফর্মার উপর সকরুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ। এমন সময় শরৎচন্দ্র নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই জলধরদার এমন মুষড়ে পড়া চেহারা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সভয়ে অথচ স্বভাবগত ফক্কড়ি করে জিজ্ঞাসা করলেন—একি জলধরদা! কেন আজি হেরি তব মলিন বদন? কিবা প্রয়োজনে আগিয়াছ—

রাগতস্বরে জলধরদা বললেন—দেখ শরৎ, সব সময় তোমার এই ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়। তোমায় ডেকে

পাঠিয়েছিলাম কোথায় আমাকে একটা সৎপরামর্শ দেবে, তা নয় ঘরে ঢুকেই থ্যাটারি শুরু করে দিলে!

জলধরদার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় অনেক দিনের। যেদিন থেকে জলধরদা 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদনার ভার নিলেন, সেদিন থেকে শরৎচন্দ্র এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক। লেখক-সম্পাদক পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে এতদিনে মধুর ইয়ার্কির সম্পর্কে এসে দাঁড়িয়েছে। জলধরদাকে শরৎচন্দ্র বরাবরই অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন। শুধু বয়ঃজ্যেষ্ঠ বলেই নয়, সাহিত্যিক জলধর সেন শরৎচন্দ্রের অগ্রণী। তাছাড়া এই আত্মভোলা মানুষটির চারিত্রিক মাধুর্য সব সময়েই শরৎচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছে। শরৎচন্দ্র অনুমান করলেন নিশ্চয় সদ্যছাপা উপন্যাস নিয়েই জলধরদার এই দুশ্চিন্তা। ওঁর চোখের দৃষ্টিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ যেন অরক্ষণীয়া কন্যার প্রতি পিতার ব্যাথাতুর দৃষ্টি।

জলধরদা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—জানো শরৎ, এইটিই আমার শেষ উপন্যাস। আমার যা-কিছু সঞ্চয় ছিল সেই টাকা দিয়েই উপন্যাসটি ছাপলাম। এখনও প্রেসকে কিছু টাকা দেওয়া বাকি, কিন্তু বাইণ্ডার বলছে কিছু টাকা আগাম না পেলে ছাপাখানা থেকে আর ফর্মা ও ডেলিভারি নেবে না। এখন কি করি বলতো?

শরৎচন্দ্র অবাক! এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের সামান্য সঞ্চয় এভাবে নিঃশেষ করলেন!

জলধরদা বলেই চললেন—তুমি ভাবছ নিজে খরচ করে কেন এ-বই ছাপলাম। কিন্তু এছাড়া উপায় কি ছিল! প্রকাশকরা আমার বই নিতে চায় না, বলে কি না আমার বইয়ের বিক্রি নেই। আমার আগে যে-সব বই প্রকাশকদের কাছে আছে, তার বাবদ কি পাওনা হয়েছে, তার কোন হিসেব পত্তর নেই। অন্ততঃ অধিকাংশের কাছে হিসেব চাইতে গিয়ে 'আমার বই বিক্রি হয় না', এই কথা শুনে লজ্জায় ফিরে এসেছি। তাই ভাবলাম, আমার জীবনের এই শেষ উপন্যাস আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে নিজের খরচেই প্রকাশ করব। কিন্তু এখন দেখছি, তরী তীরের কাছে এসেই বুঝি ডোবে ডোবে।

—এই জন্য আপনার এত দুশ্চিন্তা? কিছু ভাববেন না। আমি আপনাকে সোজা উপায় বাৎলে দিচ্ছি।—কথাটা শরৎচন্দ্র বললেন একটু

জোরের সঙ্গেই, যাতে জলধরদার মনের বোঝা নিমেষেই নেমে যায়। সত্যি সত্যি হ'লও তাই। ক্ষীণ আশার আলোক সঞ্চারে জলধরদার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

টেবিলের উপর থেকে উপন্যাসের ছাপা ফর্মাগুলি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শরৎচন্দ্র বললেন—টাইটেল পেজ তো ছাপা হয় নি দেখছি। বইটা উৎসর্গ কাকে করবেন কিছু ভেবেছেন কি?

জলধরদার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বললেন—ঠিক করেছি বইটা আমার প্রথমা পত্নীকেই উৎসর্গ করব—তিনি ছিলেন আমার প্রথম যৌবনের সাহিত্য প্রেরণার উৎস।

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকে বললেন—প্রথমা পত্নীকে আপনি যে প্রাণাধিক ভালবাসতেন, এই বৃদ্ধ বয়সে সে-কথা দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে আর লাভ কি! তাছাড়া তিনিও তো আর স্বর্গ থেকে নেমে এসে আপনার বই প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতে পারছেন না। এ-ক্ষেত্রে যাকে উৎসর্গ করলে কাজ হবে, তার কথাই ভাবুন।

এতক্ষণে জলধরদা যেন একটু আশার আলো দেখলেন। বললেন—তুমিই বল না কাকে উৎসর্গ করা যায়।

—কেন, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় তো আছেন। একেবারে সাক্ষাৎ গৌরী সেন। তাঁর নামে উৎসর্গ করে সশরীরে বইটা তাঁর হাতে তুলে দিন, দু-চার হাজার তো নির্ঘাত এসে যাবে।

শিশুর মত একগাল সরল হাসি হেসে জলধরদা বললেন—এই জন্যই তো তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম শরৎ! তুমি ছাড়া এ সব বুদ্ধি আর কার মাথায় খুলত বল? তোমার পরামর্শ তো ভালই বোধ করছি, তবু এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে শরৎদা বলে উঠলেন—সে কথা আমিও যে ভাবি নি তা মনে করবেন না। উৎসর্গ করা সত্ত্বেও যদি টাকাটা না পান তাহলে এ-কূল ও-কূল দুকূল যাবে। এই তো আপনার আশঙ্কা?

—ঠিকই বলেছ। জাতও দেব, পেটও ভরবে না, এ রকমটা যেন না হয়।

শরৎচন্দ্র বললেন—তাহলে এক কাজ করুন। উৎসর্গ পত্রটি এখন আর ছেপে কাজ নেই। ঐ পাতাটা কম্পোজ করিয়ে ভাল করে একটা প্রুফ টানিয়ে

ছাপা ফর্মার সঙ্গে জুড়ে দিলেই হবে। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে দু-চার দিনের মধ্যেই লালগোলায় চলে যান। যাবার আগে একটা চিঠি দিয়ে আপনার যাবার কারণটা না জানিয়ে শুধু খবরটা জানিয়ে রাখবেন।

শরৎচন্দ্র তো মোক্ষম পরামর্শ দিয়ে চলে এলেন।

তিন-চারদিন পর জলধরদা শিয়ালদায় দুপুরের লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে বসলেন। সন্ধ্যার সময় স্টেশনে লালগোলার সরকার মশাই এসে উপস্থিত। যথারীতি সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তিনি জলধরদাকে নিয়ে গেলেন রাজবাড়ীতে। শুভ কাজটা সর্বাগ্রে সেরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল জলধরদার ইচ্ছে। কিন্তু সরকার মশাই জলধরদাকে নিয়ে তুললেন অতিথি-শালায়। জলযোগের ভূরি আয়োজন ছিল। কিন্তু জলধরদা রাজ-সন্দর্শনের জন্য অস্থির। তিনি প্রশ্ন করলেন—রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ হতে পারে?

সরকার মশাই বিনয়ের অবতার। করজোড়ে নিবেদন করলে—পথশ্রমে আজ আপনি ক্লান্ত, জলযোগাদি সেরে বিশ্রাম করুন। আপনার সেবার যাতে কোন রকম ত্রুটি না হয়, সে কথা বার বার করে আমাকে বলে দিয়েছেন। আর বলেছেন, রাত্রে আহারের সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ততক্ষণ নদীর ধারটা একবার আপনাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসতে বলেছেন, অবশ্য শারীরিক ক্লেশ যদি বোধ না করেন।

জলধরদা বললেন—বিলক্ষণ। লালগোলায় আমি আগে কখনও আসিনি। দেশটা ভাল করে দেখে যাওয়াই তো আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এ-দেশের মহানুভব রাজার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা।

সরকার মশাই দু-হাত কচ্‌লে বললেন—সে তো নিশ্চয়, রাজাও আপনার মত দেশবরেণ্য সাহিত্যিকের দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। তাছাড়া তিনি জানতে চেয়েছেন, রাত্রে আপনার আহারাদির কি রকম ব্যবস্থা করা হবে।

জলধরদা বললেন—জলযোগের যা বিরাট আয়োজন করেছেন, রাত্রে আর কিছু খেতে পারব বলে তো মনেই হয় না। তাছাড়া রাত্রে আমি খাই যৎসামান্যই। বিশেষ কিছু করবেন না, দেখতেই তো পাচ্ছেন বয়স হয়েছে,

তাই রাত্রির খাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছি। নইলে ঘুম হয় না, হজমেরও কষ্ট হয়।

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে জলধরদা বললেন—আজ আর বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই, শরীরটা খুবই ক্লান্ত। আপনি বরং রাত্রে খাবার সময় আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন।

সরকার মশাইকে বিদায় দিয়ে জলধরদা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবনা আর কিছুই নয়, রাত্রে রাজার সঙ্গে দেখা হলে কথাটা কিভাবে পাড়বেন, মনে মনে তারই রিহার্সল দেওয়া।

যথা সময়ে সরকার মশাই এসে জানালেন খাবার সময় হয়েছে—রাজা অপেক্ষা করছেন। জলধরদার সেই রাজকীয় পোষাক। গলাবন্ধ কোট আর কাঁধের উপর ভাঁজ করা চাদর। চাদরের আড়ালে বগলের নীচে কাগজে মোড়া বইয়ের বাণ্ডিলটা নিতে ভোলেন নি।

ঝাড় লণ্ঠন আলোকিত রাজবাড়ীর প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ পার হয়ে 'ডাইনিং রুমে' ঢুকে দেখেন, একটা লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে সৌম্যদর্শন রাজা তাঁরই অপেক্ষায় বসে আছেন। চেয়ার থেকে উঠে স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে টেবিলের অপর প্রান্তে বসবার জন্য আহ্বান জানিয়েই ভোজ্যবস্তু পরিবেশনের জন্য সরকার মশাইকে আদেশ জানালেন। তারপর বললেন—কাল সকালে ওঁকে একবার নদীর ধার এবং তার পাশের গ্রামগুলি বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন।

জলধরদা খেতে খেতে বললেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না, গ্রাম দেখতেই তো আমার আসা। শৈশব, কৈশোর আমার গ্রামেই কেটেছে, তাই গ্রামের টান আমার প্রাণের টান।

আহারান্তে লালগোলাধিপতি বিদায় চেয়ে জানালেন, পরদিন সকালে যেন জলধরদা তাঁর সঙ্গে চা-পান করেন।

প্রয়োজনের কথাটা বলতে গিয়েও সঙ্কোচবশতঃ বলা হয়ে উঠল না, সুযোগই বা পেলেন কোথায়। আহারান্তে বিষণ্ণচিত্তেই শয্যা গ্রহণ করলেন। রাত আর কাটে না। কখন সকাল হবে, জলধরদা তারই প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছেন।

অবশেষে দুঃখের রাত্রির অবসান হ'ল। সরকার মশাই এসে ডেকে নিয়ে

গেলেন চায়ের আসরে। জলধরদার সেই এক বেশ। গলাবন্ধ কোট, কাঁধে চাদর, বগলের তলায় উপন্যাসের বাণ্ডিল।

লালগোলার রাজা তাঁরই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি তো?

—কিছুমাত্র না।—এ কথা বলেই আর কালক্ষেপ না করে বগলের তলা থেকে বাণ্ডিলটা বার করে রাজার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—আমি তো যেতেই বসেছি, এই আমার শেষ কাজ। আপনার নামেই—

—আহা-হা-হা-হা, সে পরে হবে। এখন চা খান।—শশব্যস্ত হয়ে জলধরদার কথার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লালগোলারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ।

সরকার মশাইকে বললেন গ্রামটা একবার ঘুরিয়ে দেখাতে এবং সেই সঙ্গে বললেন—জলধরবাবু দুপুরে এবং রাত্রে কি কি খেতে ভালবাসেন সব তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেই রকম ব্যবস্থা করবেন।—আচ্ছা জলধরবাবু, আমি তাহলে এখন উঠি। দুপুরে খাবার সময় আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

বইয়ের বাণ্ডিলটা চাদরের তলায় ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে জলধরদা হতাশ কণ্ঠে বললেন—তাই চলুন সরকার মশাই, গ্রামটা তাহলে ঘুরে দেখে আসি।

গ্রাম প্রদক্ষিণ করে দুপুরে খাবার সময় যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা। এবার মরিয়া হয়ে জলধরদা চাদরের তলা থেকে বইটা বার করেই একেবারে উৎসর্গের পাতাটা খুলে ধরে বলে উঠলেন—আমি তো যেতেই বসেছি—

জলধরদাকে থামিয়ে দিয়ে যোগেন্দ্রনারায়ণ বললেন—আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আহারাদি করে বিশ্রাম করুন। আপনি যখন আজ বিকালে চলে যাবেন স্থির করেছেন, সরকারকে বলে দিয়েছি সে নিজে গিয়ে আপনাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে। আপনি ওর জন্য কিছু ভাববেন না।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন জলধরদা। আশার আলোক যেন একটু দেখতে পেলেন। অতবড় মানুষ অথচ কি লজ্জা, কি বিনয়। একেবারে হাতে হাতে দিতে সংকোচ বোধ করছেন বলেই বোধ হয় সরকারের হাতে স্টেশনেই পাঠিয়ে দেবেন।

যথাসময়ে জলধরদা স্টেশনে এসে ঘন ঘন পায়চারি করছেন। ট্রেন আসতে তখনও মিনিট দশ দেরি। সরকার মশাই নীরবে একপাশে দাঁড়িয়ে।

একটু রূঢ় কর্কশস্বরেই জলধরদা সরকার মশাইকে বললেন—রাজা কি সত্যিই কিছু আপনার হাতে দিয়ে পাঠান নি ? কোন চেক্ বা চিঠিপত্র ?

—কই না। কিছুই তো দেন নি।

—আমার কথা আপনার কাছে কিছু কি বলেছেন ?—উৎকণ্ঠিত চিত্তে জলধরদা জিজ্ঞাসা করলেন।

—আপনার কোনরকম অসুবিধা হয়েছে কিনা তাই শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর তো কিছুই বলেন নি।

ট্রেন ততক্ষণে এসে গিয়েছে। ট্রেনের কামরায় বসেও জলধরদার স্বস্তি নেই। বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন, আর সরকার মশাইকে বলছেন—দেখুন তো রাজবাড়ী থেকে কোন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে কিনা।

সরকার মশাই ভাল করে নিরীক্ষণ করে জানালেন, কোন লোককেই এদিকে ছুটে আসতে দেখছেন না।

ট্রেন ছাড়ার হুইসিল বেজে উঠল।

এমন সময় দূরে দেখা গেল, একজন লোক সাইকেল চালিয়ে স্টেশনের দিকে আসছে। আর যায় কোথা। জলধরদা চীৎকার করে বলে উঠলেন—সরকার মশাই, গার্ডকে শিগ্‌গির বলুন যেন গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে না দেয়। রাজবাড়ী থেকে আমার কাছে লোক আসছে। আপনি ছুটে গার্ডের কাছে চলে যান।

সাইকেল চালক ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। সরকার মশাই পরামাণিককে দেখেই চিনলেন। স্টেশন মাস্টারের দাড়ি কামাবার জন্য আসছে। জলধরদাকে সে কথা জানাতেই তিনি দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে এবং ক্রোধে ফেটে পড়লেন—পরামাণিক কি আর সোনামাণিক হতে পারত না ? ইচ্ছে করলেই পারত। ইচ্ছে না থাকলে আর কোত্থেকে হবে। বুঝলেন সরকার মশাই, এই শরৎই যত নষ্টের মূল। সে-ই আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিল। কলকাতায় ফিরেই ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

সরকার মশাই জলধরদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানা ট্যাক্সি নিয়ে জলধরদা সোজা গিয়ে হাজির হলেন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে। ট্যাক্সি থেকে নামা নয়, ভিতরে বসেই খবর পাঠালেন।

—কি হ'ল জলধরদা, কি হ'ল ?—বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে শরৎচন্দ্র বেরিয়ে এলেন।

শরৎচন্দ্র বেরিয়ে আসতেই জলধরদা গর্জন করে উঠলেন—হবে আবার কি ? কিছুই হ'ল না, মাঝখান থেকে তোমার কথায় বেল্লিক বনে এলাম। লালগোলা যাওয়া আসার পরিশ্রমই সার হ'ল।

শরৎদা বিস্মিত কণ্ঠে চোখ বড় বড় করে বললেন—সে কি! কিছু দিলেন না ?

—না, কিছুই না।

গম্ভীর গলায় দৃঢ়তা এনে শরৎদা বললেন—মামলা ঠুকে দিন।

—মামলা !—জলধরদা তো অবাক।

বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের ঘুসি ঠুকে শরৎদা বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ মামলা। প্রিসিডেন্স আছে। এর আগে অনেক লেখকই বই উৎসর্গ করে ওঁর কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। আপনিই বা পাবেন না কেন ?

রোষকষায়িত চক্ষে শরৎচন্দ্রের দিকে জলধরদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাবিয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। জলদ গম্ভীর কণ্ঠে জলধরদা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন—ড্রাইভার, যেখান থেকে এসেছিলাম, সেখানেই ফিরে চল।

এই ঘটনার পর বহুদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জলধরদার বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার ভাব হয়েছিল জলধরদার এক সম্বর্ধনা উপলক্ষে আহূত এক সভায়।"

'দেশ' পত্রিকা অফিসে 'গাল্পিক সাহিত্যিকের' বলা এই গল্পটির মধ্যে সামান্য ভুল আছে। যেমন—(১) কলকাতা থেকে ট্যাক্সি করে রূপনারায়ণ নদের তীরে শরচন্দ্রের সামতাবেড়ের গ্রামের বাড়ী পর্যন্ত যাওয়া যায় না। (২) জলধর সেনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কখনই কোন উপলক্ষ নিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ হয় নি।

যাই হোক্, সাগরময়বাবুর 'গাল্পিক সাহিত্যিক' বন্ধুর বলা এই গল্পটি সত্য বলেই মনে হয়। কারণ শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে আমিও এই কাহিনীটি শুনেছি।

জলধর-সম্বর্ধনা

১৩৩১ সালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, সাহিত্যিক জলধর সেনের ৭৫তম জন্মতিথিতে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।

জলধর-সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র নিজে এবং সম্পাদক ছিলেন হাওড়ার ব্রজমোহন দাশ।

ঐ সময় শরৎচন্দ্র ব্রজমোহনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নিজে গিয়ে জলধর-সম্বর্ধনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি স্থির করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর নির্দেশে ইউনিভার্সিটির আশুতোষ হলে তখন ঐ জলধর-সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল।

এই উপলক্ষে ঐ সময় বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখক লেখিকাদের রচনা নিয়ে 'জলধর-কথা' নামে একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তক সম্পাদনার ভার পড়েছিল ব্রজমোহন দাসের উপর। এ কাজে কয়েকজন অবশ্য ব্রজ-মোহনবাবুর সাহায্যকারী ছিলেন।

'জলধর-কথা' গ্রন্থের লেখা সংগ্রহের সময় শরৎচন্দ্রের একটি লেখার জন্য ব্রজমোহনবাবু একদিন তাঁর অন্যতম সহকারী সারদারঞ্জন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গেলেন।

শরৎচন্দ্র তখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

ব্রজমোহনবাবু ও সারদাবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে তাঁদের আবেদন পেশ করলে, শরৎচন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—কার কথা বলছ তোমরা? জলধরদার কথা? তিনি তো মারা গেছেন!

ব্রজমোহনবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—আমরা কাল রাত্রে যে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলাম। রাত্রি প্রায় ন'টা পর্যন্ত ছিলাম!

—তোমরা চলে আসার পরেই দাদার শরীরটা কেমন করতে থাকে।

তারপর ভোরের দিকে হার্টফেল করে মারা যান। দাদা ব্লাড প্রেসারের রোগী ছিলেন, আর বয়সও তো হয়েছিল অনেক।

—তা আমরা তো কিছুই শুনি নি। আপনি এরই মধ্যে এখানে কি করে খবর পেলেন?

—দাদার বাড়ী থেকে আজ সকালে আমার এখানে টেলিগ্রাম করেছিল। শরীরটা ভাল নয়, তাই যেতে পারলাম না। না হ'লে দাদার মৃতদেহটাও একবার শেষ দেখার বড় ইচ্ছা ছিল।

জলধরবাবুর মৃত্যু সংবাদ শুনে ব্রজমোহনবাবু ও সারদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

এমন সময় ভৃত্য চা নিয়ে এলে শরৎচন্দ্র বললেন—নাও চা খাও। তোমাদের ভয় নেই আমি লেখা দেব।

—তবে যে বললেন, মারা গেছেন।

—না, না, মরেন নি। অমনি তোমাদের বলে দেখছিলাম, দেখি তোমরা কি বল!

ব্রজমোহনবাবু ও সারদাবাবু এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

মানপত্র

সাগরময়বাবু তাঁর 'সম্পাদকের বৈঠকে' বইয়ে শরৎচন্দ্রের আর একটি মারাত্মক রসিকতার গল্প বলেছেন। সে গল্পটি কলকাতার সদানন্দ রোডের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকা অফিসের বৈঠকে বলেছিলেন। সাগরময়বাবু লিখেছেন—

"রসচক্রের আড্ডায় তা-বড় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিশুদা (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়) প্রায়ই আমাদের বৈঠকে রসিয়ে গল্প জমাতেন। যেন এইমাত্র আড্ডা থেকে উঠে এসেছেন। বিশুদা বললেন—একদিন ঠিক হ'ল 'রসচক্রে'র তরফ থেকে কবি গিরিজাকুমার বসুকে মানপত্র দেওয়া হবে।……প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন শরৎবাবু নিজেই। আমরা কয়েকজন আপত্তি জানিয়ে বললাম—তা হয় না শরৎদা! কালীদা, যতীনদা, নরেনদা থাকতে আগেই গিরিজাদাকে দেওয়াটা একটু দৃষ্টিকটু হয় না কি?

আমাদের আপত্তি শরৎদা কানেই তুললেন না! শুধু বললেন—ওরা মানপত্রের জন্য ব্যস্ত নয়। তাছাড়া ওদের মানপত্র দেবে দেশবাসী। কিন্তু গিরিজার কথা স্বতন্ত্র। বেচারা সারা জীবন ধরে ওর বৌকে উপলক্ষ করে কয়েক হাজার প্রেমের কবিতা লিখল, অথচ তোমরা কেউ আমলই দিলে না। তাই ওর মনে একটা ক্ষোভ আছে!

এ কথার পর আর আপত্তি করা চলে না। সবাই মেনে নিলুম। বিশ্বপতি চৌধুরী মানপত্র দেবেন, পরামর্শটা শরৎবাবুই দিলেন।

…রবিবার বেলা নয়টার মধ্যে রসচক্রের সভ্যরা একে একে যতীন বাগচীর বাড়ীতে জমায়েত হয়েছেন। শরৎদাও যথাসময়ে উপস্থিত। কিন্তু মানপত্র আনার ভার যার উপরে, সেই বিশ্বপতি চৌধুরীর দেখা নেই।

এদিকে গিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী আর ধাক্কা-দেওয়া শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি পরে ষাট বছরের যুবা কবি গিরিজাকুমার বসু ঘর আলো করে বসে আছেন।

শরৎদা বললেন—মানপত্র যখন আসতে দেরি হচ্ছে, ততক্ষণে মালা-চন্দন ওকে পরিয়ে দাও।

দুটি মেয়ে এসে গোড়ে মালা আর শ্বেতচন্দন পরিয়ে দিতেই শরৎদা বললেন—হঁ্যা, এতক্ষণে গিরিজাকে বর-বর দেখাচ্ছে।

বিশুদার কথায় বাধা দিয়ে লেখক সব্যসাচী বলে উঠলেন—শরৎবাবু গিরিজাবাবুকে বর্বর বলে গাল দিলেন, আর গিরিজাবাবু তা বিনা প্রতিবাদে হজম করলেন।

বিশুদা বললেন—রসচক্রের সভ্যরা রসিকতা বুঝতেন। আপনার মত বেরসিক ছিলেন না। যাক্ যে কথা বলছিলাম। এদিকে বেলা বাড়ছে। বিশ্বপতিবাবুর দেখা নেই। সবাই ব্যস্ত আর উদ্‌গ্রীব, কখন বিশ্বপতিবাবু আসবেন। শরৎদা কিন্তু নির্বিকার। শুধু বললেন—বিশ্বপতির জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওর আসতে একটু দেরি হবেই।

…বিশ্বপতিবাবু এসে ট্যাক্সি থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নামলেন। হাতে খবরের কাগজে রোল করা একটা বিরাট জিনিস। অনুমান করলাম মানপত্রই হবে।

শরৎদা বললেন—কি হে বিশ্বপতি, এত দেরি করলে যে?

বিশ্বপতিবাবু বললেন—আপনি যে ধরণের মানপত্রের কথা বলেছিলেন, কলকাতার কোথাও খুঁজে পাই না। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে, আপনারা সবাই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাও বুঝতে পারছি। শেষ কালে খালি হাতে ফিরব? তাই মরিয়া হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম ধাপার মাঠে। তাই দেরি হয়ে গেল।

আমরা সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, আর ভাবছি, একটা মানপত্রের জন্য ধাপার মাঠ পর্যন্ত ছোটার কি সম্পর্ক!

শরৎদা বললেন—তাহলে আর অপেক্ষা করা নয়, বেলা অনেক হ'ল। ফটোগ্রাফারও সেই ন'টা থেকে বসে আছে ফটো তুলবার জন্য। বিশ্বপতি, মানপত্রটা তুমিই গিরিজার হাতে তুলে দাও।

বিশ্বপতিবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন—আপনি উপস্থিত থাকতে আমি দেব?

শরৎদা বললেন—একই কথা। তাছাড়া রসচক্রের তরফ থেকে তোমাকেই তো এ ভার দেওয়া হয়েছে।

গিরিজাকুমার বসু গলায় মালা দিয়ে বসে আছেন, আর প্রবল উত্তেজনায় শীতকালেই কপালে কালো কালো ঘাম দেখা দিয়েছে। বিশ্বপতিবাবু গিরিজাবাবুর সামনে জোড়হস্তে নিবেদনের ভঙ্গীতে খবরের কাগজে মোড়া সুতো দিয়ে বাঁধা মানপত্রটি রাখলেন।

শরৎদা বললেন—ওহে বিশ্বপতি, কাগজের মোড়কটা খুলে ওর হাতে তুলে দাও।

একটু ইতস্ততঃ করে বিশ্বপতিবাবু কাগজের মোড়কটা খুলে ফেললেন। বেরিয়ে পড়ল দুহাত মাপের একটা মানকচুর পাতা।

গিরিজাবাবু এক লাফে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। গলার মালা ছিঁড়ে ফেললেন। শরৎবাবুর দিকে বিক্ষুব্ধ দৃষ্টি হেনে বললেন—বুঝতে পেরেছি শরৎদা! আমাকে নিয়ে এই যে ধ্যাষ্টামোটা হ'ল, তার মূলে রয়েছেন আপনি।

শরৎদা চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব এনে বললেন—আমি কি করে জান্‌ব! বিশ্বপতির উপর ভার ছিল মানপত্র আনবার, কথাটা ও রেখেছে।

—আপনার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আমি চললুম।

শরৎদা বললেন—তার আগে তোমার সঙ্গে অন্ততঃ ফটোগ্রাফটা তুলে রাখা যাক্। ফটোগ্রাফারকে তাই সকাল থেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

শরৎদার এই কথায় কাজ হ'ল। শরৎবাবুর ওপর যতই রাগ হোক না কেন, ওঁর সঙ্গে একটা ছবি তুলে রাখার লোভ কার না আছে। গিরিজাবাবু রাজি হতেই ওঁকে মাঝখানে রেখে সবাই মিলে ছবি তোলা হ'ল। গিরিজাবাবুর মাথার পিছনে অতি সন্তর্পণে যে মানকচুর পাতাটা তুলে ধরা হয়েছিল, গিরিজাবাবু তা জানতে পেরেও না জানার ভান করেছিলেন।

…কবি-পত্নী তমাললতা বসু গিরিজাবাবুর কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে হুকুম দিলেন—যত টাকা লাগে এক্ষুনি গিয়ে ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে নেগেটিভ্‌টা কিনে আনতে এবং গিরিজাবাবু তা করেও ছিলেন। পরে সে নেগেটিভ্‌টির আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

প্রশ্ন দেখা দিল, শরৎচন্দ্র গিরিজাবাবুকে নিয়ে এ রকম রসিকতা করলেন কেন?

বিশুদা বললেন—আমরা শরৎদাকে এই প্রশ্নই করেছিলাম।

শরৎদা বললেন—গিরিজা রোজ সকালে তাড়া তাড়া কবিতা এনে আমাকে শোনাতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সারা সকালটাই মাটি।"

রসচক্রের তরফ থেকে কবি গিরিজাকুমার বসুকে মানপত্র দেবার নাম করে মানকচুর পাতা দেওয়া হয়েছিল—এ কথাটা সত্য কিনা জানবার জন্য আমি একদিন রসচক্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবি কালিদাস রায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

উত্তরে কালিদাসবাবু বলেছিলেন—"রসচক্রের বৈঠকে মানপত্র দেওয়ার নাম করে মানকচুর পাতা একবার একজনকে দেওয়া হয়েছিল সত্য। তবে সেটা গিরিজা বসুকে নয়, ···সিংহকে (এই লোকটি আজও জীবিত আছেন বলে, কালিদাসবাবুর বলা নামটা আর উল্লেখ করলাম না)। ···সিংহ প্রায়ই কবিতা লিখে এনে রসচক্রের বৈঠকে পড়ত। সে নিজেকে একজন মস্ত বড় কবি বলে মনে করত। তাই তাকে জব্দ করবার জন্যই রসচক্রের অন্যতম সদস্য বিশ্বপতি চৌধুরী একদিন ঐ কাণ্ডটি করেছিল। শরৎদাও সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ···সিংহ ক্ষেপে গেলে, শরৎদা তাঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেন এবং তাঁকে নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলার প্রস্তাব করেন। শরৎদার সঙ্গে ফটো তোলার লোভে সে তার ক্ষোভ ভুলে যায় এবং ফটো তুলতে রাজি হয়। ফটো তোলার সময় আবার বিশ্বপতি ···সিংহের মাথার উপরে কৌশলে ঐ মানকচুর পাতাটা তুলে ধরেছিল।"

এই ঘটনাটি আমি রসচক্রের আর একজন সদস্যের কাছেও শুনেছি। তিনিও বলেছিলেন—···সিংহের কবিতায় বিরক্ত হয়ে বিশ্বপতিবাবু তাঁকে মানপত্রের নামে মানকচুর পাতা দিয়েছিলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে, 'দেশ' পত্রিকা অফিসের বৈঠকে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় একজনের কাহিনী আর একজনের নাম দিয়ে চালিয়ে ছিলেন।

যাই হোক্, তবে শরৎচন্দ্র যে গিরিজাকুমার বসুকে নিয়ে মজা করতেন, তারও অনেক প্রমাণ আছে।

শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট্ উপাধি নেবার জন্য যখন

ঢাকায় যান, তখন গিরিজাকুমার বসুও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে তাঁর বাল্যবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলেন। গিরিজাবাবুও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চারুবাবুর বাড়ীতে ছিলেন। ঐ সময় গিরিজাবাবুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের একটা মজা করার কাহিনী চারুবাবুর লেখা থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি। চারুবাবু লিখেছেন—

"...ঢাকায় আমার বাড়ীতে থাকিবার সময়ে শ্রীমান্ গিরিজাকুমার বসু আমার অতিথি ছিলেন। তাঁর একদিন দাড়ি কামাইবার প্রয়োজন হইল, অথচ তিনি নিজে দাড়ি কামাইতে জানেন না। অনেক অনুসন্ধানেও নাপিত পাওয়া গেল না। তখন শরৎ হাস্যমুখে বলিল—এস চারু, আমরাই এই ঘাস ক্ষেতটা নিড়িয়ে ফেলি। এঁঃ হতভাগা গাধা, এত বড় ধাড়ি হয়েছেন, অথচ দাড়ি কামাতে শেখেন নি। তখন গিরিজার দাড়ি কামানো পর্ব আরম্ভ হইল। শেষকালে আমাকে শরৎ বলিল—'চারু, তুমি গিরিজার এই কানটা টেনে ধরো তো, নইলে আমি আবার কেটে দেবো।' এই লইয়া যে আমরা সেদিন কত হাসিই হাসিয়াছিলাম, তাহার ইয়ত্তা নেই।" শরৎ-স্মৃতি—প্রবাসী—কার্তিক, ১৩৪৫।

গিরিজাবাবুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের একটা পরিহাস সাহিত্যিক মহলে প্রায় প্রবাদের মত হয়েই চলে আসছে। শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বন্ধুর কাছে এ গল্প বলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই পরিহাসের গল্পটি হ'ল—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজা বসুর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার গল্প।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি

১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাস। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিস। সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা বসে আলাপ-আলোচনা করছেন। কয়েকজন সাহিত্যিকও এসেছেন সেই বৈঠকে।

শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, সেইটি নিয়েই আলোচনা চলছে।

এমন সময় শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' অফিসে এলেন। আলোচনা খুব জমে উঠল।

একজন বললেন—শরৎদা, কবি তাঁর প্রবন্ধে যদিও কারও নাম করেন নি, তবুও যাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, আমার মনে হয় তাঁদের মধ্যে আপনিও একজন। এই লেখায় কবি যে সব অভিযোগ করেছেন, দেখেছেন তো? তিনি বলেছেন—সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটা বে-আব্রুতা এসেছে, সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ। ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে-আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে-আভিজাত্য আছে, রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান-মদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।

শুনে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন—কবি, ঐ বলে আমার কি ক্ষতি করবেন শুনি? আমি তাঁর যে ক্ষতি করে দিয়েছি, তার তুলনায় ও কিছুই নয়।

শরৎচন্দ্রের এই কথায় সকলেই খুব বিস্মিত হলেন। একজন প্রশ্ন করলেন—শরৎদা, আপনি গুরুদেবের ক্ষতি করেছেন?

—করেছিই তো।

—সে কি? কি ক্ষতিটা করলেন শুনি?

—সে আর তোমরা শুনে কি করবে?

—তবু শুনিই না।

—না, থাক।

সকলে মিলে খুব পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

তখন শরৎচন্দ্র বললেন—কি ক্ষতি করেছি শুনবে? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিজা বোসের আলাপ করিয়ে দিয়েছি।

—তাতে রবীন্দ্রনাথের ক্ষতি হতে যাবে কেন?

—ক্ষতি হবে না? সে তোমরা কি বুঝবে! যাঁর ক্ষতি হবে তিনিই টের পাবেন।

শরৎচন্দ্র এবার আরো গম্ভীর হয়ে বললেন—জানো তো গিরিজা কি রকম গল্পে লোক। তার ওপর আবার কবিতা লেখার ব্যারাম আছে। রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এখন থেকে সে দু'বেলা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবে। গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব তো জানই, নিজের শত অসুবিধা হলেও তিনি লোককে মুখের ওপর শক্ত কথা বলতে পারেন না। দেখা করতে গেলে তিনি দেখা না দিয়েও পারবেন না। গিরিজা এখন থেকে অনবরত যেতে থাকবে, তার ফল এই হবে যে, রবীন্দ্রনাথকে আর একটি লাইনও লিখতে হবে না।

শরৎচন্দ্র হাত নেড়ে এমনভাবে 'একটি লাইনও আর লিখতে হবে না' বললেন যে, উপস্থিত সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

শরৎচন্দ্র তেমনি গম্ভীরভাবেই বললেন—কেমন? কবি আমার যে ক্ষতি করেছেন, সে তুলনায় আমি তাঁর বেশী ক্ষতি করি নি?

চরিত্রহীন

শরৎচন্দ্রের জীবনের তখন শেষ দিক।

সেই সময় বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে আরও একজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই শরৎচন্দ্র 'গল্প-লহরী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'চাঁদমুখ', 'হীরের ফুল' নামে ক'খানা বইও লিখেছিলেন।

ঐ সময়েই একদিন বিকালে শরৎচন্দ্র তাঁর কলকাতার বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হেঁটে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় শরৎচন্দ্র পথে হঠাৎ তাঁর এক সাহিত্য-রসিক বাল্যবন্ধুকে দেখতে পেলেন।

বহুকাল পরে এই দেখা।

শরৎচন্দ্র বন্ধুটিকে দেখতে পেয়েই ডেকে বললেন—কি হে! চিনতে পারছ না? আমার নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধুটি শরৎচন্দ্রকে চিনতে পারলেও একটু মজা করবার জন্যই বললেন—আজকাল বাঙ্গলার আকাশে দুজন শরৎচন্দ্রের উদয় হয়েছে। আপনি তার মধ্যে কোন্ জন বলুন তো?

শরৎচন্দ্র বন্ধুটির পরিহাস বুঝলেন। তাই নিজেও সহাস্যে বললেন—'চরিত্রহীন'।

বন্ধুটিও শরৎচন্দ্রের কথা বুঝতে পেরে হাসতে লাগলেন।

বৈঠকী গল্প

গুরুদেবের জাহাজ ভক্ষণ

বহু বৎসর পরে সেবার শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গেছেন। তখন দিকে দিকে তাঁর প্রশস্তি ও বন্দনাগীতি। আর যখনই তিনি যেখানে যান, সেখানেই তাঁর দর্শনার্থীরও তেমনি সমাবেশ।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়ে মামার বাড়ীতেই উঠেছেন। পরিচিত অপরিচিত অনেকেই দেখা করতে এলেন।

দিন কয়েক পরে লোকের ভিড় একটু কমলে একদিন বিকালে বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

বনফুল বহুদিন থেকেই ভাগলপুর শহরে বাস করছেন। তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন তাঁর আগমন, তার অনেক আগেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই পরস্পরের মধ্যে কোন সাক্ষাতের সুযোগ হয় নি।

বনফুল এসে দেখেন, শরৎচন্দ্র বৈঠকখানায় একটা ইজিচেয়ারে বসে লোহার শিক দিয়ে গড়গড়ার নল পরিষ্কার করছেন।

বনফুল প্রণাম করে নিজের পরিচয় দিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে, এসো এসো! দেখ তো এতদিন পরে আজ কিনা তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হ'ল। তুমি যে এখানে থাক তা জানতাম না, জানলে আগেই ডেকে পাঠাতাম। তোমার অনেক লেখা আমি পড়েছি, পড়ে আনন্দও পেয়েছি যথেষ্ট।

বৈঠকখানায় ঢালা ফরাস। তার উপর বনফুল আসন গ্রহণ করে বললেন—আপনি আমার লেখা পড়েছেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য। কি আর এমন লিখি!

—না, না, এ তোমার বিনয়ের কথা ভাই। সত্যিই তুমি ভাল লেখ।

বনফুল বললেন—আমার কথা থাক দাদা। আপনি বরং আপনার কথা কিছু বলুন শুনি।

—নিজের কথা নিজে বলব, সেটা কি রকম শোনাবে! তার চেয়ে অন্য কিছু বরং বলতে বলো, বলছি।

—দাদা, আপনি খুব ভাল বৈঠকী গল্প বলতে পারেন শুনেছি, তাই একটা বলুন।

—কি গল্প তোমাকে শোনাই বলো তো! তুমি আবার সাহিত্যিক মানুষ। তা বেশ, তবে একটা সত্যি গল্পই শোনাই তোমাকে। আমাদের ছেলেবেলাকার গল্প। এই ভাগলপুরেই আদমপুরের গঙ্গার ঘাটে ঘটেছিল ব্যাপারটা।

শরৎচন্দ্র গল্প বলবেন শুনে ঐ ঘরে উপস্থিত অন্যান্য সকলে নিজেদের কথা বন্ধ করে এগিয়ে এলেন। একে শরৎচন্দ্রের মুখের গল্প, তার উপরে ঘটনা এই ভাগলপুরেরই, তাও আবার সত্যি ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের গড়গড়ার নল ততক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তামাক সেজে কলকে দিয়ে গেছে ভৃত্য। নলটি মুখে দিয়ে সুগন্ধ তামাক সেবন করতে করতে শরৎচন্দ্র গল্প শুরু করলেন—

আমরা তখন ছেলেমানুষ। স্কুলে পড়ি। সেই সময় একবার ভাগলপুরময় একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, আদমপুরের ঘাটে এক অত্যাশ্চর্য সাধু এসেছে। গেরুয়া কিম্বা জটাজুটের দিক থেকে আর পাঁচজন সাধুর মতো হলেও, এর গুণ আর শক্তি নাকি অসাধারণ। কদিনের মধ্যেই নাকি সে ভাগলপুরেরই কত লোকের কত দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছে। আর শুধু কি তাই! কত অদ্ভুত আজব কাণ্ডও নাকি দেখাচ্ছে। আমের সময় তখন নয়, অথচ কেউ হয়তো বললে—সাধুজী আমার একটা পাকা আম খাওয়ার বাসনা। সাধুজী অমনি তার ঝোলার মধ্যে হাত পুরে দিব্যি পাকা একটা আম তুলে আনলে। লোকে এই সব অলৌকিক কাণ্ড দেখে তো একেবারে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই শহরময় হৈচৈ পড়ে গেল। ফলে হ'ল কি জানো? সাধুকে শুধু দেখবার জন্যই আদমপুর ঘাটে রোজই লোকে লোকারণ্য। অনেকে একান্ত ভক্তও হয়ে পড়ল, কি সব দীক্ষাটিক্ষা দিয়ে তাদের শিষ্যও করে ফেললে।

একদিন সাধু তার শিষ্যদের বললে—হাম গঙ্গামায়ী কো পূজা দেগা।

ভক্তরা শুনে গদগদ।—সে আর কথা কি গুরুদেব! পূজার যা কিছু

নৈবেদ্য উপকরণ সবই আমরা কাল হাজির করব এখানে। আপনি পূজার ব্যবস্থা করুন।

পরদিন শিষ্যবৃন্দ গঙ্গামায়ের পূজার জন্য প্রচুর উপকরণ এনে হাজির করল আদমপুর ঘাটে। গঙ্গাতীরে বালুর উপর একেবারে জলের কাছ ঘেঁসে থরে থরে সব কিছু সাজানো হ'ল। পূজার সময় প্রায় হয় হয়। সাধু পূজায় বসবে —এমন সময় নিদারুণ এক কাণ্ড ঘটে গেল। কার্ কোম্পানীর বড় স্টীমার খানা তখন রোজই ঐরকম সময় আদমপুর ঘাট পাস করে যেত। জাহাজের যেমন ছিল গর্জন, তেমনি ঢেউও তুলত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। সেই ঢেউ এসে করল কি জানো, গঙ্গামায়িকীর পূজার নৈবেদ্য ফলমূল স—ব নিয়ে গেল ভাসিয়ে! শিষ্যরা তো হায় হায় করে উঠল। কিন্তু সাধু গেল একেবারে ক্ষেপে। চীৎকার করে শাপ-শাপান্ত করতে লাগল—এত বড় স্পর্ধা জাহাজের! আমার গঙ্গামায়ীকীর পূজা ভাসিয়ে দিয়ে যায়! আচ্ছা কাল আয় তুই বেটা জাহাজ! এসে ছাখ্, কাল তোকে আমি আস্ত গিলে খাব। কাল আর তোকে পালাতে দিচ্ছিনে, আয় একবার!

শিষ্যেরা তো অবাক! বলে কি গুরুদেব! অত বড় একটা জাহাজ— তাকে আস্ত গিলে খাবে সাধুবাবা!

একজন শিষ্য বলেই ফেলল—গুরুদেব, এ যে জাহাজ···!

গুরুদেব তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আমার এক কথা। কাল ঐ জাহাজ আমি গিলে খাবই, ওর আর নিস্তার নেই। এত বড় স্পর্ধা! আমার পূজা ভাসিয়ে দিয়ে যায়!

শিষ্যরা চোখ-কানকে তবুও যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। মানুষ জাহাজ গিলে খাবে এ কি কখনো সম্ভব? অবশেষে তাদেরই একজন বললে—গুরুদেবের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। সাধনার বলে কি না করতে পারেন তিনি। জাহাজ ভক্ষণ তো তুচ্ছ। মহাপুরুষদের লীলাখেলাই আলাদা রে ভাই!

এদিকে এই বার্তা তো রটে গেল শহরময়। সকলে শুনল—কাল বেলা বারোটায় কার্ কোম্পানীর বড় জাহাজখানা যখন আদমপুর ঘাটের কাছ দিয়ে যাবে, তখন সাধুজী সেই জাহাজখানাকে আস্ত গিলে খাবে।

শহর ছাড়িয়ে শহরের আশেপাশেও বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল এই কথা।

পরদিন সকাল থেকেই আদমপুর ঘাটে লোক জমতে শুরু হয়ে গেল। দল বেঁধে আমরাও গেলাম। গিয়ে দেখি বেলা যত বাড়ছে, লোকও তত ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। ঘাট, ঘাটের আশেপাশে যত জায়গা সবই লোকে-লোকারণ্য।

দেখতে দেখতে বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত লোকে ভরতি হয়ে গেল। কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে গঙ্গায় নেমে দাঁড়িয়ে রইল অনেকে।

সাধুজীর জাহাজ ভক্ষণ দেখতে এটুকু কৃচ্ছ্র সাধন কে না করবে বলো!

এগারোটা বেজে গেল। বারোটাও প্রায় বাজে বাজে। তখনো কিন্তু সাধুজীর কোন সাড়াশব্দ নেই। সে তখন তীরে ধুনি জ্বালিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন। এদিকে লোকের ভক্তি-ভয়-উৎকণ্ঠা যেন ফেটে পড়ছে গঙ্গাতীরে।

এমন সময় দূরে আসামীর টিকি দেখা গেল। হৈ হৈ করে উঠল সকলে—ঐ যে জাহাজ আসছে, ঐ যে জাহাজ আসছে।

চীৎকার শুনে সাধুবাবার ধ্যান ভাঙ্গল, চোখ মেলে সে তাকাল। তারপর গম্ভীর মুখে ধীর পদক্ষেপে নামল গিয়ে গঙ্গায়। রবি বর্মার গঙ্গাবতরণ ছবিখানা দেখেছ তো? সেই শিবের মতো, কোমরে দুহাত রেখে কোমর জলে সে দাঁড়াল গিয়ে স্থির হয়ে। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে বলতে লাগল জাহাজকে—আর তোর নিস্তার নাই আজ! আয় তুই! তোকে আজ খাই।

বলে আর গলা চড়ে। এদিকে টিপটিপ করতে থাকে লোকের বুক। না জানি কি অঘটনই ঘটে আজ!

গঙ্গাতীরে হৈ-হল্লা ঠিক এই সময়টায় একেবারে থেমে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সকলে ভাবছিল—তাই তো, এত বড় জাহাজটাকে গিলে খাবে কি করে!

ভীমগর্জনে এসে পড়ল জাহাজ। ঢেউ আছড়াতে লাগল আদমপুরের ঘাটে।

সাধু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—এসেছিস্? আয় তবে!—বলেই বিরাট এক হাঁ করে জাহাজের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঠিক এমনি সময় হ'ল কি জানো! তীর থেকে দশ-পনেরোজন লোক হঠাৎ হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে হুড়মুড় করে জলের মধ্যে নেবে সাধুর পা

জড়িয়ে ধরল। বললে—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন গুরুদেব! নির্জীব অচেতন তুচ্ছ একটা পদার্থ এই জাহাজ, একটা অপরাধ করে ফেলেছে, তার কি মার্জনা নেই গুরুদেব? তার উপর রাগ করা কি আপনার সাজে! তাছাড়া, জাহাজের মধ্যে নরনারী, শিশু অগন্‌তি কত যাত্রী রয়েছে, ওরা তো কোন অপরাধ করে নি গুরুদেব! তবে কোন্‌ অপরাধে ওদের আপনি খাবেন?

শুনে সাধুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মুখ গম্ভীর করে খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—তা বটে! আচ্ছা, ছোড় দেও। তুমহারা বাত রহা বেটা।

তারপর জাহাজের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বললে—যা বেটা, খুব বেঁচে গেলি আজ। তোর পুনর্জন্ম হয়ে গেল।

জাহাজ ততক্ষণে সাধুকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সমস্ত আদমপুর ঘাট।

এই গল্প শুনে বনফুল বললেন—এতদিন লোকমুখেই শুনে আসছিলাম আপনি খুব ভাল বৈঠকী গল্প বলেন, আজ নিজের কানে শুনলাম—সত্যিই, চমৎকার!

কামিনী

কলকাতায় একসময় কর-মজুমদার কোম্পানী নামে একটি পুস্তক-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান একবার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। এঁদের ইচ্ছা ছিল শরৎচন্দ্র একটি ভূমিকা লিখে দেন।

এঁদের পক্ষ থেকে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নরেন্দ্র কুমার মজুমদার একদিন শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শরৎচন্দ্র তখন বাড়ীতে ছিলেন না, পাড়ায় রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স হাতে ফিরে এলেন।

সাবিত্রীবাবুর সঙ্গে তখন শরৎচন্দ্রের পরিচয় ছিল না। বিভূতিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ, ওর লেখা পড়েছি বটে। তুমি উপাসনা পত্রিকার মোড়ল গোছের কেউ একজন, তাই না?

সাবিত্রীবাবু বললেন—আমি উপাসনার সহকারী-সম্পাদক।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমাদের সম্পাদক রাধাকমল মুখুজ্যে নিজের কাগজে আমার 'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে কি সব সমালোচনা আরম্ভ করেছেন বলো তো? বলি, রাধাকমলবাবু উপাসনা এডিট করা ছাড়া আর কিছু করেন কি?

সাবিত্রীবাবু বললেন—রাধাকমলবাবু কলেজের অধ্যাপক।

—অধ্যাপক? বয়স কত? নিশ্চয় আমার চেয়ে বেশী নয়? তা না হয় হ'ল, কিন্তু নারীচরিত্র সম্বন্ধে ওঁর অভিজ্ঞতা কতটুকু শুনি? আমার চাইতে যে অনেক কম, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি। রেঙ্গুনে যখন থাকতাম, পাড়ার বস্তীর বহু নারীর জীবন-বৃত্তান্ত আমি সংগ্রহ করেছিলাম। তখনই জেনেছিলাম, কি বিচিত্র ও আশ্চর্য জীবন এদের। কামিনী বলে একটি মেয়েকে জানতাম। এর কথা যদি শোনো, তোমরা অবাক হয়ে যাবে।

সকলেই তখন গল্পটি শুনতে চাইলে, শরৎচন্দ্র বলতে শুরু করলেন—

কাঁচড়াপাড়ার রেল কারখানায় শীতলচাঁদ নামে একটি লোক কামারের কাজ করত। হঠাৎ রেঙ্গুনে একটা ভাল কাজ যোগাড় করে সে রেঙ্গুনে চলে আসে। আসবার সময় শীতলচাঁদ একা আসেনি, কামিনী নামে অপরের একটি বৌকেও ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছিল। কামিনীর বয়স বোধ করি তখন চব্বিশের বেশী হবে না। কিন্তু এমনি অটুট স্বাস্থ্য যে, দেখলে মনে হ'ত, প্রথম যৌবনের সব জোয়ারটাই বুঝি সে তার দেহে বেঁধে রেখেছে।

এই শীতলচাঁদ আর কামিনী রেঙ্গুনে এসে বাসা বাঁধল, আমাদেরই মেসের কাছাকাছি এক বস্তীতে।

রেঙ্গুনের ছোট-বড় বহু বাঙ্গালীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তার কারণ শুধু প্রবাসী বলে নয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতাম বলে অনেকেই আমাকে জানতেন। তোমরা যাদের ছোটলোক বলো, তাদের মধ্যে ভালো ডাক্তার বলে মিথ্যে একটা সুনামও আমার ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই শীতলচাঁদ আর কামিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। তাদের বাসা ছিল আমার অফিস যাওয়া-আসার পথে। দেখতাম সুখে-স্বচ্ছন্দেই তারা ঘরকন্না করছে। এমনও শুনেছিলাম যে কামিনীর সেবা-যত্নে পাঁড়-মাতাল শীতলচাঁদ মদ পর্যন্ত নাকি ছেড়ে দিয়েছিল।

একদিন অফিস থেকে ফিরছি, দেখি, কার পথ চেয়ে যেন কামিনী দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার কাছে আসতেই সে কেঁদে বললে—দাদাঠাকুর, আমার কপাল পুড়েছে। ওনার আজ চারদিন হ'ল মায়ের দয়া হয়েছে। ভেবেছিলাম, এমনি-এমনিই সেরে যাবে। আপনাকে আর এই রোগের মধ্যে টানব না। কিন্তু কাল রাত থেকে ঘোর জ্বর, গা-ময় এত বেরিয়েছে যে, আর চেনা যায় না। যন্ত্রণায় বড় ছটফট করছে, আমি আর চোখে দেখতে পারি নে। আপনি দয়া করে একটু ওষুধ দেবে দাদাঠাকুর? বলেই কামিনী আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে এল।

আমি একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে বললাম—তুমি বাড়ী যাও কামিনী। আমি মেস থেকে এখনি আসছি।

ঘুরে এসে শীতলচাঁদের অবস্থা যা দেখলাম, বর্ণনা করা যায় না। কয়েক

দিনের রোগে মানুষের চেহারা যে এত বিভৎস হতে পারে ধারণা ছিল না। সত্যিই আর চেনা যায় না লোকটাকে। যন্ত্রণায় সে এপাশ-ওপাশ করে কাতরাচ্ছে, চোখ চাইতে পারছে না।

তার বিকৃত মুখের কাছে কামিনী নিজের মুখ নিয়ে বললে—ওগো শুনছ! দাদাঠাকুর এসেছে। আর কোন ভয় নেই, ওঁর একফোঁটা ওষুধ খেলেই তোমার সব যন্ত্রণা সেরে যাবে।

কামিনী তো আমার ওষুধের খুব প্রশংসা করলে, কিন্তু আমার দৌড় কতটুকু সে তো আমি জানতাম। ভরসা বলতে তেমন কিছুই পেলাম না। তবু আমার সাধ্যমতো ওষুধ যাহোক দিলাম। সকাল বিকেল রোজই তাকে দেখতে যেতাম। পরে বড় ডাক্তারও আনানো হ'ল, কিন্তু শীতলচাঁদকে আর বাঁচানো গেল না।

শীতলচাঁদ মারা গেল। কামিনীর সে কি কান্না, শোকে মেয়েটা যেন একেবারে পাগল হয়ে গেল! শীতলের রোগের সময় দেখেছি, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিনের পর দিন কি সেবাটাই না সে করেছে। কোন সতী-সাধ্বীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

শীতলচাঁদের মৃত্যুর পরদিন যখন অফিস যাচ্ছি, দেখি কামিনীর বাড়ীর দরজায় তালা ঝুলছে। শুনলাম, বাড়ী সে ছেড়ে দিয়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না।

বছর দুই পরে আমার পুরনো মেস ছেড়ে অফিসের কাছাকাছি এক বন্ধুর মেসে গিয়ে উঠি। যেদিন যাই, সেদিনকারই ঘটনা। মেসে বহাল হয়ে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি। পকেটে চুরুট ছিল, কিন্তু দেশলাই ছিল না। তাই বড় রাস্তার উপর একটা মুদির দোকান দেখতে পেয়ে দেশলাই কিনতে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি, শীতলচাঁদের সেই কামিনী খদ্দেরদের সওদা ওজন করে দিচ্ছে। গা-ভরা গহনা, সেই হাসিমুখ, সেই নিখুঁত স্বাস্থ্য।

আমাকে দেখেই কামিনী শশব্যস্ত হয়ে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সিধে আমার পায়ের কাছে এসে ঢিপ করে এক প্রণাম। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল—দাদাঠাকুর, ভালো আছ তো?

আমি বললাম—তা তোমার খবর কি কামিনী? তুমি কেমন আছ বলো? দেখে তো মনে হচ্ছে দিব্যি ভালো, না কি?

কামিনী বললে—আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি দাদাঠাকুর! তারপর একটু থেমে, বোধ করি পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে একটু লজ্জা-লজ্জা করে বলতে লাগল—যমে টানলে কার সাধ্যি তাকে রাখে দাদাঠাকুর! আপনিও তো চিকিচ্ছের কম কর নি।—বলে, কামিনী আঁচলে চোখ মুছল।

একটু পরে শান্ত হয়ে বললে—ইনি তাঁরই মামাতো ভাই। অনেকদিন থেকে রেঙ্গুনেই আছে। দুঃসময়ে ইনিই খোঁজখবর নিত। আপনি হয়তো দেখেছ দাদাঠাকুর! ওঁর অসুখের সময় প্রায়ই সে আসত। এঁরই দয়ায় এখন দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি। এঁর দুটি ছোট-ছোট ছেলে, ছেলে দুটি মা-মরা। আহা! ওদের কচিমুখ দেখেই তো নতুন করে আমাকে সংসার পাততে হ'ল। তা না হ'লে, আমার একটা পেট, সে তো কোন রকমে দুঃখ ধান্ধা করেই চলে যেত। তবে মানুষটা বড্ড ভালো দাদাঠাকুর, ঠিক তারই মতন। খুব আদর যত্ন করে, বড্ড ভালবাসে।

মোটকথা বুঝলাম, কামিনী আবার এই নতুন মানুষটিকে ভালবেসেছে। এর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে এবং খুব সুখেই আছে।

শীতলচাঁদের অসুখের সময় একটি লোককে প্রায়ই আনাগোনা করতে দেখতাম বটে। জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে কামিনী, একি তাহলে সেই নিবারণ? তার নাম নিবারণই তো ছিল, তাই না?

কামিনী ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর মাথার কাপড়টা সামান্য একটু টেনে বললে—হ্যাঁ দাদাঠাকুর! আপনি তো সবই জানো।

শীতলচাঁদের সংসারে কামিনীকে দেখেছি। সেখানে কি সুখেই না সে ছিল। তারপর শীতলচাঁদের যখন বসন্ত হয়েছে, তার পাশেও কামিনীকে দেখেছি। অনাহারে, অনিদ্রায়, দুর্ভাবনায় সে শুকিয়ে একেবারে পোড়াকাঠটি হয়ে গিয়েছিল। আবার সেই কামিনীকে নিবারণের ঘরেও দেখলাম। সে পোড়াকাঠ কামিনী আর নেই, তার সারা অঙ্গে তখন বসন্তের হাওয়া, অসাধারণ লাবণ্যে তার চোখমুখ ভরা।

দেখলাম, কামিনীর জীবনে একদিকে যেমন শীতলচাঁদ সত্য, তেমনি আর একদিকে নিবারণও সত্য। কাঁচড়াপাড়ায় প্রথম যে স্বামীটিকে সে ছেড়ে এসেছিল, তাকেও কি কামিনী কম ভালোবাসতো?

বিধবা বিবাহ

'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ছাপা শেষ হয় ১৩৩৩ সালের বৈশাখ মাসে। ঐ সময় গ্রন্থাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশের ব্যবস্থা করতে শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে একদিন কলকাতায় আসেন।

কলকাতায় তখনো তাঁর বাড়ী তৈরি হয় নি, তাই এসে ওঠেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের বাড়ীতে। উমাপ্রসাদবাবুই 'পথের দাবী' প্রথম প্রকাশ করেন।

পরদিন সকালে বঙ্গবাণীর প্রধান সচিব কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একে-একে আরো অনেকে এলেন, বেশ জমাটি এক বৈঠক জমে উঠল।

কথা-প্রসঙ্গে কুমুদবাবু বললেন—'পথের দাবী' তো শেষ হ'ল। পাঠকরা কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ল না। তারা বলছে, অপূর্বর সঙ্গে ভারতীর বিয়ে হ'ল না—এটা শরৎবাবু কি করলেন ?

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন—দেখ, অনেকে বলে আমি কন্‌জারভেটিভ্‌। খুব যে অন্যায় বলে তা নয়। আমি ভেবে দেখেছি, আমার মনের কোণে সত্যিই এক গোঁড়া কন্‌জারভেটিভ্‌ লুকিয়ে আছে। তোমার বোধ হয় মনে আছে, অপূর্ব এক জায়গায় তার মা-কে বলছে—মা, তুমি আজ ইহলোকে আছ, কিন্তু একদিন তোমার স্বর্গ-বাসের ডাক এসে পৌঁছবে। সেদিন তোমার অপূর্বকে ফেলে যেতে হবে জানি, কিন্তু একটি দিনের জন্যও যদি তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তাহলে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্য তোমার চোখের জল ফেলতে হবে না।

অপূর্বর এই মাতৃভক্তি কোনদিক থেকে ক্ষুণ্ণ হতে আমি দিই নি। এই জন্যই অপূর্বর সঙ্গে ভারতীর বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কুমুদবাবু বললেন—অপূর্ব ও-কথা বলেছিল বলেই তার যে আর বিয়ে দেওয়া চলবে না, এ কি সব সময়েই খাটে ? আপনার ভারতীও তো অপূর্বকে

বলেছিল, তার মা বর্মায় এলে সে নিজে তার দেখাশুনা করবে। ভারতী ঘরে ঢুকলে তিনি যদি হাঁড়ি ফেলে দেন, তাহলেও সে জোর করে ঢুকবে। কিন্তু কই, আপনি তো ভারতীকে এ কথা রাখতে দেন নি। অপূর্বর মা বর্মায় এলে আপনি তাঁর সঙ্গে ভারতীর দেখাই করালেন না।

শরৎচন্দ্র বললেন—কুমুদ, কথার কতকগুলো রকম-ফের আছে। অপূর্বর কথা তার মজ্জাগত সংস্কারের ফল, সম্পূর্ণ আন্তরিক। কিন্তু ভারতীর কথা কেবল কথার পিঠে কথা, আলাপের অংশ মাত্র। এর ওপর অতটা জোর দেওয়া চলে না। দেখ, আমি যখন সংস্কার বা প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিই, তা যে কেবল যুক্তি দেবার জন্যই দিই, তা কিন্তু নয়। আমাদের সংস্কার বা আচার-বিচারের ওপর আমি একেবারে খড়্গহস্ত, বিরুদ্ধে যখন যুক্তি দিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেই দিই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখেছি, যখনই আমার মনের কোণে সেই কন্‌জারভেটিভ্‌টি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখুনি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। এই যেমন ধর না, বিধবা বিবাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি না দেওয়া স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির অন্যায়ের জঘন্য দৃষ্টান্ত। সংসারে অনেক পাপতাপের এও একটা কারণ। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা এই যে, বিধবা বিবাহ দেবার অনুমতির দায়িত্ব যখন আমার উপর আসে, তখন অন্তর থেকে সে অনুমতি আমি কিছুতেই দিতে পারি নে। এ সম্বন্ধে কথা উঠলে, আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে। তার কথা শোনাই তোমাদের।

বর্মায় তখন আমি চাকরি করি। সেখানে আমার এক গোয়ানিজ বন্ধু ছিল। বিয়ের পরই সে বেচারী বর্মায় আসে, তারপর বহুকাল আর দেশে যেতে পারে নি। একদিন কথায় কথায় জানতে পারলাম, সে তার সামান্য বেতন থেকে পয়সা জমাচ্ছে দেশ থেকে স্ত্রীকে আনবে বলে। ইতিমধ্যেই সে দু'শ' টাকা জমিয়েছে, আর তিনশ টাকা জমাতে পারলেই গোয়া থেকে স্ত্রীকে সে নিয়ে আসতে পারবে।

পরে একদিন দেখা হতে সে আমাকে বললে—চ্যাটার্জি, তোমাকে একটা কথা বলব? তুমি আমাকে শ-তিনেক টাকা ধার দেবে? বৌকে তাহলে দেশ থেকে নিয়ে আসি। আমি আস্তে আস্তে তোমার টাকাটা শোধ করে দেব।

লোকটি বড় ভালো ছিল। আমি টাকাটা দিতেই, সে ছুটি নিয়ে সোজা দেশে চলে গেল এবং কিছুদিন পরেই মহা উৎসাহে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ফিরে এসেই ভালো পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করল। তার পুরো ভাড়া দেওয়া তার সাধ্যের বাইরে। তাই সে তার দুটি বেড্-রুমের একটি তার প্রিয়বন্ধু লরেন্সকে ভাড়া দিয়ে দিলে। লরেন্স তার সংসারেই রইল, খাওয়া-দাওয়া এক সঙ্গেই হ'ত। ফ্ল্যাটভাড়া আর খাওয়া-দাওয়ার খরচ লরেন্স অর্ধেক দিত।

কিছুদিন পরে দেখি, গোয়ানিজ বন্ধুটির যক্ষ্মা হয়েছে। মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসতাম। নানারকম গল্প-সল্প করতাম। সান্ত্বনা যা দেবার দিতাম, যদিও জানতাম এ রোগ থেকে মুক্তি পাবার আশা তার খুবই কম।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি তার দিন যে শেষ হয়ে আসবে, তা বুঝতে পারি নি। মৃত্যুর আগের দিন হঠাৎ সে আমাকে বললে—চ্যাটার্জি, এ জীবনে তোমার ঋণ আর আমি শোধ করে যেতে পারলাম না। হাজার দুই টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স আছে, স্ত্রীকে বলে গেলাম, সেই টাকা থেকে তোমার পাওনা সে শোধ করে দেবে।

আমি বললাম—কি যে ছাইভস্ম তুমি বলছ! ওসব কথা থাক। এজন্য তুমি কিছুমাত্র ভেব না। ও-টাকা আমি চাই নে। ভগবান না করুন, তোমার স্ত্রীর যদি সেই কপালই হয়, ও-সামান্য টাকাটা তাঁর কাজে লাগতে পারে।

বন্ধুটি আমার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ছলছল চোখে বললে—চ্যাটার্জি, আমার মৃত্যুতে আমার স্ত্রীর কিছুই আসবে যাবে না। আমি মরলে তো ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, পরদিনই লরেন্সকে বিয়ে করতে পারবে। ওরা দুজনে প্রতি মুহূর্তে আমার মৃত্যু কামনা করছে। বিশ্বাস কর, এই যে আমি মরছি, এর জন্য দায়ী আমার স্ত্রী। অন্ততঃ এটুকু সত্য যে, ও-ই আমার মৃত্যু এগিয়ে দিয়েছে। যেদিন থেকে ওকে লরেন্সের সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখেছি, সেদিন থেকে আর আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারি নি। সেদিন থেকেই জানি, আমি আর বাঁচব না। ওর হাতে ওষুধ খেতেও আমার ইচ্ছে করে না। ওষুধ দেয় না কি দেয়, কে জানে?

তার এই কথা শুনে, আমি কি আর বলব, বলো! এটা ওটা বলে বৃথা কিছু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র। কিন্তু ও-কিছুতেই মানল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এই তো গেল আমার গোয়ানিজ বন্ধুটির কথা। এখন আর একটি মেয়ের কথা শোনো। এই মেয়েটি আবার দুটি সন্তানের মা।

আমাদের ওখানে এক দুলে বৌ থাকত, গঙ্গার মা বলে আমরা তাকে জানতাম। স্বামী, আর দুটি সন্তান—মৃত্যুঞ্জয় এবং গঙ্গাকে নিয়ে সে সুখে ঘর-সংসার করত। মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স বছর দশেক হবে, গঙ্গা ছিল তার চেয়ে অনেক ছোট। বেশ দিন কাটছিল, হঠাৎ তার স্বামীটি মারা যায়। গঙ্গার মায়ের যেন তর সইছিল না। একজনকে নিকে করে বসল। গঙ্গা তার সঙ্গে গেল বটে, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের কি হ'ল, সে কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে চাইল না। গঙ্গার মা মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন মনে করল না। দিব্যি তাকে ফেলে তার নতুন বরের সঙ্গে চলে গেল। এখন ভাব ঐ মৃত্যুঞ্জয়ের দুর্গতিটা!

দেখ, এই সব ঘটনা যখন মনে পড়ে, তখন ভাবি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের রীতিটা যে ছিল না, তা হয়তো ভালোর জন্যই ছিল না। হিন্দু সমাজে একটি নারীর একমাত্র পতির বিধিতে, স্ত্রী অন্ততঃ স্বামীর মৃত্যু কামনা করতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদেরও জঞ্জাল ভাববার সুযোগ পেত না। আর পাপতাপ, সে তো বিধবারও আছে, সধবারও আছে। তাই আমার কন্‌জারভেটিভ্ মন যখন বলে হিন্দুর এই প্রাচীন নিয়মই ভালো, তখন সমর্থন না করে পারি নে। কিন্তু আবার যখন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা শুনি, তাতেও আবার মন সায় দিতে চায় না। মনে হয়, বিধবা বিবাহ নিরোধ করবার অধিকার কোন পুরুষেরই নেই।

কুমুদবাবু বললেন—অনেকে আবার এই বিধবা বিবাহে বয়স বেঁধে দেওয়ার পক্ষপাতী।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, তা হয় না। বয়স দিয়ে এ সব ব্যাপারের সীমা নির্দেশ করা চলে না। এ বিষয়ে অনেক ভাববার কথা আছে। যাঁরা সমাজ-সংস্কারক, তাঁরা এ নিয়ে চিন্তা করবেন। আমার তাঁদের যা জানাবার, আমার অভিজ্ঞতায় যা ঘটেছে, খানকতক বইয়ে তা লিখে জানিয়েছি। নিয়ম জারি করা তাঁদের কাজ, সংস্কারকের ভূমিকায় কাজ করব, এমন স্পর্ধা আমার নেই। তবে বিধবা বিবাহ যে সমাজের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে মঙ্গলকর—এ কথা আমি মানতে পারি নে।

[শরৎচন্দ্র হাওড়া শহর ছেড়ে হাওড়া জেলাতেই রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতা গ্রামে গিয়ে বাড়ী করে বাস করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাড়ীটা ছিল সামতার এক প্রান্তে বা বেড়ে। সেইজন্য শরৎচন্দ্র ঐ অঞ্চলটার নাম দিয়েছিলেন—সামতাবেড়।

এই সামতাবেড়ের পাশেই হ'ল গোবিন্দপুর গ্রাম। গোবিন্দপুরেই শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীদের বাড়ী।

১৩৫৯, ৬০ ও ৬১ সালে যখন আমি 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় একটানা শরৎচন্দ্রের বিষয়ে লিখছিলাম, তখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে, গোবিন্দপুরে শরৎচন্দ্রের দিদিদের বাড়ীতে এবং ঐ অঞ্চলে শরৎচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বহুবার গিয়েছি।

সেই সময়েই আমি, কুমুদবাবুদের কাছে বলা শরৎচন্দ্রের দুলে-বৌ গঙ্গার মায়ের গল্পের গঙ্গার মাকে শরৎচন্দ্রের দিদিদের বাড়ীতে ঝি থাকতে দেখেছি। গঙ্গার মা তখন অবশ্য বুড়ি। গঙ্গার মায়ের, বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয়কে ফেলে রেখে নিকে করে চলে যাওয়ার কথাও তাঁদের বাড়ীতে আমি শুনেছি।

এ থেকে বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র অনেক সময় তাঁর চোখে দেখা ঘটনা বা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও গল্প বলে শোনাতেন।]

নিরুদিদি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট্ উপাধি নিতে শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেছেন। ঢাকায় শরৎচন্দ্রের বহু বন্ধুবান্ধব। অনেকেরই বাড়ীতে দু-একদিন করে থাকছেন। যে দিনের কথা বলছি, সেদিন তিনি অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অতিথি।

মোহিতলাল মজুমদারও সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ঐদিন সকালবেলা মোহিতবাবু তাঁর একখানি সগুপ্রকাশিত সমালোচনার বই নিয়ে শরৎচন্দ্রকে উপহার দিতে গেলেন।

বইখানি হাতে নিয়ে শরৎচন্দ্র পাতা ওলটাতে লাগলেন। মোহিতবাবু যেখানে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, তার দু-একটা লাইন পড়েই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—দেখ মোহিত, লোকে বলে আমি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী নই। আমার নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি একটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ আছে।

মোহিতবাবু বললেন—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাটা আমিও জানতে চাই। অকুণ্ঠভাবে আপনার স্বাধীন মতামত আপনি বলুন। অবশ্য আমি জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচরিত্র সৃষ্টিতে কবি-কল্পনার যে ধর্মভ্রষ্টতা আছে, তার একটা বড় উদাহরণস্বরূপ আপনি কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীর পরিণাম যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার উল্লেখ করে থাকেন।

শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন—দেখ, জীবনের সত্যকে যিনি যত বড় কবিই হোন, লঙ্ঘন করতে পারেন না। নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের সমাজে, সংস্কারের মতো বদ্ধমূল হয়ে আছে, সে যে কত বড় মিথ্যে, আমি তা জানি বলেই কোন কবির লেখায় দায়িত্বহীন কল্পনার অবিচার আমি সইতে পারি নে। ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট করে দেখতে হবে, নারীর জীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, তাকেই একটা কুৎসিৎ কলঙ্ক-রূপে প্রকাশ করতে হবে, এতে কবি-প্রাণের মহত্ব বা কবি-কল্পনার গৌরব কোথায়? আমাদের সমাজে যে নিদারুণ অবিচার প্রতিনিয়ত ঘটছে,

সাহিত্যেও যদি তারই পুনরাবৃত্তি দেখি, তবে মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য স্বীকার করা সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে রোহিণীর দুর্গতির কথা যখন ভাবি, তখন আমার নিরুদির কথা মনে পড়ে।

নিরুদি ছিলেন ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাল-বিধবা। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর চরিত্রে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নি। সুশীলা, পরোপকারিণী, ধর্মশীলা ও কর্মিষ্ঠা বলে যথেষ্ট সুনাম ছিল। রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য —এমন কি প্রয়োজন হ'লে দাসীর মতো পরিচর্যা তাঁর কাছে পায় নি, এমন পরিবার বোধ করি গ্রামে একটিও ছিল না। আমি তখন ছেলেমানুষ। কিন্তু তবুও সেই বয়সেই নিরুদির মধ্যে একটা বড় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সেই নিরুদির বত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ একবার পদস্খলন হ'ল। গ্রামের স্টেশনের বিদেশী মাস্টার, নিরুদিকে কলঙ্কের মধ্যে নামিয়ে পাষণ্ডের মতো পালাল।

এ সব ব্যাপারে সমাজে নিয়মিত যা ঘটে থাকে, নিরুদির ভাগ্যেও তার অন্যথা হয় নি। পূর্বেকার যত উপকার, সেবা-যত্ন, সব কিছু ভুলে গিয়ে গ্রামের সকলেই তাঁকে নির্মমভাবে বর্জন করল। এমন কি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিল।

লজ্জায়, অপমানে, আত্ম-গ্লানিতে কদিনেই নিরুদির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ক্রমে তিনি মরণাপন্ন হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। তাঁর সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও তাঁর মুখে জল দিতে কেউ এগিয়ে এল না। তাঁর দুয়ার পর্যন্ত কেউ মাড়াল না।

আমাদের বাড়ীতেও কড়া হুকুম ছিল। নিরুদির কাছে যাবার যো ছিল না। আমি কিন্তু রাত্রিতে লুকিয়ে নিরুদিকে দেখতে যেতাম। গিয়ে তাঁর মাথায় পায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। দু-একটা ফল সংগ্রহ করে নিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতাম। তখন দেখেছি, সে অবস্থাতেও গ্রামের লোকের কাছে এই পৈশাচিক শাস্তি পেয়েও, নিরুদি কোনদিন কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন নি। তাঁর নিজেরই লজ্জার সীমা ছিল না। যে অপরাধ তিনি করেছেন, এ শাস্তি যেন তার তুলনায় অতিরিক্ত হয় নি। তখন অবাক ঠেকত,

পরে বুঝেছি। নিজের অপরাধের শাস্তি তিনি নিজেই দিয়েছিলেন নিজেকে, গ্রামের লোক ছিল উপলক্ষ মাত্র। গ্রামের লোকদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করেন নি।

এইখানেই তাঁর শাস্তির শেষ হয় নি। যখন মারা গেলেন, গ্রামের কেউ তাঁর মৃতদেহ স্পর্শ পর্যন্ত করল না। ডোম দিয়ে সেই মৃতদেহ নদীর তীরে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হ'ল। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল সেই দেহ।

এরপর শরৎচন্দ্র বললেন—মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছে, এমনি করেই আমরা তার অপমান করি। রোহিণীর কলঙ্ক আর শাস্তি এই ধরণেরই। এমন একটা নারী-চরিত্রের কি দুর্গতিই না বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন!

['রোহিণী' চরিত্রের পরিণতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র অন্যত্রও বলেছেন—

"(রোহিণীর) মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে।...উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।"—সাহিত্য ও নীতি

রোহিণী চরিত্রের পরিণতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই যে মত, এ কিন্তু অনেকে স্বীকার করেন না। যেমন—

ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখেছেন—"বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে কঠোর নীতিদর্শী বলিয়াছেন, কিন্তু রোহিণীর দুর্ভাগ্যকে কেবল পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত হইবে না। তাহা যদি হয়, তবে নিষ্পাপ ভ্রমরও কেন শাস্তি-ভোগ করিয়াছে? বিভিন্ন প্রকারে উভয়েরই ভাগ্যে অবশেষে মৃত্যুদণ্ড আসিয়াছে। রোহিণীর পাপ স্বীকার করিয়া লইলেও, অনভিজ্ঞা বালিকার অভিমান ও অবিমৃষ্যকারিতা তাহার সহিত কি সমান দণ্ডে দণ্ডিত হইবে?..."

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত লিখেছেন—"একটি প্রকাণ্ড মতভেদ রহিয়াছে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিণীকে লইয়া। আমার মনে হয়, রোহিণীর উপরে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কোন অবিচার করেন নাই।..."—বাঙ্গলা সাহিত্যের নবযুগ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়েই বঙ্গদর্শনের পাঠকরা বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—রোহিণীকে মারলেন কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শনে উপন্যাসের শেষাংশ প্রকাশের সময় রোহিণীর মৃত্যু সম্পর্কে একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন। তা এই—

"গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল, ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিলেন, এ যে রোহিণী, ভ্রমর নয়। এ রূপতৃষা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে।…বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্বপরিজ্ঞাত স্বাদবিশুদ্ধ ভ্রমর-প্রণয়সুধা, স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত চিত্তপুষ্টিকর সর্বরোগের ঔষধ স্বরূপ দিবারাত্র স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধিশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সেকথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথা এ উপন্যাস লিখিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা কয়টির শেষে তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় আবার লিখেছিলেন—"অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হইবার পরে অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়ই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে'। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই!"

বঙ্কিমচন্দ্র সুনীতির আদর্শে অকারণ জবরদস্তিতে রোহিণীর অপমৃত্যু ঘটিয়েছিলেন—এ কথা আমিও স্বীকার করি না। এ সম্বন্ধে আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি।]

সতীত্ব ও নারীত্ব

মেদিনীপুর শহরের রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে তখন প্রতি বছর 'মেদিনীপুর পাঠাগার সম্মেলন' হ'ত। জেলার প্রায় সকল পাঠাগারের প্রতিনিধিই এই সম্মেলনে যোগদান করতেন।

১৩৩২ সালের ১২ই ফাল্গুন ঐ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন নাড়াজোলের ছোট কুমার বিজয়কৃষ্ণ খাঁ। এঁর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্র অতিথি হয়েছিলেন।

সম্মেলন শেষ হবার পরদিন সকালে একটি ছোটখাট সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা হয়েছিল বিজয়কৃষ্ণ খাঁর বাড়ীতে। মেদিনীপুর শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল, সাধারণভাবে সাহিত্য আর বিশেষ করে শরৎ-সাহিত্য।

একজন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা শরৎবাবু, সতীত্বই তো নারীত্ব। আপনি আবার ও-দুটোকে আলাদা করলেন কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—এ প্রশ্নের উত্তরে তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন—

আমাদের পাড়ায় এক বাল-বিধবা বাস করতেন। গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হতেন। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারা যান। বিধবার বেশে দিদি বাপের বাড়ীতে ফিরে আসেন। সংসারে তাঁর ভাইবোন কেউ ছিল না, শুধু বাপ-মা। তাও আবার দিদি বিধবা হবার পর দুটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তাঁর বাপটিও হঠাৎ মারা গেলেন। তারপর দিদির বয়স যখন তিরিশ কি বত্রিশ, সেই সময়ে তাঁর মায়েরও মৃত্যু হ'ল। সেই থেকে বাড়ীতে তিনি একাই থাকতেন।

বাড়ী বলতে একখানা মাত্র মাটির ঘর, চারদিকে উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্য উঠোনের একদিকে একটি মাত্র দরজা। সন্ধ্যা হলেই দিদির এই বাইরের দরজায় খিল পড়ে যেত।

গ্রামের এমন পরিবার ছিল না, যেখানে দিদির খাতির ভালোবাসার

অভাব ছিল। তার কারণ ছিল। লোকের অসুখ-বিসুখে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রাণ দিয়ে দিদি সেবা করতেন। কাজকর্মের বাড়ীতে দিনরাত তাঁর চেয়ে বেশী খাটতে কাউকে কখনো দেখা যায় নি। গ্রামে এমন বাড়ী একটিও ছিল না যে, কোন না কোন কারণে, দিদির কাছ থেকে অতিরিক্ত উপকার বা সাহায্য না পেয়েছে।

আমি তখন ছেলেমানুষ, নানা রকম দুষ্টুমি করে দিন কাটত। আমার মাথায় হঠাৎ একদিন খেয়াল চাপল—দিদিকে ভয় দেখাতে হবে। বাড়ীতে উনি একা মানুষ, ভয় দেখাবার এমন সুযোগ আর কোথায় পাব!

যেমন ভাবা তেমনি কাজ, এবং সেই রাত্রেই। ঠিক করলাম, দিদির বাড়ীর পাঁচিল লাগাও বাইরের দিকে যে বড় জামগাছটা আছে, সন্ধ্যার পর অন্ধকারে সেই গাছটায় উঠে ভূতের অনুকরণে শব্দ করে দিদিকে এমন ভয় পাইয়ে দেব যে, তিনি সারা জীবনে ভুলতে পারবেন না।

যথাসময়ে নিঃশব্দে গাছে গিয়ে তো উঠলাম।

ঘরে আলো জ্বললে, গাছের উপর থেকে দিদির ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। সুযোগ বুঝে, খোনা গলায় যেমনি ডেকেছি—দিঁ-দিঁ—অমনি দেখি একটা লোক তড়াক করে দিদির খাট থেকে নেমে, খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ল।

এই যে দৃশ্যটা দেখলাম—এরপর দিদির সম্পর্কে কি ধারণা হবে?

দিদির হয়তো সতীত্ব বলে কিছু নেই। তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাই বলে, তাঁর নারীত্বও কি সেই সঙ্গে লোপ পেয়ে গেল নাকি? মানুষের রোগে-শোকে দিবারাত্রি সেবা করে, দীন-দুঃখীকে অকাতরে দান করে, যে মহত্ত্বের পরিচয় তিনি সারা জীবনে দিয়েছেন, তার স্বতন্ত্র কোন মূল্য কি নির্ধারিত হবে না? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বাল-বিধবা, যৌবনের দুঃসহ তাগিদে যদি তাঁর দেহটাকে পবিত্র না রাখতেই পেরে থাকেন, তাই বলে কি তাঁর অন্তরের অন্য সব গুণগুলিই মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই কি তিনি পাবেন না? মানুষের প্রকৃত রূপ আমরা পাই কোত্থেকে? তার দেহের আবরণ থেকে, না তার অন্তরের আচরণ থেকে—আপনারাই বলুন?

এই কারণেই আমি সতীত্ব ও নারীত্বকে পৃথক করে দেখাতে বাধ্য হয়েছি।

চন্দ্রমুখীর উপাদান

এক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে একটি লেখা বেরোয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সেদিন ঐ প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করছিলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—

আমার বিরুদ্ধে এদের সব চাইতে বড় অভিযোগ, পাপীর চিত্রকে কেন আমি অমন মনোহর করে এঁকেছি। ওদের ধারণা, পতিতাদের আমি নাকি সমর্থন করি। অথচ সত্য কথাটা এই, সমর্থন আমি করিনে। শুধু তাদের অপমান করতে আমার মন চায় না। বলি, তারাও তো মানুষ, তাদেরও তো নালিশ জানাবার অধিকার আছে। মহাকালের দরবারে তাদের বিচারের দাবী একদিন তোলা রইল। সংস্কারের মূঢ়তায় এ কথাটা কেউ স্বীকার করতেই চায় না। আর তাছাড়া. পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—সে তো সতীত্বের চাইতেও বড়। অত্যন্ত সতী নারীকে চুরি, জাল-জুয়োচুরি ও মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আমি দেখেছি। আবার উল্টোটা দেখবার ভাগ্যও আমার হয়েছে।

একটা গল্প বলি শোনো। নিজের চোখে দেখি নি, তবে সত্য ঘটনা। এ ঘটনার সঙ্গে যে দুটি পুরুষ জড়িত, তারা আমার পরিচিত। তারা আমার কাছে অকপটেই তাদের সমস্ত কথা খুলে বলেছিল। যাদের কথা বলছি, তারা পরস্পর খুব বন্ধু। হরিহর আত্মা যাকে বলে আর কি!

ফুর্তি করবার জন্য দুই বন্ধু মিলে একদিন এক পতিতালয়ে গিয়ে হাজির। খালি চোখে ফুর্তি তেমন জমবে না ভেবে দামী কিছু মদও সঙ্গে নিয়েছে।

যেখানে গেছে, মেয়েটি বেশ নাচগান করতে জানে। নাচগান চলতে লাগল। আর দুই বন্ধুতে মিলে একটু একটু করে মদ্যপানের মাত্রাও বাড়াতে লাগল।

একটু পরেই তাদের খুব নেশা হয়েছে। কে যে কোনদিকে গড়িয়ে পড়েছে তার ঠিক নেই। কোথায় জামা, কোথায় কাপড়! তারপর যা অনিবার্য—একেবারে অচৈতন্য।

পরদিন সকালে নেশার ঘোর কেটে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। একজন নড়েচড়ে উঠে বসে কোমর হাতড়িয়ে একেবারে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—হায়! হায়! আমার কি হ'ল! আমার সর্বনাশ হয়েছে।

চীৎকারের চোটে দ্বিতীয় বন্ধুরও ঘুম ছুটে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে? এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন?

—আর কেন! আমার ট্যাঁকে যে তিন হাজার টাকার নোটের তোড়াটি ছিল, সেটি পাচ্ছি না। তুই লুকিয়ে রাখিস নি তো?

—বাঃ! আমি কেন লুকোতে যাব? কাল রাত থেকে আমি তো একদম বেহুঁস, তোর চীৎকারে এই তো সবে উঠেছি।

—তবেই সেরেছে রে, সর্বনাশ হয়েছে আমার! এ যে মহাজনের টাকা। তার টাকা তাকে বুঝিয়ে না দিলে আমার চাকরি তো যাবেই, তারপরে জেলেও যেতে হবে। হাতে এমন পয়সাও নেই যে কোনগতিকে মিটিয়ে দেব। একটি দুটি টাকা তো নয়, তিন-তিনটি হাজার টাকা। এত টাকা এখন আমায় কে দেবে। হায়, হায়! এখন আমি কি করি।—বলে লোকটি ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল।

কাঁদলে তো আর টাকা ফিরে আসবে না। বন্ধুর পরামর্শে ঘরের চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা গেল, কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তারপর এমন অবস্থায় যা স্বাভাবিক, দুই বন্ধুর মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা। তাই তো, কালকের সেই মেয়েটি গেল কোথায়? তাকে তো কই দেখছি না। কাল রাত্রে নেশায় যখন আমরা বেহুঁস, সেই মেয়েটি টাকাগুলি সরায় নি তো? মনে হচ্ছে, সে-ই নিয়েছে। তা না হ'লে এই ঘর থেকে টাকাগুলি যাবে কোথায়?

এমন সময়, যাকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, সেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। যার টাকা হারিয়েছিল, সে তো তাকে দেখে কেঁদে-কেটে অস্থির। টাকার বিশাল অঙ্কের কথা, মহাজনের কথা এবং চাকরি যাওয়া ও শ্রীঘর বাসের সম্ভাবনার কথা সবিস্তারে তাকে বললে।

সব শুনে ধীর গলায় মেয়েটি বললে—নেশার ঝোঁকে গড়াগড়ি দিতে দিতে এই ঢালা ফরাসের বাইরে চলে গিয়েছিলেন আপনারা। সেখান থেকে তুলে এনে আপনাদের মাথায় বালিশ দিতে গেলাম, আপনারা আমাকে কত যে

কটূক্তি করলেন, তা আর বলতে চাই না। এ আমাদের নিত্যকার পাওনা, এসব আমাদের সয়ে গেছে। যাকগে, কোন রকমে আপনাদের শুইয়ে দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখি মেঝেতে লুটোচ্ছে একটা টাকার থলি। তুলে দেখি এক কাঁড়ি টাকা। সেই টাকার থলি পাহারা দিয়ে সারারাত জেগে বসে আছি।

এ পাড়াটি বেজায় খারাপ নিশ্চয় জানেন। কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে, গুণ্ডারা সব সময়েই ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হয়, আপনাদের কাছে টাকা আছে সন্দেহ করে জনকয়েক গুণ্ডা আপনাদের পিছু নিয়েছিল। আমার চেনা কজন গুণ্ডাকে এই ঘরের পাশ দিয়ে বারে বারে যেতে আসতে দেখেছি। সাহস করে আর ঢুকতে পারে নি। হয়তো ভেবেছিল, আপনারা এখান থেকে বেরোলেই টাকাগুলো কেড়ে নেবে। গোটাকয়েক টাকার জন্য খুন তো ওরা হামেশাই করছে।

এদিকে আমার অবস্থাটা তখন ভাবুন। আমার হাতে আপনাদের টাকা, আর বাইরে গুণ্ডাদের আনাগোনা। দেখেশুনে আমি তো খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম্। ঘরে খিল দিয়ে, ঝিকে নিয়ে সারারাত এই টাকা আগলে জেগে কাটিয়েছি। সকাল হতে, এই তো সবে আমরা ঘর থেকে বেরিয়েছি।

এই বলে মেয়েটি তার পেট-কাপড় থেকে টাকার থলিটি বার করে দিল।

গল্প শেষ করে শরৎচন্দ্র বললেন—তোমরা একবার ভেবে দেখ, এই মেয়েটির মহত্ত্ব কতখানি। যে নারী সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য নিজেকে পণ্য করে খোরাক যোগাচ্ছে, সেই কিনা তিন-তিনটি হাজার টাকার লোভ অমন করে সামলে নিল! একি কম কথা! অথচ দেখ, যদি অস্বীকার করত, কারও সাধ্য ছিল না যে আদায় করে।

তাই বলছিলাম, বাইরের রূপটাই এদের আসল পরিচয় নয়। এরাও মানুষ, এদেরও হৃদয় আছে এবং হৃদয়ের যে সব সৎপ্রবৃত্তি, তাও এদের মরে যায় নি। আর, কেন যে এরা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেজন্য দায়ী তো এরা নয়, দায়ী আমাদের সমাজ। এই হৃদয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের সংসারের সতী-সাধ্বীদের চাইতে এরা কোন অংশে কম নয়।

এই মেয়েটির কাহিনী শোনার পরই আমার চোখ খুলে যায়। আমি তো 'দেবদাসে' চন্দ্রমুখীকে আঁকতে পেরেছি, তা এরই জন্য। এই মেয়েটিই আমার চন্দ্রমুখীর উপাদান জুগিয়েছে।

[শরৎচন্দ্র বানিয়ে গল্প বলতে খুব দক্ষ ছিলেন। এবং তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, বন্ধুমহলে কোন প্রসঙ্গ উঠলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রসঙ্গ উপযোগী গল্প বানিয়ে বলতে পারতেন। আর তিনি তাঁর গল্পকে শ্রোতার বিশ্বাসের চরম সীমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, নিজের অভিজ্ঞতার নাম করে অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবনের ঘটনা বলেও চালিয়ে যেতেন। আরও একটা কথা, তিনি একই গল্পকে এক এক সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবেও বলতেন।

এখানের এই গল্পটিও শরৎচন্দ্র নানা জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলেছিলেন। তিনি অনেকের কাছে বলেছিলেন, তাঁর দুটি বন্ধু একবার এক পতিতালয়ে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার ঐ কাহিনীটি তাঁকে শুনিয়েছিলেন।

আবার তিনি কারো কারো কাছে এমনও বলেছিলেন যে, তিনি নিজেই তাঁর এক ধনী বন্ধুর সঙ্গে কোন পতিতালয়ে গিয়ে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের কাছে বন্ধুর সঙ্গে নিজে পতিতালয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তাই অবিনাশবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' বইয়ে লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র একটু হাসলেন।...তারপর বললেন—একটা ঘটনা বলি। তুমি বোধ হয় জান, আমি রেঙ্গুনে যাবার আগে কিছুদিন উপীনের (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) দাদার বাসায় ভবানীপুরে থাকতুম।

এটা সেই সময়ের কথা। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় কোথা থেকে আমার ঠিকানা যোগাড় করে, আমার এক পুরোনো বিহারী-বন্ধু এসে হাজির। সে হচ্ছে কি একটা স্টেটের ম্যানেজার। হাতে তার এক বিরাট গ্লাডস্টোন ব্যাগ। সে এসেছে কেনাকাটা করতে। রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে পরের দিন কাজ সেরে আবার ফিরে যাবে।

পরের বাড়ীতে থাকি, তাই রাত কাটাবার ব্যবস্থা শুনে প্রথমটা আমি রাজী হই নি। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। অগত্যা তার সঙ্গী হলুম।

হাওড়ার ঘোলাডাঙ্গায় একটি বাড়ীতে গিয়ে ওঠা হ'ল। মেয়েছেলেটা পাঁচটি টাকাতেই হাসিমুখে রাজী হ'ল।

হঠাৎ ভোরের দিকে—ওরে বাবারে, সর্বনাশ হয়ে গেছে—ব্যাগ নেই, এই বলে বন্ধুটি চেঁচাচ্ছে আর মাথা চাপড়াচ্ছে।

অনেক কষ্টে চোখ রগড়াতে রগড়াতে চোখ দুটো তো খুললুম। বললুম—চেঁচাচ্ছ কেন, কি হয়েছে বল না?

সে বললে—ব্যাগে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল—ব্যাগটা নেই, আর মেয়েছেলেটিও নেই।

সত্যিই তাই! দরজাটা দেখলুম ভিতরে খিল দেওয়া নেই। মনে করলুম ভেজান আছে, খুলতে গিয়ে দেখি, বাইরে থেকে বন্ধ করা। সত্যিই ভয় হ'ল। জায়গাটা ভাল নয়, ওখানে খুনখারাপি লেগেই থাকতো। দরজা বন্ধ দেখে আমাদের স্থির বিশ্বাস হ'ল—টাকা তো গেলই, এমন কি আরও কি বিপদই না ঘটে। সে যে আমাদের কি অবস্থা, আজ ভাবলেও গা শিউরে উঠে।

এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খোলার সংবাদ হ'ল। দেখি সেই মেয়েছেলেটি ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞাসা করলুম—হাঁ বাপু, আমাদের ব্যাগ কি হ'ল? তুমিই বা আমাদের এভাবে বন্ধ করে চলে গিয়েছিলে কেন?

সে বললে—রাত্রে বাইরে খুব একটা চেঁচামেচি হচ্ছিল। জায়গাটা তো ভাল নয়, গুণ্ডাদের আড্ডা। তাই গঙ্গাস্নান করতে যাবার আগে ব্যাগটা আমি ঐ ভাঙ্গা আলমারিটার পিছনে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি।—এই বলে সে ব্যাগটি বার করে দিলে। আসবার সময় তাকে পাঁচটি টাকা আরও বেশী দিয়ে বাড়ী ফিরি।

বলতো, এ ঘটনাটি কি একেবারে মন থেকে মুছে গেছে? তা যেতে পারে না। একটা নর্দমার মেয়ে বই তো নয়? তার দায়িত্ব বোধটা কতখানি বলতো? আর শুধুই কি তাই, কতখানি সততা তার মধ্যে আছে বলতো? ঐ যে বাস্তব সাহিত্য বলো, এমনি ঘটনাই তো অভিজ্ঞতার ফাঁকে প্রকাশ পায় বলেই সাহিত্য বাস্তব হয়। তবে এর রূপ যায় বদলে—অনুভূতির নানান রঙে রঙীন হয়ে এগুলো প্রকাশ পায়।

এই গল্পটি আবার শরৎচন্দ্র তাঁর আর এক স্নেহ-ভাজন বন্ধু শৈলেশ বিশীর কাছেও বলেছিলেন। শৈলেশবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে শুনে তাঁর 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন' গ্রন্থে লিখেছেন—

"কিভাবে ঘটনাধীন কোন বন্ধুর মুখ থেকে শুনে তাঁর (শরৎচন্দ্রের) মনে এই চরিত্রের (চন্দ্রমুখীর) আভাষ এসেছিল, তাঁর নিজের মুখে যা শুনেছি, সেই কথাই বলবো।···কোন দুই বন্ধুতে উত্তর কলিকাতার এক পল্লীতে পান ভোজন করতে গিয়েছিলেন।···

খুব পুরো দমে পান ভোজন চলছে, নাচগানও চলছে। সুর ও সুরার নেশায় তখন তাদের চিত্ত মশগুল। বন্ধুর কাছে নগদ তিন হাজার টাকা আছে, তাঁর সে খেয়াল নেই। গুণ্ডারা কেমন করে এই টাকার সন্ধান পায়—আর যায় কোথায়? চারিদিক থেকে বাড়ী ঘিরে,—ঘরে ঢুকে টাকা লুঠ করবার মতলব করল তারা। মেয়েটি তাই বুঝতে পেরে—দোর বন্ধ করে দিলে। বন্ধু দুটি তখন নেশায় অচেতন। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো,—যাঁর টাকা তিনি বললেন—আমার টাকা কি হলো?

মেয়েটি বললে—আমি কি জানি? তোমরা ঘুমুলে গুণ্ডারা বাড়ী ঘেরাও করে টাকা লুঠে নিয়ে গেছে।

সেই ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—টাকা তাঁর নিজের নয়, কোন মহাজনের। এ টাকা দিতে না পারলে তাঁর জেল হবে।···শেষে তিনি কাঁদতে সুরু করে দিলেন।

মেয়েটি তখন করে কি? নিজের কোমর থেকে টাকার থলিটি খুলে দিল —সারারাত মেয়েটি টাকা কোমরে বেঁধে বালিশ চাপা দিয়ে শুয়েছিল।

দাদাকে (শরৎচন্দ্রকে) বলতে শুনেছি, এই ঘটনায় আমার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী খুলে গেল।"

একটা কথা—শরৎচন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের কাছে কি বলেছিলেন জানি না। তবে, কলকাতায় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়দের বাসায় থাকার সময় তিনি নিজে এক বন্ধুর সঙ্গে পতিতালয়ে গিয়ে একটি লোভহীনা পতিতাকে দেখে, দেবদাসের চন্দ্রমুখী লিখেছিলেন—যদি এই হয়, তাহলে এ কথা সত্য নয়। কেন না, তিনি কলকাতায় উপেনবাবুদের বাসায় আসার কয়েক বছর আগেই দেবদাস লিখে শেষ করেছিলেন।]

'টগরে'র প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহ-ভাজন বন্ধু শৈলেশ বিশীকে যেমন একদিন তাঁর 'দেবদাস' উপন্যাসের চন্দ্রমুখী চরিত্রের পরিকল্পনা সম্বন্ধে গল্প শুনিয়েছিলেন, তেমনি আর একদিন শৈলেশবাবুর সঙ্গে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'টগর'-এর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবার সময়ও তাঁকে একটি গল্প শুনিয়েছিলেন।

সে গল্পটিও একটি পতিতালয়েরই গল্প। তবে সে পতিতাটি ছিল অন্য ধরণের।

শরৎচন্দ্রের বলা সেই গল্পটি শৈলেশবাবু তাঁর 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন' গ্রন্থে লিখেছেন। শৈলেশবাবুর লেখাটিই এখানে উদ্ধৃত করলাম।

"টগর মুখরা, ঝগড়ার সময় কেবল তার মুখ চলে না, সমানে হাতও চলে। এই শ্রেণীর নারী সম্বন্ধে শিল্পী (শরৎচন্দ্র) বেশী কথা বলেন নি—তিনি জানতেন, এরা কুশিক্ষা ও কু-পরিবেশের ফল। এদের নিয়ে অন্যত্র রাখলে এরা শোধরাতে পারে। এই শ্রেণীর নারী সম্বন্ধে দাদার (শরৎচন্দ্রের) মুখে যে গল্প শুনেছি—সেটা তাঁরও অন্যের কাছে শোনা কথা বলে মনে হয়।

আবার কোন দুই বন্ধুর গল্প আসছে—তাঁরা গেছেন পান ভোজন করতে। একটি মেয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বাইরে চলে গেল—আসছি বলে। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা দেখেন, ঘরে বিছানায় কে একজন শুয়ে আছে, চাদর ঢাকা। চাদর তুলতেই দেখা গেল—একটি লোকের গলা কাটা, বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দোরে বাহির হতে শেকল বন্ধ।

এখন উপায়?

সেই বন্ধু দুটি জানালার গরাদে দুহাতে বাঁকিয়ে বিছানার চাদর গরাদে বেঁধে দোতলার জানালা গলে নেমে প্রাণ বাঁচান!"

'অভয়া' চরিত্রের পরিকল্পনা

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'অভয়া' চরিত্রে আমরা দেখি—

অভয়া তাদের পাড়ার রোহিণী নামক এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় যুবকের সঙ্গে রেঙ্গুনে গিয়েছিল তার স্বামীকে খুঁজতে। রোহিণী তখন রেঙ্গুনে যাচ্ছিল চাকরির সন্ধানে। অভয়া জানত, তার স্বামী রেঙ্গুনে রেলওয়েতে কাজ করে।

অভয়া রেঙ্গুনে তার স্বামীর সন্ধান পেয়ে দেখল, তার স্বামী তাকে ভুলে গিয়ে, এক বর্মী মেয়ে বিয়ে করে নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছে।

অভয়া তার বর্মী সপত্নীর দাসীত্ব করেও স্বামীর পদাশ্রয়ে থাকতে চাইল। কিন্তু তার স্বামী তার পরিবর্তে তাকে দিল পদাঘাত ও বেত্রাঘাত। অভয়ার স্বামী অভয়াকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করে রাত্রে বাড়ীর বার করে দিল।

অভয়া তখন নিরুপায় হয়ে, তার রোহিণী দাদার কাছে ফিরে গেল, এবং তাকেই অবলম্বন করে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করতে লাগল। কারণ, অভয়ার রোহিণীদাদা, অভয়াকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

শরৎচন্দ্র একদিন শৈলেশ বিশীর কাছে, অভয়ার পাষণ্ড স্বামীর প্রতি অভয়ার অতটা প্রেম ও নিষ্ঠার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, শৈলেশ বাবুকে অভয়ারই মত একটি নারীর গল্প বলেছিলেন।

শৈলেশবাবু তাঁর 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের বলা সেই গল্পটি লিখেছেন। এখানে শৈলেশবাবুর লেখা থেকেই সেই গল্পটি তুলে দিচ্ছি—

"নারীর এই একনিষ্ঠ প্রেম আসে কোথা হতে? আর এই প্রেমই বা তাদের হয় কাদের জন্য—যারা মাতাল, বদমায়েস ও নারীর মর্যাদা কোন দিন দেয় নি।...

অভয়া চরিত্রের পরিকল্পনা দাদার (শরৎচন্দ্রের) মনে কিভাবে এসেছিল, তাঁর নিজের মুখে যা শুনেছি, সেটা এই রকমের—

ঐ রকমই মিস্ত্রী শ্রেণীর একজনের স্ত্রী ছিল অভয়ার মতই—সেই রকম সুন্দরী ও মার্জিত রুচি। লোকটি ছিল মাতাল, অন্য রমণীতে আসক্ত ও স্ত্রীকে ধরে মারত। এই রকম মেয়ের চাহিদা আছে। জুটে গেল তার একজন পূজারী। সে তাকে ভালবাসতো ও এই দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে সব সময়ই বাঁচাবার চেষ্টা করতো।

তার স্বামী যখন মদ খাবার টাকার জন্য তার স্ত্রীকে মারধোর করতো, এই লোকটি তার বন্ধুকে টাকা দিয়ে মার থেকে বাঁচাতো। সেই মেয়েটির সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর মারের ক্ষতচিহ্ন। শতগ্রন্থি ছিন্ন মলিন বসন, এই ছিল তার আজীবন রূপসজ্জার প্রসাধন। হাতে দু'গাছি শাঁখা, কপালে সিঁদুরের রক্ত তিলক।

তার স্বামীর এত অত্যাচার উৎপীড়নেও, তার বন্ধুর শত অনুনয়, বিনয়, মান, অভিমান, চোখের জল কিছুতেই সে ঐ স্বামী ছেড়ে তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাসের জন্য রাজী হয় নি।

তাদের দুজনের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা ছিল। দুঃখের নিকষে তাদের ভালবাসা পরখ দুজনের মনেই হয়েছিল। সেটা তারা খাঁটি সোনা বলেই জানতো। কারণ পুরুষের পক্ষে ত্যাগ ছিল, দুঃখ বরণ ছিল, শুধু টাকা গহনা দিয়ে প্রলুব্ধ করবার মতলব ছিল না। এইভাবে তারা অনেকদিন দুজনে দুজনের মুখ চেয়ে ছিল। শেষে অনিয়ম, অত্যাচারে ঐ স্বামী মহাশয়ের ক্যানসার বা গ্রাংগীরেনের মতই একটা কিছু হয়।

দাদাকে (শরৎচন্দ্রকে) বলতে শুনেছি, রুগীর ঘরে মানুষ ঢুকতে পারে না দুর্গন্ধে। সর্বাঙ্গ খসে পড়ছে তার নিদারুণ ক্ষততে, কিন্তু ঐ নারী কি নিষ্ঠার সাথে তার সেবাশুশ্রূষা করল। পরে সে মারা গেলে, এলো তার প্রণয়ীর কাছে—যে এতদিন তার আশাপথ চেয়ে বসেছিল।

অভয়াও ঠিক এই ছাঁচে ঢালা।"

ডাক্তারী

হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে শরৎচন্দ্রের হাতযশ ছিল। সাধারণ, অসাধারণ কত রকম রোগ, কতবার তিনি সারিয়ে তুলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কিভাবে তিনি এই ডাক্তারী শুরু করেন, সে গল্প একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন—

গরীব দুঃখীর যদি কিছু উপকার করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে একবার আমার খুব ঝোঁক হয়। কিছু টাকা খরচ করে বিস্তর বইপত্র কিনলাম। পড়াশুনাও করলাম রীতিমত কষ্ট করে। শেষে একদিন মনে হ'ল—বিদ্যাটা তো কিঞ্চিৎ আয়ত্ত করা গেল, এবার এটা প্রয়োগ করে দেখা যাক্।

বিদ্যা প্রয়োগে মনস্থির তো করলাম, কিন্তু এখন রোগী পাই কোথায়? আমার ঐ ঘরোয়া বিদ্যার উপর বিশ্বাস করে কে আর আমার কাছে চিকিৎসা করাতে আসবে বলো! কি আর করি, নিজেই শেষে রোগী খুঁজতে বেরোলাম। বাড়ীতে যারা আসে-যায়, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করি, কারো অসুখ-বিসুখ করেছে কিনা। বদ্‌হজম? মাথাব্যথা? চোঁয়া ঢেঁকুর? অম্বল? কান কট্‌কট্‌?—এই সব।

সবাই বলে—না, কারো কোন অসুখ করে নি, সকলেই দিব্যি সুস্থ আছে। আমি তো বেজায় দমে গেলাম। বিনি পয়সায় দেখব, ওষুধের দাম নেব না, তবু রোগী জুটবে না! এ আর কদ্দিন সহ্য হয়? রোগীর অভাবে আমার এই এত কষ্টের বিদ্যাটা শেষে কি মাঠেই মারা যাবে? তাকে-তাকে আছি। এমনি সময় একদিন সত্যিই এক রোগী এসে জুটল।

আমার বাড়ীর পিছন দিকে একটা বাড়ী ছিল। ভাগ্যক্রমে সেই বাড়ীর এক বুড়ির অসুখ করল। বুড়ি তো সরাসরি আমার কাছে ওষুধ নিতে উপস্থিত।

সেদিনটা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। খুব খুশী মনে, খুব ভালো

করে বুড়িকে দেখলাম। অনেক ভেবেচিন্তে বুড়িকে ওষুধ দিলাম। আর বললাম—দেখ বাছা, এই যে তোমাকে ওষুধ দিচ্ছি, এ তোমার আজকের ওষুধ। কাল সকালে আবার এসো। কাল সকালে কি রকম থাক, আবার দেখতে হবে।

পরের দিন সকালে মহা উৎসাহে বুড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। বেলা বেড়ে চলে। আমি হাঁ করে বসে আছি, বুড়ির দেখা নেই। বড় নিরাশ হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হতে লাগল—তাই তো, বুড়িকে এক ওষুধ দিতে অন্য ওষুধ দিয়ে বসি নি তো? এই ভেবে ভয়ে তাদের বাড়ীতেও যেতে পারলাম না যে, একটা খবর নেব।

কয়েকদিন কেটে গেল। বুড়ি কিন্তু আর আসে নি। আমার দুশ্চিন্তাও কমে নি, কেবল মনে হচ্ছে—নাঃ, এ বিদ্যাটা আমার দ্বারা হ'ল না দেখছি!

ঘরের পিছন দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল, কি মনে করে সেটা খুলতে গিয়ে দেখি, দেয়ালের ওধারে যে ফাঁকা মাঠটা, সেখানে সেই বুড়ি পরম নিশ্চিন্তে গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছে।

ভয়ে ভয়ে তাকে ডাকলাম—হ্যাঁগা বাছা, তোমার সেই যে অসুখ করেছিল, তা তুমি মোটে একদিন ওষুধ নিয়ে গেলে, আর এলে না কেন?

বুড়ি বলল—তোমার ওষুধ একেবারে ধন্বন্তরি বাবা! সেই একটিবার খেয়েই আমি ভালো হয়ে গেছি। আর দরকার হয় নি বলেই আসি নি।

শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বুকটা হাল্কা হয়ে গেল। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে নিয়ে বললাম—তা বাছা, একটা খবরও তো অন্ততঃ দিতে হয়। যাক্, সেরে গেছ যখন, ভালোই।

কি অন্যায় ভাবো দেখি! কোথায় একটু জাঁকিয়ে চিকিৎসা করব, ওষুধ দেব—তা নয়। প্রথমে তো রোগীই জুটে না। যদিও বা একটি জুটল, একটি বার ওষুধ খেয়েই সে নিশ্চিন্ত। বলে কিনা ধন্বন্তরী! দ্বিতীয় দিন যে ডাক্তারী করব, তার আর উপায় নেই।

ইংরাজি বিদ্যা

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন—

"শহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন, সে স্থানগুলির নাম বোটাটং ও পোজোন ডং। রেঙ্গুন শহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডক্ ইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে, তাহাতে ফিটার, বাইশ্‌ম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিল একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক ৩।৪ টাকা রোজগার করে। ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত। ইহাদের জন্য এখানে সারি সারি কাঠের ব্যারাক বাড়ী এখনও আছে। শরৎচন্দ্র স্বল্প ভাড়ায় ঐরূপ একটি বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন।…এ পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন। তাহাদের চাকরির দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত।"

শরৎচন্দ্র প্রথম যখন এই মিস্ত্রী পল্লীতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি নিজেকে শিক্ষিত বা তাদের চেয়ে পদস্থ বলে পরিচয় দেন নি। তাদেরই মতন একজন হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে বাস করেছিলেন।

সেই সময়কারই একদিনের গল্প শরৎচন্দ্র তার এক বন্ধুর কাছে একবার বলেছিলেন—

রেঙ্গুনে আমি যখন মিস্ত্রী পল্লীতে থাকতাম, তখন প্রথম দিকে, আমি যে একটু আধটু লেখাপড়া জানি, সেখানকার লোকে তা আদৌ জানত না।

একদিনের কথা। সকালে তখন একটু বেলাও হয়েছে। আমি রাস্তার ধারে আমার বাড়ীর বারান্দায় বসে আছি। দেখি, আমাদের পাড়ারই একটি বুড়ি, মণি অর্ডারের একটা ফর্ম হাতে নিয়ে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে।

তার হাতে মণি অর্ডারের ফর্ম দেখে বুঝলাম, কাউকে দিয়ে লিখিয়ে আনতে যাচ্ছে। এবং এও বুঝলাম, এই ফর্ম লেখাতে তাকে বেশ দূরে অন্য এক পাড়ায় যেতে হবে। তাই বুড়ির কষ্ট লাঘব করবার জন্যই আমি তাকে বললাম—কোথায় যাচ্ছ বুড়ি মা?

সে বললে—বাবা, যাচ্ছি এই কাগজটা ও পাড়া থেকে লিখিয়ে আনতে। একজনকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে।

—তা তোমার ছেলে কোথায়?

—সে কাজে গেছে। আমাকে লিখিয়ে এনে রাখতে বলে গেছে।

—তা এই রোদে কষ্ট করে অতদূরে যাবে কেন, আমাকে দাও আমিই লিখে দিচ্ছি।

—তুমি কি লিখতে পারবে বাবা? এ যে ইঞ্জিরিতে লিখতে হবে! তুমি কি ইঞ্জিরি জান?

—তা তোমার ওটা লিখে দেবার মত একটু আধটু জানি।

আমার এই কথা শুনে, বুড়ি বোধ করি তার পথশ্রম এড়াবার জন্যই শুধু, ফর্মটা লেখাতে আমার হাতে দিল। কিন্তু তখন তার মুখের চেহারাটা যা দেখলাম, তাতে মনে হ'ল, সে তখন নিশ্চয়ই ভাবছিল—এ কি লিখতে পারবে? এর লেখায় কি টাকা যাবে?

বলা বাহুল্য, আমার লেখায় তাদের পাঠানো টাকা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছেছিল।

এরপর থেকেই পাড়ার সকলে ক্রমে জানতে পারল যে, আমার ইংরাজি বিদ্যা একটু আধটু আছে।

পাঁচুর মা

'রসচক্রে'র বৈঠকে শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতেন, আর সদস্যরা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

একদিন বললেন—

আমি রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে তখন বাজে শিবপুরে আস্তানা পেতেছি। দু-এক বছর কেটে গেছে। একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের আদেশ পেয়ে তাঁর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দেখা করতে গেছি। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরবার জন্য উঠেছি, ঠিক সেই সময় ঠাকুর বাড়ীরই কে একজন, নামটা এখন মনে নেই, তবে গণ্যমান্য একজন হবেন সন্দেহ নেই—এসে সেই ঘরে ঢুকলেন। কবি তাঁকে বললেন—যাও, শরৎকে পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস।

কবির কাছে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। চিৎপুর রোডে এসে তাই ভাবলাম, এখুনি ট্রামে কিংবা বাসে উঠে কাজ নেই, বরং খানিকটা হেঁটে গা-হাত-পায়ের খিল ছাড়িয়ে নিই।

যিনি আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, আমার হাঁটবার কথা শুনে বললেন—চলুন তবে, আপনাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

কথাবার্তায় কত দূর এসে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি একটা চেনা বস্তির পাশ দিয়ে চলেছি। একটি মেয়েলি কণ্ঠও কানে এল। আমাকে ডাকছে—দাদাঠাকুর, ও দাদাঠাকুর!

দেখি, একটি আধবয়সী মেয়ে আমার দিকে ছুটে ছুটে আসছে। কাছে এলে দেখলাম, পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা এসেই আমাকে ঢিপ করে প্রণাম করে বলতে শুরু করল—আজ আমার কি সৌভাগ্যি যে, দাদাঠাকুরের দেখা পেনু। আচ্ছা নোক আপনি দাদাঠাকুর! আমাদের কি একেবারেই ভুলে গেছ। কতদিন এসনি বলো তো? আজ যখন একবার পেয়েছি, কিছুতেই আর ছাড়ছি নি। আমার ঘরে আপনার একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

পাঁচুর মায়ের হাত থেকে নিস্তার নেই বুঝতে পারলাম। তাই বললাম—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

ঠাকুরবাড়ীর সেই সঙ্গী তখনো আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের আচরণ ও কথাবার্তা দেখে ও শুনে তিনি একেবারে অবাক। পাঁচুর মা বিদায় নেবার পর তিনি বললেন—শরৎবাবু, এরা কি আপনার পরিচিত? এই সব বস্তীতে কি আপনার যাওয়া-আসা আছে নাকি?

আমি বললাম—কি আর করি বলুন! এদের সঙ্গে না মিশে আমার উপায় নেই। এদের নিয়েই যে আমার কারবার। এদের কথাই তো,—থাক্ সে কথা আর একদিন বলব এখন। আজ বরং আপনি আসুন। ধরা যখন পড়ে গেছি, আজ আর রেহাই নেই। হয়তো এ বেলা না খাইয়ে ছাড়বে না।

—আপনি এদের এখানে খাবেন?

—আজ কি আর নতুন খাচ্ছি রে ভাই!

তারপর তিনি ফিরলেন তাঁর বাড়ীর দিকে, আর আমিও পাঁচুর মায়ের বাড়ীমুখো হলাম।

বস্তীর ভিতরে ঢুকতেই, জানাশোনা সব ছেলেমেয়েরা—দাদাঠাকুর এসেছে, দাদাঠাকুর এসেছে—বলে আমাকে একেবারে ঘিরে ফেলল। তাদের সকলের অভিযোগ—পুরো এক বছর কেন তাদের ওখানে যাই নি, কেন তাদের ত্যাগ করেছি, কেন তাদের ভুলে গেছি, ইত্যাদি।

পাঁচুর মায়ের বাড়ী গিয়ে দেখি, তার সাত বছরের পাঁচু বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রথম ভাগখানা খুলে মুখ ভার করে দাওয়ায় বসে আছে।

পাঁচুর মুখ দেখে বড় মায়া হ'ল। তার মাকে ডেকে বললাম—ও পাঁচুর মা, তোমার ছেলে অমন করে বসে আছে কেন? পড়তে হচ্ছে বলেই বুঝি?

পাঁচুর মা বলল—ছাখ না দাদাঠাকুর, কখন থেকে বলছি ইস্কুলে কাল যা পড়েছিস, তা আজ ভাল করে পড়ে নে বাড়ীতে। তবে তো ম্যাস্টারের কাছে গিয়ে পড়া দিতে পারবি। তা মুখপোড়া ছেলে কিছুতেই শুনবে না। এদিকে পয়সাকড়িও নেই যে ঘরেতে ম্যাস্টার রেখে পড়াব।

আমি বললাম—আচ্ছা, তুমি এখন তামাক সেজে আনো দেখি। আমিই তোমার পাঁচুকে পড়াচ্ছি।—বলে পাঁচুকে পড়াতে বসে গেলাম।

তামাক সেজে এনে হুঁকোটি আমার হাতে দিয়ে পাঁচুর মা বলতে লাগল

—দাদাঠাকুর, আপনিই বলো তো! মুখপোড়া ছেলেকে কত বুঝুই যে বেশী না পড়িস, পেরথম ভাগ আর দুতীয় ভাগটাই পড়্। তা নয়। আপনার কথা কত যে শোনাই। বলি, ঐ যে দাদাঠাকুর, শুনি নাকি বই নেকে। তা তুইও হতভাগা ছেলে, আর কিছু যদি না পারিস, পেরথম ভাগ দুতীয় ভাগ পড়ে দাদাঠাকুরের মতো দুটো বই নিকেও তো খেতে পারবি। তা মুখপোড়া ছেলে, কিছুতেই পড়বে নে। এখন বায়না ধরেছে ইস্কুলেও আর যাবে নে। আপনি কিরপা করে ওকে একটু বুঝিয়ে দাও না দাদাঠাকুর! আপনার কথা শুনে ওর যদি একটু বুদ্ধি হয়। আমি ততক্ষণে আপনার খাওয়া-দাওয়ার একটু বেবস্তা করে আসি, কেমন?

আমি বললাম—তা না হয় তোমার পাঁচুকে আমি বুঝিয়ে বলছি, কিন্তু আবার খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা কেন? ওসব আজ থাক।

পাঁচুর মা বলল—ও-সব হবে না দাদাঠাকুর! আজ আপনি কতদিন পরে এয়েছ, আজ কি আর দুটি না খাইয়ে ছাড়ি।

সেদিন দুপুরের আহারটা পাঁচুর মায়ের ওখানেই সারতে হ'ল। তারপর পাড়ার মধ্যে এর বাড়ীতে ওর বাড়ীতে একবার করে 'পায়ের ধুলো' দিতে দিতেই দিন কাবার। বাড়ী যখন ফিরলাম, তখন সন্ধ্যে।

শাশুড়ী ও বধূ

শরৎচন্দ্র তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে থাকার সময় প্রতিদিনই বিকালে তাঁর দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। সেখানে নানা রকম গল্প-সল্প করে রাত্রি ৮৷৯টা নাগাদ বাড়ী ফিরতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর দিদির বাড়ীতে বিকালে বেড়াতে গিয়ে সেখানে বৈঠকখানায় বসে বাড়ীর ও পাড়ার পুরুষদের সঙ্গে যেমন গল্প করতেন, তেমনি বাড়ীর ভিতরে গিয়েও বাড়ীর ও পাড়ার মেয়েদেরও গল্প শোনাতেন।

যেমন রোজ হয়, সেদিনও শরৎচন্দ্র তেমনি বিকালে তাঁর দিদির বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন।

তাঁর মুখে গল্প শোনার লোভে সেদিন পাড়ার মেয়েরা একটু আগেই অনিলা দেবীর বাড়ীতে এসে জড়ো হয়েছেন। মেয়েদের মধ্যে যেমন কিশোরী ও কুমারী আছে, তেমনি বধূ ও শাশুড়ীরাও আছেন।

গল্পের আসরে বাড়ীর দু-একজন পুরুষও আছেন। তাঁরা একটু তফাতে বসেছেন।

কিঞ্চিৎ মুখরা এক বধূ হঠাৎ সেদিন ফরমাস করে বসলেন—আপনি তো মেয়েদের সম্বন্ধে কত কথাই কত দরদ দিয়ে লিখেছেন। কিন্তু নিরীহ বৌ বেচারীরা জাহাঁবাজ শাশুড়ীদের হাতে কিভাবে যে নির্যাতীতা হন, কই সে সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখেন নি তো! এ রকম ঘটনা বাঙ্গালীর ঘরে তো রোজই ঘটছে। বৌদের ওপরে নির্যাতন কি এতই উপেক্ষার বিষয়? আজ আপনাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে।

বধূটির এ কথা শুনে আসরে শাশুড়ীশ্রেণীর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—এ রকম ঝগড়াটে শাশুড়ী আমার চোখে কম পড়ে নি। তা বেশ, আজ তাহলে তোমাদের কুঁদুলে শাশুড়ীর গল্পই শোনাই।

বলা বাহুল্য, শাশুড়ী ঠাকরুনরা এ কথা শুনে খুশী হলেন না। মুখ ব্যাজার করে বসে রইলেন। অনূঢ়া ও বধূর দল সাগ্রহে এগিয়ে এসে বসলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—একটা সত্যি ঘটনাই বলি। এ আমার চোখে দেখা।

আমি তখন বাজে শিবপুরে থাকি। আমার উঠোনের এক পাশে উঁচু একটা দেয়াল ছিল। সেই দেয়ালের ওপাশে, আমার এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে ছিলেন, এমনি একটি শাশুড়ী। সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, সব সময়েই —ওলো ভালোখাকীর ঝি, ওলো সব্বনাশীর বেটি ইত্যাদি অজস্র সম্বোধনবাণী সেই বাড়ী থেকে শোনা যেত। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, শাশুড়ীর এত গলা শুনতাম বটে, কিন্তু বৌয়ের গলা কোনদিনই শুনতে পেতাম না।

এক একদিন বসে ভাবতাম, আহা, এমন নিরীহ বৌটাকে এমনি করেও কেউ অযথা গালাগালি পাড়ে! বৌটির স্বামী লোকটাই বা কি, মাকে একটু নিষেধ করেও দিতে পারে না! আবার ভাবতাম, এ হেন যে মা, সে কি আর তার ছেলের কথা শুনবে! ছেলে কিছু বলতে গেলে উল্টে তাকেই হয়তো শুনিয়ে দেবে পাঁচ কথা।

যাই হোক্, বৌটির জন্যে যেমন আমার মায়া হ'ত, তেমনি তার ওপরে আমার শ্রদ্ধাও বেড়ে যাচ্ছিল দিনে দিনে। মনে হ'ত, এমন গৃহলক্ষ্মী মেয়ে বোধ করি আজকাল লাখেও একটি মেলে না। অবিরাম গালাগালি মেনে নিচ্ছে, মুখে রা-টি নেই, অথচ ঠিক সংসারের কাজ করে যাচ্ছে। এমন কি, ঐ ঝগড়াটে শাশুড়ীটিকে পর্যন্ত রেঁধেবেড়ে খাইয়ে সেবাযত্ন করছে। বৌটিকে দেখলেও পুণ্য হয়।

শরৎচন্দ্র যখন এই নিরীহ বৌটির প্রতি তার শাশুড়ীর নির্যাতনের গল্প বলছিলেন, তখন আসরের শাশুড়ী আর বধূদের মুখের ভাব লক্ষ্য করার মত। শাশুড়ীদের মুখ যেমন বিষণ্ন, বধূদের মুখ তেমনি হাসিতে উজ্জ্বল।

শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—

একদিন, তখন খুব সকাল। আমি উঠোনে পায়চারি করছি। এমন সময় পাশের বাড়ীর সেই শাশুড়ীটির গলা বেজে উঠল—ওলো সব্বনাশীর বেটি, ভালোখাকীর ঝি ইত্যাদি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই সকালে উঠেই আবার জুড়লো রে! আবার অহেতুক সেই গালাগালি! সেদিন তাদের দেখবার জন্যে আমার বড়

কৌতূহল হ'ল। তাই পাঁচিলের কাছে এগিয়ে, খানকতক ইট সাজিয়ে, তার ওপরে উঠে ও-বাড়ীর দিকে মুখ বাড়ালাম। মুখ বাড়িয়ে সে যা দেখলাম, তাতে আমার এতাবৎ কালের সমস্ত ধারণাই এক নিমেষেই উবে গেল। দেখলাম, বাড়ীতে তখনো আর কেউ বোধ হয় ওঠে নি, শুধু শাশুড়ী আর বৌটি। বৃদ্ধা বসে আছে দাওয়ায়, আর বৌ পাশেই ঝাঁট দিচ্ছে। বৌটি মুখে কোন কথা বলছে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে শাশুড়ীর দিকে সেই ঝাঁটাখানা তুলে, হাত, মুখ আর চোখের সাহায্যে, তাকে আচ্ছা করে ঝাঁটাপেটা করবে বলে শাসাচ্ছে। কত ভাবে, কত ভঙ্গীতে যে শাসাচ্ছে তা আর কি বলব! শাশুড়ী আর কি করবে, থেকে থেকে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছে।

বৌটির এই কাণ্ড দেখে আমি কি আর সেখানে দাঁড়াই।

শরৎচন্দ্রের গল্প শেষ হ'ল।

আসরে যত বধূ ছিলেন, তাঁদের মুখ কালো হয়ে উঠল। এদিকে হাসিমুখে পান গালে দিলেন শাশুড়ীরা।

[শরৎচন্দ্রের বলা এই 'শাশুড়ী ও বধূ' গল্পটি আমি প্রথমে কবি দিনেশ দাসের কাছে শুনে আমার 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' বইয়ে লিখেছিলাম। পরে 'শরৎচন্দ্র' (১ম খণ্ড, জীবনী) ছাপাবার সময় যখন আমি প্রায়ই বাজে শিবপুরে যেতাম, সেই সময়, শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে যে বাড়ীতে বাস করতেন, তার পাশের বাড়ীর দীপক মুখোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলেছিলেন— আপনার 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' বইটা পড়েছি। তার মধ্যে 'শাশুড়ী ও বধূ' গল্পটি আমাদের এক পাশের বাড়ীর শাশুড়ী ও বধূরই গল্প। শুনেছি ঐরূপ শাশুড়ী ও বধূ তখন ঐ বাড়ীতে ছিল।

পরে, শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী ও তাঁর স্নেহভাজন অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—আমাদের পাড়ায় ঐরূপ যে শাশুড়ী ও বধূ ছিল, আমি তাদের দেখেছি। তবে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে বৌটাকে যতটা মন্দ বলেছেন, সে ততটা মন্দ ছিল না।]

চরিত্রহীন

'উপাসনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের যখন কিছুটা বিরূপ সমালোচনা বেরোয়, তখন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ঐ কাগজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

এই সাবিত্রীবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে আবার একদিন শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলে, সেদিন শরৎচন্দ্র তাঁকে 'চরিত্রহীনে'র প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন—দেখ সাবিত্রী, আমার 'চরিত্রহীন' নিয়ে একবার এক মজার কাণ্ড ঘটেছিল। এবার কাশীতে গিয়ে শুনে এলাম। সেই ঘটনাটা তোমাকে বলি শোনো—

এবার কাশীতে গিয়ে উত্তরা-সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে উঠি। একদিন সকালে কয়েকজন বাঙ্গালী এসে আমায় বললেন, ওখানকার বাঙ্গালীরা আমায় দেখতে চান। তাই তাঁরা এক সভার আয়োজন করেছেন, আমাকে সেখানে যেতে হবে। তাঁরা জানতেন, কিছু বলতে বললে আমি হয়তো যাব না, তাই শুধু আমার উপস্থিতির আমন্ত্রণই জানিয়ে গেলেন।

তাঁদের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। যাব বলে কথাও দিয়ে দিলাম।

সভায় মালাচন্দন, ধূপধুনো কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁদের অভ্যর্থনার মধ্যে সত্যিকারের আন্তরিকতাও ছিল। গিয়ে বেশ আনন্দ পেলাম।

সভার শেষে সকলেই তখন প্রায় চলে গেছেন। আমিও উঠ্‌ব উঠ্‌ব করছি, এমন সময় দুটি বিধবা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন বৃদ্ধা, আর একজনের বয়স কম, বিশ-বাইশ বছর হবে। অল্পবয়সী বিধবাটি কাছে এসে প্রণাম করে আমার মুখের দিকে এমনভাবে চাইল, যেন আমি তার খুব চেনা। মৃদুস্বরে আমাকে বললে—আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আপনি আমার গুরু। আমি আপনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

মেয়েটির কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। একটু সামলে নিয়ে

বললাম—আমি তোমায় বাঁচিয়েছি! কই কোথায়, কিছু তো মনে পড়ছে না। তাছাড়া, আমি তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি বলেও তো মনে পড়ছে না।

মেয়েটি খুবই সুন্দরী। যেমনি তার রঙ, তেমনি মুখশ্রী। একপাশে আমাকে ডেকে নিয়ে, তার নিজের কাহিনী যা বললে, তা এই—

আমার বাবা বাঙ্গলার বাইরে কোন এক কলেজের অধ্যাপক। চিরকালই বাবার কাছে আমি থেকেছি। আমি যখন দু বছরের, মা তখন মারা যান। সেই থেকে বাবাই আমাকে মানুষ করেছেন। আমার বিয়ে হয় সতেরো বছর বয়সে। কিন্তু ছ মাস যেতে না যেতেই মাত্র তিনদিনের জ্বরে এই কাশীতেই স্বামীর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বাবার কাছেই আবার ফিরে গেলাম। আমি তাঁর একমাত্র মেয়ে। আমাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য তিনি আবার আমাকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলেন।

বাবার এক ছাত্র ছিল, আমাদের বাড়ীতেই থাকত। বাবা তাকে খুব স্নেহ করতেন। অনেকে নিজের ছেলেকেও অতখানি স্নেহ করেন না। কলেজে কোন্ দিন কোন্ লেকচার হবে, সে-ই সব হিসেব রাখত। প্রয়োজনীয় যত বই ও নোটের খাতা, তারও ঠিক রাখত ঐ ছেলেটি। আমি তার কাছে পড়তাম। এমনি করে প্রায় বছর দেড়েক কাটল।

এই মেশামিশির ফলে আমাদের দুজনের মধ্যেই বেশ একটা পরিবর্তন এসে গেল। ছেলেটি তা লক্ষ্য করে একদিন বাবাকে বললে, আমাকে সে পড়াবে না। বাবাও যেন আমার উপর বিরক্ত হয়েই কিছুদিনের জন্য আমাকে বরানগরে মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

বরানগরে এলাম বটে, কিন্তু আমার মন পড়ে রইল সেইখানে। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমাদের দুজনের মধ্যে চিঠি লেখালেখি চলতে লাগল। একদিন ছেলেটি হঠাৎ কলকাতায় এসে উপস্থিত হ'ল।

তখন আমাদের নিয়মিত দেখাশোনার আর কোন বাধা রইল না। অবশেষে একদিন আমরা ঠিক করলাম, যা থাকে বরাতে, দুজনে কোথাও পালিয়ে চিরকালের মতো মিলিত হব।

ঠিক হ'ল, সে রাত্রে আমি জেগে থাকব। দুটোর সময় সে গাড়ী নিয়ে

আসবে। এসে আমি নীচের যে ঘরে শুই, সেই ঘরের জানলায় টোকা দেবে, আর আমিও বেরিয়ে আসব।

সেদিনের কথা আমি সহজে ভুলব না। সমস্তক্ষণ কেমন একটা অস্বস্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। সন্ধ্যার সময় আমি আমার মামাতো ভাইকে তাদের লাইব্রেরী থেকে একটা উপন্যাস এনে দিতে বললাম। পাছে ঘুমিয়ে পড়ি, তাই বইটা পড়ে রাত জাগব স্থির করেছিলাম।

আমার মামাতো ভাই মোটা যে উপন্যাসটি আমার হাতে এনে দিল, মলাটের উপরে তার নাম দেখলাম, 'চরিত্রহীন'। দেখেই আমার বুকটা কেমন যেন ধড়াস করে উঠল। ভাবলাম, প্রকৃতির একি পরিহাস!

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যে যার শুতে গেল। আমিও বই হাতে নিয়ে ঘরে গিয়ে খিল দিলাম।

কোন রকমে বই যখন শেষ হ'ল, রাত তখন পৌনে দুটো। ততক্ষণে আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। আপনার কিরণময়ী আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

যথাসময়ে জানালায় টোকা পড়ল। বুঝলাম, সে এসেছে। জানালা খুলে মিনতি করে তাকে বললাম—আমায় ক্ষমা কর, আমি যেতে পারব না।

এ কথা শুনেই, তখন তার মুখের যে চেহারা হয়েছিল, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। মনে হ'ল, আমি যেন তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছি।

সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, মায় ট্রেনের টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে। এখন পিছু হঠলে সে মানবে কেন?

আমি হাত জোড় করে বললাম—অন্যায় করেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর!

ছেলেটি কিছুক্ষণ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল।

তারপরই আমি আমার এই দিদিমার সঙ্গে কাশী চলে আসি। সেও আজ বছরখানেক হয়ে গেল। আজও ভাবি, আপনার কিরণময়ীই সেই রাত্রে আমাকে বাঁচিয়েছিল।

'চরিত্রহীন' পড়ে আপনাকে দেখবার আমার বড় ইচ্ছা হয়েছিল। বাবা বিশ্বনাথ যে এত শীগ্‌গির সে ইচ্ছা পূরণ করবেন, তা কখনো ভাবি নি।

সেদিন যদি আপনার চরিত্রহীন না পড়তাম, তাহলে আজ আমি কোথায় যে যেতাম, আমার কি দশা হ'ত, তা ভাবতেও পারি নে। তাই আপনাকেই আমি গুরু বলে মেনেছি। আপনিই আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

গল্প শেষ করে শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ সাবিত্রী, আমার 'চরিত্রহীন' প্রথম যখন বেরোয়, তখন এই বই নিয়ে গালাগালি কম হয়-নি। আমার উপর দিয়ে তখন নিন্দা, বিদ্রূপ ও আক্রমণের একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। এখনো সে ঝড় মাঝে মাঝে ওঠে। কিন্তু তবু ভাবি, সমালোচকরা আমার চরিত্রহীন নিয়ে যাই বলুক না কেন, সে যে এমনি ভাবে অন্ততঃ একটি মেয়েকেও রক্ষা করতে পেরেছে, সেইখানেই আমার বড় সান্ত্বনা।

ভালোবাসার গভীরতা

শরৎচন্দ্র কলকাতায় বালিগঞ্জে নিজের বাড়ীতে থাকার সময় নিকটেই কবি নরেন্দ্র দেবের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াতে যতেন।

একদিন নরেনবাবুর বাড়ীতে একটা গল্পের আসরে এক স্ত্রৈণ ভদ্রলোকের গভীর ভালোবাসার কথা উঠতেই শরৎচন্দ্র বললেন—আরে, রাখ, রাখ, তোমাদের যত গভীর ভালোবাসার কথা! ওসব আর বোলো না। অনেককেই তো দেখলাম। ওসব গভীর জলের মাপ আমার জানা আছে। শোনো তবে বলি এক মহাপ্রেমিকের গল্প—

রেঙ্গুনে আমার এক বিশেষ বন্ধু আমার বাসার কাছেই বাসা করে থাকত। বন্ধুটি বিবাহিত ছিল। স্ত্রী বেশ সুন্দরী। তাছাড়া দুজনেরই ছিল অল্প বয়স। অতএব যৌবনের অভাব ছিল না। মহাসুখে তাদের দিন কাটত, কেউ কাউকে বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারত না—অভিন্ন-হৃদয় যাকে বলে আর কি।

এমনি করে তো বেশ কিছুদিন কাটল। তারপর একদিন বন্ধু-পত্নীটি হঠাৎ অসুখে পড়ল। কঠিন অসুখ, তাই স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য বন্ধুটিকে অফিস থেকে ছুটি নিতে হ'ল।

কাছাকাছি কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকায়, খানিকটা সেবার ভার আমার উপরেও পড়েছিল। অনেকদিন আমাকে রাতটা ওদের বাড়ীতেই কাটাতে হয়েছে।

বড় ডাক্তার ডাকানো হ'ল, বড় কবরেজ এলেন, কিন্তু সারবার নাম নেই। অসুখ ক্রমেই খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল।

আমার বন্ধু আমার কাছে এ নিয়ে রোজ কান্নাকাটি করতো। দু হাত ধরে বলতো—ভাই ওকে তোমরা যে করে হোক বাঁচাও। ওকে ছেড়ে আমি এক দণ্ডও বাঁচতে পারব না। ও চোখ বুজলে আমার যে সব অন্ধকার। ও যদি যায়, আমাকেও যেতে হবে—এ তুমি জেনে রাখ।

এ রকম খেদের কথা রোজই আমায় শুনতে হ'ত। আমিও যথাসাধ্য

প্রবোধ দিতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। একদিন রাত প্রায় এগারোটার সময়, বন্ধু-পত্নী প্রাণত্যাগ করে অন্যলোকে যাত্রা করল।

আমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হ'ল। বন্ধুটিকে আর কিছুতেই সামাল দিতে পারি নে। মৃতা স্ত্রীকে জড়িয়ে কি আকুল কান্নাটাই না সে কাঁদলে। শোকে সে প্রায় উন্মাদ হয়ে যাবার যোগাড়।

এ সব দেখেশুনে আমি ভাবলাম—হাজার রাত হলেও, আজই মৃতদেহ এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তা না হ'লে ওকে ছাড়ানো তো যাবেই না, কান্নাও থামানো যাবে না।

বন্ধুকে ডেকে বললাম—দেখ, আমি একটু ঘুরে আসছি। জন কয়েক লোক লাগবে বুঝতেই তো পারছ, তাদের গিয়ে ডেকে আনি।

এ কথা শুনেই বন্ধু একেবারে চুপ। তার চেহারা কেমন বদলে যেতে লাগল। যে-মুখে একটু আগে এক শোকের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সে-মুখ এখন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটে এসে সে আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বললে—ভাই, দোহাই তোমার! এই নিশুতি রাতে এই মড়ার কাছে আমাকে একলাটি ফেলে তুমি যেও না। আমি তাহলে নিশ্চয়ই হার্টফেল করে মরে যাব।

আমার পক্ষে আর বিরক্তি চেপে রাখা সম্ভব হ'ল না। বললাম—একটু আগেই না ওঁকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলে না! বলতে না, ওঁকে ছেড়ে তুমি এক দণ্ডও বাঁচবে না? ওঁকে কত না তুমি ভালোবাসতে? এরই মধ্যে সব উবে গেল? আমি না থাকলে অল্পক্ষণের জন্য পাশে বসে থাকতেও তোমার এত ভয়?

কে শোনে কার কথা! বন্ধু খালি ব্যাকুলভাবে বলতে লাগল—সে হবে না ভাই, তুমি আমাকে কিছুতেই একা ফেলে যেতে পারবে না। যাও তো ফিরে এসে দেখবে, বন্ধু আর বেঁচে নেই। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি, ইত্যাদি।

একটু থেমে শরৎচন্দ্র বললেন—এখানেই এই কাহিনীর শেষ নয়। মনে আছে, মাস দুই পরে একখানা রঙীন চিঠি পেয়েছিলাম—বন্ধুবরের দ্বিতীয়বার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র।

বরযাত্রী

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"১৩২২ সালে বন্ধুবর মণিলাল (গঙ্গোপাধ্যায়) এবং আমি 'ভারতী'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করি। ২০ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে (এখন কৈলাস বসু স্ট্রীট) ছিল ভারতীর কার্যালয় এবং নীচের তলায় কান্তিক প্রেস। তখন শরৎচন্দ্র প্রায় আসতেন ভারতী অফিসে এবং সকলের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তা যেমন অমায়িক, তেমনি স্নেহশীল। সকলের প্রীতি-শ্রদ্ধা তিনি নিজের স্বভাবের গুণে পরিপূর্ণ ভোগ করতেন।"

সৌরীনবাবুদের আমলে 'ভারতী' অফিসে তখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকরা প্রায় প্রতিদিনই এসে জমতেন। সৌরীনবাবু আর মণিবাবু তো থাকতেনই। তাই তখন ভারতীর আড্ডা এক রকম রোজই জমজমাট থাকত।

এই ভারতীর আসরের একদিনকার কথা সম্বন্ধে সৌরীনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"আমাদের ভারতীর আসর একদিন বেশ সরগরম। শরৎচন্দ্রও সে আসরে আছেন। আমি বলছি গল্প—ক'দিন আগে আমরা (পারিবারিক গোষ্ঠীভুক্ত ক'ভাই—তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর) হাওড়া-শিয়াখালা লাইনের শিয়াখালা গ্রামে বরযাত্রীর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম।

বরপক্ষ বেশ বনেদী এবং ধনী। বরযাত্রীর সংখ্যাও ছিল বেশ ভারী। বরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন বরকর্তা। আমাদের নিয়ে তিনি ও লাইনের ছোট গাড়ীতে উঠলেন। আমরা একটি দল একখানা ইণ্টার-কামরা দখল করে বসলুম। ট্রেন চললো ঘর বাগান ফুঁড়ে, এর পাঁচিল ঘেঁসে, তার ডোবার পাড় দিয়ে, কোথাও বারোয়ারিতলা, হাট কি মন্দিরের গা ঘেঁসে। ভারী মজা লাগছিল। তারপর শিয়াখালা স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের

প্রায় দশ-বারোজনকে নিয়ে বরকর্তা চললেন পল্লীর পথে, পুকুরপাড় দিয়ে বনবাদাড় ঘুরে। বাকি বরযাত্রীদের চার্জ নিলেন তাঁর এক আত্মীয়।

শিয়াখালার একটি বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসাবার ব্যবস্থা। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট হেঁটে, এর ছাঁচতলা, তার গাছতলা দিয়ে আমরা যে বাড়ীতে এসে পৌঁছুলুম, সেটি বেশ বড় বাড়ী। দু-মহল বাড়ী, বাহিরের মহল একতলা। গুল্-বসানো সদর দরজা দিয়ে ঢুকে প্যাসেজ। প্যাসেজের দু'দিকে বড় বড় দুটি ঘর। একটি ঘরে আমরা বসলুম। প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে উঠান। উঠানের মাঝ-মধ্যখানে উঁচু ফ্লোরের উপর প্রকাণ্ড দালান। পূজাদি হয় দালানে। দরজা-জানালা নেই, শুধু ক'টা খিলান।

আমাদের জন্য এলো মুখ-হাত ধোবার জল, সাবান-তোয়ালে। মুখ-হাত ধুয়ে ঘরে বসা হলো। তখন বৈশাখ মাস, মুখ-হাত ধুয়ে বসবার পর এলো ডাব, চা এবং বড় থালাভরা প্রচুর মিষ্টান্ন, পান, সিগারেট। যথারীতি সে সবের সদ্ব্যবহার করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

এসেটিলিন বাতি জ্বললো ক'টা। তারপর দেখি, ফুল দিয়ে সাজানো চতুর্দোলা এলো। একদল ব্যাণ্ডের বাজনা, কতকগুলো খাসগেলাস এবং মশাল এলো। রাত প্রায় ন'টা বাজে, বর বেরোলো। আমরা চললুম হাঁটতে হাঁটতে বরের চতুর্দোলার পিছনে বরযাত্রীর দল।

বনের মধ্য দিয়ে বর চলেছে প্রোসেশন করে। বরের আগে আগে মশাল, খাসগেলাস, ব্যাণ্ডের বাজনা, বরের পিছনে আমরা বরযাত্রীর দল। যে পথে চলেছি, তাকে পথ বলা চলে না। থিয়েটারের সীনে 'বনপথ' বলে যে ছবি খাটানো থাকে স্টেজে, ঠাসাঠাসি গাছের নীচে দিয়ে পায়ে-চলা পথ, তেমনি পথ। আলো আমরা পাচ্ছি কতটুকুন! সেই আবছা-আলোয় ভেড়ার পাল যেমন চলে তাদের লীডারের পিছু পিছু, তেমনিভাবে চলেছি আমরা। গাছের ডালে খোঁচা খাচ্ছি, কাঁটা ঝোপের আঁচড় খাচ্ছি। এমনিভাবে চলতে চলতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটবার পর হঠাৎ সামনে দেখি আলোর ছটা। মনে পড়লো, থিয়েটারের লাস্ট সীনে উজ্জ্বল দৃশ্যপটের কথা।

পৌঁছুলুম কন্যাপক্ষের গৃহে এবং সেখানে ঘণ্টা দুই আমাদের বসিয়ে রাখবার পর, আমাদের তাড়ায় ছাদে পড়লো আসন। আমরা নিজেরা কলাপাতা বিছিয়ে, ভাঁড়-খুরি নিয়ে নিজেরাই জল পরিবেশন করে চ্যাঁচাতে

লাগলুম—লুচি আনো, লুচি। চ্যাঁচামেচিতে লুচি এলো, কিন্তু তারপর আর কিছু আসে না। না আলু-বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, না ডাল। আবার চ্যাঁচামেচি চীৎকার। এমনি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দু ঘণ্টা পরে খাওয়ার পালা চুকলো। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে সেই আশ্রয়-নীড়ে ফেরা। কিন্তু কি করে ফিরবো, অন্ধকারে জঙ্গল ঠেলে? আলো নেই। কন্যাপক্ষের বাড়ী থেকে একটা বাতি সংগ্রহ করে সেই বাতি জ্বেলে বেরবো, বরকর্তা বললেন—পাগল হয়েছো! অনেকখানি পথ, বাতির আলোয় চলবে না। অপেক্ষা কর; আমি মশালের ব্যবস্থা করি।

কন্যাকর্তাকে ধরে তিনি দুজন মশালধারী গাইড দিলেন। আমরা সেই মশাল-গাইডের সাহায্যে ঘণ্টাখানেক হেঁটে আশ্রয়-নীড়ে ফিরলুম। আমাদের শোবার জন্য জায়গা হয়েছে সেই ঠাকুর দালানে। লম্বা জাজিম পাতা, জাজিমের উপর চাদর পাতা এবং আট-দশটা তাকিয়া।

আমরা ঘর্মাক্ত কলেবরে দালানের সিঁড়িতে বসে হাওয়া খাচ্ছি। একজনের কি খেয়াল হলো, তিনি দালানে পায়চারি করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর পা পড়লো জাজিমের নীচে একটা গর্তয়। তখনি জাজিম তুলে দেখেন, বেশ বড় গর্ত। তিনি সভয়ে চীৎকার করে উঠলেন—সাপের গর্ত, বাবারে!

আমরা দেখলুম গর্ত। দালানে আমাদের জন্য ছিল দুটো এসেটিলিন বাতি এবং একজন ভৃত্য। গর্ত দেখে সাপের ভয়ে সে স্থান শুধু ত্যাগ নয়, সে গৃহও ত্যাগ করলুম। বাড়ীর সামনে মস্ত পুকুর। পুকুর ঘিরে চারিদিকে বড় বড় তালগাছ, বাঁধানো ঘাট, চাতাল, রোয়াক। আমরা একটা জাজিম টেনে নিয়ে চাতালে বসে বসে গল্প করে রাত কাটালুম। একজন ভয় দেখিয়ে বললেন—এখানটাও খুব নিরাপদ নয়।

—কেন?

তিনি বললেন—অনেক সময় তালগাছের মাথায় সাপ থাকে। তালপাতাগুলো বাতাসে খড়খড় করে দুলছে, ওখান থেকে কুণ্ডলীপাকানো এক ঝাঁক সাপ পড়তে পারে!

সর্বনাশ! এমন ভয় থাকলে মানুষ ঘুমোবে কি, সে জায়গায় থাকতে পারে কখনো? কিন্তু উপায় নেই, কোথায় যাবো? পথ যা, তাকে থিয়েটারের বনপথ বলে, রাজপথ নয়—দুধারে ঝোপঝাপ গাছ।

গরম কালের রাতে সাপগুলো গর্ত ছেড়ে চরতে বেরোয়। আমাদের অবস্থা—সেই রামায়ণের মারীচ কুরঙ্গের মতো! কোনমতে তালগাছের মাথার দিকে নজর রেখে রাতটুকু কাটানো হ্লো এবং ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ীতে ফিরে ভৃত্যকে ডেকে জল আনিয়ে মুখ-হাত ধোওয়া।

আর এক মিনিট সেখানে নয়! সোজা স্টেশনে এলুম। স্টেশনে এসে শুনি, প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে ফার্স্ট ট্রেন ছাড়বে। ট্রেনের কামরায় উঠে বেঞ্চে শুয়ে পড়লুম—শোবামাত্র ঘুম। সে ঘুম ভাঙ্গলো বেশ একটু বেলায়, মানে তখন ট্রেন ছাড়তে বিশ-পঁচিশ মিনিট দেরি। যাত্রীরা আসছে দলে দলে, এ দলে কজন বরযাত্রীও ছিলেন।

এ কাহিনী শেষ করে আমি মন্তব্য জানিয়েছিলুম—এমন বরযাত্রী কেউ গিয়েছো কখনো?

শরৎচন্দ্র শুধু বললেন—হুঁঃ! তাহলে বলি শোনো, আমার বরযাত্রী যাওয়ার কাহিনী।

এই কথা বলে তিনি সুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

শরৎচন্দ্র বললেন—অনেক বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতার একটা অফিসে চাকরি করছি, থাকি বৌবাজার অঞ্চলে একটা মেসে।

এই পর্যন্ত বলতেই আমি তুললুম প্রতিবাদ—যাও, বানানো গল্প সুরু করলে। তুমি চিরকাল পশ্চিমে কাটিয়েছ। তারপর কিছুকাল ভবানীপুরে, তারপর বর্মায়। কলকাতার অফিসে চাকরি করতে জুটলে কবে?

গম্ভীরমুখে শরৎচন্দ্র বললেন—তোমার কথাতেই অমনি আমি চাকরি করি নি, মেনে নেবো? তাছাড়া তোমার গল্পের সময় আমরা কেউ একটি কথাও বলি নি, নিঃশব্দে বসে শুনেছি। তুমি কেন আমার গল্পের মধ্যে কথা কও! গল্প শুনতে হ'লে চুপচাপ থাকতে হয়, এটুকু শিক্ষাও হয় নি তোমার?

আমরা সকলে হেসে উঠলুম। আমি বললুম—না, না, তুমি বলো। একটি কথাও বলবো না আর।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, কথা বলবে না, শুধু শুনবে। তবে বানানো গল্প নয়। সত্য ঘটনা বলছি আমি। বিশ্বাস করো।

শরৎচন্দ্র শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।"

শরৎচন্দ্র সেদিন ভারতীর আসরে যে বরযাত্রী যাওয়ার গল্পটি বলেছিলেন, তা হচ্ছে এই :—

আমি তখন কলকাতায় কয়েক মাস ধরে এক মেসে আছি। সেখানে কয়েকজন ছিল আমার সমবয়েসী। বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল আমাদের মধ্যে। একজনের বাড়ী ছিল মগরার দিকে। সে তার বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ করলে—বরযাত্রী যেতে হবে।

কনের বাড়ী ছিল শ্রীরামপুর। বরের সঙ্গে মগরা থেকে শ্রীরামপুর যাওয়া আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তাই ঠিক হ'ল, আমরা যে যার কাজ সেরে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সিধে শ্রীরামপুর যাব। বন্ধুটি আমাদের চারজনের যাওয়া-আসার ইণ্টার ক্লাস রিটার্ন টিকিটের দাম দিয়ে দুদিন আগেই বাড়ী চলে গেল। যাবার আগে গোলাপী কাগজে ছাপা বিয়ের চিঠি দিয়ে বারবার করে বলে গেল, আমরা যেন সময় মতো যাই!

বিয়ের দিন আমরা কাজকর্ম সেরে, যত্ন-সহকারে সাজসজ্জা করে, সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়লাম।

শ্রীরামপুর স্টেশনে গিয়ে যখন নামলাম, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। চেকারকে টিকিটের আধখানা দিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে আমাদের খেয়াল হ'ল, তাই তো, শ্রীরামপুর তো এলাম, এখন যাব কোন্ ঠিকানায়? বিয়ের সেই গোলাপী চিঠি সঙ্গে আনতে আমরা সকলেই ভুলে গেছি। এমন কি মেয়ের বাপের নামও কারো মনে নেই। আমাদের অবস্থাটা তখন ভাবো একবার!

অগত্যা ঠিক করা গেল—বিয়ে তো আর সব বাড়ীতেই হচ্ছে না। অতএব পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক্। যেতে যেতে যে বাড়ীতেই দেখব, ছাদে সামিয়ানা বা রোশনচৌকি, অমনি ঢুকে খোঁজ নিলেই ঠিক মিলে যাবে কনের বাড়ী।

এই মতলব মতো আমরা চার বন্ধুতে তো পথ চলা শুরু করলাম। চলছি তো চলছিই, বিয়ে বাড়ী আর চোখে পড়ে না। মনে হতে লাগল শ্রীরামপুরের বাপ-মায়েরা কি হৃদয়হীন! বিয়ের দিনে মেয়ের বিয়ে দাও না গা!

হঠাৎ গলির মধ্যে এক বাড়ী থেকে শাঁখের শব্দ কানে এল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই ঐ আমাদের কনের বাড়ী। তাড়াতাড়ি শাঁখের শব্দ লক্ষ্য করে গিয়ে বাড়ীটা আবিষ্কার করলাম। দেখলাম, সামনেই একটা দালান, সেই দালানেই আসর। বরের জন্য জরিদার লাল ভেলভেটের আসন পাতা, কিন্তু বর নেই। ভাবলাম, সন্ধ্যার পরই বিয়ের লগ্ন, বর হয়তো বাড়ীর ভেতর।

বাড়ীতে লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। কাকেও চিনি না। আর আমাদেরও কেউ চেনে না। চিনবেই বা কি করে? আমরা তো শুধু বরেরই পরিচিত। যাকগে, চেনাচিনিরই বা দরকার কি? আমরা গেছি বরযাত্রী, আমাদের চর্ব্যচোষ্য হলেই হ'ল। আসরের একধারে আমরা গিয়ে জাঁকিয়ে বসলাম।

নিজেরাই বসে গল্প করছি। কিছুক্ষণ পর একটি ছেলেকে দেখলাম বিয়ের পদ্য বিলোতে এল। আমাদেরও হাতে একখানা করে দিল। পদ্য পড়েই তো আমাদের চক্ষুস্থির! বরের নাম দেখি কি এক পাল! আমাদের বন্ধুবরের উপাধি চক্রবর্তী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। অতএব, আর এখানে বসা নয়, সবার অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে সরে পড়লাম।

পথে তখন বেশ অন্ধকার। আমাদের মনও তখন ভাবনায় অন্ধকার। পথে যাকেই দেখি জিজ্ঞাসা করি—মশায়, এখানে বামুন বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে কোথায় বলতে পারেন? আমাদের কথা শুনে কেউ হাসে, কেউ একটু বিরক্ত হয়, কেউ আবার মুখের দিকে কেমন যেন সন্দেহভরে তাকায়। এ তো ভালো বিপদে পড়া গেল দেখি! কেউ কথা বলে না কেন?

অবশেষে একজনের কি দয়া হ'ল। সে আমাদের সব কথা শুনে বললে—কোথাকার বর বলুন তো?

আমরা বললাম—মগরার।

মগরার?—ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হ'ল, এ সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন। কাছাকাছি একটা বাড়ীর খোঁজও দিলেন। আমরা তাঁর নির্দেশ মতো এ-গলি ও-গলি খানিক ঘুরে একটা বিয়েবাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। সন্ধান নিয়ে জানা গেল, হ্যাঁ এ বাড়ীতে বর চক্রবর্তীই বটে।

বাড়ীর সামনেই মস্ত উঠান। পথ থেকে সুন্দর রাঙচিতের বেড়া পেরিয়ে তবে ঢুকতে হয়। উঠানেই আসরের ব্যবস্থা হয়েছে। বিয়ের আসর লোকজনে গমগম করবে, তা নয়। সব কেমন খালি খালি, কেমন যেন থমথমে ভাব।

মনে কেমন একটু খটকা লাগল। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বিয়ের আগে যৌতুক নিয়ে বরপক্ষে আর কন্যাপক্ষে খুব গোলমাল হয়ে গেছে। সোনার ওজনে ঘাটতি পড়ায় বরকর্তা বর প্রায় তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। শেষে পাড়ার সকলে ধরাধরি করে অপোষে এই মীমাংসা হয়েছে যে, কন্যাপক্ষ এই রাত্রের মধ্যেই ঘাটতি পূরণ স্বরূপ নগদ আড়াই-শ টাকা বরকর্তার হাতে ধরে দেবেন। কনের মামা গহনা বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে গেছেন। যাবার আগে বন্ধকের গহনাগুলি বরকর্তাকে দেখিয়ে গেছেন। এদিকে লগ্ন যাতে না বয়ে যায়, সেজন্য বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে।

বরপক্ষের এই আচরণে আমরা তো ক্ষেপে আগুন। ঘটনার সময় উপস্থিত থাকলে, কি করতাম জানি না। যাই হোক্, গোলমাল যখন এক রকম মিটেই গেছে, তখন আর এ নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত মনে হ'ল না।

জুতো ছেড়ে আসরের এক কোণে বসে রইলাম। ঘুরে ঘুরে সকলেই বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলাম। আর খিদেও যা পেয়েছিল, সে আর কি বলব!

ওদিকে বাড়ীর ভেতর ঘন ঘন শাঁখ বাজতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে শাঁখের ডাক আর শুনি না, উলুধ্বনিও বন্ধ হ'ল —বুঝলাম বিবাহপর্ব শেষ হয়েছে। ভিতর থেকে বরপক্ষের দু-চারজন হোমড়া-চোমড়া বেরিয়ে এলেন। তাঁদের মুখ বেশ গম্ভীর। কন্যাপক্ষের একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—টাকাটা এবার পাওয়া যাবে তো?

—নিশ্চয় পাবেন। কনের মামা গহনা নিয়ে গেছেন, এসে পড়লেন বলে। আপনারা বসুন। আমি এবার খাওয়ানোর ব্যবস্থাটা একটু দেখি,—এই বলে ভদ্রলোকটি বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

এখুনি খাওয়ানোর ব্যবস্থা হবে শুনে আমরা তো পরম তৃপ্তিবোধ করলাম। খিদে তখন যা পেয়েছে!

কখন এই কাজের লোকটির পুনরাগমন হবে, এই আশায় সকলে বসে রইলাম।

হঠাৎ যেন বাজ পড়ল! বাড়ীর ভিতর থেকে গর্জন শোনা গেল—খাওয়াব বইকি! খাওয়াব! রেখে দাও ওসব কুটুম্বপনা! বিয়ে তো হয়ে গেছে। বর তো এখন আমাদের হাতে! খাওয়াচ্ছি দেখ না! ওরে বারীন, কানাই,

নবীন, ঘেন্টু আয় তো তোরা এখানে। ঐ রাঙচিতের বেড়া ভেঙে বেত বানা। তারপর আচ্ছা করে পেটা তো ঐ যত বেটা বরযাত্তিরকে—

শুনে আমরা তো চমকে উঠলাম! খিদে-তেষ্টা কোথায় গেল! তামাশা নাকি ভাবছি! এমন সময় দেখি, সত্যি সত্যিই পাঁচ-ছয়জন জোয়ান ছোকরা ভেতর থেকে বেরিয়ে রাঙচিতের বেড়া খুলতে শুরু করলে। সর্বনাশ! করে কি এরা!

আর করে কি! চক্ষের নিমেষে লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেল। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে, মারছে। সে কি বেদম মার! আমরা চার বন্ধুতে মিলে পালাতে পথ পাই না। মুহূর্তমাত্র জুতোর জন্য একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম বটে, কিন্তু তার বেশী নয়। মারের ভয়ে জুতোর মায়া কোন্ ছার! মুক্তকচ্ছ হয়ে যেদিকে দুচোখ যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালাম।

ছাত্রাবস্থা পার হবার পর এমন ছোটা আর ছুটি নি! একে শ্রীরামপুরী কৃষ্ণ রাত, তার ওপর তীর্থযাত্রীর মতো খালি পা! ছুটছি, পথের ওপর নজর রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বেশ বুঝতে পারছি, পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। কোথায় চোট লাগল, দাঁড়িয়ে যে একদণ্ড দেখব, তার উপায় নেই, কয়েকটা হতভাগা আবার পিছু নিয়েছিল। পায়ের দ্রুত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ফিরিয়ে বারে বারে দেখতে হচ্ছিল—হতভাগারা কতদূরে!

এমনি করে ছুটতে ছুটতে গঙ্গার ধারে পৌঁছে, তবে নিজেদের নিরাপদ মনে করলাম। কারো মুখে কোন কথা নেই, সকলে হাত-পা ছড়িয়ে বসে প্রাণভরে খুব হাঁপাচ্ছি। ঘামের চোটে যাকে বলে ভিজে-কাক ব'নে গেছি। পায়ের দিকে তাকিয়ে নতুন করে সকলের শোক উথলে উঠল। সে যা পায়ের অবস্থা! কত জায়গায় যে কেটে গেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কতগুলি কাটা জায়গায় ধুলো জমে বেশ ফুলে উঠেছে। ভাবলাম, এর চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাঙচিতের প্রহার খাওয়া যে ছিল অনেক ভালো।

গঙ্গায় নেমে ভাল করে পা ধুয়ে নিলাম, চোখে-মুখেও জল দিলাম। এতে কিছুটা সুস্থবোধ করলাম বটে, কিন্তু এক নতুন উপসর্গ এসে উপস্থিত হ'ল, সেই পুরোণো খিদে। প্রাণরক্ষার তাড়নায় পেটের জ্বালা যে ভীষণ জ্বালা, তা এতক্ষণ ভুলেই ছিলাম—সেই খিদে আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। খিদেরই বা দোষ কি বলো! রাত তো কম হয় নি, তার ওপর সন্ধ্যা থেকে

যা ব্যায়ামের ঘটা! বত্রিশ নাড়ির টান, সে তো কম কথা নয়! সেই টানে আবার সচল হতে হ'ল। লক্ষ্য—কোন দোকানপাট বা হাট-বাজার, আহার্য বলে কোন বস্তু যেখানে মেলে।

ঘুরতে ঘুরতে ছোট্ট একটা দোকানের সামনে এসে পড়া গেল। ঝাঁপ তখনো খোলা, তবে দোকানীকে দেখলাম, মাদুর বালিশ নিয়ে শোবার যোগাড় করছে। আমরা গিয়ে তাকে বললাম—একটু সবুর কর বাপু! তোমার দোকানে খাবার আছে?

সে বললে—আজ্ঞে তা আছে। সিঙাড়া, নিমকি, গজা আর পান্তুয়া।

আমরা বললাম—বেশ, বেশ, তাতেই হবে। আমরা চারজন আছি, ভয়ানক খিদে পেয়েছে, বেশ ভাল করে খাওয়াও দেখি।

অত রাত্রে চারজন শাঁসালো খদ্দের পেয়ে দোকানী তো মহা খুশী। তাড়াতাড়ি আমাদের হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিল। তারপর শালপাতার ঠোঙা বানিয়ে, পরম উৎসাহে খাবার পরিবেশন করতে লাগল।

তার মজুত মাল আমরা কয়েক পলকেই সাফ করে দিলাম। তারপর প্রচুর জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ করে জিজ্ঞাসা করলাম—দাম কত হ'ল হে, বলো এবার!

লোকটা বেশ হিসেবি দেখলাম। চটপট কাগজে ফর্দ বানিয়ে বললে—আজ্ঞে, সাড়ে-সাতটাকা।

আমাদের সকলের পকেট ঝেড়েঝুড়ে টাকা তিনেকের বেশী পাওয়া গেল না। শেষে মরিয়া হয়ে ঐ টাকা ক'টাই দোকানীর হাতে দিয়ে বললাম—দেখ, মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, এর বেশী আর একটি পয়সাও আমাদের কাছে নেই।

দোকানী তো টাকার অঙ্ক দেখে 'অ্যাঁ' করে চোখ কপালে তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

আমরা বললাম—কি করব বলো! কলকাতা থেকে বরযাত্রী হয়ে তোমাদের দেশে এসেছিলাম। তা একটি দানাও দিলে না যে দাঁতে কাটব। উল্টে রাঙচিতের বেড়া খুলে এল মারতে। ঘোরাঘুরি ছোটাছুটিতে খিদেয় প্রায় মারা যাচ্ছিলাম, তোমার দোকানের খাবার খেয়ে তবে বাঁচলাম। এমন হবে তা কি জানি? তাহলে কি সঙ্গে বেশী পয়সা না নিয়ে বেরোই?

আর আগেই পয়সার হিসেব করে খেতে যাই কি করে বলো! খিদে কি তাতে মানতো? এখন এই চারখানা হাফ টিকিট ছাড়া আর কিছু আমাদের কাছে নেই। ইচ্ছে করলে এগুলি তুমি নিতে পারো, আমরা না হয় দুর্গা বলে হেঁটেই কলকাতা পাড়ি দেব।

দোকানী বললে—ও টিকিট নিয়ে আমি কি করব? ও আমার চাই না।

আমরা বললাম—থাক তবে। তারপর সুড়সুড় করে দোকান থেকে নেমে পড়লাম।

কিছু দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি দোকানী তখনো হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সৌরীনবাবু লিখেছেন—"গল্প শেষ হলো, আমরা হেসে খুন।

চারুচন্দ্র বললেন—স্রেফ বানানো গল্প।

শরৎচন্দ্র তুললেন প্রতিবাদ। বললেন—এই ছাখো, তবু বলে বানানো গল্প! যথার্থ ঘটনা হে! বিশ্বাস না হয়, বেশ দলের আর তিনজনের মধ্যে একজন এখন থাকে চাঁপাতলায়, তাকে এনে ভজিয়ে দেবো।"

সৌরীনবাবু বলেন—ভারতীর আসরে শরৎচন্দ্র সেদিন আর একটি বরযাত্রীর গল্প বলেছিলেন।

সে গল্পটি সম্বন্ধে সৌরীনবাবু লিখেছেন—

"বরযাত্রীর আর একটি গল্প শরৎচন্দ্র বলেছিলেন। সে গল্প আরো মজার।

তিনি বললেন—বহু বৎসর পূর্বে একবার বরযাত্রী গিয়েছিলুম। হালিশহর স্টেশনে নেমে আট-দশ মাইল যেতে হবে কন্যাপক্ষের বাড়ী। স্টেশনে নেমে দেখি, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী মোতায়েন। গাড়ী মানে, একটা পালকিতে চারখানা চাকা লাগানো, আর সামনে জোতা ঘোড়ার দুটি কঙ্কাল। আমরা চারজন বরযাত্রী যাবো সেই গাড়ীতে চড়ে।

চড়বার আগে গাড়োয়ানকে বললুম—তোর ঘোড়া জ্যান্ত, না টিনের পাতের তৈরি ঘোড়া?

সে চমকে উঠলো। বললে—বলেন কি বাবু! জ্যান্ত ঘোড়া।

যাই হোক্, গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়ী চললো। গাড়োয়ান ক্রমাগত ছিপ্‌টি হাঁকড়াচ্ছে, আর 'হিয়ো-হিয়ো' করছে। আমরা কজনে গল্প-গুজবে মত্ত।

সরু রাস্তা। রাস্তার দুধারে মাঠ আর ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। আধ ঘণ্টা যাবার পর গাড়ী থামলো। তারপর গাড়ী আর চলে না। ঘোড়াকে গাড়োয়ান যা-তা অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে আর দুহাতে ছিপটি দিয়ে পিটছে। শেষে গাড়ী থেকে নামলো গাড়োয়ান। নেমে ছিপটির বাঁট দিয়ে ঘোড়াকে প্রহার!

আমরা গাড়ী থেকে নামলুম। বললুম—করছিস্ কি রে? ঘোড়া যে মরে যাবে!

গলদঘর্ম গাড়োয়ান শেষে ছিপটি ফেলে দিয়ে বললে—না বাবু, গাড়ী যাবে না।

—কেন?

গাড়োয়ান বললে—আজ্ঞে, একটা ঘোড়ার এখনি বাচ্ছা হবে।

এ গল্প শুনে আমরা হেসে খুন।

শরৎচন্দ্র বললেন—তোমরা হাসছো, কিন্তু আমাদের দুর্গতির কথাটা ভাবো! সেই অজানা পাড়াগাঁয়ে বন-বাদাড়ের ধারে আমরা তখন যাকে সাহিত্যে বলে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়!"

[সৌরীনবাবু শরৎচন্দ্রকে ঠিকই বলেছিলেন—"কলকাতায় অফিসে চাকরি করতে জুটলে কবে?"—কেননা শরৎচন্দ্র কলকাতায় কোন অফিসে কোনদিনই চাকরি করেন নি। তাই তাঁর শ্রীরামপুরে বরযাত্রী যাওয়ার ব্যাপারে কিছুও সত্য আছে কিনা, তা বলা যায় না। এ গল্পটা যাই হোক্, দ্বিতীয় গল্পটাও কিন্তু একটা বানানো গল্প বলেই মনে হয়। কেননা শরৎচন্দ্রের দরদী স্বভাবের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, রোগা ঘোড়াকে গাড়োয়ান একটানা দুহাতে ছিপটি দিয়ে পিটছে দেখলে, শরৎচন্দ্র কখনই সে

গাড়ীতে বসে নিশ্চিন্তে গল্প-গুজবে মত্ত থাকতে পারতেন না। তিনি গাড়োয়ানকে তখনই বাধা দিতেন এবং সে গাড়ীতে আর চাপতেনও না।

ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা গাড়ীতে যাত্রী নিয়ে ঘোড়াকে চাবুক মারে বলে, শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ ঘোড়ার গাড়ীতে চাপতেন না। ঘোড়ার প্রতি শরৎচন্দ্রের এইরূপ দরদের প্রসঙ্গে সৌরীনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থেই অন্যত্র লিখেছেন—

"১৯২০-২১ সালের কথা। শিশির-সম্পাদক শিশিরকুমার মিত্র তখন শিশির পাবলিশিং হাউস খুলেছেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় বড় হলঘরে তাঁর অফিস। তিনি প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর'। শরৎচন্দ্র উপন্যাস দেবেন 'বামুনের মেয়ে'—কথাবার্তা পাকা।

শরৎচন্দ্র তখন থাকেন শিবপুরে। শিশিরকুমার মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় যান তাঁর কাছে শিবপুরে তাগাদা দিতে এবং আরো নানা কথা আলোচনা করতে। গল্পাদি করে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায়। তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করতেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়ী ছিল গলির মধ্যে। তিনি প্রায়ই গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার উপর এসে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতেন। ঘোড়ার গাড়ী দেখে শরৎচন্দ্র খুঁৎখুঁৎ করতেন। বলতেন—ঘোড়ার গাড়ীতে চড়, আমার মনে ব্যথা লাগে। গাড়োয়ানরা চাবুক মারে ঘোড়াকে, আমি কেমন সহ্য করতে পারি না।

শিশিরকুমার বললেন—ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া আসবো-যাবো কি করে? অত রাত্রে ট্রামও পাওয়া যায় না এবং হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ নয়।

তিনি যতবার ঘোড়ার গাড়ী দেখেছেন, ততবারই কাতরভাবে অভিযোগ করেছেন।"]

কাশীর ভূত

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় একবার শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি ভূত মানো?

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—ওরে বাবা খুব মানি! ভূত দেখেছি। তাছাড়া আমার বাবার মুখে একটি কাহিনী যা শুনেছি, তা ভুলবার নয়।

শরৎচন্দ্র তখন তাঁর বাবার দেখা বা প্রত্যক্ষ করা ভূতের গল্পটি সৌরীন-বাবুকে শুনিয়েছিলেন। সে গল্পের ঘটনা কাশীধামের।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

বাবা কাশীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন। পূজার্চনায় তাঁর বেশ মন ছিল। নিত্য অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের মন্দিরে যাওয়া এবং অন্য মঠ-মন্দিরে ঘোরা বাদ দিতেন না।

একদিন তিনি এক মন্দিরে শুনলেন, এক ভদ্রলোকের দুঃখের কাহিনী।

ভদ্রলোক বললেন—তাঁর বাড়ীতে তিনি নিত্য পূজা করেন—শালগ্রাম শিলা পূজা। তিনি নিজে পূজা করেন, রাত্রে ঠাকুরের আরতি করেন এবং রাত্রে আরতির পর ঠাকুরঘরটি বেশ গুছিয়ে রেখে আসেন। ঠাকুরঘরে তালা লাগানো থাকে রাত্রে। কেন না, বিগ্রহের অঙ্গে সোনার গহনা আছে, পাছে চুরি যায়।

ভদ্রলোক বললেন—রাত এগারোটা বারোটা নাগাদ তালাবন্ধ ঠাকুরঘরে তিনি •আরতির ঘণ্টা শোনেন। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখেন, কোথাও কেউ নেই, অথচ ঠাকুরের সামনে আসন পাতা। আসনের কাছে থালায় ফুল, তুলসীপাতা প্রভৃতি উপকরণ। সেগুলো বেশ সাজানো-গুছোনো নয়—পাত্র থেকে ফুল প্রভৃতি নিয়ে পূজা করা হয়েছে যেন—কোষাকুষিতে জল পর্যন্ত!

অথচ ভদ্রলোক নিজে আরতি শেষ করে কোষাকুষি, পুষ্পপাত্র প্রভৃতি সাজিয়ে গুছিয়ে যথাস্থানে রেখে, বেরিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ করেছেন। তার উপর শালগ্রাম শিলাকে ঠাকুরের বিছানায় শুইয়ে ভদ্রলোক ঠাকুরের

খাটে মশারি পর্যন্ত ফেলে এসেছিলেন—ঠাকুর ঘুমোবেন। কিন্তু তালা খুলে অত রাত্রে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখেন, ঠাকুরের খাটের ছোট মশারি তোলা। ঠাকুরকে বিছানা থেকে নামিয়ে আসনের সামনে তামার টাটে রাখা এবং শালগ্রাম শিলার গায়ে চন্দনলেপন, ফুল, তুলসীপাতা। তিনি আরতির পর ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর এ চন্দন, এ ফুল কোথা থেকে কে নিয়ে এলো? আশ্চর্য কথা! শুধু এক রাত্রি নয়—প্রতি রাত্রে এ ব্যাপার!

এ কাহিনী শুনে বাবার কৌতূহল হলো। তিনি বললেন—আমাকে সুযোগ দেবেন, এ রহস্যের যদি মীমাংসা করতে পারি!

ভদ্রলোক বললেন—ভূতের কাণ্ড মশায়! তবে মজা এই, বাড়ীতে আজ পর্যন্ত কেউ ভয় পায় নি। এ ভূত ভয় দেখায় না, শুধু ঠাকুরঘরে ঐ আরতি-পূজা করা তার কাজ। টাইম একেবারে বাঁধা—রাত বারোটা নাগাদ এ ব্যাপার ঘটে। তার আগেও নয়, পরেও নয়।

যাই হোক, সে ভদ্রলোক রাজী হলেন এবং বাবাকে সেই রাত্রেই তাঁর বাড়ীতে আসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

বাবা সেদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করলেন না। গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধাচারে ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। পূজারতি দেখলেন এবং পূজারতির পর যথারীতি ঠাকুরঘর যখন তালাবন্ধ হবে, তিনি তখন গৃহস্বামীকে বললেন—রাত্রে তালাবন্ধ করবেন না, আমি ঠাকুরঘরে থাকবো রাত বারোটা পর্যন্ত। তবে আমি একলা থাকবো, আপনারা কেউ ঠাকুরঘরে থাকবেন না।

ভদ্রলোক রাজী হলেন এবং বাবা ঠাকুরঘরে রইলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো।

তারপর দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো এবং বারোটা বাজে-বাজে, তখন বাবা দেখলেন—গরদের থান পরা, গায়ে নামাবলী জড়ানো এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘরে! কোথা দিয়ে এলেন, তা নজরে পড়ে নি। তিনি ব্রাহ্মণের পানে ঠায় চেয়ে আছেন।

ব্রাহ্মণ আসন পাতলেন, কোষাকুষি নিয়ে তাতে ঘড়া থেকে গঙ্গাজল ঢাললেন। তামার টাট নামিয়ে আসনের সামনে রাখলেন, শালগ্রামকে শয্যা থেকে বার করে সেই তামার টাটে রাখলেন।

বাবা অতি নিকটে বসে আছেন, তাঁর দিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দৃকপাত নেই।

বাবা নিঃশব্দে দেখছেন। ব্রাহ্মণ পূজায় বসলেন—কোষার জল নিয়ে আচমন, আসনশুদ্ধি, তারপর পূজা। সচন্দন ফুল পড়তে লাগলো শালগ্রামের গায়ে—যথারীতি পূজা। বাবা কাঠ হয়ে বসে সে পূজা দেখছেন। তারপর আরাত। ঘণ্টা বাজিয়ে, পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে যথারীতি আরতি। তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হঠাৎ অদৃশ্য হলেন!

বাবা ঠাকুরঘরের দরজা খুললেন। ঘরের বাইরে ভদ্রলোক এবং তাঁর বাড়ীর·কজন পরিজন। বাবা তাঁদের সমস্ত ব্যাপার বললেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চেহারার যে বর্ণনা দিলেন, শুনে ভদ্রলোকের গায়ে রোমাঞ্চ! তিনি বললেন—এ চেহারা আমার স্বর্গগত বাবার। তিনি নিজে পূজাদি করতেন।

বাবা বললেন—কাল রাত্রেও আমি এ ঘরে থাকবো এবং চেষ্টা করে দেখবো যদি কোন কথা জানতে পারি।

পরের দিন রাত্রে বাবা কি করলেন জানো? সে রাত্রে ভদ্রলোককে পূজারতি করতে দিলেন না। বললেন—আমিই পূজারতি করবো এবং পূজায় বসবো রাত পৌণে বারোটায়।

কথামতো কাজ। ঠাকুরঘরে বাবা পূজায় বসেছেন। তিনি আরতি করবেন, হঠাৎ পাশে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ!

বাবা বললেন—আমায় অনুমতি দিন, আমি আরতি করি।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন— করো, আমি দেখবো।

বাবা আরতি করলেন। আরতির পর বৃদ্ধকে বাবা বললেন—আপনি কেন এত কষ্ট করে ইহলোকে আসেন?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—ছেলে পূজারতি করে, কিন্তু শুদ্ধাচারে করে না। তার চায়ের নেশা, সন্ধ্যায় চা খেয়ে তারপর আরতি করে।

—আমি তাঁকে মানা করে দেবো।

—হ্যাঁ, তাকে বুঝিয়ে বলবে—ঠাকুর-দেবতার পূজায় ফাঁকি চলে না। পূজা যদি করতে হয় তো আচার রক্ষা করে পূজা করা চাই, না হ'লে শুধু ফুল ফেলা আর ঘণ্টা নাড়াতেই ঠাকুরের পূজা হয় না। বহুকাল থেকে আমি ওর এ অনাচার লক্ষ্য করছি। পূজারতি অনেক কাল থেকেই আমি রাত্রে এসে করি। সকালে যারা ঠাকুরঘর ধুয়ে মুছে সাফ করতে আসে, তাদের খেয়াল থাকে না, ঘরে এত ফুল পড়ে আছে কেন! তাই ওদের যাতে টনক নড়ে

সেজন্য ঘণ্টা বাজানো সুরু করেছি আরতির সময়। আগে আমার ঘণ্টা নাড়ায় শব্দ করতাম না। এখন করি শুধু এদিকে ওদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

এমনি উপদেশ দিয়ে ব্রাহ্মণ আরো বলেছিলেন—পূজায় যদি মন বা বিশ্বাস না থাকে, তাকে বলো, ভড়ং করবার প্রয়োজন নেই—শালগ্রামকে যেন গঙ্গায় দিয়ে আসে। কিন্তু বহু পুরুষ ধরে এ শিলা ঘরে আছেন, এঁর থাকার জন্য বহু অকল্যাণ রোধ হয়েছে। শিলা হলেন রক্ষক। গঙ্গায় দিলে ঘর-সংসার অরক্ষিত থাকবে, তার ফলে বহু অকল্যাণ হবার আশঙ্কা আছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—বাবা তারপর প্রশ্ন করেন—আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, গয়ায় গিয়ে মরা বাপের পিণ্ডিটা দিয়ে আসতে বলো। এ তো শক্ত কাজ নয়।

সৌরীনবাবু একাগ্রমনে এ কাহিনী শুনছিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—বাবা সেই ভদ্রলোককে পরে সমস্ত কথা বললে, সেই ভদ্রলোক গয়ায় গিয়ে তাঁর মৃত পিতার আত্মার শান্তির জন্য পিণ্ড দিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি পরে আচারনিষ্ঠ হয়ে পূজা করতেন।

অপারেশন

১৩৬০ সালের 'দৈনিক বসুমতী'র শারদীয়া সংখ্যায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেমাঙ্কুরবাবুর সেই লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"হয়তো অনেকেই জানেন না যে, শরৎচন্দ্র খুব ভালো গল্প-বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তাঁর লেখার চেয়ে গল্প বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর। এ কথা এই জন্য বলছি যে, ছাপা হয়ে যাবার পর সে গল্প বা কাহিনীর অন্য কোন রূপ কল্পনা করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একই ঘটনা বা কাহিনীকে শরৎচন্দ্র দিনের পর দিন ভিন্ন ভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তুলতেন—একদিনের বর্ণনার সঙ্গে অন্যদিনের এত তফাৎ থাকত যে, একই ঘটনাকে ভিন্ন বলে মনে হ'ত।

প্রতিভার লক্ষণই হচ্ছে—'মুড্'। তিনি যেদিন যে রকম ভাবের খেয়ালে মশগুল থাকতেন, বর্ণনাও সেদিন সেই ভাবে রঙিয়ে উঠত।

শরৎচন্দ্র আমাদের আড্ডার নিয়মিত আড্ডাধারী ছিলেন। যখন শিবপুরে থাকতেন, তখন তো প্রায়ই আসতেন। এমন কি কলকাতা থেকে পানিত্রাস (শরৎচন্দ্রের গ্রামের নাম সামতাবেড়। সামতাবেড়ের পাশেই পানিত্রাস। পানিত্রাস সামতাবেড়ের ডাকঘর।) চলে যাবার পরও তিনি ঘন ঘন আসতেন আমাদের আড্ডায়, আর আমরাও মাঝে মাঝে সেখানে যেতুম।

শরৎচন্দ্র আমাদের সবাইকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন। এক সত্যেন-বাবুকে (সত্যেন দত্ত) 'আপনি' বলতেন। আমাদের আড্ডার চারু বন্দ্যো-পাধ্যায় ও সৌরীন মুখোপাধ্যায় তাঁর পুরাতন বন্ধু ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ভাগলপুরে থাকতে ওঁদের জানাশোনা হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রকে আমরা শরৎদা বলতুম। বয়সে ছোট সব পরিচিত লোকই তাঁকে শরৎদা বলে ডাকত। শরৎদা যেদিন আসতেন, সেদিন তিনিই হতেন আমাদের গোষ্ঠীমঞ্চের প্রধান নট। নানা রকমের গল্প ও আলোচনায় তিনি

একাই আসর এমন জমিয়ে তুলতেন যে, আড্ডা ছেড়ে লোক আর উঠতেই চাইত না। আমাদের আড্ডায় তাঁর জন্য একটি ইজিচেয়ার নির্দিষ্ট ছিল। তিনি এলেই সেই আসন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। আসন গ্রহণ করবার পাঁচ-সাত মিনিট যেতে না যেতেই সুরু হ'ত কথার ঝরণা—

গল্প বলতে বলতে শরৎদা ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, আর সেই সঙ্গে বাড়ত অস্থিরতা। সিগারেটের পর সিগারেট উড়ছে, কাপের পর কাপ চা উড়ছে, তার সঙ্গে ছুটেছে অবিরাম গল্পের ফোয়ারা। থেকে থেকে তিনি আসন ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করে দিতেন—অস্থিরতা একটু কমে গেলে আবার এসে বসে সুরু করতেন কথা।

এই সময় শরৎদা আমাদের কাছে এমন অনেক গল্প করেছেন, যা পরে সাহিত্যে রূপ পেয়ে অমর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর গল্প বলবার অপূর্ব ভঙ্গি ও অভিনয়, কণ্ঠস্বর কখনো উঠছে, কখনো নামছে—ধ্বনির মধ্যেই হাস্য-রুদ্র-করুণ রসের প্রস্রবণ,—তা হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য।

শরৎদার বর্ণিত অনেক গল্পের মধ্যে একটা গল্প এখনো সাহিত্যে রূপ পায় নি বলে মনে হচ্ছে। সেটি হচ্ছে তাঁর হার্ণিয়া অপারেশনের কাহিনী। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তাঁর সেই বর্ণনার অপূর্ব জৌলুষ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেলেও, যতটুকু এখনো মনে আছে তাও উপভোগ্য হবে বলে মনে করে প্রকাশ করছি। শরৎদার জবানিতেই আরম্ভ করা যাক :—

একবার ছেলেবেলায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হয়ে গেল হার্ণিয়া। মহা মুস্কিল, চলতে ফিরতে পারি নে, যন্ত্রনায় অস্থির! গেলুম ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার মানে আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার। ডাক্তার তো অবস্থা দেখে নিজেই ভড়কে গেল। সে বললে—এ তো এমনিতে যাবে না, অস্ত্র করতে হবে। ট্রাস পরে থাকলে যন্ত্রণার অবসান হবে, কাজকর্ম অল্পস্বল্প করতে পারবে। নইলে অবিলম্বে মারা যাবার সম্ভাবনা আছে।

বলে কি রে বাবা! কোমরে সেই ট্রাস এঁটে আমি বেড়াতে পারব না। এতে যাই হোক্!

বললাম—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, অস্ত্র করলে ভালো হতে পারি না?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললে—হ্যাঁ, তা ভালো হতে পার, আবার—

—আবার কি মশায় ?

—আবার না-ও হতে পার। হার্নিয়া অপারেশন করে শতকরা পঞ্চাশটি লোক মারা যায়। তাছাড়া অপারেশনের পরেও আবার হতে পারে।

—তবে উপায়! আমি তো মশায় ট্রাস পরে ঘুরে বেড়াতে পারব না—তাতে মারা যাই যাবো।

ডাক্তার এমন করে একটা ঢোঁক গিললেন, যাতে মনে হ'ল অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু তা না বলাই ভালো। যাই হোক, ঢোঁকের পর কিছু উদ্গারের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু সে উদ্গার উঠছে না দেখে, জিজ্ঞাসা করে ফেললুম—ডাক্তারবাবু, আমি অপারেশন করাব স্থির করেছি, আপনি করবেন ?

ডাক্তার বললেন—ও সব বড় বড় অপারেশন কি আর বাড়ীতে হয় হে! কাটাতে যদি চাও তো হাসপাতালে যেতে হবে।

হাসপাতালের নাম শুনে দস্তুর মতো ভড়কে গেলুম। দুনিয়ায় যার কেউ নেই, সে ব্যক্তিও নেহাৎ জীবন-মরণের ব্যাপার না হ'লে সেকালে হাসপাতালে যেত না। সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, হাসপাতালে ঢুকলে তাকে একেবারে খাটে চড়ে বেরোতে হয়। আগের দিনে যেমন লোকে উইল করে তীর্থ করতে যেত, সে সময়ে হাসপাতালে যেতে হ'লেও বিষয়ী লোক উইলের কথাটা ভেবে নিত।

যাই হোক্, বাড়ীতে হাসপাতালের নাম করতেই তো সেখানে মড়া কান্না উঠে গেল।

গুরুজনেরা বললেন—ডাক্তারের ত্রি-সীমানায় যেও না, বাঘে ছুঁলেই আঠার ঘা।

জোরসে জড়ি-বুটি, মন্ত্রপূত তৈল, কবচ ইত্যাদি চলতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষকালে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ঠিক করলুম—যা থাকে কপালে, হাসপাতালে গিয়ে অস্ত্রই করাব। সেরে যদি যাই তো বেঁচে গেলুম, আর যদি মরে যাই তো এ যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে যাব। এই মনে করে কিছু টাকা সংগ্রহ করে, একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে কলকাতা আসা গেল।

মেডিক্যাল কলেজে ঢোকা হবে না, তাহলে বাড়ীর লোক টের পেয়ে গিয়ে

বাধা দিতে পারে মনে করে, ভাবলুম অন্যত্র কোথাও চেষ্টা করে দেখা যাক্। কিন্তু অন্যত্র কোথায় বা চেষ্টা করি! এখন যেমন অলিতে গলিতে হাসপাতালের ছড়াছড়ি, তখন তা ছিল না। খোঁজ করতে করতে শেষকালে হদিশ একটা লেগে গেল।

কলকাতার একজন উৎসাহী চিকিৎসক, ডাক্তার চৌধুরী তাঁর নাম। তিনি একটি বেসরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই যুগে। ভদ্রলোক জীবন-মরণ পণ করে সেই হাসপাতাল ও তৎসংলগ্ন মেডিক্যাল স্কুলে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। তখনকার দিনে শহরের উপান্তে শৃগাল-নেকড়ে অধ্যুষিত খানিকটা জমিতে চালাঘরে ছিল সেই হাসপাতাল। যে রুগীকে সব হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত, তারা গিয়ে জুটত সেই চৌধুরীর হাসপাতালে। ঠিক করা গেল, এইখানে গিয়ে ভর্তি হ'লে কোন খোঁজ পাওয়া বাড়ীর লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না।

পরের দিন সকালবেলা তো ভাই তাদের আউটডোরে গিয়ে বললুম—আমি হার্ণিয়া কাটাতে চাই।

—আরে এস এস।—তারা শুনে তো আমায় মহাসমাদর করে ভর্তি করে নিলে। বললে—বড় ভাল সময়ে এসে গেছ তুমি। কাল আমাদের বড় সার্জেনের অপারেশন করবার দিন। একটু পরেই তিনি আসবেন, তোমায় দেখেশুনে যাবেন।

ভর্তি হয়ে গেলুম। বড় সার্জেন এসে দেখে গেলেন। সঙ্গে ডাক্তার চৌধুরীও এলেন। তিনি বললেন—আজ আর তোমায় খেতে-টেতে কিছু দেওয়া হবে না। জোলাপ খেয়ে শুয়ে পড়।

আমাকে একটা আলাদা ঘরে থাকতে দেওয়া হ'ল। ভাবলুম, ভালই হ'ল। অন্য রুগীদের সঙ্গে থাকতে হ'লে তারা সব চ্যাঁ-ভ্যাঁ করবে দিনরাত, এ বেশ নিরালায় থাকা যাবে।

শুয়ে আছি আর ভাবছি। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ এক ভদ্রলোক একটি আউন্স-গ্লাস ভর্তি করে জোলাপ এনে বললে—নাও, খেয়ে ফেল। এটা জোলাপ।

বললুম—মশাই, জোলাপ তো খাওয়াচ্ছেন—তার আগে দয়া করে পায়খানাটা দেখিয়ে দেবেন কি?

লোকটা তিরিক্ষি হয়ে বললে—বাক্যি-টাকা তো বেশ বেরোয় দেখছি—ঐ যে পায়খানা।

পায়খানাটা দেখিয়ে দিয়ে লোকটি বললে—যাও, আজকের মত উঠে হেঁটে যাও, আর তো উঠতে হবে না—

আউন্স-গেলাসটা শেষ করে তার হাতে দিয়ে বললুম—কেন মশাই?

বেশ চটে গিয়ে সে বললে—কেন মশাই! এখানে মরতে এসেছ কেন? সজ্ঞানে কি কেউ এখানে আসে!

—বলেন কি!

—হ্যাঁ কেউ রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ল—কেউ বিষ খেয়ে শেষ অবস্থায় পৌঁছল—যার তিন কুলে কেউ নেই, রাস্তায় পড়ে মরছে, রাস্তার লোকে তুলে এইখানে পৌঁছে দিয়ে গেল—লাশটা মড়া কাটার কাজে লাগল—

লোকটা আরো কি সব গজ-গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ভাবলুম, আর কেন, এবার লম্বা দেওয়া যাক। শেষকালে কি বেঘোরে প্রাণটা খোয়াব! গুটি গুটি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছি, একটু ফাঁকা পেলেই সরে পড়ব। কিন্তু লোক লোক লোক—লোক চলার আর বিরাম নেই। সবাই হাঁ করে আমার মুখের দিকে চায়। এই রকম করতে করতে প্রায় দু ঘণ্টা কেটে যাবার পর একটু নিরিবিলি হতেই, পালাব মনে করে কয়েক পা এগিয়েছি—এমন সময় পেটের ভেতর, বুঝলে কিনা, ডাক ছাড়লে—কৌন হ্যায়?—

দরজার দিকে না গিয়ে ছুটতে হ'ল পায়খানায়। এক পায়খানাতেই হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। কিন্তু রেহাই নেই—বার কয়েক যাতায়াত করে একেবারে নিঃঝুম হয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

সন্ধ্যে হবার একটু আগে ডাক্তার চৌধুরী এসে একবার দেখে গেলেন। বললেন—ঘর ঠিক আছে তো?

বললুম—ঠিক আছে কি মশায়? খিদের চোটে মারা গেলুম যে। হয় আমাকে কিছু খেতে দিন, নইলে আমি বাইরে গিয়ে খাবার-দাবার খেয়ে আসি।

ডাক্তার চৌধুরী খিঁচিয়ে উঠলেন—বাইরে খাবার খেয়ে এসে একেবারে আমায় উদ্ধার করবে—জানো, তোমার পেট থেকে বদহজম খাবার বের করতে

আমার কত খরচ হয়েছে? আজ আর কিছু খেতে পাবে না—কাল অপারেশন হবে, চুপ করে শুয়ে থাক।

দেখলুম, এখানকার সবার মেজাজ তেরিয়া। যাক্, পড়েছি মোগলের পাল্লায় মনে করে চুপ করে পড়ে রইলুম। সারারাত অন্ধকারে পড়ে পড়ে নানান্ ভাবনায় ঘুমই এল না।

'কালনিশি পোহাইল!'

ভোর হতে না-হতেই দুই যমের দূত ঝোলা নিয়ে এসে হাজির।

বললে—চল।

—কে বাপু তোমরা? কোথায় যেতে হবে?

দু-একজন লোক—খুব সম্ভব হাসপাতালেরই পুরোনো রুগী তারা, সকাল বেলা এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছিল। এগিয়ে এসে বললে—ঝোলায় উঠে পড়—উচ্ছুগ্‌গু হবার আগে ঝোলায় চড়তে হয়।

বুঝলুম, অপারেশন রুমে নিয়ে যাবার জন্য ঝোলা এসেছে। বললুম—চল, আমি হেঁটেই যাচ্ছি, ঝোলায় চড়বার দরকার নেই।

যমদূতেরা কিছুতেই শুনলে না। তারা একরকম জোর করে আমায় পেড়ে ফেলে নিয়ে চলল অপারেশন-রুমে।

অপারেশন-রুমে পৌঁছে দেখি, সেখানে অনেক লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার চৌধুরীও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। দেখলুম, তিনিই সর্বেসর্বা।

আমায় নিয়ে যাওয়া মাত্র ডাক্তার চৌধুরী বললেন—এস এস ছোকরা, তাড়াতাড়ি এই টেবিলে শুয়ে পড়। ভয় কি—ভয় নেই—কিচ্ছু ভয় নেই—

মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল—ভরসাও তো কিছু পাচ্ছি নে।

আমার কথা শুনে ডাক্তার চৌধুরী চটে লাল—ভরসা পাচ্ছ না তো এখানে এসেছ কি করতে—শোবার হয়তো শুয়ে পড়, নয়তো চলে যাও—

অন্য যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা মাঝে পড়ে বললেন—যাক্ যাক্, শুয়ে পড়, তোমার কোন ভাবনা নেই।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—মশায়, অজ্ঞান করা হবে তো?

চৌধুরী মশায় খিঁচিয়ে উঠলেন—না, তোমায় মুরগী জবাই করা হবে—এখন শুয়ে পড় তো।

ইষ্টনাম জপতে জপতে তো শুয়ে পড়া গেল। শুতে না শুতে মুখের ওপর কি একটা বাটির মত চাপা দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে ছাড়তে লাগল ক্লোরোফর্ম।

বাপরে বাপ! একি দম বন্ধ করে দিয়ে অজ্ঞান করবে নাকি! কিন্তু প্রথমটা তাই মনে হলেও, পরে বেড়ে লাগতে লাগল হে! ক্লোরোফর্ম বেশ উঁচুদরের নেশা হে! হ'ল মন্দ নয়। শুয়ে শুয়ে বেড়ে নেশা উপভোগ করতে লাগলুম। কিন্তু সুখের পথে পদে পদে কণ্টক। একবার শুনলুম কে যেন বললে—হয়ে গিয়েছে।

—ওরে বাবা! হই নি—হই নি—এখনো অজ্ঞান হই নি। ডাক্তারবাবু এখনো আমার জ্ঞান আছে।

ডাক্তার চৌধুরীর গলা পেলুম—হও নি তো আমায় কেতাথ করেছ—শীগ্‌গির অজ্ঞান হও বলছি, নইলে সজ্ঞানেই অস্ত্র করে দেব।

নাকের ওপর ভোঁস ভোঁস করে সজোরে ক্লোরোফর্ম এসে পড়তে লাগল। নেশায় বুঁদ হয়ে গেলুম, কত রকমের মজার কল্পনা এসে জুটতে লাগল। ডাক্তার চৌধুরীকে নিয়ে মনে মনে একটা মজার গানও তৈরি করে ফেললুম। সেটা গাইব কিনা ভাবছি, এমন সময় চৌধুরীর গলা পেলুম—ছোকরা!

—আজ্ঞে।

—এখনো তুমি অজ্ঞান হও নি! হায় হায়, বদমাইস আমার চার আউন্স ক্লোরোফর্ম মেরে দিলে। লোকের কাছে ভিক্ষে করে আমি হাসপাতাল চালাই—এ রকম আর দুটি জুটলে তো হাসপাতাল তুলে দিতে হবে।

বললুম—আজ্ঞে মনে হচ্ছে এইবার অজ্ঞান হয়ে যাব।

বেশ কড়া গলায় ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কত রকম নেশা করা হয় শুনি?

বাজে প্রশ্নের জবাব দিয়ে আর কি হবে! চুপ করে শুয়ে ক্লোরোফর্ম টানতে লাগলুম। ওরি মধ্যে কখন যে ভাই ঘুমিয়ে পড়লুম তা মনেও নেই। ক্লোরোফর্মে যে এমন উঁচুদরের নেশা হয়, হাসপাতালে না গেলে তা জানতেও পারতুম না।

জ্ঞান হয়ে মনে হ'ল, এ কোথায় যেন এসে পড়েছি। চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, ঘরের মধ্যে আবছা আবছা আলো, দেখলুম—সেই আলো-আঁধারির মধ্যে কারা যেন সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক, তার এক পা

রাইট-এঙ্গেলের মত হাঁটু থেকে পেছন দিকে চলে গিয়েছে—লাঠি ধরে পাখীর মত এক পায়ে লাফাতে লাফাতে আমার কাছে এল। একটি স্ত্রীলোক, ব্যাণ্ডেজ-করা একখানা হাত তার গলায় ঝুলছে—আর একজন তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, একটা চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে—আরো এই রকম দু-এক জন আমার খাটের কাছে এগিয়ে এসে আমায় দেখতে লাগল। অন্ধকারে তাদের মুখও ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমি হার্ণিয়া অপারেশন করাতে হাসপাতালে এসেছিলাম, অস্ত্র করবার পর বোধ হয় মরে গেছি। এই সব ল্যাংড়া খোঁড়ারাও হাসপাতালে মরেছে—ভূত হয়ে এখন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কোমরে সাংঘাতিক জ্বালাবোধ হতে লাগল। প্রাণান্তকর জল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠতে লাগল। কোন রকমে গলা দিয়ে একটু স্বর বার করলুম—জল।

রাইট-এঙ্গেল-পায়া লোকটি বললে—এই যে জ্ঞান হয়েছে, আমরা তো মনে করলুম অজ্ঞানেই তোমার গঙ্গালাভ হ'ল—যাক্, তোমার জ্ঞান হয়েছে।

—আমায় একটু জল দিতে পারেন ?

একজন বললে—জল তো তোমায় দেওয়া হবে না বাপু!

স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল—পোড়ারমুখো হাসপাতালে মরবার সময় মুখে একটু জল দেয় না গা!

লোকটি বললে—জল দেবে কি—পেট কাটা হয়েছে যে।

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলুম—বাবা গো, আর যে পারি না—

মাথায় ব্যাণ্ডেজওলা একচক্ষু লোকটি এগিয়ে এসে সহানুভূতির স্বরে বললে—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে ?

তারপর বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—আঃ—এত যন্ত্রণা হবার কথা তো নয়!

বললুম—অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, আর সহ্য করতে পারছি না!

—তাহলে বাপু ওরা তোমার পেটে কোন যন্ত্রপাতি ভুলে রেখে দিয়েছে—আবার কাটতে হবে।

—অ্যাঁ! আবার কাটতে হবে!—

মাথা ঘুরতে লাগল! চার আউন্স ক্লোরোফর্মে যা করতে পারে নি, লোকটার এক কথায় তা হয়ে গেল—অর্থাৎ তখুনি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।”

[শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হার্ণিয়ায় ভুগেছিলেন এবং তাঁর সেই হার্ণিয়া অপারেশন করতে হয়েছিল—শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করে এমন কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। তবে তিনি রেঙ্গুনে থাকার সময় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিন মাসের ছুটি নিয়ে একবার কলকাতায় এসেছিলেন এবং এসে হাইড্রোসিল (?) অপারেশন করিয়েছিলেন, এ কথা জানা যায়।

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় ভাগলপুরে থাকার সময় সেখানে তাঁর মামার বাড়ীতে একটা ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াটি ছিল তাঁর মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটভাই অঘোরনাথের। শরৎচন্দ্র সেই ঘোড়ায় তখন খুব চাপতেন। এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

“শ্যামবাবুর বাগানটি ছিল একটি অরক্ষিত পোড়ো বাগান—ছেলেদের এবং তাদের সর্দারের অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লীলাভূমি।

এই বাগানে ছোটকর্তার সফরের তৈজস-পত্রাদি বইবার জন্য একটি ঘোটকী আর তার বাচ্চা নিত্য বিচরণ করত।…এই লাদ্‌না-ঘোড়াটির পিঠে দাঁড়িয়ে তার গতির সঙ্গে শরীরের ভারটির সমতা অর্থাৎ ব্যালান্স রাখার কসরৎ দেখতে দেখতে বিস্ময়ে, ভয়ে, আশায়, আনন্দে আমাদের দিনগুলি কত শীগ্‌গির কেটে যেত, তা মনে করলে আজও ভারি ভালো লাগে। এই খেলাটি বলা বাহুল্য সার্কাসের অনুকরণেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে রিং এবং বল-লোফা আর ঘোড়ার পিঠ থেকে ডিগবাজী খেয়ে নীচে এসে দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান পর্যন্ত চমৎকার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।”—‘শরৎ-পরিচয়’।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলার ঘোড়ার চড়ার কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তীকালের তাঁর অপারেশনের কাহিনীটি মিলিয়ে এবং তাতে হাসপাতালের ঘটনাটিতে কল্পনা জুড়ে, রসাল করে, এই গল্পটি বলেছিলেন বলে মনে হয়।]

কুকুরকে খাওয়ানো

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া শহরে থাকার সময়, মাঝে মাঝে তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি-বিজড়িত ভাগলপুরে বেড়াতে যেতেন। ভাগলপুরে গিয়ে তিনি তাঁর মামাদের বাড়ীতেই থাকতেন।

শরৎচন্দ্র এইরূপ একবার পূজার ছুটির সময় ভাগলপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেবার গিয়ে তিনি তাঁর দুই সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে স্টীমারে করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

ঐ সময় পাটনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা স্টীমার সার্ভিস ছিল। স্টীমার পাটনা থেকে ছেড়ে ভাগলপুর হয়ে শেষে পদ্মা দিয়ে গোয়ালন্দ আসত। তারপর সুন্দরবন হয়ে ডায়মণ্ডহারবার দিয়ে কলকাতায় খিদিরপুরে আসত। আবার ঠিক এমনি বিপরীতভাবেই কলকাতা থেকে পাটনা যেত।

শরৎচন্দ্র তাঁর মাতুলদের নিয়ে স্টীমারে গোয়ালন্দ ও সুন্দরবন হয়েই সেবার কলকাতায় ফিরছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর দুই মাতুলসহ ভাগলপুর থেকে যাত্রা করেছিলেন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরেই।

বিকালে তাঁদের স্টীমার কাহালগাঁয়ে এসে পৌঁছল। কাহালগাঁ একটা স্টীমার স্টেশন। এখানে স্টীমার কিছুক্ষণের জন্য থামে। তাই শরৎচন্দ্র স্টীমার থেকে নেমে গেলেন।

এদিকে স্টীমার ছাড়বার সময় হয়ে গেল, তবুও শরৎচন্দ্র আসছেন না দেখে, তাঁর মামারা তাঁকে খুঁজতে গেলেন। তাঁরা গিয়ে দেখেন, স্টীমার ঘাটের অদূরে যাত্রীদের নিকট বিক্রয়ের জন্য যে ছোট দোকানটি আছে, তার সামনের মাঠে শরৎচন্দ্র বসে আছেন। তাঁর চারদিকে পনের-কুড়িটি কুকুর 'দহি-চুড়ার' ভোজে রত। একটি বছর বার-তের বয়সের ছেলে শরৎচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে—তার দু হাতে দই চিঁড়ে মাখা। ঐ ছেলেটিই পরিবেশক।

শরৎচন্দ্রের মামারা গিয়ে বললেন—একি! স্টীমার যে ওদিকে ছাড়ে।

—না, সেদিকে আমার হুঁস আছে। এখনও ভোঁ দেয় নি তো!

শরৎচন্দ্র এবার উঠে দোকানীকে টাকা দিলেন।

ছেলেটির মজুরি দিয়েও, কিছু খুচরা পয়সা দোকানীর কাছ থেকে তাঁর পাওনা হ'ল।

দোকানী সেই পয়সা ফেরৎ দিতে এলে, শরৎচন্দ্র বললেন—দেনে নেহি হোগা, উহা তুমহারা নাফামে গিয়া।

স্টীমারে ফিরে আসতে আসতে শরৎচন্দ্র তাঁর মামাদের বললেন—একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। চল, স্টীমারে গিয়ে সেই ঘটনা বলছি।

শরৎচন্দ্র স্টীমারে এসে বসে তাঁর মামাদের সেই ঘটনাটা বললেন।

সুরেনবাবু তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' নামক বইয়ে সেই ঘটনাটি সম্বন্ধে এইরূপ লিখেছেন—

"স্টীমারে ফিরিয়া সে গল্পটি আরম্ভ করিল—

তাঁদের অবস্থা খুবই ভাল। বাড়ীর মেয়েরা আমার বই পড়েই বোধ হয় আমার উপর মহা খুশী। একদিন আমার নিমন্ত্রণ হ'ল।

প্রকাণ্ড বাড়ী তাঁদের। মার্বেল পাথরের মেঝে; সেই মেঝের ওপর জুতসই একটা গালচের আসন পাতা—ত্রুটি নেই কিছুরই। আর যা খাবার দিয়েছে—তা দেখেই মনে হয়, আমি যেন একটা রাক্ষস।

দেখেই আমার মনে মনে রাগ হ'ল। খাচ্ছি আর ভাবছি, কি করি; হঠাৎ দেখি দূরে একদল কুকুর—বেজায় রোগা চেহারা। কোন জন্মে ভাল করে খেতে পায় নি তারা।

গৃহস্বামীকে বললাম—মশাই, একটা বড় গামলা-টামলা গোছের কিছু দিতে পারেন?

তিনি তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন—হাত ধোবেন বুঝি?

বললাম—আনুন তো!

গামলাতে ভাত-ডাল, মাছ-তরকারি, মাংস-মিষ্টি, ক্ষীর-সর যা কিছু ছিল—সব মেখে, দুহাতে গামলা নিয়ে ছুট—একেবারে কুকুরগুলোর কাছে।

উঃ, কুকুরগুলো সত্যিই খেয়ে বাঁচল!

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর ?

শরৎ বললে—বাড়ীর লোকদের মুখে আর কথা ফোটে না। কর্তা শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন—ছেলেপুলেরাও তো খেতে পারতো !

বললাম—মশাই তাদের জন্য ভাবনা কি ? তারা তো রোজই খায়, কিন্তু কুকুরগুলো আজ খেয়ে বাঁচল।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে শরৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—যারা সত্যি খেতে পায় না, তারা খেলেই হয় অপব্যয় !

আমরা হাসতে লাগলাম।

শরৎ বললে—এখানেও ঠিক তাই। অত্যন্ত সোজা কথা, শুধু একবার চেয়ে দেখ ভাল করে। স্টীমার থামলে দেখি কিনা একদল কুকুর ছুটে আসছে। দেখেই বুঝেছি কতদিন হয়ত পেটে তাদের অন্ন পড়ে নি। এমন দেখলে কারই বা না ইচ্ছা হয়, ওই ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে কিছু খাওয়াতে ?

সারেঙ বললে—মাল অনেক আছে ওঠা-নামার, দেরি হবে।

ব্যস নেমে পড়লাম। যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি। দেখি দোকানে দই, চিঁড়ে, শালপাতা—আর কি ? শুভস্য শীঘ্রম্ ! এই তো ছোট ব্যাপার। সব মানুষের মনে ও ইচ্ছাটুকু আছে—শুধু দুচোখ মেলে, সমস্ত মন দিয়ে দেখা আর বোঝা !"

[প্রবাসী-সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়ে দেখছি, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে বলা শরৎচন্দ্রের এই কুকুরকে খাওয়ানোর গল্পটি, শরৎচন্দ্রের জীবনের একটি সত্যকারই ঘটনা। তবে শরৎচন্দ্র সুরেনবাবুদের কাছে বলবার সময় সামান্য অদল-বদল করে বলেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল, দিল্লীতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৩৭০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকায় 'পুরণো দিনের নানাকথা' নামক একটি প্রবন্ধে কেদারবাবু এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের ঐ কুকুরকে খাওনোর প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"সেটা ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরের (কংগ্রেসের) স্পেশাল সেসন।...ঐ কংগ্রেস সেসনে বাঙ্গলার ডেলিগেটদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ও অন্য কয়েকজন ডেলিগেট—যাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়ও ছিলেন—অতিথি হিসাবে সাদরে স্থান পেয়েছিলেন এইচ্, সি, সেন এণ্ড কোং-এর বিশাল অট্টালিকার উপরতলায়।...সন্ধ্যার পর গেলাম এইচ্, সি, সেন এণ্ড কোং-এর অতিথিশালায় খবর নিতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও দেখা হ'ল না। আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম, গাজিয়াবাদে এক বন্ধুর কাছে।...

সেদিন সঙ্গীদের নিয়ে শরৎবাবু অতিথিশালায় ফেরেন রাত্রি ন'টারও পরে।...তিনি সবে খেতে বসেছেন, এমন সময় এক রাস্তার জীর্ণশীর্ণ নেড়িকুত্তা সদর দোর খোলা পেয়ে, কি মনে করে সিঁড়ি বেয়ে সেই তেতলার ঘরে ঢুকে সোজা শরৎবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে আরম্ভ করল।

'যাদের বাড়ীর কুকুরের এই অবস্থা, তারা আবার ভদ্রলোক'—এই বলে সঙ্গী ও চাকর-বাকরদের ধমক দিয়ে থামিয়ে শরৎচন্দ্র নিজের থালার লুচি, মাংস ইত্যাদি সবই সেই কুকুরকে খাওয়ালেন।

পরে শুনেছি, এই ব্যাপার নিয়ে হাসাহাসিও হয়েছিল।"

কেদারবাবুর লেখায় দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র জীর্ণশীর্ণ রাস্তার কুকুরকে রাস্তার কুকুর বলে চিনতে না পেরে, বাড়ীর মালিকের কুকুর বলে ভুল করেছিলেন।]

যাত্রা

শরৎচন্দ্র যখন বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার নামে সেখানে তাঁর একজন অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রতিবেশী ছিলেন। (এই অমরবাবু বর্তমানে এই বই লেখার সময়, হাওড়ায় নরসিংহ দত্ত কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল।)

অমরবাবুদের গ্রামের বাড়ী শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর নিকটেই দেউলগ্রামে।

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া শহর ছেড়ে তাঁর সামতাবেড়ের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে বাস করছেন।

ঐ সময় অমরবাবুর বিয়ে হয়। অমরবাবুর বিয়ে তাঁদের গ্রামের বাড়ী থেকেই হয়েছিল।

অমরবাবু তাঁর বিয়েতে শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বৌ-ভাতের দিন দুপুরের একটু আগেই যথাসময়ে অমরবাবুদের বাড়ীতে গেলেন।

দুপুরে বৌ-ভাতের খাওয়া-দাওয়ার খানিকটা আগের কথা।

নিমন্ত্রিত বহু লোক এসেছেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিরা অমরবাবুদের বৈঠকখানায় সকলে মিলে শরৎচন্দ্রকে ঘিরে তাঁর মুখের কথা শুনছেন।

শরৎচন্দ্র তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে নানা রকমের গল্প বলে যাচ্ছেন। এমন সময় কথায় কথায় গ্রামের যাত্রার দলের কথা উঠল। শরৎচন্দ্র বললেন—

আমি তখন ছেলেমানুষ! সেই সময় আমাদের দেশে একটা গ্রামে একবার আমি যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম। সে রাত্রে যাত্রার পালা ছিল—সাবিত্রী-সত্যবান।

পাড়াগাঁয়ে যেমন সাধারণতঃ হয়, রাত্রি ১০টা বেজে গেল যাত্রা সুরু হতে।

ইতিমধ্যে আসরে লোকে লোকারণ্য। যাই হোক, যাত্রা সুরু হ'ল। যাত্রাওয়ালারা ভালই অভিনয় করছিল। তাই দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখছিল।

যাত্রা বেশ জমে উঠল, যখন সত্যবান মারা গেলে সাবিত্রী তার মৃত স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য যমের কাছে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল।

যম মৃত সত্যবানকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সাবিত্রী সত্যবানকে ছাড়তে চায় না। সে যমের পায়ে ধরে কাঁদে। মেয়েটির সে কি কান্না! সে যে অভিনয় করছে, দেখলে তা কিছুতেই মনে হয় না। এত জীবন্ত অভিনয়!

কিন্তু নাট্যকার করেছিলেন কি জানেন, ঐ নাটকীয় চরম মুহূর্তে এনে তাঁর নাটকের একটা অঙ্ক শেষ করেছিলেন। তাই, একটা অঙ্কের শেষে আর একটা অঙ্ক আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত সময়টার মধ্যে যে ঐকতান বাদন হয়, ঐ জমাটি সময়টায় সেই ঐকতান বাদন আরম্ভ হয়ে গেল।

এদিকে অভিনেতা যমরাজ তখন দর্শকদের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য তাদের যে পথ ছিল, সেই পথ দিয়ে সত্যবানকে নিয়ে চলেছে। আর সাবিত্রী আকুলি-বিকুলি করে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু পিছু যাচ্ছে।

ঠিক ঐ সময় দর্শকদের ভিতর থেকে প্রৌঢ় গোছের একটি লোক উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে যমরাজকে ডেকে বললে—ওহে যমরাজ! শোনো, শোনো, যেও না। তুমি এক কাজ কর। ঐ ছুঁড়িটা অনেক কান্নাকাটি করেছে। ওর স্বামীটাকে ছেড়ে দাও। ওর স্বামীটাকে ছেড়ে দিয়ে বরং ঐ বাজনদারগুলোকে ধরে নিয়ে যাও। ওরা অনেকগুলো আছে। ব্যাটারা যাত্রাটাকে একেবারে মাটি করে দিলে গা! যখন যাত্রাটা জমে উঠেছে, তখনই কিনা বাজনা সুরু করে দিলে! তাও আবার একটা আধটা বাজনা নয়, একসঙ্গে একেবারে সব ক'টা।

শরৎচন্দ্রের গল্প শুনে শ্রোতারা খুব হাসতে লাগলেন।

চরকা

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন লাইব্রেরী হলে ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেনের এক সম্বর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতি হন।

সভায় প্রবীণ-নবীন বহু সাহিত্যিক এবং গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আহ্বানে গুরুসদয় দত্ত ঐ সভায় এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেছিলেন।

সভার শেষে শরৎচন্দ্র সেদিন আর তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে ফিরলেন না। বেহালায় মণীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কলকাতায় তখনও শরৎচন্দ্রের বাড়ী হয় নি।

পরদিন সকালে শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রায়বাড়ীতে বিরাট এক বৈঠক বসেছে। আগের দিন জলধর সম্বর্ধনা-সভায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এসেছেন। চা সহযোগে গতকালের জলধর সম্বর্ধনা-সভার কথাই আলোচনা হচ্ছে। শরৎচন্দ্র গুরুসদয়ের বক্তৃতার খুব প্রশংসা করলেন। গুরুসদয়ের কথা থেকে পল্লী-সংস্কার, পল্লী-সংস্কার থেকে আলোচনা শেষে চরকায় এসে দাঁড়াল।

একজন প্রশ্ন করলেন—শরৎবাবু, আপনি নিজে কি কখনো চরকা কেটেছেন?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে, আমার চরকাকাটা সে এক ইতিহাস। সে গল্প শুনবে? তবে বলি শোন—

চরকা আমি শুধু একাই কাটি নি, বাড়ীসুদ্ধ সবাই কেটেছি, মায় চাকরগুলো পর্যন্ত।

চাকরগুলোর চরকাকাটা শিখে তো খুব মজা, কাজে দেদার ফাঁকি দিতে লাগল। যদি জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁরে তোরা অমুক কাজটা করিস নি কেন? তখুনি জবাব পাই, বাবু চরকা কাটছিলাম যে! চরকার নাম করলে আর কিছু বলাও যায় না, কেননা ভৃত্যরা আমার দেশোদ্ধারের কাজে লেগেছেন।

তা লাগুন, কিন্তু সত্যিকারের সুতো যদি কিছু কাটত, তাহলেও না হয় বুঝতাম।

নিজের উপরই কি কম ধাক্কাটা গেছে! দেশবন্ধুর পাল্লায় পড়ে পচা তেলের ফুলুরি, কচুরি, নিমকি আর ছোলাভাজা পর্যন্ত খেয়ে গ্রামে গ্রামে চরকা চরকা করেই কি কম ঘুরেছি? অনেক দিন আবার তাও জোটে নি। চরকা চরকা করে এতটা অত্যাচার না করলে শরীরটা বোধ করি আজ এতটা খারাপ হতো না।

কত কাণ্ডই না করেছি! এই চরকা থেকেই শেষে তাঁতও বসানো হয়েছিল। সুরেনমামা (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) একদিন এসে বললেন—শরৎ, শুধু চরকায় তো হবে না, তাঁতও বসাতে হবে।

বললাম—ঠিক বলেছ।

অমনি লেগে গেলাম তাঁত বসানোর কাজে। ভাগলপুরে সুরেনমামাদের ওখানে গিয়ে পাঁচ-সাতটা তাঁত বসালাম। বাঙ্গলা দেশ থেকে ভালো ভালো তাঁতি অগ্রিম টাকা দিয়ে নিয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই, এমন কি তাদের দাদনের টাকাটা শোধ না হতেই, তাদের বাড়ী থেকে চিঠি যেতে লাগল—কারো ছেলের অসুখ, কারো স্ত্রীর অসুখ, টাকার অভাবে তাদের নাকি চিকিৎসা পর্যন্ত চলছে না। অতএব, দাও টাকা। দিলাম টাকা।

আবার চিঠি গেল—লোক অভাবে পাকা ধান মাঠে নষ্ট হচ্ছে, কাটবার লোক নেই, অতএব পত্রপাঠ চলে এস। কারো চিঠি গেল—অমুকে নালিশ করেছে। মামলার তদ্বির করতে হবে চলে এস, না হ'লে সব যাবে। তাঁতিরা এ হেন সব চিঠি নিয়ে হাজির হয়, আর আমরা বাধ্য হয়ে রাহা খরচ আর ছুটি দিয়ে তাদের বাড়ী পাঠাই। কিন্তু ছুটি ফুরিয়ে গেলেও তারা আর ফেরে না। এদিকে তাঁতশালায় উইপোকারও উৎপাত—ওদের তো আর দেশাত্মবোধ নেই!

হতাশ হয়ে সুরেনমামা বললেন—দূর ছাই, পরের উপর নির্ভর করে আর কাজ চলবে না। তার চেয়ে এস, দেশলাইয়ের কারখানা করা যাক। দেশের কাজও হবে, পয়সাও হবে। তবে এবার কিন্তু আর লোক লাগানো নয়। নিজেরাই শিখব, নিজেরাই সব করব, কিছু অনুগত ছেলেকেও কাজ শিখিয়ে নেওয়া যাবে।

সুরেনমামার উপদেশ মতো তাঁত শিকেয় তুলে দেশলাইয়ের কল পাতা হ'ল। কিন্তু হিন্দুর ছেলেরা কেউ কাজ শিখতে এল না। শেষে পাওয়া গেল ক'টি মুসলমান ছেলে। তারা বললে—আমরা কাজ শিখব, কিন্তু আমাদের মজুরি দিতে হবে। সুরেনমামা অনেক বলে-কয়ে দৈনিক চার আনাতে একটা রফা করে নিলেন।

সুরেনমামা আমাকে বললেন—দেশে শিক্ষার অভাব। তা নইলে কি আর দেশের এমন দুরবস্থা হয়!

যাই হোক, কাজ তো খুব জোরে চলতে লাগল। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন বারুদে আগুন লেগে গেল। কারো হাত পুড়ল, কারো পা পুড়ল, কারো গা পুড়ল, আর সেই সঙ্গে পুড়ল আমাদের মুখ। এইখানেই আমাদের দেশলাই কারখানার ইতি। সুরেনমামা বাইরে মুখ দেখানোর লজ্জায় ভাগলপুরেই লুকিয়ে রইলেন, আর আমি চলে এলাম সামতাবেড়ে।

হাতে কলমে দেশোদ্ধার পর্ব শেষ হ'ল।

সংস্কারের শিকড়

কলকাতায় বালীগঞ্জে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী।

সুনীতিবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি বলে শরৎচন্দ্র তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

শরৎচন্দ্র কলকাতার বাড়ীতে থাকলে, সুনীতিবাবু মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

সুনীতিবাবু এইরূপ একবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে গেছেন। সেদিন এ-কথা সে-কথার পর শরৎচন্দ্র সুনীতিবাবুকে প্রশ্ন করলেন—তোমার কি মনে হয়, সুনীতি, মানুষের আচরণ নির্ভর করে কার উপর বেশী? সমাজের কাছে শিক্ষা পেয়ে যা আমরা মনের মধ্যে গড়ে তুলি সেই সংস্কার? না, মানুষের আদিম প্রকৃতি, যার আধার হচ্ছে তার দেহের তাড়না? কোনটা?

সুনীতিবাবু হেসে বললেন—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

—কি জানি, আজ বারেবারেই একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটা বর্মার। বলি তোমাকে, প্রশ্নটা তাহলে বুঝতে পারবে।—

আমি তখন রেঙ্গুনে থাকি। একদিন আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, তাঁর পরিচিত একটি বামুনের ছেলে চাকরির আশায় দেশ ছেড়ে এখানে এসেছে। চাটগাঁয়ে বাড়ী, বড্ড গরীব। আমি যদি দয়া করে তার কিছু ব্যবস্থা করে দিই, তাহলে বেচারার বড় উপকার হয়। ছেলেটি কিছু বাঙ্গলা লেখাপড়া জানে, অল্পস্বল্প হিসেবের কাজও করতে পারে।

আমার এক বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন, রেঙ্গুনে তাঁর সেগুন কাঠের চালানী ব্যবসা ছিল। তাঁকে বলে-কয়ে ঐ বামুন ছেলেটির একটা কেরাণীর কাজ যোগাড় করে দিলাম। দোকানেই সে থাকত, মনিবই তাকে খেতে দিতেন। এ ছাড়া দশ-পনেরো টাকার একটা মাইনের ব্যবস্থাও হয়েছিল।

যাই হোক, একটা উপায় হয়ে গেল ছেলেটির।

বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ তাকে একদিন অন্য বেশে দেখলাম। দেখি পথ দিয়ে চলেছে, খালি গা, নামাবলী জড়ানো, মাথায় টিকি, টিকিতে ফুল গোঁজা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে গামছায় বাঁধা ছোট একটা পুঁটুলি—মনে হ'ল চালকলা বেঁধেছে। ভাবলাম চক্রবর্তী-সন্তান, দেশের পৈত্রিক পেশা পুরুত-গিরিটা বোধ করি এখানে এসে নতুন করে ধরেছে।

ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হে, কাঠের দোকানের কাজটা ছেড়ে দিলে নাকি?

সে বললে—কি করি বলুন! বাবুরা যা দিচ্ছিলেন, তাতে কুলোচ্ছিল না। তাই ভাবলাম, এই পাড়ায় তো অনেক ঘর বাঙ্গালী আর হিন্দু মিস্ত্রী আছে। তাদের বাড়ীর মেয়েরা বারব্রত পূজাপার্বণ করতে চায়, কিন্তু বামুন পুরুত পায় না। তাছাড়া সরস্বতী পূজো, বারোয়ারী কালীপূজো—এ সবেতেও দু পয়সা আছে। বামুনের ছেলে, বাঙ্গলাটা কিছু জানি, পৈতেও হয়েছে। গুপ্তপ্রেস পাঁজি দেখে যা জানবার সব জেনে নিলাম। এখন বেশ কাজ চালিয়ে নিতে পারি। আর এদেশে ওদের মধ্যে খুঁটিনাটি ধরছেই বা কে! তা আপনার আশীর্বাদে মন্দ হচ্ছে না। আর এইটাই তো আমাদের জাত-ব্যবসা।

আমি বললাম—বেশ, বেশ, ভালো থাকলেই ভালো।

তারপর কয়েক বছর ছেলেটির আর দেখা নেই। তার কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

কতদিন বাদে একবার কি কাজে রেঙ্গুন ছেড়ে আমাকে উত্তর বর্মায় যেতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে মোমিয়ো শহরে কিছুদিন ছিলাম। চমৎকার জায়গা—চারদিকে পাহাড়, গাছপালা, ঝরণা। এই মোমিয়োতে সাধারণের বেড়াবার জন্য সুন্দর একটি বাগান আছে। একদিন আমি একা সেই বাগানে বেড়াচ্ছি। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন আমায় ডাকলে—শরৎবাবু, ও-শরৎবাবু!—ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি মুসলমান আমার দিকে এগিয়ে আসছে। পরণে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় শাদা কাপড়ের টুপি। কিছুতেই চিনতে পারলাম না।

লোকটি কাছে এসে বললে—আমায় চিনতে পারছেন না শরৎবাবু?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুই মনে পড়ল না।

বললাম—না বাপু, তোমায় তো চিনতে পারছি নে! তোমার নাম কি বলো তো? কি করা হয়? কোথায় থাক?

একমুখ দাড়ি নেড়ে হেসে সে বললে—আমি সেই চক্রবর্তী। যাকে আপনি সেই কাঠগুদামে চাকরি করে দিয়েছিলেন।

এইবার তার মুখ ভাল করে পরীক্ষা করে তাকে চিনতে পারলাম। বললাম—তোমায় তো ক'বছর দেখি নি। কোথায় ছিলে এতদিন? তাছাড়া, মুখে আবার ঐ অত বড় বড় দাড়ি গজিয়েছে! তা চক্রবর্তীর পো, তোমার এই অপরূপ বেশ কেন?

মুখ একটু কাঁচুমাচু করে চক্রবর্তীর পো বললে—আজ্ঞে, আমি এখানে এসে এই ক'বছর হ'ল মুসলমান হয়েছি।

শুনে আমি তো একেবারে থ! বলে কি! বামুনের ছেলে, পুরুতের পেশা ছিল, সে অমনি জাত বদলে ফেললে! কিন্তু এর পরে তার নিজের মুখ থেকে যে কাহিনী শুনলাম, তা আরো বিস্ময়কর।

সে বললে—মশায়, রেঙ্গুনে পুরুতের কাজ দিন কতক তো করলাম। চলছিল মন্দ না, তবে ঠিক পোষাচ্ছিল না। আয়ের একটা মাত্রা ছিল, আমার আরো রোজগার চাই। তাই ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রেঙ্গুন থেকে উত্তরে চলে এলাম। অনেক জায়গা ঘুরে কোথাও তেমন সুবিধা করতে পারলাম না। শেষে এলাম এই মোমিয়োতে। এখানে এক বাঙ্গালী মুসলমানের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তার বাড়ীতেই আশ্রয় নিলাম বাধ্য হয়ে।

মুসলমানটির ব্যবসা ছিল কসাইয়ের। মোমিয়োতেই তার মাংসের দোকান। আর এই দোকান থেকেই সে বেশ দু পয়সা রোজগার করত। দিনকতক পরে হঠাৎ মুসলমান বন্ধুটি কঠিন অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। তার স্ত্রী একদিন আমায় ডেকে বললে, তার স্বামীর তো ঐ অবস্থা, তা আমি যদি তার দোকান চালাবার ভার নিই তো আমাকে কিছু লাভের বখরা দেবে।

এদিকে আমারও তখন কোন কাজকর্ম নেই। ভাবলাম, মন্দ কি, দেখাই যাক না। তা হিন্দু থেকে তো কসাইয়ের ব্যবসা করা যায় না। একদিন তাই মসজিদে গিয়ে কলমা পড়ে রীতিমতো মুসলমান হয়ে এলাম। ইতিমধ্যে আল্লার মর্জি, বন্ধুটি মারা গেল। তখন বন্ধুর স্ত্রীর কথায় তাকে আমি

নিকেও করলাম। বর্তমানে দোকানের মালিক হয়ে বসে, এখানে বেশ দু পয়সা জমিয়ে নিয়েছি শরৎবাবু!

লোকটা আমাকে তার পূর্বেকার একজন হিতৈষী ভেবেই বোধ করি অকপটে সব কথা আমার কাছে বলে গেল। কি ভাবে ব্যবসা চালায় সে কথায় চক্রবর্তীর পো বললে—আগে এরা জানোয়ারগুলোকে সরকারী কসাই খানায় নিয়ে যেত। তাতে খামোখা কতগুলো টাকা খরচ হ'ত বেশী। প্রথম, যে লোকগুলো জানোয়ার তাড়িয়ে নিয়ে যেত, তাদের মজুরি দিতে হ'ত। তারপর, সেখানে কাটা হ'লে, আবার গরুর গাড়ী করে সেগুলোকে নিয়ে আসতে হ'ত। এতেও একটা মোটা টাকা বেরিয়ে যেত। দোকানের মালিক হয়ে আমি এসব বাজে খরচ একদম তুলে দিয়েছি। জবাইয়ের কাজটা এখন আমি নিজেই করি।

তার কথা শুনে আমার মুখে তো কথা নেই! একটু সামলে নিয়ে কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করলাম—ছোট বড় সব জাতের জানোয়ার নিয়েই তো তোমার কারবার, কি বলো?

উত্তরে সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। খদ্দের তো সব আর হিন্দু নয়। মুসলমান, খ্রীষ্টান সব জাতেরই আছে। তাই, ভেড়া, ছাগল, গরু—এই তিনেরই কারবার।

—তুমি নিজের হাতে সব জবাই কর?

—তা ব্যবসা চালাবার জন্য করি বৈকি! ও এমন আর কি শক্ত কাজ শরৎবাবু! কেবল গরুর বেলায় যা দু-তিনজন লোকের দরকার হয়। নিজের হাতে করি বলেই তো ওদিকটায় আমার কিছু সাশ্রয় হয়।

ভাবতে লাগলাম—তাই তো, বামুনের ঘরের ছেলে, মনে একটা সংস্কারও তো ছিল। সে করে কিনা গরু জবাই! আবার বলে—এ আর এমন কি শক্ত কাজ শরৎবাবু! নিজের জন্মগত সংস্কারকে অবস্থার ফেরে কি অবলীলাক্রমে সে ঝেড়ে ফেলে দিলে, আশ্চর্য!

সে আবার বলতে লাগল—চলতি কারবারটা পেয়ে গেলাম। তার ওপর ঐ মেয়েটিও আমাকে নিকে করে বসল। একেবারে যাকে বলে পাতা সংসার!

আমি বললাম—এ যে তুমি অর্ধেক রাজত্ব—অর্ধেকই বা কেন, পুরো রাজত্ব—আর সেই সঙ্গে একটি রাজকন্যা পেয়ে গেলে হে!

আমার কথায় সে আনন্দে অথচ একটু লজ্জিতকণ্ঠেই বললে—পুরো রাজত্ব আর কই, শরৎবাবু? ঐ মেয়েটির তো একটা ভাগ আছে।

গল্প শেষ করে শরৎচন্দ্র বললেন—তাই আমি ভাবছি স্নীতি, শিক্ষা থেকে, সমাজ থেকে, পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যে সংস্কারকে আমরা গড়ে তুলি, তার শিকড় কি এমনই অগভীর যে, মানুষ তার জীবনধারণের আদিম তাড়নায়, এত সহজেই তাকে উপড়ে ফেলতে পারে? তোমার কি মনে হয়?

স্নীতিবাবু বললেন—এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা মুস্কিল। কেননা, অসুবিধায় পড়ে মানুষ সারা জীবনের বিশ্বাস আচরণ ছেড়ে দিতে পারে এ যেমন আছে, তেমনি আবার হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে, তবু তার সংস্কার বা বিশ্বাস ছাড়বে না, এমন মানুষও কম নেই। মনে হয় সংস্কারকে কে কতটা মূল্য দেয় এবং কে কতখানি গভীরভাবে জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করে, তার ওপরেই সব নির্ভর করছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ স্নীতি। এ বিষয়ে সঠিক মত নির্ণয় করা কঠিন। মানুষের ভিতরকার প্রকৃতির ওপরেই তার সব নির্ভর করে। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, সংস্কারটা যেন উপরকারই জিনিস। আদিম বা মৌলিক প্রয়োজনের তাড়নায় নিজের প্রকৃত স্বরূপে মানুষ বেরিয়ে আসে, তখন সংস্কার তার কিছুই করতে পারে না। তবে, কেউ যদি একটা বিরাট কিছু পেয়েছে বলে মনে করে তাকে আঁকড়ে থাকে, আর সব কিছুই উপেক্ষা করা চলে, তাহলে সে আলাদা কথা।

বৈষ্ণব নন্দীগ্রাম

শীতের সকাল। শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর কলকাতার বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। সামনে বসে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দুজনে লঘু আলাপ-আলোচনা করছেন।

এমন সময়ে একটি যুবক সেই বৈঠকখানা ঘরের ভিতর এসে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

শরৎচন্দ্র যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—হঠাৎ প্রণাম, কে তুমি? তোমায় তো চিনি বলে মনে হচ্ছে না!

যুবকটি বললে—আমার নাম রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডা। আমি আপনার একজন একান্ত ভক্ত। আপনাকে চাক্ষুস কখনো দেখি নি। তাই ভাবলাম, এবার কলকাতায় যখন এসেছি, আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রণাম করে যাই।

শরৎচন্দ্র যুবকটিকে একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বসো। বলছ কলকাতায় এসেছ, তা তোমার বাড়ী কোথায়?

—মেদিনীপুর।

—মেদিনীপুর? কোন্ জায়গায়?

—নন্দীগ্রাম।

নন্দীগ্রাম নাম শুনেই শরৎচন্দ্র দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন —ওরে বাবা, নন্দীগ্রাম! নমস্কার! নমস্কার! নমস্কার! সে যে একেবারে পরম বৈষ্ণবের দেশ!

সুরেনবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। নন্দীগ্রামের নামে শরৎচন্দ্রকে ভক্তিভরে নমস্কার করতে দেখে এবং তাকে পরম বৈষ্ণবের দেশ বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি, শরৎ?

—সে এক মজার ঘটনা মামা! শুনবে সে গল্প?

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন নন্দীগ্রামে শীতকালটায় খুব বড় একটা মেলা বসত। দেশ-বিদেশ থেকে লোকে সেই মেলা দেখতে আসত।

আর মেলাও চলত পুরো একটি মাস ধরে। অসংখ্য দোকান-পসার যেমন খুলত, তেমনি খেলাও বসত নানা রকমের। স্থানীয় মোড়লরা থানার দারোগার সঙ্গে একটা চুক্তি করে জুয়াখেলাও বসাত মেলায়। চুক্তিটা হ'ত এই রকম—জুয়াওয়ালারা খেলার অনুমতি পাওয়ার জন্য যা টাকা দেবে, তার অর্ধেক নেবে দারোগা, আর বাকি অর্ধেক ঐ মোড়লরা। মোড়লরা টাকাটা নিজেরা না নিয়ে দেশের কাজেই খরচ করত।

একবার হলো কি জানো? নতুন এক দারোগা এসে মোড়লদের সঙ্গে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও, জুয়াওয়ালাদের কাছ থেকে পুরো টাকাটা আদায় করে নিজেই সবটা মেরে দিলে। মোড়লদের একটি পয়সা দেওয়া দূরে থাক—দেখালেও না।

মোড়লরা গিয়ে জুয়াওয়ালাদের ধরল।

জুয়াওয়ালারা বললে—প্রতি বছরের মত সব টাকাটাই তো আমরা দারোগার হাতে দিয়েছি। কিন্তু এ দারোগা যে এমন লোক, তা জানব কি করে বলুন? আপনারাও তো আগে কিছু বলেন নি!

মোড়লরা দারোগার কাছে দিন কতক যাতায়াত করে বুঝতে পারল—ফল হবে না কিছু। শেষে তারা টাকার আশা ছেড়ে দিয়ে থানায় যাওয়া বন্ধ করে দিল।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। জুয়ার টাকার কথাও একেবারে চাপা পড়ে গেছে। এমন সময় একদিন নন্দীগ্রামের দক্ষিণপাড়া থেকে ভীষণ এক মারামারি-কাটাকাটির খবর থানায় গেল।

দারোগা লোকটা ছিল এক নম্বরের ঘুষখোর। কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর পেলে নিজেই সেখানে যেত। আর গিয়ে করত কি জানো, দু পক্ষ থেকেই ঘুষ নিত। এজন্য একাই সে যেত, সঙ্গে কাউকে নিত না, পাছে তাকেও আবার ভাগ দিতে হয়।

যাই হোক, নন্দীগ্রামের দক্ষিণপাড়ায় খুনোখুনির খবর শুনে দারোগা তো মহা খুশী। একাই সে গেল তদন্ত করতে।

এই মারামারি-কাটাকাটির খবরটা কিন্তু একেবারেই মিথ্যে। গ্রামের মোড়লরা এতদিন পরে দারোগার কাছ থেকে সেই জুয়ার টাকার শোধ নেবার ব্যবস্থা করেছে।

দারোগা সেখানে যেতেই মোড়লরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। তারপর তার হাতে আর পায়ে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধল। কিন্তু আশ্চর্য! এক ঘা মারল না কেউ। পাছে রক্তপাত হয়, এই ভয়ে কেউ হাতই দিল না তার গায়ে। পরম বৈষ্ণবের দেশ কিনা!

রক্তপাতের ভয়ে গায়ে হাত দিল না বটে, কিন্তু করলে কি জানো! পরম বৈষ্ণবেরা মিলে দারোগাকে নিয়ে একটা পোলখড়ের গাদার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে। তারপর তাতে একটা দেশলাই কাঠি জেলে ধরিয়ে দিলে। দারোগা বেচারা যতক্ষণ না শ্রীহরির পদে বিলীন হ'ল, ততক্ষণ কয়েকজন মিলে বড়-বড় বাঁশ দিয়ে গাদাটা চেপে রইল।

পরম বৈষ্ণবের দেশ কিনা, তাই রক্তপাতের ভয়ে কেউই আদৌ মার লাগালে না।

এই হ'ল একেবারে নিখুঁত বৈষ্ণবীয় ব্যবস্থা, বুঝলে?

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সুরেনবাবু হাসতে লাগলেন।

যুবকটিও না হেসে থাকতে পারল না।

রয়াল বেঙ্গল টাইগার

নন্দীগ্রামের সেই যুবকটি দিন দুই পরে আবার এসে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করে বললে—আজ বাড়ী যাব। যাবার আগে তাই প্রণাম করতে এসেছি।

—বাড়ী মানে, তোমার সেই নন্দীগ্রামে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, নন্দীগ্রাম তো মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাদের বাড়ী থেকে সুন্দরবন কত দূরে?

—তা অনেক দূর হবে।

—রাত্রে বাঘের গর্জন-টর্জন শুনতে পাও না?

—আজ্ঞে না।

—বাঘ-টাঘ বন থেকে ছিটকে তোমাদের ওদিকে আসে না কখনো?

—কই না। তবে ছেলেবেলায় শুনেছি, একবার নাকি এসেছিল। তা গ্রামের অনেকে মিলে তাকে ঘিরে গুলি করে মেরে ফেলে।

—রয়াল বেঙ্গল তো?

—না, নেহাতই ছোট একটা চিতা।

—দেখ, তোমার এই বাঘের কথায় আমার ছেলেবেলায় এক বাঘ দেখার গল্প মনে পড়ল। ভারি মজার গল্প, শোনাই তোমাকে—

আমি তখন দেবানন্দপুরে থাকি, আর প্যারি-পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ি। আমাদের সহপাঠী কাশীনাথ একদিন এসে বললে—এই, বাঘ দেখতে যাবি? রয়াল বেঙ্গল টাইগার! মাত্র এক পয়সা নিয়ে দেখাচ্ছে।

সবেমাত্র তখন সুন্দরবন, আর তার রয়াল বেঙ্গল টাইগারের কথা বইয়ে পড়েছি। বাঘ দেখার লোভটা তাই সামলাতে না পেরে বললাম—কোথায় রে? নিশ্চয় যাব।

কাশীনাথ বললে—আমার মামাদের গ্রামে। সেখানে এক সপ্তাহ ধরে রথের যে মেলা বসেছে, সেই মেলায় বাঘ দেখাচ্ছে। আজ ফিরতি রথ, আজই শেষদিন। চল্ না, যাবি? গণ্শা, কেষ্টা ওরাও যাবে বলেছে।

—তা এতদিন বলিস্ নি কেন? আজ শেষদিন বলতে এসেছিস্?

যাই হোক্, মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চার বন্ধুতে তো বাঘ দেখতে রওনা হলাম। সময় সংক্ষেপ করার জন্য মাঠ ভেঙে হেঁটেই চললাম। ঘণ্টাখানেক পর মেলায় পৌঁছে দেখি, একটা ফাঁকা জায়গা খানিকটা ত্রিপল দিয়ে ঘেরা, একপাশে একটা গেট। গেটের সামনে টুলের ওপর একটা লোক চীৎকার করে বলছে—এক এক পয়সায় বাঘ দেখে যান বাবু, এক এক পয়সা—দি রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

দেখলাম, লোকের বেশ বড় একটা লাইন পড়ে গেছে বাঘ দেখবার জন্য। এক পয়সা দিয়ে একজন করে ঢুকছে ভিতরে, সে দেখে ফিরে এলে তবে আর একজনকে ঢুকতে দিচ্ছে। আমরাও লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাশী, কেষ্টা, গণ্শা সবাই আমাকে বললে—তুই-ই আগে যা।

তাই গেলাম। গেটে পয়সা দিয়ে ঢুকবার সময় যে লোকটা বাঘ দেখে বেরিয়ে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি মশায়, কেমন দেখলেন বাঘ? লোকটা কোন উত্তর দিলে না, চুপ করে চলে গেল। ভাবলাম, আমি ছেলেমানুষ বলেই হয়তো অতবড় লোকটা আমার কথায় কান দিলে না। আবার ভাবলাম, যাক্‌গে, নাই বলুক, এখুনি তো ভিতরে গিয়ে দেখতে পাব।

গিয়ে দেখি, আরে রামঃ, বাঘের নামগন্ধ কোথাও নেই। চারদিক ফাঁকা। আর সেই ফাঁকার মধ্যে এক জায়গায় হাঁড়ির ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে একটা লোক মাঝে মাঝে গর্জন করছে। এই হাঁড়িমুখো লোকটার পাশেই একটা ছোট্ট তারের খাঁচা, তার মধ্যে বিরাজ করছেন এক বিড়াল। গায়ে হলদে হলদে ডোরাকাটা দাগ, একেবারে স্বহস্তে প্রস্তুত।

দেখে তো মেজাজ বিগড়ে গেল। ভাবলাম, হলামই বা ছেলেমানুষ, দিই দুটো কথা শুনিয়ে। এমন সময় যে লোকটা বাঘ ডাকের নকল করছিল, সে দেখি হাঁড়ি ফেলে উঠে এল। এসে হঠাৎ আমার পা দুটো জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

আমি তো অপ্রস্তুত। এ আবার কাঁদে কেন রে বাপু! কাঁদতে কাঁদতে

সে কি বললে জানো! বললে—বাবু, দয়া করে বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। দুই ভাইয়ে করে-কম্মে খাচ্ছি। চাকরি-বাকরি কারো নেই, অথচ বাড়ীতে খেতে-পরতে ছেলেপুলে নিয়ে পনেরো ষোলটি। কোন রকমে আধ-পেটা খেয়েই কাটছে। তার ওপর যদি ধরিয়ে দেন তো না খেয়েই সকলে শুকিয়ে মরব। আমি বামুনের ছেলে, এই দেখুন আমার পৈতে। একটুও মিথ্যে বলছি না বাবু। যদি ধরিয়ে দেন, অনাহারে এতগুলো ব্রহ্মহত্যা হবে।

আমি বললাম—আঃ, কি কর, পা ছেড়ে কথা বল না।

লোকটা তবু কেঁদে বলতে থাকে—আপনি আগে বলুন, বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু বলবেন না। অন্ততঃ আজকের দিনটা বাবু! আজই আমাদের শেষ খেলা। আপনি কথা না দিলে, আমি কিছুতেই পা ছাড়ছি নে।

এ তো দেখি মহা বিপদ! আর কিছুর জন্য না হোক, পা ছাড়াবার জন্য বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল—আচ্ছা কথা দিচ্ছি, বাইরে গিয়ে আজ আর কাউকে কিছু বলব না।

বেরিয়ে আসবার সময় দেখি আমার পরেই আমাদের গণ্‌শা ঢুকছে। গণ্‌শা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কি রে, কেমন দেখলি?

আমি কোন উত্তর দিলাম না, চুপ করে চলে এলাম।

বেরোবার সময় গেটের লোকটা আমাকে বললে—বাবু, আপনার তো দেখা হয়েছে, এখন দয়া করে একটু পাশে সরে যান। লাইনের মুখে ভিড় করবেন না।

রাজুর গল্প

শরৎচন্দ্র বন্ধুদের কাছে এবং মেয়েদের মহলে যেমন গল্প বলতেন, তেমনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও তাদের মনের মতন করে মজার মজার গল্প শোনাতেন।

শরৎচন্দ্রের নিজের কোন সন্তান ছিল না। তাঁর প্রথমা স্ত্রী শান্তি দেবীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্র হয়েছিল। সে ১ বৎসর বয়সের সময় মারা যায়। শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের পুত্র-কন্যাদের অপত্য-স্নেহে মানুষ করতেন। পাড়ার এবং প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদেরও তিনি খুব আদর করতেন।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের তিনি আদর করে সময়ে অসময়ে নানা রকম খাওয়াতেন, আর তাদের গল্প শোনাতেন।

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতেন, তখন তিনি পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কিভাবে মিশতেন ও তাদের কিরূপ গল্প শোনাতেন, সে সম্বন্ধে সেই সময়কার তাঁর গল্পের আসরের শ্রোতা বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি বর্তমানে, এই প্রবন্ধ লেখার সময়, হাওড়া কোর্টের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার) লিখেছেন—

"সেদিনের কথা আজও মনে পড়ে। স্কুলের ছুটির পর আমরা মার্বেল খেলিতেছিলাম। এমন সময় একটি শীর্ণকায় ভদ্রলোক আমাদের খেলা দেখিতে দেখিতে বলিলেন—কিরে ফস্কে গেলি, চেয়ে দেখ আমার কত টিপ্।

সেদিন কয়েকটি বালকের সহিত মার্বেল খেলায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলাম, আহা, আমাদের যদি এমনই টিপ্ থাকিত।

ইহাই পরিচয়ের সূত্রপাত। পরে শুনিয়াছিলাম, ভদ্রলোকটি আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়াটে আসিয়াছেন। সাদাসিধা ধরণের মানুষ, আড়ম্বরহীন বেশভূষা। প্রত্যহই তাঁহাকে আমাদের খেলার দর্শক হিসাবে অথবা তাঁহার

গল্পের শ্রোতা হিসাবে কাছে পাইয়াছি। গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা তন্ময় হইয়া যাইতাম। সেদিনের কথা বেশ মনে পড়ে—যেদিন তিনি আমাদের কাছে 'মহাশ্মশানের গল্প' বলিয়াছিলেন। বড় হইয়া সেই গল্পটি হুবহু শ্রীকান্তের ১ম পর্বে পাঠ করিবার পর অনেক প্রশ্নই মনে উদিত হইয়াছিল। একদিন কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম—তবে যে সেদিন বললেন, আপনাদের মধ্যে তর্ক হওয়ায় আপনি নিজে বন্দুক নিয়ে মহাশ্মশানে গেছলেন। শকুন-শিশুরা কচি ছেলের মত কাঁদে, কিন্তু বই লিখলেন অন্য নাম দিয়ে?

শরৎচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন—কি শুনতে চাস্, শ্রীকান্ত আমি কিনা এই ত? কিন্তু এর উত্তর আজ না পাস্, একদিন হয়ত পাবি।"—মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৪৪।

শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়ে তাঁর দিদির বাড়ীর কাছে ছিলেন, তখনও তিনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন ও গল্প শোনাতেন। সেখানে বিকালের দিকটায় তিনি সাধারণতঃ পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করত, সেখানে গিয়ে বসতেন। আর প্রায়ই বিকালে সের দুয়েক করে ছোলা কড়াই কিনে নিয়ে তাঁর দিদির মেজ জা সুকুমারী দেবীর কাছে গিয়ে বলতেন—মেজদি, এই ছোলাগুলো ভেজে দিন।

ছোলা ভাজা হ'লে, শরৎচন্দ্র একটা পাত্রে করে ছোলাভাজা নিয়ে, ছেলেরা যেখানে খেলা করত, সেখানে গিয়ে ছেলেমেয়েদের মুঠো মুঠো করে ছোলাভাজা দিতেন।

তিনি এদের যে শুধু ছোলাভাজাই খাওয়াতেন তা নয়, সপ্তাহে দুদিন করে বিস্কুট খাওয়াতেন। একজন বিস্কুট ফেরিওয়ালার সঙ্গে তিনি চুক্তি করে রেখেছিলেন। সে সপ্তাহে দুদিন—মঙ্গলবার ও শনিবার বিকালে ঐ ছেলেদের খেলার জায়গায় বিস্কুট নিয়ে আসত। সে এলে তার কাছ থেকে সমস্ত বিস্কুট কিনে নিয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন।

শরৎচন্দ্র এই যেমন ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন, তেমনি তিনি তাদের মজার মজার গল্পও শোনাতেন।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরে একদিন যেমন বলাইবাবুদের 'শ্রীকান্ত' থেকে মহাশ্মশানের গল্প শুনিয়েছিলেন, তেমনি তিনি সামতাবেড়ের ছেলেমেয়েদেরও

শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথের অর্থাৎ বাস্তব রাজুর (রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার) গল্প শোনাতেন।

শরৎচন্দ্র বলাইবাবুদের যেমন লেখা বই 'শ্রীকান্ত' থেকে গল্প বলেছিলেন, তেমনি সামতাবেড়ের ছেলেমেয়েদের কাছে বলা রাজুর গল্প, পরে শেষ বয়সে ছোটদের জন্য লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বলাইবাবুদের কাছে যেমন গল্প বলার সময় শ্রীকান্ত না বলে 'আমি' 'আমি' বলেছিলেন, রাজুর গল্পগুলি লিখবার সময়ও তেমনি তিনি রাজুর নাম উল্লেখ না করে 'লালু' লিখে গেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার গল্প' বই-এর অন্তর্গত 'লালু'র তিনটি গল্প সম্বন্ধেই শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন —'ইন্দ্রনাথের (রাজুর) কাহিনী ফলিয়ে সাহিত্য করে লেখা।'

শরৎচন্দ্র তাঁর 'ছেলেবেলার গল্প' বই-এর ভূমিকায় নিজেও লিখেছেন—'মনে পড়লো এক বাল্যবন্ধুর কথা। ভাবলাম, আজ তারই দু-একটা গল্প বলি। শুনে খুশী হও ভালই।'

শরৎচন্দ্রের ঐ বাল্যবন্ধুই ছিল রাজু।

যাই হোক্, সামতাবেড়ের ছেলেমেয়েদের কাছে বলা, শরৎচন্দ্রের সেই রাজুর গল্প এখানে বলছি—

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল, তার নাম রাজু। পঞ্চাশ বছর আগে অর্থাৎ, সে এতকাল আগে যে তোমরা ঠিক মতো ধারণা করতে পারবে না। আমরা একটি ছোট বাঙ্গলা স্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার মত কত কৌশলই যে রাজুর মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। রাজু তার মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচকে প্রায় সাত-আট দিন খুঁড়িয়ে চলেছিলেন। তিনি রাগ করে বলেছিলেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। মাস্টার সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, তাহলে ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে রাজুর বাবা বললেন—না। আমার নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে এখন আমি একজন বড়

উকিল হয়েছি। আমার ইচ্ছা রাজুও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। তবে যে বার রাজু ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম হতে না পারবে, তখন থেকে ওর জন্য বাড়ীতে পড়ানোর টিউটর থাকবে।

সে যাত্রা রাজু পরিত্রাণ পেল, কিন্তু মনে মনে সে তার মায়ের উপর চটে রইল। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানতো বাড়ীতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

রাজুর বাবা ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হ'ল পুরানো বাড়ী ভেঙে তেতলা বাড়ী করেছেন। রাজুর মায়ের আশা গুরুদেবকে একবার এ বাড়ীতে এনে তাঁর পায়ের ধূলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, আর দূরেও থাকেন। তাই আসতে রাজী হন না। কিন্তু এইবার সে সুযোগ ঘটেছে।

গুরুদেব স্মৃতিরত্নমশায় কাশী গেছেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন— ফেরবার পথে রাজুর মা নন্দরাণীকে আশীর্বাদ করে যাবেন।

রাজুর মার আনন্দ আর ধরে না। তিনি উদ্‌যোগ আয়োজনে ব্যস্ত— এতদিনে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। গুরুদেবের পায়ের ধূলো পড়বে। বাড়ীটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হ'ল। নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এলো—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেই এক কোণে তাঁর পূজো-আহ্নিকের জায়গা হ'ল, কারণ তেতলার ঠাকুরঘরে উঠতে নামতে কষ্ট হবে।

দিন কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরী করতে, ফল-মূল সাজাতে রাজুর মা নিঃশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়েঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যাগ্রহণ করলেন। চাকর-বাকর ছুটি পেল। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরাণীকে আশীর্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়ছে। উঃ, কি ঠাণ্ডা সে জল!

শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন—নতুন বাড়ী করলে নন্দরাণী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেছে দেখছি!

ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারিসুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশী নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জল টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন। উঠে খাট টেনে অন্য ধারে নিয়ে গেলেন। এবং বলতে লাগলেন—ইঃ, ছাতটা দেখছি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত ফেটে গেছে!

গুরুদেব আবার শুলেন। শুতেই আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে আর একধারে নিয়ে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন—বিছানাটাও ভিজেছে, শোবার জো নেই।

স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো মানুষ, অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি জানি ফাটা ছাত ভেঙ্গে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন। সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলছে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই—ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝোড়ো হাওয়া। দাঁড়াবার জো নেই! কোথায় চাকর-বাকর, কোন্ ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিললো না।

একধারে একটা বেঞ্চি ছিল। রাজুর বাবার গরীব মক্কেল যারা, তারাই এসে তাতে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। এতে তাঁর আত্মমর্যাদা যথেষ্ট লাঘব হ'ল বলে অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি!

উত্তরে বাতাসে আর বৃষ্টির ছাটে গুরুদেবের শীত পাচ্ছিল। তাই তিনি কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি বেঞ্চির উপরে তুলে যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন। নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে তাঁর দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরুভোজন ও রাত্রি জাগরণে দু-একটা অম্ল-উদ্গারের আভাস দিল—উদ্বেগের আর অবধি রইল না।

এমনি সময় আবার এক নূতন উপদ্রব দেখা দিল। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে গান জুড়ে দিল। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত! মাত্র মিনিট দুই—অনিশ্চিত নিশ্চিত হ'ল। গুরুদেব বুঝলেন, সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জলুনি, তেমনি তার চুলকুনি।

গুরুদেব দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিল! ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন, ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমনি। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দেখা দিল। ইচ্ছে হ'ল ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন।

কল্পনায় দেখলেন, নন্দরাণী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ীর যে যেমন আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটাছুটির বিরাম নেই।

কোথাকার ঘড়িতে চারটে বাজলো।

গুরুদেব কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—কামড়া ব্যাটারা যত পারিস কামড়া—আমি আর পারি নে!—বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন।

তারপর বললেন—সকাল পর্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে, তো এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ী প্রথমে পাবো সেই গাড়ীতেই দেশে পালাবো। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না, তার হেতু বোঝা গেল।

দেখতে দেখতে সর্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারা রাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে। গুরুদেব অচেতন-প্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরাণী ভোর হতে না হতেই উঠেছেন—গুরুদেবের পরিচর্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেছেন—যদিচ তা গুরুতর, তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভাল হয় নি। আজ দিনের বেলা নানা উপচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেছেন,

ভেবে একটু লজ্জাবোধ হ'ল। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন, তিনি নেই। কিন্তু একি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেছে, কোশাকুশি, আসন প্রভৃতি পূজা-আহ্নিকের জিনিসপত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন, তারা কেউ তখনও ওঠে নি। তবে গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো—ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মত কি একটা বসে না? সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন, তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন—ঠাকুর মশাই!

ঘুম ভেঙে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তারপর ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরাণী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর মশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—সারারাত দুঃখের আর পার ছিল না মা!

—কেন বাবা?

—নতুন বাড়ী করেছ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারারাতের বৃষ্টি-বাদল বাইরে তো পড়ে নি, পড়েছে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই, সেখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে। কিন্তু তাতেও কি রক্ষে আছে মা, পঙ্গপালের মতো ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েছে—এ-ধার থেকে ও-ধারে যাই, আবার ও-ধার থেকে ছুটে এ-ধারে আসি। গায়ের অর্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা!

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরাণীর দু-চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বললেন—কিন্তু বাবা, বাড়ীটা যে তেতলা। আপনার ঘরের ছাতের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন-তিনটে ছাত ফুঁড়ে নামবে কি করে?

তিনি বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হ'ল, এ হয়তো ঐ শয়তান রাজুর কোন রকম শয়তানি বুদ্ধি! ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন, মাঝখানের চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন, ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড় বরফ, সবটা গলে নি তখনো, এক টুকরো বাকি আছে। পাগলের মতো ছুটে বাইরে

গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন, চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন—হারামজাদা রেজো কোথায় ? কাজকর্ম চুলোয় যাক্‌গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন।

রাজুর বাবা সেইমাত্র নীচে নামছিলেন। স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বললেন—কি কাণ্ড করছো ? হ'ল কি ?

নন্দরাণী কেঁদে ফেলে বললেন—হয় তোমার ঐ রেজোকে বাড়ী থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

—কি করলে সে ?

—বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেছে চোখে দেখে এস।

তখনই সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরাণী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন—এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করবো কি করে তুমি বলো ?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

রাজুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে—রাজুবাবু কোঠি মে নেহি হ্যায়।

আর একজন এসে জানালে সে মাসিমার বাড়ীতে বসে খাবার খাচ্চে। মাসিমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসিমা মানে নন্দরাণীর ছোট বোন। তার স্বামীও উকিল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে রাজু দিন পনেরো আর এ বাড়ীর ত্রি-সীমানায় পা দিলে না।

স্কুল ছেড়ে আমরা কলেজে ভর্তি হলাম। রাজু বললে সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি সুরু করে দিলে। আমরা বললাম—রাজু তোমার পুঁজি তো দশ টাকা !

সে হেসে বললে—আর কত চাই, এই তো ঢের।

সবাই তাকে ভালবাসতো ; তার কাজ জুটে গেল। তারপর কলেজের

পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, রাজু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাসা করে বলতো—যা যা দৌড়ো—পারসেণ্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

তারও ছোটকালে যখন আমরা বাঙ্গলা স্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত, একটা হামান্‌দিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরণো তুরপুণের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল—কি জানি কোথা থেকে সে এসব সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু এ দিয়ে পারতো না সে এমন কাজ নেই। স্কুল সুদ্ধ সকলের ভাঙা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় সেলাই করে দেওয়া—এমনি কত কি। কোন কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও চমৎকার।

একবার 'ছট্‌' পরবের দিন কয়েক পয়সার রঙিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন জিনিস তৈরী করে, সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেল্‌না বিক্রি করে ফেললে। তা থেকে আমাদের পেট ভরে চিনাবাদাম ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পর বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিম্‌নাস্টিকের আখড়ায় রাজুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ের জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহসও ছিল তেমন অপরিসীম। ভয় কাকে বলে সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতুম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় এক নিমিষে কোথা থেকে আসে। একটা ঘটনা বলি—

পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ী কালীপুজো। দুপুর রাতে বলির সময় বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতেই সবাই মাথায়

হাত দিয়ে বসলো—উপায়? এত রাতে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পুজো পণ্ড হয়ে যায় যে!

কে একজন বললে—পাঁঠা কাটতে পারে রাজু। এমন অনেক সে কেটেছে।

লোক দৌড়ল তার কাছে। ডাকাডাকিতে রাজু ঘুম থেকে উঠে বসলো, বললে—না।

—না কি গো? দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে!

রাজু বললে—হয় হোক্ গে। ছোটবেলায় ও-কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করবো না।

যারা ডাকতে এসেছিল, তারা মাথা কুটতে লাগলো। বললে—আর দশ-পনেরো মিনিট মাত্র সময় আছে। তারপরই সব নষ্ট, সব শেষ! তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না।

রাজুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন—ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন, না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও!

সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য রাজুর নেই।

রাজু এলে তাকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো।

সময় নেই, তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো।

বাড়ীসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল।

রাজুর হাতের খড়্গ নিমেষে ঊর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তারপরে বলির ছিন্ন কণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিল।

রাজু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো।

এবার যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙা মালা। আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি।

আবার রাজুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার কয়েক হাত-পা আছড়ে কি

জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো। তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙামাটি আরো খানিকটা রাঙিয়ে দিল।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে। উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল। সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদিত-নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত। অকস্মাৎ রাজু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

সমস্ত সাড়াশব্দ গেল থেমে। সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! রাজুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে। চেঁচিয়ে বললে—পাঁঠা কই?

বাড়ীর কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে—আর তো পাঁঠা নেই! আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

রাজু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—নেই পাঁঠা, সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা, মা জয়মা কালী!—বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে পড়ল। আবার ওদিক থেকে লাফিয়ে এদিকে এল। তার হাতের খাঁড়া তখন বন্‌বন্ করে ঘুরছে।

তখন যে কাণ্ড ঘটলো তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই এক সঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে রাজু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়ছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মতো হয়েছে। একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে—কিন্তু এসব মুহূর্তের জন্য। তারপরেই সমস্ত ফাঁকা।

রাজু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কই? পুরুত গেল কোথায়? গুরুদেব কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি

উঠে ঠাকুর দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। রাজু এগিয়ে বাঁ হাতে তার একটা হাত চেপে ধরলে, বললে—চলো, হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদ-কাঁদ গলায় মিনতি করতে লাগলেন—রাজু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠা-মশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

—সে জানি নে! আমার খুন চেপেছে—চল তোমাকে বলি দেব! মায়ের আদেশ!

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্খনো নয়—মা যে জগজ্জননী!

রাজু বললে—জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে, বলো?

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—কোনদিন নয় বাবা, আর কোনদিন নয়। মায়ের সুমুখে তিন-সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়ীতে বলি বন্ধ।

—ঠিক তো?

—ঠিক বাবা, ঠিক। আর কখনও না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাবো।

রাজু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কই? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলায় ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে রাজু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে ঝুম করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ী ছেড়ে পালালো।

তখন কারো বুঝতে বাকি রইল না খুন চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার

চালাকি। রাজু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল, ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পুজো তখনো বাকি, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে এবং মহা হৈ চৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জেমশাই সকলের সম্মুখে বারবার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয় নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো সাত-আট দিন কেউ তার খোঁজ পেলে না।

দিন সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়ীতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে যাত্রা রাজু বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেল।

কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে, চাটুজ্জে বাড়ীর কালীপুজোয় তখন থেকে পাঁঠা বলি উঠে গেল।

[রাজু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো না। রাজু ছিল শরৎচন্দ্রের চেয়ে বছর তিনেকের বড়।

রাজুর বাবা রামরতন মজুমদার উকিল ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার।

দ্বিতীয় গল্পটিতে শরৎচন্দ্র যে বলেছেন—রাজু স্কুল ছেড়ে ব্যবসা করেছিল এবং মিস্ত্রীর কাজ জানত, এ কথা সত্য। 'কেননা রাজু স্কুল ছেড়ে কাঠের গোলা করেছিল এবং নিজেও মিস্ত্রীর কাজ জানত। রাজু একবার নিজের হাতে একটি চেয়ার তৈরি করে শরৎচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিল।

সেই চেয়ারটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে লিখেছেন—'একটি তেপায়া চেয়ার। শরৎ বললেন—এটি রাজুর নিজের হাতে তৈরি—তুন কাঠের।'].

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন কলেজে পড়তেন, সুরেনবাবু তখন স্কুলের নীচের ক্লাসের ছাত্র। শরৎচন্দ্র কলেজে পড়ার সময় সুরেনবাবুকে পড়াতেন, এর বিনিময়ে সুরেনবাবুর পিতা শরৎচন্দ্রের কলেজের মাহিনা দিতেন।

সুরেনবাবু পরে তাঁর পিতার কর্মস্থল মালদহ জেলার চাঁচলে চলে যান। সুরেনবাবুর পিতা চাঁচল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। সুরেনবাবু চাঁচল থেকেই এনট্রান্স পাস করেন।

সুরেনবাবু ভাগলপুরে থাকার সময় দূর থেকে রাজুকে দেখে থাকলেও, তার সঙ্গে মিশবার সুযোগ তাঁর ছিল না। সুরেনবাবু রাজুর সম্বন্ধে বেশীর ভাগ গল্পই শুনতেন শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে।

ভাগলপুরের বাঙ্গলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের স্ত্রী মারা গেলে, রাজুর, সেই মৃতদেহ সৎকার যাওয়ার গল্পটাও সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের কাছে শুনেছিলেন।

শরৎচন্দ্র মড়া পোড়ানোর ব্যাপারে রাজুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু ঐ মড়া পোড়ানোর সময় সম্ভবতঃ তিনি নিজে ছিলেন না। কারণ রাজুই তখন অপরের নেতৃত্বে মড়া পোড়াতো।

রাজুর ঐ মড়া পোড়ানোর গল্পটি শরৎচন্দ্র তাঁর 'ছেলেবেলার গল্প' বইয়ে রাজুর বদলে 'লালু' নাম দিয়ে এবং দু-একটা অন্য নামও অদল-বদল করে লিখেছেন। এই গল্পটি তিনি সামতাবেড়ের ছেলেমেয়েদের এবং সুরেনবাবুকেও বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কাছে শুনে সুরেনবাবু রাজুর ঐ গল্পটি তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' বইয়ে আবার সরস করে লিখেছেন। এখানে সুরেনবাবুর সেই লেখাটিই তুলে দিচ্ছি—

"মাঘ মাসে ভাগলপুরে দারুণ শীত হয়! সেই দুর্বিষহ শীতের রাত্রে বাঙ্গলা স্কুলের পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রীবিয়োগ ঘটল। তিনি নিজে অসুস্থ এবং কোলের ছেলেটি নিতান্ত শিশু। সে ক্ষেত্রে মৃত-সৎকারে তাঁর যোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাতেও বড় কিছু আসে যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ পীড়িতজনের ছিলেন অভিভাবক। খবর দিলে কি না দিলে, তিনি সে বাড়ীতে হামেহাল হাজির। আবার রুগী না বাঁচলে নাকি কর্তব্যের

তিনিই ছিলেন সে বাড়ীর অধ্যক্ষ। তাঁর কর্তৃত্বে বাঙ্গালীর মড়া বাসি হওয়ার চেয়ে বড় অপমান কি আছে? সূর্যদেব গাফিলি করে হয়তো একদিন পশ্চিমে উঠতে পারেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে এ অসম্ভবেরও অসম্ভব! কিন্তু এ সংসারে এতোবড় নিষ্ঠাও সকলের থাকে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ অধিকন্তু হিসেবে একটি স্কুলের হেড মাস্টার—অতএব ছাত্র সম্প্রদায় তাঁর মুঠোর মধ্যে।

রাজুর দল কোমর বেঁধে অগ্রসর হ'ল। তাদের মাঘেও শীত নেই, মেঘেও ভয় নেই। একে অমানিশা, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! যেতে হবে মণ্টের ঘাটে—ক্রোশ দুই-এর ধাক্কা—অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ আর সবুর সইতে পারলেন না। চারজন হতেই নৈশ আকাশে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো—বলো হরি, হরি বোলের নিদারুণ ধ্বনি!

হাস্য-রসিক বিধাতা এতেও তৃপ্ত হলেন না। গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া! টিপি টিপি বৃষ্টিও সুরু হ'ল!

সেকালে হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রবর্তিত হয় নি। কিন্তু মানুষের যাকে বলে উদ্ভাবনী শক্তি, তা চিরকালই অপরাজেয়! একটি হাঁড়ির মধ্যে ভেরেণ্ডার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা চাকরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে অভিযান সুরু হয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ চলেছেন অশ্বগতিতে। পিছন থেকে বামাচরণ মামা ডাকেন—ওহে শুনছ,—আস্তে, আস্তে! ছেলেদের পা মচকে যাবে যে! সব্বার তো তোমার মত ঠ্যাং লম্বা নয়, বোজেন্দর!

—গেলে, আপনি তো আছেন!—ছেলেদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে।

—বাপ সকল আমি আর বহনে পটু নই! তোমাদের সঙ্গদানই বর্তমানে আগমনের উদ্দেশ্য।

ব্রজেন্দ্র বললেন—বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি হচ্ছে, ঝমাঝম্ হ'তে আর দেরি কি?

…অবিলম্বে আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হ'ল। পা অসাড় হয়ে গেছে। জলে ভিজে স-শয্যা মড়া ফুলে ঢোল! ছেলেদের কচি কাঁধ বাঁশের ঘসড়ানিতে নোন্‌চা পড়ে জ্বালা করতে লেগেছে।

—মাস্টার মশাই, একটু রাখলে হয় না!

—তবে রাখ এই তেঁতুল-তলায়!

গাছটা যেন এক বনস্পতি। বামাচরণ বসে বললেন—কিন্তু জায়গাটা আমার পছন্দসই নয়।

—কেন, ঠাকুরদা?

—এৎবারি বেটা এখেনেই থাকে কিনা!

—কে এৎবারি? ডাকাত?

—দ্যুৎ, সে তো তিলকা মাঝি!

—তবে?

বামাচরণ বললেন—সে একটা মস্ত ইতিহাস। বলি শোন্—আমাদের ঐ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেমকে দেখেছিস্? নীল গাউন পরা?

—ধোপানী?

—ধোপানী হ'লে কি হয়, মানুষটা ভালো। ও সায়েবের ছোঁয়া খায় না। বাবুর্চির রান্না ছুঁয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে।

ব্রজেন্দ্র বললেন—এতও তুমি জান মামা!

—ঠেকলেই জানতে হয়, বাবাজীবন!

—তারপর ঠাকুরদা?

—ঐ যে দেখছো—ঐ ছোট্ট কুঁড়ে, সাহেবের ফটকের লাগাও—ঐতে থাকতো এৎবারি ধোপা। হঠাৎ এৎবারি মারা গেল। তারপর ধোপানীর উন্নতি হ'ল; সে নীল গাউন পরলে। কিন্তু তার বেশী আর সে কিছুতেই এগোতে চায় না। সাহেব অনেক বোঝালে, কিন্তু ধোপানীর সেই এক কথা —সাহেব তোমায় সব দিতে পারি, কিন্তু জাত দেব কেমন করে?

—কেন?—সাহেব জিজ্ঞাসা করে।

—জাত তো আমার নয়, জাত যে বাপ-দাদার!

এই অকাট্য যুক্তির পর আর তর্ক চলে না। তবুও লোকে ছাড়ে না, বলে—তুই সায়েবকে সাদি করিস নি?

—সাদি নয় তো, নিকা করেছি। নৈলে বেটাবেটি হ'ল কি করে? —ধোপানী দৈহিক সংস্কারে নীল গাউন পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু মানসিক সংস্কারে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। অতএব তার এৎবারি মরে ভূত ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

ধোপানীর মন দিয়ে মেম সায়েব সেই ভূতকে মোটেই পরিত্যাজ্য মনে

করে নি। সে দিনে-রাতে এই তেঁতুলতলায় এংবারির সঙ্গে কথা কয়ে নিজেকে অপাপ-বিদ্ধ রেখেছিল। এংবারিও এমন মেয়েকে ছেড়ে যায় নি। সে এই গাছেই বিরাজ করে—অবশ্য কুলীন ভূত নয় বলে কথা কইতে পারে না, কিন্তু গাছের ডাল নাড়িয়ে ধোপানীর সমস্যার সমাধান করে দেয়। অতএব, তাই বলছিলাম বোজেন্দর,—এই গাছটার ওপর লোকে একটু ভয়চকিত কটাক্ষ ফেলে, একটু তফাৎ রেখেই আনাগোনা করে থাকে।

এই কথা ক'টি বলে মামা সেঁতানো টিকে ধরাবার জন্য গাল ফুলিয়ে কলকেয় ফুঁ পাড়তে লাগলেন।

—তারপর ঠাকুরদা?

—হুঁ, তাই বলছিলাম—আজ তিথিটাও সুবিধের নয়—আর এই জায়গাটা গিয়ে কি বলে, আমার মনঃপূত নয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ ভূতে অবিশ্বাস করতেন না। কিন্তু ঠিক এই সময়ে তা স্বীকার করা উচিত হবে না মনে করেই বোধ হয় বললেন—ও সব কিছু না। আচ্ছা দেখাই যাক্ না—সত্যি মিথ্যে—আমরা তো আর একা নই!

—কি দেখবে? দেখা আমার ভাল করেই আছে।

—কি রকম সে?—কে একজন পিছন থেকে প্রশ্ন করে বসলো।

তাকে চাপা দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন—থাক্ মামা, থাক ওসব এখন! ছেলেরা ভয় পেয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষের স্বভাব ভালো নয়। ভয় পায় তবুও সে আবার ভয়ংকরকে চায়, বিশেষ করে এই অর্বাচীনের দল! তারা সমস্বরে বললে—না ঠাকুরদা, বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।

—দেখছো হে ব্রোজেন, এদের আবদারটা!

—বলুন তবে, সময়টা তো কাটবে।

খেলো হুঁকাটায় বার কতক কলকে-ফাটান টান মেরে, খুব কতকগুলো কেশে নিয়ে বামাচরণ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প সুরু করে দিলেন।

—তুমি বোধ হয় দেখে থাকবে ব্রোজেন, আমার পিসে রঙ্গলাল মুখুজ্যে মশাইকে? তিনি ঐ ঠাকুরদের এস্টেটে ওভারসিয়ার ছিলেন।

—দেখেছি মনে হয়। উদুরিতে মারা গেলেন তো? তাঁকেও ঐ মণ্টের

ঘাটের পূবে পুড়িয়েছি।—বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বেশ একটু শ্লাঘা অনুভব করলেন।

—এমন ভালো মানুষ কালে-ভদ্রে দেখা যায়। পুকুরের পাঁক যেন। আর আমার পিসিমাটি! বাপ্! যেন পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—

—ধূমটা কি, মামা?

—বচন হে, ক্ষুরধার! রাগে দুর্বাসা মুনিটি! নিত্য উদ্দীপনাময়ী, রণচণ্ডিকা!

বামাচরণ আফিং সেবা করতেন এবং তার সহকারী ছিল তাম্রকূট। নিত্য-উৎসারিত ধূমকুণ্ডলীতে অতিপুষ্ট গোঁফজোড়া, চোখের উপর ঝুলে পড়া ভ্রূযুগল, আর চুলগুলি পেকে তাম্রবর্ণ ধারণ করেছিল। কথার বাঁধুনি ছিল, কিন্তু তা চিবিয়ে চিবিয়ে। যেন মনটি, বসে রোমন্থন করছে। কথার গতি মন্দাক্রান্তা।

বামাচরণ বললেন—আমি থাকি কোথায় সেই বাঙ্গালীটোলায় আর তিনি এই বারারিতে। পিসিমার হুকুম হ'ল, বোশেখী পূর্ণিমার সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়ে যেতে হবে তাঁর বাড়ীতে। 'না' বললে রক্ষা আছে! এলুম সকাল সকাল। আশা যে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফেরা যাবে। কিন্তু পিসিমার রোগটাও জানা ছিল। লক্ষ্মীপুজোর বরাতে শেষ পর্যন্ত ফেঁদে বসবেন, মহামায়ার সাড়ম্বর পুজো!—আমই করেছেন সাতাশ রকমের—মায় সেই জরদালু থেকে আরম্ভ করে, বোম্বাই, ল্যাংড়া,—ভরতভোগ, কিষণভোগ, ফজ্‌লি, গঙ্গাসাগর—শেষে গিয়ে ঠেকেছে পাতুকায়—

—পাতুকাটা কি দাদামশাই?

—সেই যে কালো কালো ছোট ছোট আমগুলো,—

—আর কাগ্‌ দেশান্তরি?

—তার অম্বল হয়েছিল।

—তারপর?

—ক্ষীরের সঙ্গে—যে সে ক্ষীর নয় গো! ভঁয়সার ক্ষীর। তার সঙ্গে বোম্বাই—বুঝেছ, বোজেন্দর—সে একেবারে, ব্লড্—ব্লড্।

—মানে?

—গায়ে রক্ত গজিয়ে উঠবে। শেষ করতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা কাবার

হ'য়ে গেল। ঠিক সাড়ে বারোটার সময় একটা কেঁদো লাঠি হাতে করে—অগস্ত যাত্রা সুরু হ'ল।

পুলিস সায়েবের বাংলো পেরিয়ে এই তেঁতুলগাছের মগ্‌ডালটায় নজর পড়লো। নির্মেঘ আকাশ, ফুটফুটে জোছনা! কোথাও কিচ্ছু নেই, কিন্তু হঠাৎ ছাঁৎ করে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল! দূরে সায়েবের কুকুরগুলো ঝাঁউ ঝাঁউ করে ডাকছে। পেঁচার ডাক! আকাশে মারওয়াড়ির দোকানে কাপড়-ফাড়ার আওয়াজ! গায়ে কাঁটা দেবেই। কিন্তু বামাচরণ ভয় পাবার বান্দা নয়! বামাচরণ ভীতু নয়, আবার হোঁৎকাও নয়! অবশ্যি, লাঠিটা বাগিয়ে ধরলুম—হাত থেকে না ফস্‌কে খসে যায়।

চলছি আর বলছি, হে বাবা রজকনন্দন! তুমি যে ঐ তেঁতুলগাছে আছ, তা আজকালকার ইংরিজি পড়া আহম্মকেরা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু···

—তারপর, আপনার রজকনন্দন কি বললে?

—কিচ্ছু না। সাধ্যি কি কথা কয় চক্কোত্তি বামুনের সামনে এসে! ন' খেই সুতো কি বৃথায় ঝোলে বামুনের গলায়? চলেছি আর বলছি, লোকে বলে, এৎবারি তুই আছিস ঐ তেঁতুল গাছের ডগাটায়। কিন্তু প্রত্যয় হয় না, একটা কারসাজি না দেখালে! বলি, পারিস দেখাতে?

একশো হাত দূর থেকে বুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে জপছি, ব্রহ্মমন্তর গায়ত্রী। উঃ, কি তেজ মন্তরের—গা চপ্ চপ্ ঘামে—যেন সুরধুনী বইছে গায়ে। আর বুকের মধ্যে—যেন বালাপোষের তুলো ধুনচে আমাদের গোমদা মিঞা। ব্রহ্মতেজ কি অসাধারণ মাইরি! থামি নি, চলেছি গুড়ি গুড়ি! জিভ জড়িয়ে আসে—ওঁ বলতে বেরোয় বোং।

অন্ধকারে হাসির খুক্ খুক্ শব্দ শুনে বামাচরণ বললেন—হাসছো এখন? পড়তে যদি সে পাল্লায় বাছাধনরা, সাতদিন দাঁতকপাটি লেগে থাকতো, এই গাছতলায়। রোজা ডেকে হলুদ পুড়িয়ে স্নান করাতে হ'ত, তা তোমায় আমি বলে দিচ্ছি, বোজেন্দর!

—তারপর, তারপর?

গাছতলায় এসেছি কি না এসেছি, সমস্ত গাছটাই উঠলো হুড়মুড়িয়ে দুলে আর মগডাল থেকে পড়লো ঝাড়া দশ ইঞ্চি চৌপল থান ইট। পড়ে শব্দ হ'ল ঠং—আনকোরা মিনটের টাকার মতো। ঠিক সামনে! বেঁচে গেল পৈত্রিক

মাথাটি আমার। মাথাটি যে একটু ঘোরে নি, আর চোখে সরষে ফুল দেখি নি, বললে সত্যের উপক্ষয় হবে। কিন্তু বামাচরণের ভুল হয় নি, অবস্থা দেখে ব্যবস্থা! গায়ত্রী ছেড়ে—সোজা ধরেছি রামনাম!

বললুম—কেয়াবাৎ, এৎবারি হাতের তারিফ তোর! সামনে ইটখানা পড়ে আছে টাটকা—যাকে বলে গরমাগরম, একটা কোণার এতটুকু বালি পর্যন্ত খসে নি! ভৌতিক, একদম ভৌতিক! আমরা তোমরা ফেললে, ইটখানা চৌ-চাক্‌লা হয়ে ভাঙতো, না বাবাজীবন?

—নিশ্চয়!

—তারপর?

—ধোপানী তখনো ফেরে নি কুঠিতে। দৌড়ে এসে বললে—কেয়া হুয়া বাবুজি?

—কুছ নেহি, মেমজি। এক লোটা পানি তো মাংগাও!

সবুর সয় না। ছুটলাম সোজা বাবলা বনের পাশ দিয়ে।

বাড়ী ফেরার পথে দেখি, তখনও দফাদার ডাক্তার পড়ছে তার সেই মোটা মোটা বইগুলো।

বললুম—একটা পেট কামড়ানির ওষুধ দাও। সে দিলে কি না জেলস্।

বললুম—ডাক্তার, একজ্বরির ওষুধ দিচ্ছ কেন? সে আমার বিদ্যে দেখে হাসে। জানে কিনা বামাচরণ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ!

—তাহলে আপনি ভূত মানেন?

—নিশ্চয়! আমি ভেবে দেখেছি যে, ভূত অস্বীকার করলে ভগবান অস্বীকার করতে হয়। তবে এলো কোত্থেকে এই বামাচরণ চক্কোত্তী, শুনি!

বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়তে আরম্ভ হ'ল।

ব্রজেন্দ্র বললেন—কাছাকাছি আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মড়া ফেলে তো আর যাওয়া যায় না।

রাজেন্দ্র বললে—আপনারা যান, আমি তো আছি।

—কে রে তুই? সাবাস্!

—ও রাজু।

—তা ছাড়া আর কে হবে? বলে বামাচরণ বললেন—চলো চলো,

আমাদের নিমোনিয়া হবে বোজেন্দর, আমরা ছা-পোষা মানুষ! ওদের কি? টাঁস্লে তো একাই টাঁস্বে।

—তাই তো! ভাবছি!

—আরে! মাথা দিয়ে ভাববে তো! যদি শিলে মাথাই ভেঙ্গে চুর হয় তো ভাববে কি দিয়ে? শুভস্য শীঘ্রম্!

—বাবু হাম্‌ভি···

—আবার চাকরটা যেতে চায় যে, মামা!

—কাহে রে?

—ডর!

—ডর কোন্ বাৎ কা?

জোরে চেপে ঝড় আর শিলাবৃষ্টি আসাতে সবাই ছুটে চলে গেল আশ্রয়ের সন্ধানে।

রইল একা রাজু।

শেষ রাতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আলো দেখা দিতেই, সবাই ফিরে এসে দেখলো, মড়া পড়ে আছে, আর কেউ নেই!

—ও আমি আগেই জানতুম, বোজেন্দর!

—কিন্তু কাজটা কি ভাল হ'ল? ভারি অকল্যাণ, মামা!

—দাঁড়াও, অকল্যাণ—লাশটা যে উঠে চলে যায় নি, এই আমাদের ভাগ্যি!

—রেজোর উপর আমার ধারণাটা কিন্তু ভালোই ছিল।

—ভুলে গেলে, এটা কোন্ কাল?

—তা ঠিক।

—সরে এসো, সবাই সরে এসো! সব্বাই শোন, বামাচরণ চক্কোত্তির কথা—নৈলে প্রাণ খোয়াবে, বলে দিলুম।

সকলে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্র বললেন—ব্যাপার কি মামা?

—ব্যাপার গুরুচরণ!

—সে কি?

—দেখছো না, মড়া নড়তে স্নুরু করেছে।

—তাই তো!

—পেটটা ফুলে ঢাক হয়ে গেছে।

—এ সব এৎবারি বেটার খেলা!···বোজেন্দর যা বলি শোন।

—কি মামা!

—আমরা সবাই বামুনের ছেলে আছি। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে চীৎকার করে বলবে, রাম, রাম, রাম। দেখবে একতার জোর, ভয় আমার ঐ চাকরটাকে নিয়ে, ওকে না ভর করে বসে বেটা।

—এই কেয়া নাম তুমারা?

—গরভূ—

—হট যাও গরভূ, তফাৎ যাও। বল সবাই এক সঙ্গে।

—রাম, রাম, রাম।

—ব্যস্‌,—নড়ছে, ফের বল।

—রাম, রাম, রাম।

—ওই দেখ উঠছে। আরো চেঁচিয়ে বল—

—রাম, রাম, রাম।

—ঐ আসছে, পেছু হটে—সবাই পেছিয়ে—

হাসতে হাসতে মড়া-ঢাকা লেপের ভিতর থেকে রাজু এলো বেরিয়ে।

—সাবাস বাচ্ছা! জীত রহো—এই তো মরদের সাহস।"

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর কলকাতার বাড়ীতে কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে ছেলেবেলাকার গল্প বলছিলেন। মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীকান্ত প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথের কথা উঠল।

একজন প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, ইন্দ্রনাথের মতো বাস্তবজীবনে সত্যিই কেউ ছিল কি? না, চরিত্রটি আপনার মনগড়া?

শরৎচন্দ্র বললেন—না, মনগড়া নয়। ইন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ একটি বাস্তব চরিত্র। ভাগলপুরে মামাদের বাড়ীর কাছে নামকরা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, রামরতন মজুমদার। রামরতনবাবুর একটি ছেলের নাম ছিল রাজেন। আমরা ডাকতাম রাজু বলে। এই রাজুই আমার শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ। রাজুর বড়দা রায় বাহাদুর সুরেন মজুমদার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সাহিত্যিক এবং একজন উঁচুদরের গায়ক ছিলেন।

রাজু বেশী লেখাপড়া করে নি বটে, কিন্তু গুণ ছিল অশেষ। ঐ বয়সে ঐ ধরণের অতবড় একটা আদর্শ মানুষ, আমি জীবনে দেখি নি। শ্রীকান্ত উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের চরিত্র আঁকতে গিয়ে আমাকে কোন কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি। রাজু মানুষটাই ছিল ঐ রকম। তার কথা মনে পড়লে আজও আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আজ তারই কথা যখন উঠেছে, তার গল্প দু-একটা শোনাই তোমাদের—

রাজুদের বাড়ীর অদূরেই ছিল গঙ্গা। তার তীরে বিরাট একটা বটগাছ ছিল। জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন। সেই বটগাছের বড় একটা ডাল গঙ্গার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সেই ডালে বাঁশের একটা মাচা করে, ক্যানেস্তারার টিন দিয়ে ঘিরে, রাজু ছোট্ট একটা ঘরের মতো তৈরি করেছিল। রোজ ভোরে তার কাজ ছিল, সেই ঘরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ভগবানের ধ্যান করা। সকলেই ঘরটাকে রাজুর ধ্যানঘর বলে জানত। কিন্তু কারো সাধ্য ছিল না, সেই ঘরে ঢোকে। ডাল বেয়ে সেই ঘরে ওঠাও ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি অবশ্য রাজুর ধ্যানঘর দেখতে সেই ঘরে দু-একবার গিয়েছিলাম।

একদিন সকালে ধ্যান শেষ করে নদীর ধার দিয়ে রাজু বাড়ী ফিরছে। বাঙ্গালীটোলা ঘাটের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল। হয়েছে কি, একটি আধবয়েসী মেয়ে ঘাটের একপাশে স্নান করছিল। সেখানে মাঝবয়েসী একটি হিন্দুস্থানী সাঁতার শেখবার ভান করে হাত-পা ছুঁড়ে মেয়েটির গায়ে মাথায় খুব জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটি অসহায়, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। রাজু তাই না দেখে তড়াক করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তারপর কোঁচার খুঁটটি খুলে রসিকপ্রবরের গলায় আলগা ফাঁসের মতো পরিয়ে দিয়ে, এক হ্যাঁচকায় তাকে জলের তলায় টেনে ধরল।

লোকটা জলের নীচে হাঁসফাঁস করছে, আর রাজু গুণে চলেছে, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর···। নিঃশ্বাস না নিতে পেরে লোকটা তো ছটফট করতে লাগল, কিন্তু রাজুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বেশ খানিকটা পরে লোকটা ছাড়া পেয়ে খুব এক চোট হাঁফাতে লাগল। তখন রাজু জিজ্ঞাসা করল—আউর কভি?

লোকটা দম নেবার ফাঁকে বললে—কভি নেহি হুজুর। কসুর মাফ্ কিজিয়ে।

তব্ ভাগো আভি—বলে রাজু জল থেকে উঠে এল।

লোকটি আর কোন কথা না বলে, ভয়ে ভয়ে জল থেকে উঠে চলে গেল।

আর একদিনের ঘটনা।

সেদিন সন্ধ্যার পর রাজু বেড়াতে বেরিয়েছে। এমন সময় বারারী স্টেট হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত রাজুকে দেখতে পেয়েই এসে কেঁদে পড়লেন—বাবা রাজু, আমি তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, বাবা!

রাজু ব্যস্ত হয়ে বললে—কি হয়েছে পণ্ডিতমশায়? আপনি অমন করে কাঁদছেন কেন?

উত্তরে পণ্ডিতমশায় তাঁর পিঠ দেখিয়ে বললেন—এই দেখ না বাবা, কথা নেই বার্তা নেই, পুলিশ সাহেব আমাকে কি মারটাই না মারলে! জমিদার বাড়ী টিউশনিতে যাচ্ছিলাম, পথে পুলিশসাহেবের সঙ্গে দেখা। সাহেব আসছে ঘোড়ায় চড়ে, আমি তাই না দেখে তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছি। তবু সাহেবের মেজাজ গরম, গালি দিয়ে বললে—রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াতে পার নি?—বলেই আমাকে সপাং সপাং করে মার সেই ঘোড়ার চাবুক দিয়ে। তারপরই সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের পথে চলে গেল।

রাজু বললে—আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা! ঘোড়ায় চড়ে সাহেব গেছে ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলতে। ফেরার সময়েই টেরটি পাবে। আপনি এখন বাড়ী যান পণ্ডিতমশায়! কালই শুনতে পাবেন, কি করেছি সাহেবকে।

এই বলে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, রাজু সিধে আমার কাছে এসে হাজির। দেখলাম, মুখখানা তার চাপা রাগে থমথম করছে। আমাকে সব কথা বলে, তারপর বললে—শরৎ, তুই শিগ্‌গির আয় আমার সঙ্গে।

সেই ডাক অবহেলা করতে পারি, এমন বুকের পাটা আমার ছিল না।

তবু ভয়ে ভয়ে বললাম—তুমি সাহেবকে মারবে রাজু? তার কোমরবন্ধে সব সময়েই রিভলভার, আর আমাদের খালি হাত, মনে থাকে যেন!

রাজু বললে—তুই আয় না। কি করি সে দেখবি তখন।

ব্যস্, আর কথা চলে না। চললাম রাজুর সঙ্গে। প্রথমে আমরা গেলাম আদমপুরের ঘাটে। আদমপুরের ঘাট তখন গমগমে জাহাজঘাট। গোটা কয়েক স্টীমার আর বড় বড় নৌকা সব সময়েই বাঁধা থাকত। অন্ধকারে চুপেচুপে একটা বড় নৌকায় উঠে, মাঝিদের অলক্ষ্যে রাজু মোটা একটা কাছির বাণ্ডিল মাথায় করে তুলে নিয়ে এল।

আমি ঘাটের একপাশে আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাজু এসে বললে—চল্ এবার।

পুলিশসাহেবের বাংলো থেকে ক্লাব প্রায় মাইলখানেকের পথ। সাহেব এই পথটা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করত। আর তার একটা ব্যারাম ছিল, কিছুতেই সে আস্তে ঘোড়া চালাতে পারত না। সব সময়েই জোরে ঘোড়া ছোটানো ছিল তার বাতিক।

সাহেবের বাংলো আর ক্লাবের মাঝামাঝি এক জায়গায় আমরা অন্ধকারে লুকিয়ে রইলাম। তারপর অনেক রাতে যখন মনে হ'ল সাহেবের ফিরবার সময় হয়ে এসেছে, তখন রাজুর হুকুমে কাছিটাকে হাত দুই উঁচু করে রাস্তার দুধারে দুই আমগাছে বেশ টান করে বাঁধা হ'ল।

আগেই বলেছি, রাত তখন অনেক, রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ হয়ে এসেছে। আমরা দড়ি টাঙিয়ে নিঃশব্দে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। এমনি করে খানিকটা সময় কাটবার পর, ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম, সাহেবের বিলিয়ার্ড খেলা শেষ হয়েছে। যেমন বাতিক খুব জোরেই সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। যেমনি আমাদের কাছির কাছে আসা, অমনি তো ঘোড়া হোঁচট খেয়ে একেবারে সওয়ারসুদ্ধ উল্টে পড়ল। সাহেব ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

সাহেব বেদম নেশা করেছিল। এমনিতেই দাঁড়াতে পারত কিনা সন্দেহ, তার উপর আবার আচমকা আছাড়। বুঝতেই পারছ পুলিশসাহেবের অবস্থা, মাটিতে পড়ে বেটা মুখ থুবড়ে গোঙাতে লাগল।

রাজু একটা হিংস্র বাঘের মতো সাহেবের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর

সে কি মার! মারের চোটে সাহেবের নেশা ছুটে যাবার যোগাড়! রাজু কিন্তু মুখে একটি কথাও বললে না। নিঃশব্দে কাজ সেরে, সাহেবের কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে নিয়ে উঠে পড়ল।

আমাকে ইশারা করলে—চল্।

ক্ষিপ্রহাতে কাছিগাছটা খুলে নিয়ে দুজনে সরে পড়লাম। আদমপুর ঘাটে এসে রাজু যথাস্থানে কাছিটা রেখে এল। তারপর সাহেবের রিভলভারটা ফেলে দিল গঙ্গায়। বললে—চল্, বাড়ী ফিরি এবার। সাহেবকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, কি বলিস্।

এই আমার রাজু, আমার ইন্দ্রনাথ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে, অন্যের জন্য নিজেকে এমন বিলিয়ে দিতে, আমি দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নি।

কবি নরেন দেবের বাড়ীতে একদিন শরৎচন্দ্র চা পান করছিলেন। নানা রকম গল্প হচ্ছিল। কথায় কথায় শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথের সাহসের কথা উঠল।

শরৎচন্দ্র বললেন—ইন্দ্রনাথ অর্থাৎ রাজু, সে যে কি পরিমাণে সাহসী ছিল, তার সঙ্গে যে না মিশেছে, সে ঠিক বুঝতে পারবে না। আমরা যেখানে ভয়ে পালাতাম, সে সেখানে এগিয়ে যেত। ভয় জিনিসটা সে জানতই না। তার সাহসের একটা গল্প বলি শোনো—

আমি তখন স্কুলে পড়ি। রাজু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে লোকের সেবা করে বেড়ায়। কে কোথায় কি বিপদে পড়েছে, তাকে উদ্ধার করা। কার অসুখে লোক নেই, তার সেবা করা। কে কোথায় মরেছে, সেই মৃতদেহ দাহ করতে যাওয়া—এই সব হ'ল তার কাজ।

আমি আবার ছিলাম রাজুর ডান হাত। দরকার হলেই রাজু আমাকে ডাকত। বিশেষ করে শবদাহের কাজ একা হ'ত না বলে এ কাজে আমাকে প্রায়ই যেতে হ'ত রাজুর সঙ্গে।

ভাগলপুরে মামাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজো হ'ত খুব জাঁক করে। সেবার জগদ্ধাত্রী পুজোর ঠিক পরের দিন, মামাদের বাড়ীতে যাত্রা হচ্ছে। কলকাতা থেকে নামকরা দল এসেছে। পাড়ার এবং প্রতিবেশী অঞ্চলের লোক সব ঝেঁটিয়ে এসেছে যাত্রা শুনতে। আমিও আসরের এক কোণে বসে তন্ময় হয়ে যাত্রা শুনছি। এমন সময় রাজু কোথা থেকে এসে কানে কানে বললে—উঠে আয়।

উঠে বাইরে এলাম। রাজু বললে—ও-পাড়ার তারাপদর ছেলেটা এইমাত্র কলেরায় মারা গেল। ছোট ছেলে, মাত্র বছর তিনেক বয়স। অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুতেই বাঁচানো গেল না। একমাত্র ছেলে! কলেরার মড়া, সেই তাকে নিয়েই তারাপদ আর তার স্ত্রী পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে। ঐ রোগের মড়া ঐভাবে ওদের কাছে ফেলে রাখাটা ঠিক নয়। তাই ভাবছি, এখুনি মড়া নিয়ে শ্মশানে যাব। ও-পাড়ার সবাই তো যাত্রা শুনতে এসেছে, পাড়া খালি। তা তুই আয় আমার সঙ্গে।

আমি আর বাক্যব্যয় না করে সুড়সুড় করে রাজুর সঙ্গী হলাম। যাত্রা শোনার ঐখানেই ইতি।

তারাপদ আর তার স্ত্রীকে নানারকম প্রবোধ দিয়ে, মৃত শিশুটিকে কোন প্রকারে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, আমরা যখন শ্মশানে রওনা হলাম, রাত্রি তখন বোধ করি ১টা হবে।

পথে বেরিয়ে রাজুকে বললাম—সঙ্গে বাতি-টাতি কিছু একটা নিলে হ'ত না?

রাজু বললে—তা তো হ'ত! কিন্তু এখন পাই কোথা? দেবে কে? চল্, আমার সঙ্গে দেশলাই আছে। প্রয়োজন হ'লে তাই জ্বালানো যাবে এখন।

আর কোন কথা বললাম না। তারাপদর ছেলেকে কোলে নিয়ে রাজু চলেছে আগে, আমি তার পিছনে।

গঙ্গার ধারে শ্মশান। যেমন বিরাট, তেমনি বিভীষিকাময়! দিনের বেলাতেও সেই শ্মশানের ধারে যেতে লোক ভয় করে। চারদিকে বহুদূর

পর্যন্ত লোকালয়ের নামগন্ধ নেই। শুধু বালু, আর মাঝে মাঝে কোথাও দু-একটা খেজুর বা কাঁটাগাছের ঝোপ।

শ্মশানের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা চালাঘর। লোকে মড়া পোড়াতে এসে জলঝড়ে পড়লে, নয়তো বিশ্রামের প্রয়োজন হ'লে, সেই চালায় এসে আশ্রয় নিত। এইদিক থেকে ঐ চালাঘরটি সকলের বিশেষ কাজে লাগলেও, লোকে কিন্তু শ্মশানের চেয়েও বেশী ভয় করতো ঐ চালাঘরটিকেই। বলতো ওটা নাকি ভূতের একটা আড্ডাখানা। রাত্রে তো দূরের কথা, দিনের বেলাতেও কেউ সঙ্গে অনেক লোকজন না থাকলে, ওর ধারে কাছেও ঘেঁসতে চাইত না।

রাজু এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না। সে সোজা গিয়ে উঠল প্রথমেই ঐ চালাঘরটিতে। পিছু পিছু আমিও গিয়ে উঠলাম বটে, তবে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। বুঝছিলাম, হাতে-পায়ে কেমন খিল ধরে যাচ্ছে। তবে সঙ্গে আছে রাজু—এই যা একমাত্র ভরসা।

মেঝেতে মৃতদেহ নামিয়ে রেখে রাজু বললে—অনেকক্ষণ বিড়ি খাওয়া হয় নি। আগে একটা বিড়ি খেয়ে নিই, কি বলিস?

রাজুর কথায় আমি সায় দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই স্পষ্ট কানে এল, অন্ধকার থেকে কে যেন বললে—আমায় একটা দেবে?

আমার অবস্থা তখন বুঝতেই তো পারছ! মাথার চুল তারের মত খাড়া, গা দিয়ে স্রেফ ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে।

রাজু কিন্তু গলা ঝাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কে?

উত্তর এল—আমি।

আমি কে?—বলেই রাজু ফস্ করে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরাল।

আলোতে দেখলাম, আমাদের পাশেই ময়লা একটা বিছানা। সেই বিছানায় মানুষের মতো কি একটা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে, আপাদ-মস্তক কাঁথা দিয়ে ঢাকা।

রাজু ভাল করে দেখে বললে—এ আর একটা মড়া রে! কারা পোড়াতে এসে ফেলে রেখে গেছে। কাঠকুটো আনতে গেছে বোধ হয়।

তখন আবার শোনা গেল, কে যেন বললে—না গো আমি মড়া নই।

এবার আমি রাজুর হাত দুটো চেপে ধরলাম। কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না। দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

বলিহারি যাই রাজুর সাহসে—সে নির্ভয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে কে তুমি?

প্রথম কাঠিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, রাজু আর একটা কাঠি ধরাল। এবার দেখলাম, কাঁথার ভিতর থেকে শব্দ এল—আমি গঙ্গাযাত্রী।

রাজু এগিয়ে গিয়ে কাঁথার একটা ধার তুলে ধরল। দেখি, প্রায় আশি বছরের এক বুড়ো, কট্‌মট্‌ করে দিব্যি তাকিয়ে আছে। মুখে মৃত্যুর লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

রাজু আমাকে সাহস দিয়ে বললে—ভয় নেই রে! এ মড়া নয়, গঙ্গাযাত্রীই।

তারপর সে একটা বিড়ি ধরিয়ে বুড়োর মুখে পুরে দিলে। পরম আরামে বিড়িতে এক টান দিয়ে বুড়ো বললে—আঃ, বাঁচালে বাবা! কদিন হ'ল এসেছি, চাইলে একটা বিড়িও দেয় না। যত সব হতচ্ছাড়া!

রাজু এবার বুড়োকে প্রশ্ন করতে লাগল—কদিন এসেছ? তোমার সঙ্গে কে কে এসেছে? তারা সব কোথায়?

বুড়ো বললে—এসেছি বাবা আজ তিনদিন হ'ল। মরণ আর হচ্ছে না। আমার দুই নাতি, আর পাড়ার একটি লোক আমাকে নিয়ে এসেছে। তারাও এ কদিন রয়েছে আমার সঙ্গে। কোথায় নাকি আজ কলকাতা থেকে ভালো যাত্রার দল গাওনা করতে এসেছে, তারা খানিক আগে গেছে সেখানে। আমার মরতে দেরি হচ্ছে বলে, তারা আমার উপর বিষম চটে যাচ্ছে বাবা। বলছে, মরবে ভেবে বুড়োকে বা'র করলাম, আর এখানে এসে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বুড়ো দিব্যি সেরে উঠছে, মরবার নামটি নেই। কি জানি বাবা, কি হবে আমার! একবার গঙ্গাযাত্রী হয়ে এলে আর নাকি ঘরে ফিরতে নেই!

রাজু বললে—কে বললে ফিরতে নেই? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি এখন মরবে না, এ যাত্রা সেরে উঠলে। তা তোমার বাড়ী কোথায়? চল, বাড়ী ফিরে যাবে চল। আমরা তোমাকে নিয়ে যাব। না হ'লে, ঐ বাড়ী ফিরতে নেই বলে যারা তোমাকে নিয়ে এসেছে, তারাই হয়ত তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

বুড়ো বললে—তুমি ঠিক বলেছ বাবা! কদিন ধরেই তো ওরা এই বলে আমাকে শাসাচ্ছে। এখন কবে না জানি গলা টিপে ধরে।

রাজু বললে—ঠিক আছে, তোমার আর ভয় নেই। আমরা আমাদের কাজটা সেরে নিই, তারপর তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। আজ রাত্রে তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে। কাল বেলা হ'লে তোমাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসব।

তারাপদর ছেলেটিকে মাটি চাপা দেওয়া হ'ল। তারপর রাজু গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে একাই বুড়োকে কাঁধে তুলে নিলে। আমাকে বললে—তুই ওর কাঁথা বিছানা সব বগলদাবা করে নে।

আসবার সময় যেমন, ফেরবার সময়ও তেমনি—সামনে চলেছে রাজু, আর পিছনে চলেছি আমি। তার কাঁধে এবার বুড়ো, আমার বগলে বুড়োর ময়লা কাঁথা বিছানা।

মামারবাড়ীর কাছে এসে শুনলাম, যাত্রা তখনো চলছে।

এই আমার বন্ধু রাজু, অর্থাৎ আমার শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ।

এই রাজু একদিন কাউকে কিছু না বলে, কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে গেল, আজও কেউ তার সন্ধান পেলে না। তার মুখ, তার কথা মনে পড়লে আজও আমার বুকটা কেমন করতে থাকে। সে যে কত বড় বন্ধু ছিল আমার! সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি কত দেশ-বিদেশ তো ঘুরলাম, কত মানুষই তো দেখলাম, কিন্তু কই, রাজুর মতো অমন মানুষ আর একটিও চোখে পড়ল না!

মৃত্যুর পর

শরৎচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার সময় বালীগঞ্জের বাড়ীতে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আর নরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। শরৎচন্দ্র বলছিলেন— শুনেছি মানুষ মরে গিয়েও আবার দেখা দেয়। কি করে যে এ সম্ভব তা তো বুঝতে পারি নে।

বিদ্যাভূষণমশায় বললেন—আমার জীবনে এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। বহুদিন মৃত আমার এক গুরুজনকে আমি একবার দেখেছিলাম, এমন কি তিনি আমাকে তখন যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে পরে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম।

শরৎচন্দ্র বললেন—আমার নিজের জীবনে এ রকম কোন ঘটনা ঘটে নি বটে, তবে আমার মামার বাড়ীতে একবার এই ধরণের একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। বাবার মুখে সে গল্প শুনেছি, আত্মীয় স্বজনদের মুখেও শুনেছি। ঘটনাটা শুনলেই সব বুঝতে পারবে—

ভাগলপুরে আমার মামাদের যে পাকা বাড়ী, তার পিছনদিকে তখন একটা দোতলা মাঠকোঠা ছিল। এই মাঠকোঠার একতলায় তিনটি ঘর থাকলেও, উপরে কিন্তু সবটা জুড়ে মাত্র একটা বড় ঘর ছিল। নীচের তিনটি ঘরই ব্যবহার করা হ'ত, কিন্তু উপরের ঘরটা ছিল গুদোমঘরের মতো, একরাশ হাঁড়িকুঁড়ি ও নানারকম জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে থাকত। একটি অল্পবয়েসী বউ, ঐ দোতলার ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল বলে, ঘরটা কেউ আর ব্যবহার করত না।

মামাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজোয় প্রতি বছর খুব ধুমধাম হ'ত। আত্মীয়-কুটুম আসত অনেক, দিনকতক বাড়ীঘর লোকে একেবারে গিসগিস করত। একবার পূজোয় এত লোক হ'ল যে, শোবার আর জায়গা নেই। জগদ্ধাত্রী পূজোর সময়টা পড়ে একেবারে অঘ্রাণের কাছাকাছি, হিমে ঠাণ্ডায় খোলা দালানেও শোয়া চলে না। বাবা আর ছোট দাদামশায়, অর্থাৎ

আমার মায়ের ছোটকাকা, এঁরা ছিলেন একবয়েসী। এঁরা ঠিক করলেন, মাঠকোঠার ঐ দোতলার ঘরেই শোবেন। জিনিসপত্র সরিয়ে ঘরের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করা হ'ল। দুটো খাটিয়া পেতে বিছানা করা হ'ল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁরা গিয়ে দুজনে সেই ঘরে শুলেন।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। হঠাৎ বাবা চীৎকার করে উঠলেন—ওরে বাবারে! ওখানে কে রে?

চীৎকারে ছোট দাদামশায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ধড়মড় করে তিনি উঠে পড়লেন। বাড়ীর আরো অনেকে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। সকলের প্রশ্নের উত্তরে বাবা বললেন—জানালার ধারে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘাকৃতি, সুন্দর তার চেহারা, গলায় পৈতে আর বড় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় মোটা শিখা। হঠাৎ এত কাছে ঐ মূর্তি দেখেই ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

বাবার কথা শুনে সকলে তো হেসেই অস্থির।

কেউ কেউ বললেন—স্বপ্ন দেখেছ। মেয়েমানুষের মূর্তি দেখলেও না হয় বুঝতাম, একটা কারণ রয়েছে।

বাবা বাড়ীর জামাই মানুষ, খুব অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। ভাবলেন—হবেও বা, হয়তো স্বপ্নই দেখেছি।

পরের দিন রাত্রে বাবা আর ছোট দাদামশায় দুজনে আবার ঐ ঘরে শুয়েছেন। গতরাত্রে ভালো ঘুম না হওয়ায় বাবা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেদিনও মাঝরাত্রে, আবার একটা বিকট চীৎকার শোনা গেল। সেদিন আর বাবা নয়, ছোট দাদামশায়। বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকলে আবার ছুটে এলেন। ছোট দাদামশায়ের গা দিয়ে তখন ঘাম ঝরছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় ছোট দাদামশায় বললেন—কে একজন জানালার কাছে এসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। জামাই যাকে কাল দেখেছে, ঠিক সে-ই। সেই লম্বা-চওড়া চেহারা, গলায় মোটা পৈতে, রুদ্রাক্ষের মালা—

ছোট দাদামশায়ের কথাও কেউ বিশ্বাস করলেন না। বললেন—ও কিছু নয়। জামাইয়ের কাছে শোনা কথা তোমার মনে ছিল, তাই ঐ স্বপ্ন দেখেছ।

ছোট দাদামশায় বললেন—তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখেছি। সত্যিই হোক্ আর স্বপ্নই হোক্, এ ঘরে আর শোওয়া নয়।

আমার দাদামশায়দের অবস্থা ছিল ভালো। অতিথি, আত্মীয়-স্বজন প্রায়ই এসে তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নিত, আর তাঁরা অতিথিবৎসলও ছিলেন খুব। যে ঘটনার কথা বললাম, তার প্রায় বারো-তের বছর আগে একদিন এক ব্রাহ্মণ এসে বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সেই থেকে আর কোথাও তিনি যান নি, এঁদের বাড়ীতেই থেকে গিয়েছিলেন। সকলেই তাঁকে ভট্টচায্যিমশাই বলে ডাকুত। ভট্টচায্যিমশায় খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রপাঠ, পূজার্চনা এ সব নিয়েই দিন কাটাতেন।

বাবা আর ছোট দাদামশায়ের মুখে পরদিন রুদ্রাক্ষের মালা পরা সেই মূর্তির কথা শুনে ভট্টচায্যিমশায় বললেন—আজ রাত্রে আমি ঐ ঘরে শোব। দিনে ঘরে তুলসী ধুনো দেব, আর রাত্রে সিংহাসনসুদ্ধ নারায়ণ নিয়ে গিয়ে বসাব। দেখি কি হয়!

ভট্টচায্যিমশায় যথারীতি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে রাত্রে গিয়ে একা ঐ ঘরে শুলেন। কিন্তু রাত্রি দুটো নাগাদ সেদিন যে কাণ্ড ঘটল সে আরও সাংঘাতিক! ভয়ে বিকট চীৎকার করে একেবারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। তখনকার দিনে দরজায় এখনকার মতো কব্জা দেওয়া থাকতো না, হাঁসকল থাকত। বাইরে থেকে অনেক চেষ্টায় কোন রকমে সেই হাঁসকল তুলে দরজা খোলা হ'ল। মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে অনেকক্ষণ বাতাস করবার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে—কি ব্যাপার?

তিনি শুধু বললেন—আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না। আমি কিছু বলতে পারব না।

পরদিন সকাল থেকে ভট্টচায্যিমশায়ের জ্বর এল। এমন জ্বর যে, ডাক্তার ডাকা হ'ল। তাঁর চিকিৎসায় কিছুদিন কাটল, কিন্তু জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। বারো-তের দিন পরে তিনি আমার দাদামশায়কে ডেকে বললেন —শুনুন, এ জ্বর থেকে আমার নিস্তার নেই। আমার হাড়টা যাতে কাশীর মণিকর্ণিকায় পড়ে, সে ব্যবস্থা যদি দয়া করে করেন তো সুখে মরতে পারি।

ভট্টচায্যিমশায়কে নিয়ে কে এখন কাশী যায়—এই হ'ল তখন সমস্যা। আগেই বলেছি, ছোট দাদামশায় আর বাবা এক বয়সী ছিলেন, আর দুজনের

ভাবও ছিল খুব। শেষে ওঁরাই তাঁকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন। দিনকয়েক পরেই একজন চাকর সঙ্গে করে ভট্টচায্যিমশায়কে নিয়ে তাঁরা কাশী যাত্রা করলেন।

কাশীতে ভাড়া বাড়ীর এক তেতলার ঘরে ভট্টচায্যিমশায়কে রাখা হয়েছিল। ছোট দাদামশায় আর বাবাও ঐ ঘরেই থাকতেন। ক'দিন কেটে গেল। ভট্টচায্যিমশায়ের অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকেই যেতে লাগল। তিনদিন ক্রমাগত তাঁর শ্বাস চলছে, এমনি সময়ে একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ছোট দাদামশায় দেখতে পেলেন—একটা লোক জানালার বাইরে থেকে ঘরের ভিতরে কেবলই উঁকি মারছে। ছোট দাদামশায় তখন জেগেছিলেন, বাবা ঘুমিয়ে ছিলেন। কে? কে? করে তিনি চেঁচিয়ে উঠতেই বাবাও উঠে পড়লেন। জেগে বাবাও স্পষ্ট দেখতে পেলেন—কে একটা লোক যেন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভট্টচায্যিমশায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু কাউকে কোথাও দেখা গেল না। ঘরে এসে বাবা বললেন—ছোটকাকা, মুখটা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হ'ল না?

ছোট দাদামশায় বললেন—ঠিক বলেছ, আমিও তাই ভাবছিলাম।

পরদিন সকালেই ভট্টচায্যিমশায় মারা গেলেন।

কাশীতে কিছু লোক আছে শবদাহই তাদের কাজ। খবর পেয়ে একে-একে ছয় সাতজন লোক জুটে গেল। তাদের মধ্যে একজন ছোট দাদামশায়ের কাছে গিয়ে বললে—দেখুন, উনি যখন আপনাদের নিজের কেউ নন বলছেন, তখন এক কাজ করুন, আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের সন্তান, আমাকেই ওঁর মুখাগ্নির কাজটা করতে দিন।

বাবা আর ছোট দাদামশায় ভাবলেন—তাও তো বটে, আমরাই বা ওঁর মুখাগ্নি করতে যাই কেন। তাঁরা রাজী হয়ে বললেন—বেশ তাই হবে, আপনিই মুখাগ্নি করুন।

লোকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গেই মুখাগ্নি করল। শুধু তাই নয়, শ্মশানের যাবতীয় কাজও সে প্রায় একাই করল।

যেমন কাজকর্মে, চেহারাতেও লোকটি তেমন সুন্দর ও বলিষ্ঠ। বাবা ও ছোট দাদামশায় দুজনেই মনে মনে ভাবছেন—একে কোথায় যেন দেখেছি,

মুখটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। দুজনেই একই কথা ভাবছেন বটে, কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলছেন না।

সন্ধ্যে নাগাদ সকলেই বাসায় ফিরলেন। অগ্নিস্পর্শ করবার পর, সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই জলখাবার এবং আট আনা করে পয়সা দেওয়া হ'ল। কেবল মুখাগ্নি যে করেছিল, তাকেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছোট দাদামশায় জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের আর একজন কোথায় গেলেন? তাঁকে দেখছি না যে?

তারা বললে—সে তো মশায় আপনাদেরই লোক। আমাদের দলের কেউ নয়। ওকে তো আগে আমরা কখনো দেখি নি।

বাবা আর ছোট দাদামশায় তখন কিছুই প্রকাশ করলেন না। তারা চলে গেলে বাবা বললেন—ছোটকাকা, একটা কথা বলবে? আমরা দেশে যাকে দেখেছিলাম, এ সে-ই কিনা ঠিক করে বলো তো?

ছোট দাদামশায় বললেন—হ্যাঁ, এ সেই লোকই, তাতে আর সন্দেহ নেই। ও যখন আমার কাছে এসে মুখাগ্নির কথা বললে, তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছে, একে যেন আগে কোথায় দেখেছি। আশ্চর্য ব্যাপার! দাহ পর্যন্ত করে গেল, কিছু বুঝতে দিলে না!

দেশে ফিরে এসে তাঁরা সকলকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন, কিন্তু সেই রহস্যের কোন কিনারা কেউই করতে পারলেন না।

বাড়ীতে ভট্চায্যিমশায়ের একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছিল। ব্যাগটি খুলে দেখা গেল, তাতে ক'খানা গরদের জোড়, দানে পাওয়া সাত আটটা সোনার নথ, পাঁচটা কি ছ'টা সোনার আংটি, আর খানকতক চিঠি রয়েছে। একটি চিঠির মধ্যে ভট্চায্যিমশায়ের বাড়ীর ঠিকানা ছিল।

দাদামশায় বললেন—ভট্চায্যিমশায়ের দেশের পোস্টমাস্টারের নামে একখানা চিঠি লিখে দাও, তিনি যেন অনুগ্রহ করে মৃত্যু-সংবাদটা আত্মীয়দের জানান। আর এখানে ভট্চায্যিমশায়ের যা জিনিসপত্র রয়েছে, তাঁর আপনার কোন লোক এলেই সেগুলি তাঁকে দিয়ে দেওয়া হবে।

লেখা হ'ল চিঠি। অনেকদিন পরে মধ্যবয়সী এক বিধবা স্ত্রীলোক একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে পরিচয় দিলেন, তিনি ভট্চায্যিমশায়ের এক জ্ঞাতি

ভাইপোর স্ত্রী। তাঁর গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোকের চিঠি, আর পোস্ট মাস্টারকে লেখা সেই চিঠিখানিও সঙ্গে এনেছেন।

তাঁর কাছে জানা গেল—ভট্টচায্যিমশায় সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী আগেই মারা যান। এক ছেলে ছিল, সে টোলের উপাধি পেয়েছিল। একদিন কি কারণে বাপ-ছেলের মধ্যে খুব ঝগড়া হয়। সেইদিনই দেখা গেল, ছেলে বাগানের একটা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ভট্টচায্যিমশায় বাড়ীতে আর টিকতে পারেন নি। ওঁর যা কিছু ছিল আত্মীয়দের দান করে, সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েন।

ভট্টচায্যিমশায়ের ছেলের চেহারাটা ছিল খুব সুন্দর। বেশ বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া, মাথায় মোটা টিকি। তার একটা শখ ছিল—সাত-আট দণ্ডী মোটা পৈতে খুব করে মেজে-ঘষে গলায় পরতে ভালবাসত।

চেহারার বর্ণনা শুনে বাবা আর ছোট দাদামশায় দুজনেই বললেন—একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আমরা যাকে দেখেছি সে এই ছেলেটিই!

বোঝা গেল, ভট্টচায্যিমশায় তাহলে মাঠকোঠার ঘরে তাঁর মৃত ছেলের চেহারা দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেইজন্যই এ বিষয়ে কোন কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। আত্মঘাতী ছেলে বোধ হয়, অনুতপ্ত হয়ে মৃত্যুর পরও বাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত একটা মূর্তি ধরে পুত্রের কর্তব্য তাঁর মুখাগ্নিও করে গেছে।

পিশাচ

সেদিন সন্ধ্যাবেলা 'যমুনা' পত্রিকার কার্যালয়ে শরৎচন্দ্র বেড়াতে এসেছেন। সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল, কর্মকর্তা হেমেন্দ্রকুমার রায় উপস্থিত তো আছেনই, তাছাড়া আছেন, সুধীরচন্দ্র সরকার এবং আরো অনেকে। শরৎচন্দ্র একাই আসর মাত করে রেখেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হ'ল। অনেকে বিদায় নেবার আয়োজন করছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক অনুরোধ জানালেন—শরৎদা, একটা ভূতের গল্প হোক্। এই রাত্রে জমবে ভালো।

শরৎচন্দ্র সানন্দে রাজী হলেন। শ্রোতারা কান খাড়া করে বসলেন। শরৎচন্দ্র গল্প আরম্ভ করলেন—

দেখ, যে গাঁয়ে আমাদের বাড়ী, গঙ্গা সেখান থেকে অনেক দূর। হাঁটা-পথে মাইল পাঁচেক তো হবেই। এই গঙ্গার ধারেই ছিল চার-পাঁচ গাঁয়ের একমাত্র শ্মশান। অদূরে নদীর তীর ধরে বেশ গভীর একটা জঙ্গলও ছিল। শ্মশানের কাছে এই জঙ্গলটা থাকাতে সকলের বড় সুবিধে হ'ত। কাঠের জন্য আর ভাবতে হ'ত না, গিয়ে দরকার মতো কেটে আনলেই হ'ল।

গাঁয়েদেশে কেউ মারা গেলে, এই কাঠের ভাবনাই একটা বড় ভাবনা। গাঁ থেকে শ্মশান—অতটা পথ কাঠ বয়ে নিয়ে যাওয়া তো সোজা কথা নয়। শহরে শ্মশানের কথা আলাদা, পয়সা ফেললেই চিতার কাছে একেবারে শুকনো কাঠ ফেলে দিয়ে যাবে। জ্বলন্ত এক গোছা প্যাঁকাঠি ধরাও, ব্যস, চোখের পলকে মেদিনী-তাতানো আগুন ধরে যাবে। সদ্যকাটা জংলী কাঠের ঐ আর একটা অসুবিধে, আগুন ধরাতে দস্তুরমতো তোয়াজ করতে হয়।

আমাদের দলে একটি ছেলে ছিল, তার নাম ভোলা। খুব ডানপিটে, সাহসী আর গায়ের জোরও ছিল কম নয়। কিছুদিন ধরে আড্ডায় ভোলার আর দেখা পাই না, শুনলাম তার দিদিমার খুব অসুখ।

একদিন রাত্রে আমরা যে যার ঘুমোবার জন্য শুতে গেছি, হঠাৎ শুকনো

মুখে ভোলা এসে উপস্থিত। তখুনি বুঝতে পারলাম, তার দিদিমা মারা গেছেন।

ভোলা বললে—পাড়ার সকলে বলছেন, বুড়ীকে আর বাসি মড়া করে কাজ নেই। আজ রাত্রেই দাহ করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাড়ার লোকেরা তো বলেই খালাস। এখন ঐ রাতে, ঐ পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে শ্মশানে যাবার লোক মিলবে কোথায়!

আমাদের দলের লোকেরই শরণাপন্ন হতে হ'ল। বাড়ী বাড়ী গিয়ে জুটল তিনজন, আমি আর ভোলা। এই পাঁচজনে মিলে তো গভীর রাত্রে রওনা হওয়া গেল। তখন শুক্লপক্ষ, যদিও আকাশে মেঘ ছিল, পথে মাঠে দিব্যি আলো। গাঁয়ের রাস্তায় গভীর রাত্রে, অন্ধকার মাথায় করে যাচ্ছি না—এ বড় কম কথা নয়।

শ্মশানে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটা ঘর ছিল। ঘরটি মাঝারি গোছের। ঘরে যাওয়া আসার একটি মাত্র দরজা। দরজা বললাম বটে, তবে তাতে পাল্লার কোন বালাই ছিল না—কোন কালে ছিল হয়তো, প্রয়োজনে কেউ সেই পাল্লা চিরেই কাজ সেরে থাকবে। দাহর স্থানে দাহ্য দরজার এ রকম পরিণতি অস্বাভাবিক নয়, বুঝতেই পারছ!

মৃতদেহ সেই ঘরে রেখে ঠিক করা হ'ল, আমরা তিনজনে যাব কাট কেটে আনতে, আর ভোলার সঙ্গে পাহারা দেবার জন্য থাকবে আর একজন।

ভোলা বললে—আমার সঙ্গে কেউ থাকবার দরকার নেই। আমি একাই আগলে থাকতে পারব। কাঠ আনতে তোরা চারজনেই যা। তাতে তাড়াতাড়ি হবে, আর তোদের বইতেও হবে কম।

দলের একজন বললে—কিন্তু, শুনেছি যে শ্মশানে নাকি একা থাকতে নেই।

ভোলা বললে—রাখ তোর শোনা। এখন যা পালা, আমার জন্য কিছু ভাবিস নি।

ভোলাটার ঐ রকমই ছিল বুকের পাটা। ওর সাহসের তারিফ করতে করতে আমরা কুড়ুল হাতে চারজন তো জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম। বিরাট বিরাট অর্জুন, শিরীষ আর বাবলা গাছে জঙ্গলটা ভর্তি। কোন রকম সময় নষ্ট না করে আমরা খপাখপ্ কোপ লাগাতে সুরু করে দিলাম।

একজন মানুষকে দাহ করতে খুব কম করেও তিন মণ কাঠ লাগে।

এতখানি কাঠ চারজন মিলে কাটলেও, চিরে ফালা ফালা করতে দু ঘণ্টা সময় তো লাগলই। দু ঘণ্টা কেন, তার কিছু বেশীই হবে।

চার ভাগে কাঠ নিয়ে আমরা ফিরছি। একটু ফাঁকায় এসে চাঁদের আলোয় শ্মশান ঘরটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। একি কাণ্ড! দেখি ঘরের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে!

ঘরটার কাছাকাছি এসে দেখি, পথের মধ্যে কে যেন একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

মাথার কাঠ ফেলে লোকটার গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম, তার জ্ঞান নেই, কাঠের মতো শক্ত। তুলে ধরে দেখলাম—সে আর কেউ নয়, আমাদের ভোলা। একেবারে বেহুঁস, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে।

ভোলাটা ঘরে না থেকে বাইরে এমনভাবে পড়ে কেন? আর ঘরের ভিতর দাউ দাউ করে আগুনই বা জ্বলছে কেন? ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভয় যা করতে লাগল, কি আর বলব!]

ঘরের দিকে ছুটে গেলাম, গিয়ে আর ঢুকতে পারি না—ঢুকবার পথ বন্ধ। দরজার সামনে মস্ত এক মাটির ঢিপি খাড়া। ঢিপিটা গঙ্গা মাটির, প্রায় মানুষপ্রমাণ উঁচু। অল্পের জন্য মাথার চৌকাঠ ঠেকে নি। এতখানি মাটি এখানে এল কি করে, আর আনলই বা কে?

উপর দিকে যেটুকু ফাঁক ছিল, সেখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখি—এক কোণে একরাশ কাঠ, তখনো বেশ গন্‌গন্ করে জ্বলছে। পাশেই যে খাটে আমরা মৃতদেহটি বয়ে এনেছিলাম, সেই খাটখানা দেখলাম শূন্য। হুমড়ি খেয়ে আনাচ-কানাচ ভালো করে খুঁজলাম। কাঠের আগুনে সবই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু কোথাও শবদেহের চিহ্ন পর্যন্ত পেলাম না। আর, বেশীক্ষণ যে দেখব তারও উপায় ছিল না, ঘর থেকে যা উৎকট মাংস পোড়ার গন্ধ বেরোচ্ছিল তাতে টেকাই দায়!

নাকে কাপড় দিয়ে ভোলার কাছে ফিরে এলাম। তাড়াতাড়ি তাকে ধরাধরি করে নদীর ধারে নিয়ে এসে, চোখেমুখে জল দেবার পর তার জ্ঞান হ'ল। একটু সুস্থ হয়ে সে যে কাহিনী বললে, তা এই :—

তোরা কাঠ আনতে চলে গেলি, আমি ঘরের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে, চমকে আমি জেগে উঠলাম। শব্দটা অনেকটা থপ্-এর মতন, যেন ভারী কিছু একটা পড়ল। চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কাউকে বা কিছু দেখতে পেলাম না। তবু সজাগ দৃষ্টি রেখে বসে রইলাম। একটু পরে তন্দ্রার মতন এসেছিল। আবার শুনলাম—থপ্।

তারপর সমানে কিছুক্ষণ থপ্‌থপ্ শব্দ চলতে লাগল।

সাহস সঞ্চয় করে উঠে পড়লাম। ভাবলাম, ঘুরে দেখে আসি শব্দের কারণটা কি। বেরোতে গিয়ে দেখি, একি কাণ্ড! দরজার সামনে এত তাল তাল মাটি এনে ফেললে কে? উদ্দেশ্য যে অসৎ, বুঝতে আর বাকি রইল না। উদ্দেশ্য দরজার পথ বন্ধ করা।

মাটির তালগুলো টপকে তো বাইরে এলাম। চাঁদের আলোয় চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নদীর ধারে তাকিয়ে দেখি, একটা কালো লম্বা-চওড়া লোক, মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দুহাতে খুব বড় একটা মাটির তাল বয়ে আনছে। মনে হ'ল লোকটা নিশ্চয়ই পাগল, তা না হ'লে অমন সৃষ্টিছাড়া কাজ কেউ করে? এই ভেবে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—এ সব হচ্ছে কি, শুনি?

জবাবে লোকটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওরে বাবা, সে কি চোখ, সে কি দৃষ্টি! চোখ নয় তো, দু টুকরো বড় বড় জ্বলন্ত কয়লা! আর দৃষ্টি মানুষের তো নয়ই, পশুরও নয়, বরং উন্মাদ প্রেতের বলা যেতে পারে। তারপর চুলের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, সে এমন একটা বিকট চীৎকার করে উঠল যে, ভয়ে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। চীৎকারের সময় আমি ওর দাঁত দেখতে পেয়েছিলাম, নেকড়ের যেমন দাঁত, ঠিক সেই রকম!

আমি প্রাণভয়ে সেখান থেকে ছুট লাগালাম, কিছুদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। তারপর আর কিছু জানি না।

এই বিবরণ শুনে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, ভোলা পিশাচের পাল্লায় পড়েছিল। বরাত জোরে খুব বেঁচে গেছে। শুনেছি, অসৎ প্রেতাত্মার নাকি মুক্তি নেই, তাদের দুষ্ট প্রকৃতি ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। উপযুক্ত সুযোগ পেলেই তারা নাকি মৃতদেহে প্রবেশ করে মানুষের রূপ ধরে শ্মশানে

নির্জনে বাস করে। আর তারা শবাহারী। মানে, শবদেহই তাদের প্রধান খাদ্য। আহারের সময় দগ্ধ করে নেওয়াই নাকি রীতি! ভোলার দিদিমার মৃতদেহ অন্তর্ধানের কারণ এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম।

সেদিনকার সেই সৎকার করতে যাওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতি আমি জীবনে ভুলব না।

গল্প শেষ করে শরৎচন্দ্র একটা চুরুট ধরালেন। শ্রোতারা সব চুপ করে বসেই আছেন, কেউ উঠবার নাম করছেন না।

শরৎচন্দ্র বললেন—চল হে, এবার ওঠা যাক্। রাত যে অনেক হ'ল!

শ্রোতাদের মধ্যে একজন বললেন—তাই তো শরৎদা, এমন গল্প বললেন যে, এখন পথে বেরোতেই ভয় করছে। ধরুন, যদি কোন পিশাচের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—দূর পাগল, শহরে ওসব ভয়ের কোন কারণ নেই। নাও, চল এবার।

কালীসাধক হরিপদ

সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় সেদিন তাঁর বহু পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সমাগম। শরৎচন্দ্রও এসেছেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু সৌরীনবাবু। নানা বিষয়ে হাল্কা আলোচনা চলছে। এক পাশে কয়েকজন মিলে দৈব ওষুধ নিয়ে তর্ক করছিলেন। কেউ স্বপক্ষে, কেউ বিপক্ষে।

একজন বললেন—এই যে শ্মশানকালীর দৈব ওষুধ নিয়ে কত রকম কথা শুনি, এর সবই কি মিথ্যে? অমাবস্যার গভীর রাত্রে, একা গিয়ে যদি কোন চিতায় হত্যা দেওয়া যায়, শুনেছি প্রায়ই আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। ওষুধ তো মিলেই, মাঝে মাঝে মা কালীর দর্শনও নাকি মিলে শুনেছি।

শরৎচন্দ্র চুপ করে এতক্ষণ এঁদের তর্ক শুনছিলেন। শ্মশানকালীর কথা ওঠায় তিনি বললেন—তোমার কথায় আমাদের কালীসাধক হরিপদর কথা মনে পড়ল।

অনেকেই জানতে চাইলেন—এই কালীসাধক হরিপদটি কে?

তখন শরৎচন্দ্র বললেন—তবে বলছি শোন—

হরিপদ আমাদের গ্রামের লোক। মাথায় তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পরণে শাক্তদের রক্তাম্বর, গলায় জবাকুসুমের মালা, কপালে আধুলি আকারের টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা। মুখের কথার আগে চোখের দেখাতেই সে বুঝিয়ে দিত—সে কালীসাধক। হেনস্তা করবার মতো নয়, বেশ উঁচুদরের কালীসাধক হিসেবে আমাদের গাঁয়ে তো বটেই, আশপাশে আরো চার-পাঁচটা গাঁয়ে হরিপদ বেশ জাঁকাল পসার জমিয়েছিল।

কারো কঠিন বা সরল অসুখ করলে, ভাবনা-চিন্তার কোন দরকারই ছিল না। শুধু গতর খাটিয়ে একটু হরিপদর কাছে যাওয়া, আর নৈবেদ্যর জন্য আনা কয়েক পয়সা দেওয়া। সরল অসুখ হ'লে রাত্রিটার জন্য, আর কঠিন অসুখ হ'লে অমাবস্যার জন্য যা একটু অপেক্ষা করা।

পরদিনই অমোঘ আরোগ্যের মতো দোরে দেখবে হরিপদ দাঁড়িয়ে। হাতে তার ওষুধ—যে ওষুধ নিজের হাতে মা তাকে দিয়েছেন বা নিজের মুখে আদেশ করেছেন—কোন পাতা, কোন শিকড়, কিসের অনুপানে খেতে হবে।

হরিপদর মা কে, নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ! হরিপদর মা শ্মশান-বাসিনী, মুণ্ডমালিনী স্বয়ং শ্যামা। গভীর রাত্রে শ্মশানে গিয়ে, কোন এক চিতায় বসে, হরিপদ কয়েকবার 'মা, মা' বলে ডাকলে আর রক্ষে ছিল না! ভক্তের ডাকে ভয়ঙ্করীর মন তখনই হু-হু করে উঠত। তিনি সোজা ছুটে আসতেন হরিপদর কাছে। এসে হরিপদর সঙ্গে কত কথা কইতেন তিনি। কারো অসুখ থাকলে, ঐ সময়েই ওষুধের জন্য আবদার করে বসত হরিপদ। মা আদ্যোপান্ত অবস্থা শুনে, তবে ওষুধের ব্যবস্থা দিতেন।

হরিপদ বড়াই করে বলত—মা-কালীর দেখা পাওয়া না হয় ছেড়েই দাও, অমাবস্যার রাতে কেউ শ্মশানে গিয়ে চিতার ওপর খানিক বসুক দিকি, তবেই বুঝব বুকের পাটা! কে আছে এই গাঁয়ে বা পাশের গাঁয়ে, বা তার পাশের গাঁয়ে? আসুক দিকি!

হরিপদর এই বড়াই করা সাজত। কারণ এই আমন্ত্রণ কেউ কোনদিন গ্রহণ করে নি। গাঁয়ের অনেক লোকের মুখে শুনেছি, তারা হরিপদর এই কালীসাধনার কথা রীতিমতো পরখ করে দেখেছে। কয়েকজন মিলে একাধিকবার তাকে অনুসরণ করে দেখেছে, শ্মশানে গিয়ে সত্যিই সে চিতায় বসে। তারপর 'মা, মা' বলে ব্যাকুলভাবে ডাকেও।

এ পর্যন্ত ঠিক আছে এবং বিশ্বাস করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু তার পরের যে সমস্ত ঘটনা হরিপদ ফলাও করে বলত, তাতেই ছিল আমাদের আপত্তি।

আমাদের তখন বয়স কম, মস্তিষ্কে দুষ্টু সরস্বতীর প্রভাব খুব বেশী। হরিপদর বড়াই আর ভাল লাগছিল না। আমাদের দলের কেষ্টা বললে—ভাখ, হরিপদর সঙ্গে মা কালীর কথোপকথন ও ওষুধ প্রদান—এই দৃশ্যটি স্বচক্ষে দেখে জীবন ধন্য করতে হবে। আসছে অমাবস্যায় চল্, সকলে মিলে যাই।

করবার মত একটা কাজ পেয়ে আমরা রাজী হয়ে গেলাম।

অমাবস্যার রাত একটু বেশী হ'লে দল বেঁধে শ্মশানে গিয়ে তো সবাই

উপস্থিত হলাম। একে শ্মশান, তায় আবার অমাবস্যা। সে যে কি অন্ধকার, চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। পাশাপাশি চলেছ, কিন্তু পাশের লোককে সহজে চিনতে পারবে না।

শ্মশানের মাঝামাঝি একটা অশথগাছ, সেই গাছে উঠে আমরা হরিপদর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আজ অমাবস্যা, কালীসাধকের কাছে মস্ত বড় জিনিস এটা। অতএব হরিপদ যে আসবেই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কখন যে আসবে সেইটা ছিল চিন্তার বিষয়।

বসে আছি তো আছিই, হাতে-পায়ে খিল ধরে যাবার উপক্রম, কিন্তু হরিপদ আর আসে না। বেশী নড়াচড়া করতেও পারছি না, পাছে হরিপদর কোন রকমে সন্দেহ হয়। সকলেই তখন ভাবছি—তাই তো রে, সেটা আজ আর আসবে না নাকি!

এমন সময় কে একজন গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে এই পথেই আসছে বুঝতে পারলাম। গলা শুনে সন্দেহ রইল না, এ-ই আমাদের হরিপদ।

আমরা তখন গাছ থেকে নেমে হরিপদর গলা অনুসরণ করে তার কাছাকাছি হবার জন্য এগিয়ে যেতে লাগলাম। আগে আগে চলল আমাদের দলপতি কেষ্টা।

হরিপদ নিজের জন্য একটা জায়গা বেছে নিল। জায়গাটা বোধ করি কারো চিতাই হবে, অন্ধকারে ঠাওর হচ্ছিল না। তারপর শ্মশান কাঁপিয়ে আরম্ভ হ'ল তার 'মা, মা' ডাক।

হরিপদ চেঁচিয়েই যাচ্ছে—মা, ও মা, মাগো!

হঠাৎ কেষ্টার মাথায় কি বুদ্ধি চাপলো, সে পায়ে পায়ে হারপদর কাছে গিয়ে প্রায় তার কাছে মুখ নিয়ে, মেয়েলি গলায় চেঁচিয়ে উঠল—কি বাবা, ডাকছ কেন?

যেমনি এ-কথা বলা অমনি এক কাণ্ড ঘটল। আমরা কোথায় অপেক্ষা করে আছি, এবার হরিপদর স্তোত্রপাঠ শুনব, তা নয়, শুনলাম দড়াম করে এক আছাড় খাওয়ার শব্দ! বুঝলাম, সবেগে হরিপদর মূর্ছা ও পতন।

কেষ্টার কাছে দেশলাই ছিল, সে ফস করে একটা কাঠি ধরিয়ে বললে—এই সেরেছে রে! কালীসাধক দেখি একেবারে অজ্ঞান!

তখন সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে পুকুরপাড়ে এনে ফেললাম। হরিপদ তখনো গোঁ-গোঁ করছে। বেশ কিছুক্ষণ চোখে-মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দেবার পর মনে হ'ল তার জ্ঞান ফিরেছে। তারপর সে একটু নড়তে-চড়তেই আর কি আমরা সেখানে দাঁড়াই! তাড়াতাড়ি দে দৌড়!

পরদিন থেকে হরিপদর আশ্চর্য পরিবর্তন! বাড়ী বাড়ী গিয়ে বড়াই করা তার থেমে গেল, শ্মশানকালীর ওষুধ বিতরণও সে বন্ধ করে দিল। কেউ এ-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, তার কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যেত না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকত।

সাপধরার গল্প

সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় একবার ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাটি 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। সেই বক্তৃতায় শৈলজানন্দবাবু শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা শরৎচন্দ্রের পিতার সাপ ধরার একটি গল্পও বলেছিলেন।

শৈলজানন্দবাবুর লেখা থেকে শরৎচন্দ্রের বলা সেই গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করছি। শৈলজানন্দবাবু লিখেছেন—

"ভূতের গল্প বলতে পারতেন শরৎচন্দ্র চমৎকার।

দত্ত বেকারীর বাগান-বাড়ীতে রসচক্রের এক বার্ষিক উৎসবে বিস্তর সাহিত্যিক জড়ো হয়েছিলেন একসঙ্গে। শরৎচন্দ্র ছিলেন আমাদের পুরোধা। খাবার দেরি আছে, কি করা যায়? ধরে বসলাম শরৎদাকে। ব্যস, এমন ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন যে, খাবার তৈরি, তবু কেউ উঠতে চায় না। গল্পটা শেষ হোক্ আগে। গল্প যখন শেষ হলো, খাবার তখন জুড়িয়ে গেছে।

আর একদিনের কথা মনে আছে আমার।

আমার বাবা সাপ ধরতে পারেন শুনে, তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর বাবার কথা। তিনিও নাকি সাপ ধরতে পারতেন।

একদিন হয়েছে কি, তাঁর বাবা কোথায় যেন দূরের একটা গ্রামে গেছেন কি একটা কাজে। সন্ধ্যেবেলা শুনলেন, পাশের বাড়ীর বৌ নাকি লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দিতে গিয়ে দেখেছে, লক্ষ্মীর বেদীর কাছে প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি সর্বনাশ, ছেলেপুলের ঘর, সাপের ভয়ে বাড়ী ছেড়ে সবাই পালিয়ে এসেছে। ভয়ে আর বাড়ীতে ঢুকতে পারছে না।

বাধ্য হয়ে তাঁকে যেতে হলো। গিয়ে আর সাপ দেখতে পান না কোথাও।

খুঁজে খুঁজে সাপটা তিনি বের করলেন। সাপ তখন গিয়ে ঢুকেছে মাটির

একটা হাঁড়ির ভেতর। ঘরের একটা দিক মাটির হাঁড়িতে কলসীতে ঠাসা। স্থমুখের হাঁড়িগুলো না সরালে সেখানে যাবার জো নেই। অথচ বাড়ীর গিন্নি হাঁ হাঁ করে উঠলেন। ও হাঁড়ি-কলসী বাইরের কাউকে তিনি ছুঁতে দেবেন না।

—বেশ, তবে তোমরাই কেউ হাঁড়ি-কলসী সরিয়ে দাও।

গিন্নি অম্লানবদনে হুকুম দিলেন তাঁর বৌকে—যাও তো বৌমা, হাঁড়িগুলো সরিয়ে দাও।

একদিকে শাশুড়ীর হুকুম, আর একদিকে প্রাণের ভয়। বৌ তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, কিছুতেই আর এগিয়ে আসে না।

এদিকে রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বর্ষার মাঠ পেরিয়ে যেতে হবে অনেকখানি পথ। তার ওপর ছোট একটা মাঠের ওপর মস্ত শ্মশান। আট-দশখানা গ্রামের যত মানুষ মরে সব সেইখানে পোড়ানো হয়। সেখানে ভয় পায় নি, সে রকম মানুষ সে তল্লাটে বিরল।

শরৎচন্দ্র বললেন—বাবা তখন আর দেরি করতে পারছেন না। দেখলেন, বৌকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে শাশুড়ী সটান্ রান্নাঘরে গিয়ে উঠেছে। ভয়ে এ-ঘরের ত্রিসীমানা মাড়াচ্ছে না। নাতিপুতিকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন মা-মনসাকে প্রণাম করছে আর বলছে—মুখপোড়া সাপ আর ঢোকবার জায়গা পেলে না!

বাবা বললেন—তাহলে কি করবো আমিই সরাই হাঁড়িগুলো।

ভয়ে বৌটা সিঁটিয়ে উঠলো।

—তাহলে মিছে কথা বোলো শাশুড়ীকে। বোলো তুমিই সরিয়েছ।

বাবা নিজেই সরালেন হাঁড়ি-কলসীগুলো। কিন্তু মুস্কিল হলো, হাঁড়ির মুখটা খোলা। ঢাকা দেবার মত একটা সরা চাই। সরা না পেয়ে পেতলের একটা রেকাবি পেলেন হাতের কাছে। সেই রেকাবি ঢাকা দিয়ে হাঁড়িসুদ্ধ সাপটাকে বাবা যখন উঠোনে এনে ফেললেন, শাশুড়ী চেঁচাতে লাগলো—আচ্ছা, কি রকম আক্কেল তোমার বৌমা, লক্ষ্মীর ভোগের ঐ রেকাবিটা তুমি দিলে কি বলে?

—উনি নিজেই নিলেন।

—তুমি বারণ করতে পারলে না?

গাঁয়ের একজন মুরুব্বি-মাতব্বর গোছের লোক তখন সাপের একজন রোজা ডেকে এনেছিলেন। সাপ ধরা, সাপ খেলানো, সাপে-কাটা রুগীর চিকিৎসা করা তার পেশা। নাম রাজেন বাউরী।

রাজেন আসতেই বাবা বেঁচে গেলেন। বললেন—নাও রাজেন, এবার তোমার কাজ তুমি কর।

রাজেন তখন গিন্নিমাকে বললে—পাঁচটা টাকা বের করুন মা-ঠাকরুণ, সাপটা আমি নিয়ে যাই।

গিন্নিমা বললেন—ছেলেরা কেউ বাড়ীতে নেই, টাকা আমি কোথায় পাব?

রাজেন বেশ রসিক লোক। বললে—তাহলে সাপটাকে আমি ছেড়ে দিয়ে যাই মা, যেখানকার সাপ সেইখানে চলে যাক্।

—আ মর মুখপোড়া! তা দিবি বই কি! ওই নে, ওই পেতলের ফুলকাটা রেকাবটা দিচ্ছি, হাঁড়িতে সের তিনেক সরু চাল আছে। সব তুই নিয়ে যা।

রাজেন বললে—রেকাব নিয়ে আমি কি করবো মা। আর ও চাল আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।

—তা দিবি বই-কি! ওই চালের ভাত খেয়ে শেষে গুষ্টিসুদ্ধ মরি! যা বাবা যা, ওটা সরা শিগ্‌গির। ঘরের কাজকম্ম সব বন্ধ!

রাজেনও সরাবে না, গিন্নিও টাকা দেবে না। মজাটা শেষ পর্যন্ত না দেখে বাবাও আসতে পারছেন না। গ্রামের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দোরের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন গা-ঢাকা দিয়ে।

শেষে রাজেনেরই হলো জিৎ। হবে তা সে জানে।

গিন্নি উঠলেন।—সুবিধে পেয়েছে, ও ছাড়ে কখনও!—মা-মনসার পুজো দিতে হবে রাজেন, একটি টাকা নিয়ে যাও বাবা!

রাজেন সেইখানে গড় হয়ে একটি প্রণাম করে বললে—তাহলে চলি মা, প্রণাম। সাপ থাক্।

গিন্নি রেগে টং হয়ে গেলেন।—দাঁড়া মুখপোড়া, আসুক আমার ছেলে। বৌমা দাঁড়িয়ে দেখছো কি হাঁ করে। আলোটা ধর, চল আগে আগে। আবার ওই ঘরে ঢুকতে হবে তো!

দু'পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন গিন্নিমা।—বলি হাঁরে রাজেন, জোড়ায় জোড়ায় ঢোকে নি তো? কাচ্চা-বাচ্চা নেই তো ওর?

—না মা, আপনি নিভ্‌ভয়ে যেতে পারেন। ইঁদুরের বড় বড় গর্ত আছে কিনা আপনার ঘরে। থাকে যদি তোঁ তেনারা তারই ভেতর চুপটি করে ঘুমুচ্ছেন।

—ঘুমোচ্ছে কি রে?—গিন্নিমা থম্‌কে থামলেন।

রাজেন দেখলে আর ভয় দেখানো উচিত নয়। বললে—না মা, ওটা এমনিই বললাম। আমি রয়েছি গাঁয়ে, আপনার ভয় কি? আকামা সাপ পড়ে রয়েছে উঠোনে, ফোঁস করে বেরিয়ে পড়লে আর সামলাতে পারবো না। একটু চট্‌পট্‌ করুন।

দু'হাতে তালি বাজাতে বাজাতে গিন্নিমা ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকেই চট্‌ করে পাঁচ টাকার একটি নোট এনে রাজেনের গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন —পাঁচটা টাকাই নিলি বাবা! কাল দিনের বেলায় একবার আসিস্‌, ঘরটা দেখে যাবি।

—আসবো মা।

রাজেন হাঁড়িটা দু'হাত দিয়ে তুললে।

গিন্নিমা বললেন—আসবার সময় বেশ করে ঘষে-মেজে রেকাবিটা হাতে করে আনিস বাবা। ওটা আমার লক্ষ্মীর রেকাবি, ওতে ছেলেপুলেরা হাত দেয় না।

মুখে মুখে তৈরি করে গল্প তিনি বলতে পারতেন চমৎকার। তেমনি করে বানিয়ে এই গল্পটি বলেছিলেন কিনা তাই বা কে জানে।"

['রসচক্রে'র বার্ষিক উৎসবে বলা শরৎচন্দ্রের সেই ভূতের গল্পটি সম্বন্ধে শৈলজানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—সে গল্পটা আজ আর

মনে নেই। সব ভুলে গেছি। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সেদিন আমরা গল্পটা খুবই উপভোগ করেছিলাম।

শৈলজানন্দবাবু অন্যত্রও তাঁর পিতার সাপ ধরা বা সাপ খেলানোর সম্বন্ধে বলেছেন—"বাবা ছিলেন উদাসীন প্রবৃত্তির, সাপ খেলাতেন, ম্যাজিক দেখাতেন।"—অমৃত, ২রা ভাদ্র ১৩৭২

শরৎচন্দ্রের পিতা সাপ ধরতে পারতেন কিনা জানি না। শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছে এ সম্বন্ধে কিছুই শুনি নি। তবে শরৎচন্দ্র নিজে সাপ ধরতে পারতেন এবং তার প্রমাণও আছে। যেমন, বাজে শিবপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্রের একবার একটি গোখুরা সাপ ধরা সম্বন্ধে তাঁর বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'নিজের চোখে তাঁহাকে (শরৎচন্দ্রকে) গোখুরা সাপ ধরিতে দেখিয়া ইন্দ্রনাথের সাপ খেলাইবার কথা মনে পড়িয়াছে।'—মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৪৪

শৈলজানন্দবাবুর মুখে তাঁর বাবা সাপ ধরতে পারেন এই কথা শুনেই, খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র তাঁর বাবাও সাপ ধরতে জানতেন বলে সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে এই গল্পটি বলেছিলেন।]

অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ

মিসেস সিমসনকে বিয়ে করার জন্য ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :—

এডওয়ার্ড তখন যুবরাজ। সেই সময় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে একদিন যুবরাজ লিস্টারশায়ারে এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে সেখানে মিসেস সিমসনকে প্রথম দেখলেন। আমেরিকার সিমসন-দম্পতি তখন যুবরাজের ঐ বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। মিসেস সিমসনের নাম ছিল—ওয়ালিস।

বন্ধুর বাড়ীতে ওয়ালিসের সঙ্গে যুবরাজের আলাপ হয়। ওয়ালিস কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় এবং পরিহাস-রসিকতায় অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। যুবরাজ এই মহিলাটির সঙ্গে কথা বলে মোহিত হলেন। এডওয়ার্ড পরে তাঁর আত্ম-কাহিনীতেও তাই লিখেছিলেন—ওয়ালিসের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

ওয়ালিসের সঙ্গে যুবরাজের এই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল এবং শেষ পর্যন্ত যুবরাজ ওয়ালিসকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থ করলেন।

যুবরাজ এরূপ মনস্থ করলেও কিন্তু ভাবলেন—যে পাত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা তার পূর্ব স্বামীকে ত্যাগ করে আসবে, সেই পাত্রীকে বিয়ে করলে রাজঅন্তঃপুরের এবং পার্লামেণ্টের সমর্থন পাব কি?

যুবরাজ অনেক চিন্তা করে স্থির করলেন, তিনি তাঁর মনের কথা পিতাকে জানাবেন। কিন্তু সে সুযোগ হ'ল না। কেন না, সম্রাট পঞ্চম জর্জ দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ হলেন ইংলণ্ডের সম্রাট।

ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের নিয়ম অনুসারে কালাশৌচের প্রথম ছ-মাস এডওয়ার্ড বাইরের জগতের সঙ্গে সকল সংস্রব বর্জন করে লণ্ডন থেকে ২৫ মাইল দূরে ফোর্ট বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। ঐ সময়

ওয়ালিসের সঙ্গে এডওয়ার্ডের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। এর পর আগস্ট মাসে এডওয়ার্ড যখন আবার সমুদ্র-ভ্রমণে বেরোলেন, তখন তাঁর অনেক সঙ্গী-সঙ্গিনীদের মধ্যে ওয়ালিসও একজন হলেন। জাহাজের মধ্যে পরস্পর কাছাকাছি থাকবার খুবই সুযোগ পেলেন।

এই সময় আমেরিকার সংবাদপত্রগুলিতে ওয়ালিসের সঙ্গে এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা রকমের সংবাদ বেরোতে লাগল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র জগতের দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এডওয়ার্ডের বন্ধু ছিলেন বলে, ইংলণ্ডের কাগজে এ সংবাদ তেমন বেরোল না।

সমুদ্র-ভ্রমণ শেষ করে এডওয়ার্ড বাকিংহাম প্রাসাদে ফিরে এলেন।

ওদিকে ওয়ালিসও তখন তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা সুরু করলেন। মামলায় ওয়ালিসই জিতলেন। তবে সর্ত রইল, ছ-মাসের আগে তিনি পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন না।

এই সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন—সম্রাটের ঈপ্সিত ঐ বিবাহে পার্লামেণ্ট কিছুতেই সম্মতি দেবে না। তা সত্ত্বেও সম্রাট যদি জেদের বশে বিবাহ করেন, তাহলে আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে পদত্যাগ করব। আর এও ঠিক যে, সম্রাট পরে অন্য কোন মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবেন না।

ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র এইরূপ বিপন্ন দেখে, সম্রাটের বন্ধু 'ডেইলি মেল' ও 'ইভ্‌নিং নিউজ' পত্রিকার মালিক এসমণ্ড হার্মসওয়ার্থ একদিন এডওয়ার্ড ও ওয়ালিসকে নিজের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ করে বললেন—আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আপনারা যদি 'মর্গ্যানাটিক' বিবাহে রাজী হন, তাহলে এই সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। এই বিবাহ-পদ্ধতিটি আইনতঃ সিদ্ধ। এতে কেবল সম্রাটের স্ত্রী সম্রাজ্ঞীর আসন পাবেন না। আর আপনাদের ছেলেমেয়ে হ'লে, তারা অন্য সকল সুযোগ-সুবিধা পেলেও, কেউ সিংহাসনের অধিকারী হতে পারবে না।

এই বিবাহ ওয়ালিসের কাছে কতকটা বিচিত্র ও অমানুষিক বলে বোধ হলেও, তিনি এতে মত দিলেন।

অনেক বছর আগে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারে এইরূপ একটা বিয়ে হয়েছিল বলে, সম্রাটও এই বিবাহে অমত করলেন না।

এডওয়ার্ড একদিন প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর 'মর্গ্যানাটিক' বিবাহ করার কথা বললেন।

উত্তরে প্রধান মন্ত্রী সম্রাটকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—মর্গ্যানাটিক বিবাহ পার্লামেণ্টের সদস্যরা পছন্দ করেন না। সম্রাটের পত্নীই সম্রাজ্ঞী হবেন, এই হ'ল আমাদের কথা। অতএব মর্গ্যানাটিক বিবাহ করলেও আপনার সিংহাসন ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই।

সম্রাট প্রধান মন্ত্রীকে বললেন—এ বিবাহ আমি করবই। এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প অটুট। এরজন্য আমি সিংহাসন ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

অবশেষে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করে পার্লামেণ্টের কবল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলেন।

ইতিপূর্বে সম্রাট, ওয়ালিসকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবার তিনিও মা ও ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে ইংলণ্ড ত্যাগ করে ফ্রান্সে চললেন ওয়ালিসের কাছে। সেখানে তাঁদের বিয়ে হ'ল এবং তাঁরা পরমানন্দে বাস করতে লাগলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রদত্ত ডি-লিট্ উপাধি নিতে শরৎচন্দ্র যখন ঢাকায় যান, তখন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ না করলেও, মিসেস সিমসন লাভের জন্য তাঁর সিংহাসন ত্যাগ একরূপ ঠিক।

এই ব্যাপারটি নিয়ে তখন কিছুদিন ধরে শুধু ইংলণ্ড, আমেরিকাতেই নয়, সারা পৃথিবীময় একটা মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র ডি-লিট্ উপাধি নিতে গিয়ে ঢাকায় কয়েকদিন ছিলেন।

সেদিন তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে অতিথি।

শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে রমেশবাবুর বাড়ীতে সেদিন একটা ছোটখাট সভা বসেছে। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মধ্য থেকে একজন শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন

করলেন—দেখুন শরৎবাবু, আপনাকে আমরা একজন নারী-দরদী লেখক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ ঔপন্যাসিক বলে জানি। নর-নারীর প্রেম ও তাদের মনস্তত্ত্ব নিয়েই আপনার কারবার। এই যে সম্রাট এডওয়ার্ড ও মিসেস সিম্‌সনের ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্বজোড়া এত আলোড়ন, এটার সম্বন্ধে আপনার কি মত বলুন, আমরা শুনি।

এই প্রশ্ন শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—দেখুন, এই অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের কথায় আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এর জন্য একবার আমি মহা বিপদে পড়েছিলাম। সে কাহিনীটা বলছি শুনুন—

প্রতিদিন অনেক চিঠি আমার কাছে আসে। একদিন একটি নতুন ধরণের চিঠি পেলাম। রাজসাহী জেলার কোন এক জায়গা থেকে এক ভদ্রমহিলা লিখেছেন।

তিনি বলেছেন, আমার বই নাকি তাঁর খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার উদার মতবাদের জন্যই নাকি আমার উপর তাঁর খুব শ্রদ্ধা। আমার বই বারবার করে পড়েও তাঁর তৃপ্তি হয় নে। তিনি এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, আমাকে একটিবার তিনি চোখে দেখতে চান। এই দেখা কবে, কোথায় এবং কিভাবে হবে, সেকথা জানতে চেয়েই তিনি চিঠি লিখেছেন। মত পেলে তিনি সেই দূর দেশ থেকেই কলকাতায় আমাকে দেখতে আসবেন। আমার উত্তরের জন্য তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছেন।

চিঠিখানা পেয়ে একটু খুশী যে না হলাম, তা নয়। বই পড়ে লোকে প্রশংসা করলে কে না খুশী হয় বলো? যাই হোক, ধন্যবাদ দিয়ে ভদ্রমহিলাকে একটা উত্তর লিখে দিলাম। এ কথাও লিখে দিলাম যে, আমাকে দেখবার কিছুই নেই, বরং না দেখাই ভাল। কেন না, আমার উপর যেটুকু শ্রদ্ধা এখনো রয়েছে, চেহারা দেখলে তা উবে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

দিনকতক পরে ভদ্রমহিলার আর একটি চিঠি এসে উপস্থিত। খামের চিঠি, দিব্যি এক প্রেমপত্র!

প্রেমপত্র মানে আমার কাছে তিনি একেবারে আত্ম-নিবেদন করেছেন। লিখেছেন—আপনার প্রতি আমার এই সুগভীর প্রেমের কোন প্রতিদানই কি পাব না? আপনি কি এতই নিষ্ঠুর হবেন? এই তো সামান্য এক নারীর

প্রেমের জন্য সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড তাঁর পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য পর্যন্ত ত্যাগ করছেন। আর নারী-দরদী হয়ে, নারীর অন্তরের বেদনার কথা এমন গভীর-ভাবে জেনে, আপনি কি আমায় উপেক্ষা করবেন?

নারী-দরদী হওয়ার বিপদখানা একবার বোঝ!

শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর?

—তারপর আর কি! ভাগ্যিস চিঠিটার কথা বড়বৌ জানতে পারে নি! জানলে কি মনে করতো কে জানে!

একজন ঠাট্টা করে বললেন—মত দিলেই তো পারতেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের তো অমন একাধিক বিয়ে হয়েই থাকে। এতে আর দোষ কি!

শরৎচন্দ্র বললেন—বয়েস কি আর আছে রে ভায়া! আরো কিছুদিন আগে এ-ধরণের চিঠি এলেও না হয় দেখা যেত।

—ভদ্রমহিলার চিঠির একটা উত্তর দিতে হলো তো?

—উত্তর আর কি দেব, চুপ করে গেলাম। শুনে আশ্বস্ত হবে, শেষ পর্যন্ত তিনি সত্যি সত্যি কলকাতায় চলে আসেন নি।

[এখানে দেখা যাচ্ছে, নারী-দরদী ও মনস্তত্ত্ববিদ্ বলে শরৎচন্দ্রকে এডওয়ার্ড-ওয়ালিস সম্পর্কীয় যে প্রশ্নটি করা হয়েছিল, তিনি তার ধার দিয়েই গেলেন না। তিনি আসল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে খুব সম্ভব বানিয়েই অন্য একটা গল্প বললেন।

শরৎচন্দ্র যখন উত্তর দেবার মত মনের অবস্থায় থাকতেন না, তখন এই ভাবেই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। উদাহরণ হিসাবে এই গ্রন্থেরই ২৮ ও ১৬০ পৃষ্ঠায় 'ব্যাকরণ' ও 'মুদিখানা' গল্প দুটির কথা বলা যেতে পারে।

জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ উত্তর দেবার মত মনের অবস্থায় না থাকলে বা প্রয়োজনবোধ না করলে প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। দীনেশচন্দ্র সেন (পরবর্তী

কালের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র লেখক। দীনেশবাবু তখন কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন।) একবার কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র দীনেশবাবুর প্রশ্ন কিভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে দীনেশবাবু তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"কুমিল্লার জলবায়ু, ধান-চালের অবস্থা, লোকসংখ্যা, স্কুল-কলেজের কথা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আলাপ চলিল। যতবার আমি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, ততবার তিনি সে-কথা এড়াইয়া ধানাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন।···আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সাহিত্য-প্রসঙ্গে ইঁহার সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করি। কিন্তু···তিনি যেন মনে করিলেন, আমি একটি কৃষক যুবক। অতএব লাঙ্গল, ফাল ও চাষাবাদের কথা ছাড়া আর কিছু বলিবার উপযুক্ত নহি। বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলার লেখক আমার নিকট এইরূপে দেখা দিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, যদি একবার সাহিত্যের কথা আমার সঙ্গে পাড়িতেন, তাহা হইলে মারলোর ফস্ট ও শিলারের এপিসিকাইডন হইতে কবিতা আওড়াইয়া তাঁহাকে আমি আমার বিক্রম দেখাইয়া দিতাম। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস যে গীতি-কবিতার রাজা তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিস্ময় ও প্রীতির স্তোকবাক্য আদায় করিয়া লইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে সে সুযোগ দিলেন না।"

শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু শৈলেশ বিশীর একটি লেখায় দেখছি, শরৎচন্দ্রের বই পড়ে আকৃষ্ট হয়ে একটি মেয়ে একবার শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলেন এবং পরে সেই মেয়েটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ আলাপ পরিচয়ও হয়েছিল।

শৈলেশবাবুর সেই লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"একবার দাদার (শরৎচন্দ্রের) সাথে নবদ্বীপ যাই। সাল তারিখ মনে নেই। তবে জ্যৈষ্ঠ মাস মনে আছে। কারণ আম খেয়েছিলাম। এই নবদ্বীপ যাওয়ার একটা ইতিহাস আছে। দাদার লেখা পড়ে খুব আকৃষ্ট হয়ে, দিল্লী থেকে এক মহিলা তাঁকে চিঠি লেখেন—'দাদা, একবার দেখা করতে এসো।'

মহিলাটি তখন অসুস্থ। দাদা করলেন কি, দিল্লীতে কই, মাগুর মাছ পাওয়া যায় না—একেবারে কলকাতা উজাড় করে, কৈ, মাগুর মাছ জালায় ভরে দিল্লী চললেন।

তার পরের ঘটনা। কি সূত্রে জানিনা মহিলাটির স্বামী বদলি হয়ে নবদ্বীপ এসেছেন—দাদা যাচ্ছেন সেখানে, আমি তল্পী-বাহক।

আমরা বোধ হয় দশটার সময় নবদ্বীপ গিয়ে পৌঁছলাম। স্টেশনে মহিলাটির স্বামী আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। তিনি ভাড়াটে গাড়ী করে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাড়ী পৌঁছেই আমি হলুম—দাদার ভাই, মহিলাটির ঠাকুরপো। আর আমাকে পায় কে!

মহিলার চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল না, কিন্তু এত স্নেহশীল যে তাঁর আদর-যত্নের কথা কোন দিনই ভুলি নি।

শরৎদা নবদ্বীপ এসেছেন—সে এক রৈ রৈ ব্যাপার! কোথায় বুড়ো শিবতলা, পোড়া মা তলা, কোথায় সোনার গৌরাঙ্গ, সকলের বাড়ীতে চা পান, খাবার খাওয়া, গল্প আর আড্ডা দিতে দিতে রাত ন'টা বেজে গেল। দাদাকে কেউ ছাড়তে চায় না। কি করি, নতুন বৌদিকে কথা দিয়েছি, যে করেই পারি, দাদাকে সকাল সকাল বাড়ী নিয়ে আসবো। তারপর সকলের অনুরোধ ঠেলে দাদাকে এক রকম জোর করেই প্রহরখানেক রাতে বাড়ী আনা গেল।

বৌদি রান্না-বান্না সেরে ঘর-বার করছেন। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই। তাঁর স্বামীও আমাদের সাথী। দুটি ছোট ছেলেমেয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। মহিলাটি একা রাতের খাবারের কি বিরাট আয়োজনই না করেছেন!

আমাদের পরিতোষ করে খাইয়ে, তিনি নিজের হাতে আমার ও দাদার পাশাপাশি বিছানা করে মশারি খাটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে। একতলা বাড়ী, বারান্দা আছে। পাশের ঘরে তাঁরা ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন। বড্ড গরম—দাদা আমাকে শুতে বলে নিজেই এসে তাল পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন—কিছুতেই শুনবেন না। শেষে নতুন বৌদি তাঁর হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। রাত তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

আমি কখন ঘুমিয়েছি জানি না। ভোরে উঠে দেখি তাঁরা দুজন বারান্দায়

বেঞ্চিতে বসে গল্প করছেন। বিছানা দেখে মনে হলো—দাদা শুতে আসেন নি, সারারাত গল্প করেই কাটিয়েছেন। এই দেখে আমার ভবভূতির একটা লাইন মনে পড়লো—

তরুণ রাম সীতাকে সবে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন—কপোলে কপোল ঠেকিয়ে তাঁরা সারারাত গল্পই করছেন। কথা আর শেষ হয় না, কিন্তু রাত ভোর হয়ে গেল। আমার শেষ লাইনটা মনে আছে—'রাত্রিমেব ব্যরংসীত' —রাতই কেটে গেল। যদিও ঐ গল্পের টেক্‌নিকের সাথে প্রথম অংশের কোন মিল নেই, কিন্তু শেষটায় হুবহু মিল দেখে শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেল।

আমি উঠে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করলাম। বৌদি হেসে বললেন—কি ভাই, তোমার কেমন ঘুম হলো? তুমি জাননা—উনি আরো দুবার উঠে গিয়ে তোমাকে বাতাস করেছেন। কাল যা গুমোট গেছে।

তারপর বিদায়ের পালা। যেমন বিদায় বেলা মামুলী মনের ভাব যা হয়ে থাকে—মন ভারাক্রান্ত, বার বার আসার প্রতিশ্রুতি কিন্তু আসা আর হয় না। বৌদি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন, দাদা গাড়ী থেকে তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে জোরসে একটা সিগারেট ধরারেল। গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন—হাঁকাও জলদি স্টেশন।"

শৈলেশবাবুর লেখা এই কাহিনীটি সত্য হ'লে বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র সেদিন এডওয়ার্ড-ওয়েলিস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে, তাঁর জীবনের এই ঘটনাকেই হয়ত ঘুরিয়ে অন্যভাবে গল্প করে বলেছিলেন।]

প্রেমেপড়া

শরৎচন্দ্র তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে তেজনারায়ণ কলেজে পড়বার সময় সুরেনবাবুকে পড়াতেন। সুরেনবাবু তখন স্কুলের ছাত্র।

সুরেনবাবু ভাগলপুরে স্কুলে পড়তে পড়তেই মালদহ জেলার চাঁচলে তাঁর পিতার কাছে চলে যান। তাঁর পিতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে চাঁচল রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। সুরেনবাবু চাঁচল থেকেই এনট্রান্স পাস করেন।

সুরেনবাবু চাঁচল থেকে ভাগলপুরে ফিরে এসে দেখলেন, শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হওয়ায় শরৎচন্দ্রের পিতা শ্বশুরবাড়ী ত্যাগ করে পুত্রকন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে গিয়ে বাস করছেন।

সুরেনবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জানলেন—শরৎচন্দ্র খুব গল্প লিখছেন। গিরীন্দ্রনাথের (সুরেনবাবুর ছোটভাই) হাতে লেখা পত্রিকায় 'বোঝা' নামে একটি গল্পও শরৎচন্দ্র সুরেনবাবুর নামে প্রকাশ করেছেন।

সুরেনবাবু আরও শুনলেন, শরৎচন্দ্র রাজ বনেলী এস্টেটে একটা চাকরিও জোগাড় করে নিয়েছেন।

সুরেনবাবু চাঁচল থেকে ভাগলপুরে ফিরে একদিন খঞ্জরপুরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেদিন শরৎচন্দ্র, সুরেনবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায়, তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর প্রেমেপড়ারও একটা গল্প বলেছিলেন।

সুরেনবাবু এ সম্বন্ধে তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে লিখেছেন—

"ইংরাজী ১৮৯৮ সালে ভাগলপুরে এসে এক বন্ধুর মুখে শুনে অবাক হলাম যে, আমি নাকি সুন্দর সুন্দর ছোট গল্প লিখি। তিনি আরো বল্লেন, 'বোঝা' গল্পটি নাকি ভারি সুন্দর হয়েছিল।

খঞ্জরপুরে শরৎদের বাড়ীটির কাছাকাছি একখানি প্রাসাদতুল্য ভবনে

সব্‌জজ স্বর্গীয় নফরচন্দ্র ভট্ট মশাই বাস করতেন। তাঁর সংসারটি ছিল বিচিত্রভাবে এলোমেলো। বাড়ীর মধ্যে শক্ত বাঁধন—বাইরে গেরো একেবারে ফস্‌কা। কর্তাকে সবাই যমের চেয়ে বেশী ভয় করতো—কিন্তু এড়িয়ে চলার ফাঁকও ছিল অনেক।

তাঁর বাড়ীর পাশেই ছিল একটি প্রকাণ্ড মোসোলেম বাড়ী। সেটি কিন্তু মসজিদ নয়। কোন বড়লোকের গোরস্থান হবে। বাড়ীর ছাদখানি ছিল মাঠের মত বড়। একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে—একেবারে লোক-লোচনের বাইরে চলে যাওয়া যায়। যেন আড্ডার আদর্শ স্থান। ছেলে-পুলেদের এইটিই ছিল নর্তন-কুর্দনের লীলাভূমি।

একদিন শরতের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় এখানে এলাম। অবাক করে দেওয়ার মতই জায়গা। তখন বসন্তকাল, সেদিন আবার শুক্লপক্ষ। চাঁদ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ছাদটাকে আলো করেছে। উত্তরে গঙ্গা—ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ছাদের ওপরে এখানে সেখানে এক একখানা মাদুর পেতে এক একদল বসে গেছে।

এক জায়গায় থিয়েটারের রিহার্সাল চলেছে ঘোর রবে। আবার অন্য একটা মাদুরে চটা-ওঠা হারমোনিয়ম নিয়ে চলেছে গানের মহড়া। একটু দূরে চলেছে সাহিত্যের বাক্‌-বিতণ্ডা। চা আসছে। খাবার এল পরাৎ ভর্তি। কোথাও চলেছে গড়গড়া। আবার কোথাও বা সিগারেটের ধোঁয়ায় আকাশ সমাচ্ছন্ন।

শরৎ তখন বনেলীরাজের এস্টেটে কাজ করছেন। ম্যানেজার শিবশঙ্কর সহায়ের টুর ক্লার্ক। দিনকতক সহরে থাকতে হয়, আবার দিন কতক ঘুরতে হয় মফঃস্বলে।···

সংসার সম্বন্ধে শরতের ধরি মাছ না ছুঁই পানি ভাব! মাসের টাকাটা দিয়েই খালাস। না কুলালে উপায় দেখতে হয় মতিলালকে। এ-বাড়ী সে-বাড়ী থেকে ধার বলে ভিক্ষে করে আনা যৎকিঞ্চিৎ—যেদিন যা মেলে!

শরৎ কিন্তু তখন মোটেই ম্রিয়মান নন্‌।

সংসারের কুৎসিত দিকটা ঝেড়ে ফেলে, একটা রসের দিক নিয়ে মাতোয়ারা ভাব।

মনে হলো, সত্যিই একটা ডিট্যাচমেণ্ট আছে।

এ যেন কাট-ফাটা রোদে পাতা-ঝরা কুর্চিগাছে এক গাছ ফুল ফুটে ওঠা!

কি হাসিখুশী ভাব! মুখে কথার খই ফুটছে।

মনে হয়, সেটা শরতের প্রেমে পড়ার যুগ চলছিল। সেই নবীন প্রেমের দয়িতা যে কে তা ঠিক করা সোজা নয়। বিশেষ করে যার পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতিটা অজানা বা নতুন। তবে সে যে প্রেমে পড়ার ব্যাপার তা বুঝে নেওয়া শক্ত ছিল না।

সেদিন অনেক গল্প হলো শরতের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এসে। দুজনে খেয়ে নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে তাঁকে পৌঁছতে গেলাম। তিনি আবার আমাকে পৌঁছতে এলেন। এমনি করে পথে পথে গল্পে রাত কেটে গেল। আমি নীরব শ্রোতা। শরতের জিভে মা সরস্বতী নৃত্য করে চলেছেন।

বুঝলাম, শরৎ টুরে গিয়ে নীরদা বলে কোন একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। উচ্ছ্বাস-মেশা সে যে কত গল্প আজ তা মনে করা শক্ত! একটা তেজী ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন তীরবেগে অন্ধকার সাঁওতাল পরগণার পথ দিয়ে শরৎচন্দ্র! কোন কথা মনে নেই, শুধু এই মনে আছে যে, নীরদা তাঁর জন্য রাত জেগে প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ ঘোড়াসুদ্ধ নদীতে পড়ে গেলেন তিনি। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিজে কাপড়ে, ভিজে ঘোড়ায় চলেছেন নটবর নায়ক পবন গতিতে!

সেদিন সবই বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আজ বুঝি যে, বোকা-বোঝান ছাড়া আর কিছুই নয়। গল্পে প্রেমে পড়ার অংশটুকুই ছিল বাস্তব—আর বাকি ঘোড়া, নদীর জলে লাফিয়ে পড়া, ভিজে কাপড়ে প্রিয়ার কাছে পৌঁছান, এ সবই কথা শিল্পীর অনৃত-সৃষ্টি। যাদুকরের কাছে দর্শকের চোখে ধুলো দেওয়ার আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, তেমনি বিশ্বাসী শ্রোতার কাছে কথার মায়াজাল সৃষ্টি করে কথকেরও আনন্দ আছে। সেদিন আমার আগ্রহ এবং ধৈর্যের খরচে শরৎচন্দ্র সেই ধরণের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

দয়িতার সন্ধান করার মধ্যে মুস্কিল আছে। কেন না, ঠিক সত্যটি খুঁজে বার করা সব ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। তাছাড়া, সংসারের পথও তেমন ঋজু নয়। পথে সাপ-ব্যাঙের ভয় থাকে। অতর্কিতে কারুর ল্যাজে পা পড়লে সে যে ফোঁস করে একটা ছোবল না দেবে তাও বা কে বলতে পারে! তাই খুঁটিয়ে ওদিকের বিচার না করাই ভাল। তবে একথা সত্য যে শরৎচন্দ্রের

জীবনে রভসের যুগ চলছিল সেদিন, আর তাঁর মনে এমন একটা ছাপ রেখে দিয়েছিল, যা সারা জীবনের বহু উত্থান পতনের, দুঃখ-সুখের অভিজ্ঞতায় একেবারে মুছে গেল না।"

['সেটা শরতের প্রেমে পড়ার যুগ চলছিল'—সুরেনবাবু একথা লিখলেও, সংসারের পথ ঋজু নয় বলে, খুঁটিয়ে ওদিকের বিচার করতে সাহস করেন নি।

যাই হোক্, নীরদার কথা জানি না, তবে ঐ সময়টায় শরৎচন্দ্রের জীবনে যে সুরেনবাবুর কথায় 'রভসের যুগ চলছিল' তা সত্য এবং তার ব্যর্থতায় তাঁর জীবনে যে একটা গভীর ছাপ পড়েছিল তাও সত্য। শরৎচন্দ্রের চিঠি থেকেও এ কথা জানা যায়। যেমন, তিনি রাধারাণী দেবীকে একবার লিখেছিলেন—

"তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেরেছি রাধু।···নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি, এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়ত সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারেও।···

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলুম না তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত ধারণা, সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।"]

রাজলক্ষ্মী

শরৎচন্দ্র যে কিরূপ সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে গল্প বলতে পারতেন, তা ইতিপূর্বে অনেক গল্পেই দেখিয়েছি। এখানে তাঁর ঐরূপ আর একটি বানানো কাহিনী বলছি—

শরৎচন্দ্রের স্নেহ-ভাজন শৈলেশ বিশী একদিন বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রের বাসায় যান। সেদিন কথায় কথায় শৈলেশবাবু শরৎচন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে গম্ভীরভাবে বলেন—রাজলক্ষ্মী, সে ঐ তো তোমার বৌদি। আমি ওকে শেষে শৈব মতে বিয়ে করেছি।

শরৎচন্দ্রের এই কথাকে শৈলেশবাবু একেবারে বেদবাক্যের মতই বিশ্বাস করেন। তাই তিনি পরে তাঁর 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন' গ্রন্থে লেখেন—

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজলক্ষ্মী কে? তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী লক্ষ্মী বলেই যাঁকে তিনি আদর করে ডাকতেন।···তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন শৈব মতে। যেদিন সেই কথা তাঁর মুখে শুনলুম, আমার সব অমৃতের সন্ধান বিষিয়ে গেল, নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে ক' ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। আমি স্পষ্টই বললুম—এত বড় ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্যাদা করলেন? যেটা ছিল স্রোতের জল, স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া—ভাগীরথী, আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন একটা পুকুর, খানা, ডোবা!

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—এছাড়া উপায় ছিল না, তাছাড়া ও ছাড়ল না।

এতদিনে আমার সম্বিত ফিরে এল, তখন বুঝি নি। না জেনে দাদার মনে আমি কি আঘাতই না দিয়েছি। এখন বুঝেছি—রাজলক্ষ্মী স্বামী চেয়েছিল, সে প্রেমিক চায় নি। গৌরীর মত তপস্যা করেই সে এই ভবঘুরে স্বামী লাভ করেছিল। রাজলক্ষ্মীর জীবনের পূর্ণতা স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে। এ অমৃত সকলের ভাগ্যে জোটে না।"

শৈলেশবাবুর এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে কখনই 'লক্ষ্মী' বলে ডাকতেন না। তাঁকে তিনি সাধারণতঃ 'বড়বৌ' বলে ডাকতেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি বহুবার সামতাবেড়ে হিরণ্ময়ী দেবীর কাছে গেছি। গিয়ে দেখেছি—তিনি একরূপ অশিক্ষিতা, (কোন রকমে নিজের নামটা সই করতে পারতেন ও টেনে টেনে কষ্ট করে বই পড়তে পারতেন) ও অত্যন্ত সরলা গ্রাম্য মহিলা ছিলেন। বাঈজীর নাচ ও গান-বাজনা কাকে বলে তিনি জানতেনই না। আর রাজলক্ষ্মীর মত চৌকস কথাবার্তা তিনি ভাবতেও পারতেন না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ভাষায় কথা বলতেন, এমন কি কথা বলার সময় অনেক সময় আড়ষ্ঠ হয়েও পড়তেন।

অতএব শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী আদৌ রাজলক্ষ্মী নন।

শরৎচন্দ্র—১ম খণ্ড—জীবনী গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি।

জামাই আদর

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে। পথের দাবী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের তৎকালীন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করে। আর শুধু বই বাজেয়াপ্ত করাই নয়, বইয়ের লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথাও চিন্তা করতে থাকে।

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছুদিন পরেই ১০ই কার্তিক তারিখে শরৎচন্দ্রের মেজভাই স্বামী বেদানন্দ দেহত্যাগ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি সামতাবেড়ে দাদার কাছে যান। দাদার কাছে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দাদার বুকের উপর মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শরৎচন্দ্র তাঁর মেজভাইকে খুবই স্নেহ করতেন। হঠাৎ এইভাবে তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছিলেন।

পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হওয়া এবং মেজ ভাইয়ের মৃত্যু—এই উভয় কারণে শরৎচন্দ্র তখন খুবই মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র, দাদার ঐরূপ মানসিক অবস্থা দেখে, তাঁর দাদার বাল্যবন্ধু ও তাঁদের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে সমস্ত জানালেন। প্রকাশবাবু সুরেনবাবুকে এও লিখলেন—আপনি এসে দাদাকে বুঝিয়ে একবার ভাগলপুরে আপনার ওখানে নিয়ে যান। আমার মনে হয়, দাদা আপনাদের কাছে এখন থাকলে, একটু শান্তিতে থাকবেন।

সুরেনবাবু প্রকাশবাবুর এই চিঠি পেয়েই ভাগলপুর থেকে সামতাবেড়ে চলে এলেন। এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে বুঝিয়ে ভাগলপুরে নিয়ে গেলেন।

ভাগলপুর থেকে মাইল বার দূরে রামচন্দ্রপুর নামক একটা জায়গায় সুরেন বাবুদের চাষ-আবাদের কিছু জমি ছিল। সেখানে থেকে সেই সব চাষ-আবাদ দেখাশুনা করবার জন্য সেখানে সুরেনবাবুদের একটি বেশ বড় ও সুন্দর বাংলো

বাড়ী ছিল। সুরেনবাবু অনেক সময় সপরিবারে সেই বাংলো বাড়ীতে গিয়ে বাস করতেন।

সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রকে এবার প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দর সেই রামচন্দ্রপুরে নিয়ে গেলেন।

সুরেনবাবু যাবার সময় তাঁর পরিবারবর্গকেও সঙ্গে নেন।

শরৎচন্দ্র রামচন্দ্রপুরে এই আত্মীয়দের মধ্যে থেকে অনেকটা শান্তিতেই দিন কাটাতে লাগলেন।

রামচন্দ্রপুর থেকে প্রায় ন' মাইল দূরে সাবোরে বিহার গবর্ণমেণ্টের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে ঐ সময় সুরেনবাবুর বড়দা মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় একজন অফিসার ছিলেন।

সুরেনবাবু রামচন্দ্রপুরে থাকলে প্রফুল্লবাবু প্রায়ই সাবোর থেকে এসে খুড়শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতেন। এবারে শরৎচন্দ্র এসেছেন শুনে প্রফুল্লবাবু অফিসে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে রামচন্দ্রপুরে চলে এলেন।

প্রফুল্লবাবু বেশ সৌখীন মানুষ ছিলেন। আর তিনি খুব ভাল খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করতেন।

প্রফুল্লবাবু যেদিন রামচন্দ্রপুরে আসেন, তার আগের দিন থেকে সুরেনবাবুর স্ত্রীর হঠাৎ খুব জ্বর হয়। তাই বাড়ীতে রান্না-বান্নার ভার পড়েছিল চাকর-বাকরদের উপর। চাকর-বাকরদের রান্না প্রফুল্লবাবুর তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। এজন্য তিনি রোজই খাবার সময় খুঁত্ খুঁত্ করতেন এবং ভাল রকম জামাই আদর হচ্ছে না বলে শরৎচন্দ্রের কাছে অভিযোগও করতেন।

প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ছিল মামাতো-পিসতুতো ভগ্নীপতি-সম্বন্ধী সম্পর্ক। শরৎচন্দ্র এই সম্পর্কের সূত্র ধরে প্রফুল্লবাবুর ঐ খুঁতখুঁতুনির জন্য তাঁকে একদিন গল্পের ছলে বললেন—প্রফুল্ল, তুমি সেই শ্বশুরবাড়ীতে নতুন বড়লোক জামাই যাওয়ার গল্পটা জান কি ?

—কি গল্প বলুন তো ? বলুন শুনি।

শরৎচন্দ্র বললেন—বলছি তবে শোন—

এক ভদ্রলোকের জামাই খুব বড়লোক। ভদ্রলোকের অবস্থাও খুবই

ভাল। জামাই নতুন। এই জামাই এখন শ্বশুরবাড়ী এসেছে। জামাই-এর যারপর নাই আদর-যত্ন হচ্ছে।

জামাই স্নান করবে, তাই তার জন্য কিনে আনা হ'ল বেশ দামী বড় টার্কিশ তোয়ালে, নতুন দামী ফুলেল তেল, নতুন সাবান ইত্যাদি।

জামাই-এর স্নান করবার সময় হ'লে তার এক কুমারী শালী ঐ সব তার কাছে নিয়ে এল।

জামাই সব দেখল। দেখে ফুলেল তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে বললে—একি! আমি বাড়ীর জামাই, আমি মাখ্‌ব এই ফুলেল তেল! তা কখনই হ'তে পারে না। আমি নতুন জামাই, আমি মাখ্‌ব মোমবাতি!

শরৎচন্দ্রের এই গল্প শুনে প্রফুল্লবাবু একেবারে চুপ।

সুরেনবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি কিন্তু তখন খুব হাসছেন।

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা

শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে সেদিন দু-একজন সাহিত্যিক এসেছেন। কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীও আছেন।

নানা রকমের আলোচনা হচ্ছে। কথায় কথায় শেষে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার কথা উঠল। একজন বললেন—ব্রাহ্মণরাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করেছেন সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের আয়ের একটা বেশ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মানুষ মরে গেলেও তার শ্রাদ্ধাদির নাম করে সেখানেও শোষণের ব্যবস্থা করেছেন।

শরৎচন্দ্র এই কথা শুনে বললেন—দেখ, 'বামুনের মেয়ে' লিখেছি বলে আমার সামনে বামুনদের নিন্দা করবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করব না। মৃত্যুর পরে পারলৌকিক কৃত্যের জন্য আমাদের দেশে ব্রাহ্মণরা যে ব্যবস্থা করে গেছেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় তা কিছুই নয়। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক ইতিহাস পড়ে দেখেছি। কি সভ্য আর কি অসভ্য—কোন সমাজেই আমাদের সমাজের মত এত অল্প খরচে পারলৌকিক কাজ সমাধা করা যায় না। তোমার কেউ মারা গেলে, তুমি সামান্য তিল আর সামান্য চাল-কলা নিয়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে তার শ্রাদ্ধ সমাধা করে আসতে পার। ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ বা দানসাগর শ্রাদ্ধের যে ব্যবস্থা আছে, সে সব তো দানের ব্যাপার, সে বড়লোকদের জন্য। সেখানেও দেখ, যার যেমন অবস্থা, তার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তার জন্য তেমনি ব্যবস্থা করে গেছেন। শুধু শ্রাদ্ধের খরচের কথাই বা কেন, আমাদের সমাজে মৃত্যুর পরের আচার-অনুষ্ঠানগুলোও অন্য সমাজের সঙ্গে তুলনা করে দেখ। এই প্রসঙ্গে তবে আমার দেখা রেঙ্গুনে বৌদ্ধ সমাজের একটা কাহিনী বলছি শোন—

আমি যখন রেঙ্গুনে ছিলাম, তখন আমার বাড়ীর একটু দূরে এক বর্মী পরিবারের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঐ পরিবারে লোকজন বলতে ছিল—বাড়ীর কর্তা, তার স্ত্রী ও তাদের পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একমাত্র

ছেলে। ছেলেটি একবার কয়েকদিন জ্বরে ভুগে হঠাৎ মারা গেল। তখন একমাত্র যোগ্যপুত্রের মৃত্যুতে ছেলেটির বাপ-মায়ের অবস্থা কি রকম হ'ল ভাবো!

একজন প্রতিবেশীর মুখে ঐ ছেলেটির মৃত্যু সংবাদ শুনে ভাবলাম—ওর বাপ-মাকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়াটা আমার একটা কর্তব্য। কর্তব্য তো ভাবলাম, কিন্তু গিয়ে তাদের বলব কি! তাদের ঐ বিপদে কি সান্ত্বনা আমি দোব।

যাই হোক, অনেক চিন্তা করে তো গেলাম। গিয়ে দেখি, ঘরের বারান্দায় মৃতদেহ মধু মাখিয়ে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আর মৃতপুত্রের মাথার কাছে বসে মা কাঁদ কাঁদ গলায় গান করছে, এমন কি ছেলেটির বাপকেও সেই গানে যোগ দিতে হয়েছে। গান বলতে আমার মনে হয়, মৃতপুত্রের আত্মার মঙ্গল কামনায় ঐরূপ সুর করে কোন স্তোত্রপাঠ-টাঠ হবে।

এটা হ'ল ওদের প্রথা। পুত্রশোকে প্রাণখুলে কেঁদে যে বুকটা একটু হাল্‌কা করবে, তার উপায় নেই। ওদের ধারণা কাঁদলে নাকি মৃতব্যক্তির আত্মার অমঙ্গল হবে। তাই শোক দমন করেও ঐরূপ করতে হবে। সেখানে অবশ্য তাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজন যারা উপস্থিত ছিল, তারাও ঐ গানে যোগ দিয়েছিল।

আমি কোন রকমে ছেলেটির বাপের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বললাম। তারপর ছেলেটির মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম—আপনি ভিতরে চলুন। মৃতপুত্রের মুখের কাছে বসে এইভাবে গান করা আপনার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

উত্তরে তিনি বললেন—আমাকে এখানে থাকতেই হবে। তা না হ'লে যারা এসেছে, তারা আমার বাড়ী থেকে চলে যাবে, কেউই থাকবে না। আর আমারও নিন্দা করবে।

মৃত্যুর পরে আমাদের সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, আর ওদের সমাজের আচার-অনুষ্ঠান একবার তুলনা করে দেখ। অতএব বিভিন্ন দেশের খবর না জেনে আমাদের সব কিছুরই নিন্দা করতে যেও না।

চাকরি

একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের তখন খুব নামডাক।

সেই সময় একদিন তাঁর বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে এলেন। এসে তিনি শরৎচন্দ্রকে বললেন—দাদা, আর তো পারি নে! সংসার প্রায় অচল। অনেকগুলি পোষ্য। অফিস থেকে সামান্য যা পাই, তা দিয়ে অতি কষ্টে কোন রকমে একবেলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। বড় ছেলেটা আই-এ পড়ছিল, তা ক'মাসের বাকি মাইনে আর পরীক্ষার ফি এক সঙ্গে জোগাড় করতে পারলাম না বলে, ছেলেটা আই-এ পরীক্ষাই দিতে পারল না। ছেলেটা এখন বেকার বসে আছে। আচ্ছা শরৎদা, আপনার সঙ্গে তো কত বড় বড় লোকের আলাপ রয়েছে। তাঁরা সকলেই আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তিও করেন। তা দয়া করে কাকেও বলে আমার ছেলেটার একটা চাকরি করে দিন না! তাহলে এ যাত্রা বেঁচে যাই দাদা!

শরৎচন্দ্র সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন—চাকরি পেতে হ'লে তোমার ছেলের আই-এ ফেল হওয়া প্রয়োজন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—ফেল হওয়া প্রয়োজন কেন দাদা?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—তবে গল্পটা বলি শোন। শুনলেই বুঝতে পারবে—

আমার পরিচিত একটি ছেলে একবার এক মার্চেন্ট অফিসে চাকরির জন্য দরখাস্ত করে। সে ছেলেটিও তোমার ছেলের মতই অভাবের জন্য টাকা সংগ্রহ না হওয়ায় আই-এ পরীক্ষা আর দিতে পারে নি।

যাই হোক, ছেলেটি চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে মনোনীতও হ'ল। ইণ্টারভিউ-এর শেষে অফিসের ম্যানেজার ছেলেটিকে বলে দিলেন—দু-এক দিনের মধ্যেই তোমার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ছেলেটি তো ফিরে এসে, চাকরি যে তার হয়ে গেছে, এ কথা মহানন্দে তার আত্মীয়-স্বজনদের বলে বেড়াতে লাগল।

এদিকে কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, অথচ তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আর আসছে না। আরও কয়েকদিন কেটে গেল। তখন ছেলেটি একদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কি হ'ল খোঁজ নেবার জন্য গিয়ে অফিসের সেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল।

ছেলেটি যেতেই তাকে দেখে ম্যানেজার বললেন—তোমার চেয়ে বেশী শিক্ষিত একটি ছেলে পেয়ে গেলাম হে! তাই তাকেই নিলাম। সে ছেলেটি আই-এ ফেল।

ম্যানেজারের মুখে এই কথা শুনে আমার পরিচিত সেই ছেলেটি একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। সে শুধু বললে—আপনি তো জানেন স্যার আমি আই-এ পর্যন্ত পড়েছি। শুধু পরীক্ষাটাই না হয় দিতে পারি নি। তা পরীক্ষা দিলে চেষ্টা করে কি ফেলটাও আর আমি করতে পারতাম না!

এই গল্প বলে শরৎচন্দ্র ভদ্রলোককে বললেন—তাই বলছিলাম, তোমার ছেলেরও চাকরি হতে হ'লে অন্ততঃ আই-এ ফেলটা হওয়াও প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে ভদ্রলোক শত দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠলেন।

ভুল বুঝা

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—

একদিন সন্ধ্যাবেলা।

একতলায় 'বঙ্গবাণী'র অফিস ঘরে যথারীতি আড্ডা জমেছে। মজলিস্-এর মূল কেন্দ্র মেজদা (শ্যামাপ্রসাদবাবু)। সে সময়ে আমাদের বাড়ীতে আমাদেরই এক আত্মীয় ছিলেন। কলকাতায় চাকরি করতেন। বাড়ীর দোতলার বাইরের একটি ঘরে থাকতেন।

সম্পর্কে জামাই। অথচ, বয়সে বড়। তাই আমাদের ভাইদের ডাকতেন 'বাবাজি' বলে। ভদ্রলোকের মনটি অতি সরল, তাই সহজেই রেগে যেতেন। অফিসেও সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি হোত। সারাদিন খাটুনি খেটে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন, তারপর আমাদের মজলিসে যোগ দিতেন।

সেদিন তাঁর মন মেজাজ একটু বেশী রকমই খারাপ ছিল। খারাপ থাকার কারণও ঘটেছিল। সকালে স্নান করতে যাবার সময় দেখেন, গামছাটা নেই! দোতলায় ঘরের সামনে রেলিঙ-এ শুকোচ্ছিল। কোথায় চলে গেছে। বললেন—হাওয়ায় উড়তে পারে না। নিজে বেঁধে শুকোতে দিয়েছিলাম। বুঝলে বাবাজি, নিশ্চয় কেউ সরিয়েছে। কর্তার তো অবারিত দ্বার, যার খুশী সোজা উপরে উঠে যায়!

অগত্যা, অফিস থেকে ফেরবার পথে আবার একটা নতুন গামছা কিনে আনলেন। সেইটি কাঁধে ফেলে নীচে নেমে এসে, স্নান করতে যাচ্ছেন। যাবার পথে আমাদের ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়েই বললেন—বাবাজি, চুরি কি সাধে হয়! এই এখনি দেখে এলাম।

মেজদা বললেন—গামছা পেয়েছো নাকি?

তিনি জানালেন—নাঃ, গামছা আর পাচ্ছি কোথা? এটা ত নতুন কিনে আনলাম। কিন্তু চুরিটা হয় কেন, বেশ বোঝা গেল। এই এখনি নামছি, দেখি, কর্তার ঘরের সামনে বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে রেলিঙ ধরে একটা লোক দাঁড়িয়ে! ঠিক যেখান থেকে গামছাটা গিয়েছিল।

মেজদা মুচকে হেসে বললেন—আর তুমি চলে এলে তাকে অমনি রেখে? জিজ্ঞেস করলে না কেন, কি চাই? কাকে চাই?

আত্মীয়টি বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বললেন—তা কি আর করি নি? অমন গামছাটা সবে গেছে! আমি এগিয়ে তার কাছে গেলাম। দেখি, থামের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সোজাসুজি বলে দিলাম, কি করছ বাপু, অন্ধকারে এখানে? কারও সঙ্গে দেখা করতে হয় তো নীচে যাও—গিয়ে দাঁড়াও। এখানে এইভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ীতে সব জিনিস-পত্তর চুরি যাচ্ছে!

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে চললেন।

মেজদা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন—এই সব কথাই বলেছ নাকি?

আত্মীয়টি বাহাদুরি দেখিয়ে বললেন—নিশ্চয়। বেশ কড়া করেই বলেছি। লোকটা চুপ করেই রইলো। একটা কথাও বললো না, নড়লও না। আমার কিন্তু খুব সন্দেহ হয়, লোকটা চোরই! অন্ধকারে চেহারাটা ভাল করে না দেখতে পেলেও বেশ দেখলাম—একমুখ দাড়ি, ছোট একটা কাপড় পরা। এখুনি দরোয়ানটাকে ডেকে ওপরে পাঠিয়ে দাও! আবার কিছু না হারায়!

মেজদা এতক্ষণে হেসে উঠলেন। বললেন—তুমি খবর দেবার আগেই দরোয়ান ওপরে গেছে বাবাকে খবর দিতে—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এসেছেন! তা সে বুঝি আলো জ্বেলে তাঁকে ঘরে বসিয়ে যায় নি? কিন্তু তুমি কাণ্ডটা করেছ কি!

এই শুনেই তাঁর মুখ বিবর্ণ হ'ল। বললেন—অ্যাঁ! বলে কি? পি, সি, রায়! হাঁ, তাই তো এখন মনে হচ্ছে। রইলো আমার স্নান আহার। আমি পালালাম বাড়ী থেকে এখনই। কর্তা খেয়ে ওপরে উঠলে তবে ফিরব। কাল কি হবে বুঝছি না। তোমাদের বাড়ী বোধ হয় এবার ছাড়তে হলো বাবাজি!—বলেই আর কথাবার্তা নেই, সেই বেশেই বাড়ী থেকে পলায়ন। অনেক রাত্রে চুপি চুপি বাড়ী ফেরেন, সকলের খাওয়া-দাওয়ার পর।

অথচ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই নিয়ে কোন কথাই তোলেন নি বাবার কাছে। সে-কালের সব বিরাট পুরুষ! এই সকল সামান্য ঘটনা তাঁদের অসামান্য চিত্তবৃত্তিতে কোনই রেখাপাত করত না। তাই, মনে অভিমানও নেই, গৃহকর্তার কাছে অভিযোগও নেই।

এই গল্পটি পরে একদিন আমি শরৎচন্দ্রের কাছে বলি। তিনি শুনে হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টা কেমন ভাবে হয়েছিল, সেই গল্পটি বলি শোনো—

আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম। প্রফুল্লচন্দ্রও আমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। অথচ, উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের নিকট আমার সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমনি সময়ে একদিন একটি ছাত্র আমাকে এই খবরটি দেন। আমারও উৎসাহ হয়। দুজনে তখনি প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে চলি।

সার্কুলার রোডে সায়েন্স কলেজের ওপর তলায় একটি ঘরে প্রফুল্লচন্দ্র থাকতেন। সোজা তাঁর ঘরে দুজনে প্রবেশ করলাম।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছোট খাটের ওপর বিছানায় বসে কাজ করছিলেন।

আমি দেখি, শয্যার নিকটে দুখানি মাত্র চেয়ার,—বই ও কাগজপত্রে ভরে আছে। অন্যত্র বসবার স্থানও নেই। তাই এগিয়ে গিয়ে শয্যার একপাশে বসতে যাই।

সহসা ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হ'ল। প্রফুল্লচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—করো কি? করো কি? বিছানায় বসো না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গী ছাত্রটি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি আর একটা চেয়ার এনে দিল। আমি বসলাম।

প্রফুল্লচন্দ্র তখন আমার দিকে তাকিয়ে সহজভাবে প্রশ্ন করলেন—কি করা হচ্ছে এখন?

আমি বললাম—অল্প কিছু লেখবার চেষ্টা করছি।

প্রফুল্লচন্দ্র উৎসাহ দিয়ে বললেন—বেশ, বেশ। কাজ করে যাও। লেখো—চট্ করে কিছু ছাপাতে যেও না যেন।

স্পষ্ট বোঝা গেল, প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাত্র ভেবেছেন। তবুও আমি ভুল ভাঙালাম না। উপভোগ করতে লাগলাম। বিনীত ভাবে জানালাম—নাঃ, ছাপাবার মতো কিছু নয়। কিছু করার চেষ্টা করছি মাত্র।

কথাবার্তা ঐভাবেই চলল। ওদিকে ছাত্রটি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। উদ্বেগবশে প্রফুল্লচন্দ্রের নিকটে গিয়ে সে আমার পরিচয় প্রকাশ করল।

শোনা মাত্রই প্রফুল্লচন্দ্র চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে একবার ভাল ভাবে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বিছানা ছেড়ে ঘরের দরজার দিকে ক্ষিপ্রগতিতে চলে গেলেন। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে ঘরের বাইরে ছোটখাট ভীড় জমে উঠল। তখন সেই ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ঘরে আবার প্রবেশ করলেন। পুরোভাগে তিনি। যেন সেনাপতি সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসছেন। অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে দেখিয়ে সকলকে বললেন—দেখেছিস্, ওখানে বসে কে? শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঐ দেখ্, তাঁর সব বই রয়েছে আমার ঘরে। আর আজ নিজেও এসেছেন আমারই কাছে। দেখ্ দেখ্ ভাল করে। পায়ের ধুলো নে।

তারপর এগিয়ে এসে আমার কাছে বসলেন। একান্ত অন্তরঙ্গের মতন গল্প সুরু করলেন। বললেন—শরৎবাবু, আপনার বইগুলি পড়ে কতবার আপনার সঙ্গে আলাপ করার কথা মনে হয়েছে, আজ এতদিন পরে দেখা হোল।

বহুক্ষণ দুজনের গল্প চলল, আলাপ জমে উঠল। পরিচয়ের প্রারম্ভে ভুল বোঝার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দুঃখ প্রকাশের প্রশ্নও উঠল না। উভয়ের অন্তরে বিক্ষোভের ছায়ামাত্রও থাকল না।

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী-লেখক মনোরঞ্জন গুপ্ত, বেঙ্গল কেমিকেলের গ্রন্থাগারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যে সমস্ত কাগজপত্র আছে, তার মধ্যে তাঁর এক পাতা দিনলিপি পান। ঐ দিনলিপিতে প্রফুল্লচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে

একটি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সেই দিনলিপিটি বা শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্যটি এই :—

'ধন্য শরৎচন্দ্র! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কোথা হইতে অবতীর্ণ হইলে? বাস্তবিক তোমার মতো একজন লেখকের প্রয়োজন ছিল। সামাজিক ব্যাধি ও দুর্নীতি প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার জন্য তুমি যে তুলি ধরিয়াছ, তাহা অতুলনীয়। তুমি কখনও ধর্ম-মতের ইতর ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ কর না। অথচ কু-প্রথার উপর কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত নও। তোমার লেখা মর্মস্পর্শী; অন্তস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করে, চরিত্রগুলির সঙ্গে এক হইয়া যাই। তোমার আর এক বিশেষত্ব এই যে, তাদের সুখ-দুঃখ পাঠকেরই। অনায়াসলব্ধ কোন কষ্টকল্পনা নাই। দৈনন্দিন জীবন হইতে চরিত্রগুলি আহৃত। কিন্তু ভয়ে তোমার বই কাছে রাখি না—পাছে নেশা সম্বরণ করিতে না পারি।'

উমাপ্রসাদবাবুর কাছে বলা শরৎচন্দ্রের কাহিনীটিতে দেখছি—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন—'ঐ দেখ, তাঁর সব বই রয়েছে আমার ঘরে।

অথচ তাঁর দিনলিপিতে দেখছি, তিনি লিখেছিলেন—'ভয়ে তোমার বই কাছে রাখি না। পাছে নেশা সম্বরণ করিতে না পারি।'

শুনেছি, শরৎচন্দ্রের বই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এক সময় সত্যই নেশার মতই ধরেছিলেন। বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য সদা চিন্তামগ্ন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঐ সময় প্রতিদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে শরৎচন্দ্রের 'পল্লী-সমাজে' জ্যাঠাইমা যেখানে রমেশকে গ্রাম না ছেড়ে যাবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, সেই জায়গাটা পড়ে তবে শুতেন।]

ভাগ্যলিপি

শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ীতে বাস করবার সময় প্রতিদিন বিকালে তাঁর দিদি অনিলা দেবীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে, রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত গল্প-গুজব করে বাড়ী ফিরতেন। এই গল্পের আসরে মেয়ে-পুরুষ সকলের ছিল অবাধ গতি।

সেদিনও আসরে অনেকে এসে জমেছেন। কি একটা কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র মানুষের ভাগ্যের কথা তুললেন। বললেন—যার ভাগ্যে যা আছে, তা হবেই। কারো সাধ্য নেই, ললাটের সে লিখন খণ্ডায়।

এক ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে বললেন—ভাগ্যের লেখা আবার কি? মানুষ তার চেষ্টা, অধ্যবসায় আর কর্ম দিয়েই তার ভাগ্য গড়ে তুলবে। আপনার ও-কথা আমি মানতে পারলাম না, শরৎদা!

শরৎচন্দ্র বললেন—কিন্তু একজন হয়তো শত চেষ্টা করেও সারাজীবনে কিছু করতে পারে না। আর একজন দেখবে বিনা চেষ্টাতেই বাজীমাৎ করে বসে আছে, তার বেলা কি? একে ভাগ্য ছাড়া আর কি বলবো বলো দেখি। যদি বলো হতভাগার চেষ্টার মধ্যে কোথাও গলদ থেকে যাচ্ছে, তাই সে কৃতকার্য হতে পারছে না—এ-ও ঠিক কথা হ'ল না। এ বিষয়ে একটি গল্প মনে আসছে, বলি শোন—

শিব আর দুর্গা একবার মর্ত-ভ্রমণে এলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে গিয়ে দেখেন, অদূরে এক কুটীরে এক ভিখারী বামুন, তার স্ত্রী আর তাদের একটি ছেলে—তিনজনেই শুকনো মুখে চুপটি করে বসে আছে।

দেবতারা অন্তর্ধামী তা তো জানোই। দুর্গা দেখলেন, এদের কারোরই আজ সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি। রোজকার মতো সকালে তিনজনে তারা তিন দিকে ভিক্ষেয় বেরিয়েছিল, কিন্তু কিছুই মেলে নি শেষ পর্যন্ত। আর ঘরেও তেমন কিছু নেই যে খাবে।

দেখে মা দুর্গার মনে বড় দয়া হ'ল। শিবকে বললেন—দেখেছ,

বেচারাদের কি দুরবস্থা! যেদিন ভিক্ষেয় কিছু জুটে, সেদিন খায়, আর যেদিন জুটে না, সেদিন উপোস! তুমি কতজনকে কত কৃপা কর—এদের দুঃখ দেখে কি তোমার দয়া হচ্ছে না? তুমি বড় নিষ্ঠুর।

শিব বললেন—দুর্গে, কি করবো বলো। আমার এতে কোন হাত নেই। এদের ভাগ্যে যে দুঃখ আছে, আমি হাজার কৃপা করলেও তা ঘুচবে না। যা হবার তা হবেই।

দুর্গা বললেন—তোমার ঐ যত সব বাজে কথা! তুমি মহা দেবতা, তোমার অসাধ্য হেন কাজ নেই। তুমি ইচ্ছা করলে কি আর এদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পার না? দেবে না তাই বলো!

শিব শুনে হাসলেন। বললেন—তুমিও তো দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী! তোমারই বা অসাধ্য কি? ইচ্ছে করলে তুমিও তো পার ওদের দুঃখ ঘুচাতে। তুমিই একটা বর-টর দিয়ে ওদের দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা করে দেখ না কেন? দেখ না কিছু পার কিনা! আমার কিন্তু মনে হয় বৃথা চেষ্টা, ওদের বরাত ফেরানো অসম্ভব!

বেশ দেখা যাক্—বলে দুর্গা এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণের কুটিরে উপস্থিত হলেন। শিব এক বটগাছের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

বৃদ্ধার বেশে দুর্গা ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন—ঠাকুর, আমি কিছু কিছু তুকতাক্ জানি। তোমাদের এই অবস্থা দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। এক কাজ কর, তোমাদের তিনজনকে আমি তিনটি বর দিচ্ছি। ঠিক ঠিক যা বলি তাই যদি কর, তোমাদের আর কষ্ট থাকবে না।

বৃদ্ধার কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললে—তুমি নিজে দেখছি বাছা নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে, তুমি আবার আমাদের দুঃখ ঘুচাবে কি করে! নাও, নিজের পথ দেখ।

কিন্তু দুর্গা নাছোড়বান্দা। অনেক বলা-কওয়ার পর ব্রাহ্মণ বললে—আচ্ছা বলো কি করতে হবে? দেখাই যাক কি হয়।

কাছেই একটা পুকুর ছিল। দুর্গা সেই পুকুর দেখিয়ে বললেন—ঐ পুকুরে তোমাদের তিনজনকে একে একে ডুব দিতে হবে। ডুব দিয়ে যে যা কামনা করবে, মাথা তুলে দেখবে সে তা-ই পেয়েছে।

ব্রাহ্মণ বললে—সত্যি বলছ?

দুর্গা বললেন—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। ঐ পুকুরে ডুব দিয়ে একবার পরখ করে দেখ না।—বলে দুর্গা বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।

দুর্গার এই বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার ফলে ব্রাহ্মণের কেমন বিশ্বাস হ'ল। তখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণপুত্র তিনজনে ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলে ভাবতে বসে গেল কে কি চাইবে। অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর ব্রাহ্মণ ঠিক করলে—আমি রাজা হব। ঐশ্বর্যই যদি পেতে হয় তো সে রাজৈশ্বর্য। এর চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর পৃথিবীতে নেই।

ব্রাহ্মণপুত্র বললে—বাবা যদি রাজা হন, তাহলে আমি কেন সেনাপতি হই না? বাবার রাজত্ব তো রক্ষা করতে হবে!

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বললে—তুমি রাজা আর তোমার ছেলে তো সেনাপতি হবে ঠিক করলে। এখন আমি কি হই বলে দাও!

—তুমি? তুমি এক কাজ কর—চিন্তা করে ব্রাহ্মণ বললে—তুমি হও অপূর্ব রূপসী এক যুবতী। আমি যখন এত বড় একটা রাজা হতে চলেছি, তখন আমার উপযুক্ত পাটরাণীও তো একটি চাই!

দেখতে শুনতে ব্রাহ্মণীটি আদৌ ভাল ছিল না! সুন্দরী যুবতী হওয়ার লোভে সে তো মহা খুশী।

তিনজনেই জটলা করতে করতে পুকুরঘাটে এল।

ব্রাহ্মণের আদেশে প্রথমেই জলে নামল ব্রাহ্মণী। সে ডুব দিয়ে মাথা তুলতেই ব্রাহ্মণ তো একেবারে হতভম্ব! আরে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে এই লাবণ্যময়ী রমণীটি কে? একি সত্যিই আমার ব্রাহ্মণী! আহা, কি চোখ, কি নাক, কি মুখশ্রী! এ যে পটের পরীকেও হার মানায়!

এমনি সময়ে ঘটলো কি জানো? ঠিক ঐ সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে রাজ্যের নবাবসাহেব। সঙ্গে বান্দা, সওয়ার, পাইক, বরকন্দাজ। খোলা তাঞ্জামে চড়ে বায়ুসেবনে বেরিয়েছেন নবাবসাহেব।

হঠাৎ পুকুরপাড়ে চোখ পড়াতে তাঁর তো আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দুই ভিখিরী—তাদের সঙ্গে কে এই সিক্ত-বসনা সুন্দরী? এ যে তামাম

দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী হওয়ার উপযুক্ত! কি করছে সে এখানে, দুটো ভিখিরীর সঙ্গে

নবাব হাঁকলেন—রোখ্‌কে তাঞ্জাম।

বরকন্দাজকে কি ইঙ্গিত করলেন। সে সোজা গিয়ে ব্রাহ্মণীকে তাঞ্জামে আরোহণের আদেশ জানালো। ব্রাহ্মণী তো আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল।

ব্রাহ্মণের হতভম্ব ভাবটা তখনো ঠিক কাটে নি, তার ওপরে অকস্মাৎ এই খিলজীর আক্রমণ—এতটা সে আশা করে নি। সে পৈতে আঙুলে জড়িয়ে রুখে দাঁড়াল। চোখ রাঙিয়ে বললে—সাবধান! এ আমার স্ত্রী।

জবাবে বরকন্দাজ তাকে ধমকে উঠল। দুঃখের বিষয়, শুধু বিশেষ রকম উর্দু প্রয়োগে সে ক্ষান্ত হল না—বেচারা ব্রাহ্মণকে সে এমন এক বিরাশী নম্বর লাগালো যে, সে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।

চেতনালাভের পর ব্রাহ্মণ দেখলে ভোজবাজীর মতো সবই যেন উবে গেছে। সামনে তার এক ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। কোথায় নবাবের সেই বিরাট বাহিনী, আর কোথায় বা তার ব্রাহ্মণী! তখন তার অবস্থা হ'ল, ঠিক যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ব্রাহ্মণ প্রথমে ভাবলে—তাড়াতাড়ি নিজেকে সে রাজা বানিয়ে নেবে, ছেলেও সেনাপতি হবে। তারপর নবাবের সঙ্গে লড়াই করে ব্রাহ্মণীকে সে উদ্ধার করবে।

আবার ভাবলে, যুদ্ধ-টুদ্ধ—সে তো মহা হাঙ্গামার ব্যাপার! প্রচণ্ড রক্তাক্ত পরিশ্রমের পর, তবে ইষ্টসিদ্ধি। আর যুদ্ধে সে যে জিতবেই তাই বা কে জানে! না জেতা পর্যন্ত ব্রাহ্মণী তো নবাবের কবলেই থাকবে।

নাঃ, যুদ্ধের মতলব সে মন থেকে বাতিল করে দিলে।

উপযুক্ত উপায়ের অন্বেষণে ব্রাহ্মণ অস্থির হয়ে উঠল। সে ভাবলে—ব্রাহ্মণীকে আমি যখন হারিয়েছি, তখন ঐ বেটা নবাবও তাকে যাতে না ছুঁতে পারে তারই ব্যবস্থা করি। এমন সময় হঠাৎ তার মাথায় আশ্চর্য এক বুদ্ধি খেলে গেল। তার মনে পড়ল, শূকর মুসলমানের অস্পৃশ্য। ডুব দিয়ে তাই সে বর চাইল—ব্রাহ্মণী শূকরী হয়ে যাক।

ওদিকে—তাঞ্জামে নবাবের পাশে বসে ব্রাহ্মণী তো কাঁদছে। আতরমাখা

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নবাব তাকে কত বোঝাচ্ছেন—সুন্দরী, কেন কাঁদছ তুমি? তোমার দুঃখ কিসের? তুমি নিশাতবাগের গোলাপ, তোমাকে কি ঐ মর্কটের গলায় মানায়! তুমি আমার হারেম আলো করবে এস। তোমাকে আমি কোহিনূর করে রাখব। তুমি হবে আমার পাটবেগম, আমি হব তোমার গোলাম।

ব্রাহ্মণী আরো কাঁদে। নবাব তাকে নিজের গলার মুক্তোর মালা পরিয়ে দিতে চাইলেন। হাত ধরে কাছে টানতে যাবেন, হঠাৎ চমকে গেলেন। আঁতকে উঠে বললেন—ইয়া আল্লা! তোবা! তোবা!

দেখলেন, সে সুন্দরী আর নেই—তার বদলে কোলের কাছে কদাকার এক শূকরী!

নবাব আবার হাঁকলেন—রোখ্‌কে তাঞ্জাম।

একলাফে শূকরী সড়কে নামল। তারপর ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে করতে ছুটে গেল তার স্বামী, আর ছেলে যেখানে ছিল সেইখানে।

ব্রাহ্মণীকে এই অবস্থায় দেখে ব্রাহ্মণের, আর তার ছেলের মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ! শোকে তারা প্রায় পাগল হয়ে যাবার সামিল। ব্রাহ্মণ কপাল চাপড়াতে লাগল। ব্রাহ্মণীও কেঁদে কেঁদে তাদের চারপাশে ঘুরতে লাগল।

শোকাবেগ একটু কমলে ব্রাহ্মণের খেয়াল হ'ল—তাই তো, তার ছেলের যে এখনো বর চাওয়া বাকি! সে নিজে যখন রাজা আর ব্রাহ্মণী যখন রাণী হতে পারে নি, তখন ছেলের আর সেনাপতি হয়ে কি লাভ? বরং পুকুরে ডুব দিয়ে সে এখুনি তার মায়ের পূর্ব অবস্থাই ফিরে চাইলে, তাতেই মহা মঙ্গলের কাজ হবে, পুত্রের কর্তব্যও করা হবে।

বলা বাহুল্য, ছেলেও এই শুনে সানন্দে রাজী হ'ল। সে ডুব দিয়ে তার মায়ের আসল অবস্থা ফিরে চাইল।

চোখের নিমেষে শূকরী, ব্রাহ্মণী হয়ে তার স্বামীকে প্রণাম করলে। তারপর ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। ব্রাহ্মণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আঃ, বাঁচলাম, কি ফ্যাসাদেই না পড়া গিয়েছিল! দুর্গা! দুর্গা!

এদিকে শিব দুর্গাকে বললেন—দেখলে তো নিজের চোখে, ভাগ্যলিপি কেউ বদলাতে পারে না! এমন কি স্বয়ং ভগবতীও না—

দুর্গার মন প্রসন্ন ছিল না। তিনি বললেন—নাও, নাও, আর বকতে হবে না। এখন চল, ফিরে যাই কৈলাসে।

মৌখিক অভিভাষণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোক-সভায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। তাঁর মৃত্যুর পর, তখন কলকাতার সাহিত্যিকরা তাঁর জন্য যে শোকসভা করেছিলেন, সেই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেদিন সভায় শরৎচন্দ্র যে মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে সেই সভার অন্যতম গায়ক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে লিখেছেন—

"সত্যেন্দ্র-শোকসভায় কবি নজরুল ইসলাম ও আমি গান গাইবার জন্যে আহুত হয়েছিলাম। নজরুলের ছিল সূচনা সঙ্গীত, সমাপ্তি সঙ্গীতটি আমার।

শরৎচন্দ্র এসে সভাপতির আসনে উপবেশন করলেন।

সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সভার কর্মসূচী রাখা ছিল। তিনি সেখানি তুলে নিয়ে বললেন—নজরুল গাও হে!

কবি নজরুল গান গেয়ে সভার উদ্বোধন করলেন। তারপর সভাপতি কয়েকজন পূর্বনির্দিষ্ট বক্তাকে বক্তৃতা করবার জন্য আহ্বান করলেন। প্রথমেই বক্তৃতা করলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে। তারপর আরও নানাজনে সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানাকথা বললেন। বলা বাহুল্য বক্তারা প্রায় সকলেই তাঁদের শোকোচ্ছ্বসিত ভাষণে সভামণ্ডপটিকে প্রকম্পিত করে তুললেন।

এইবার সভাপতির অভিভাষণ। শরৎচন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। বক্তৃতা করলেন এমনভাবে যেন তাঁর বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে পাশের লোকটির সঙ্গে কথা কইছেন। সভার গাম্ভীর্য তো তিনি রক্ষা করলেনই না, বরং বক্রোক্তি করলেন দর্শক ও বক্তাদের প্রতি। সভাপতি যে ভাষণটি দিলেন, তার অনেকটা এইরূপ :—

আজ আপনারা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে এখানে এসেছেন—ভালোই করেছেন। বড় মানুষরা মারা গেলে পাঁচজনে মিলে সভায় গিয়ে শোক প্রকাশ করে, আপনারাও করছেন। বেশ করেছেন।

সত্যেনবাবু প্রতিভাবান কবি ছিলেন, তাঁর উপর সকলের শ্রদ্ধা থাকবারই কথা—তাঁর অভাবে দুঃখ হবারই তো কথা। আমাদের বারজন ইয়ারের* তিনি একজন ছিলেন, আমরা তাঁর অভাব বোধ করছি। সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানান হয় তাঁর গ্রন্থপাঠের ভিতর দিয়ে। সত্যেনবাবুর বই যদি আপনারা কিনে পড়ে থাকেন, তাহলে জীবিতকালেই তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানান হয়েছে। সত্যেনবাবুর লেখা পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তিনি কত বড় কবি ছিলেন। মন্মথবাবু অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন, তিনিও হয়তো পড়ে থাকবেন। আরও অনেকে সত্যেনবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। ভালই বললেন। নজরুল গানটি গাইলে। ভালই গাইলে। নলিনী এবার তুমি গাও হে! ভালই হবে।

এই ভাষণটি দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর আসনটিতে বসে পড়লেন।"

ঐ 'সত্যেন্দ্র-শোকসভার' অন্যতম উদ্যোক্তা অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, ঐ সভায় শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি সম্বন্ধে তাঁর 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা' বইয়ে লিখেছেন—

"এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কোন সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করা শরৎচন্দ্রের এই প্রথম। এই কারণেই সেদিন সভা উপলক্ষে যে লোক সমাগম হয়েছিল, তাতে সভার কাজ যে পরিচালনা করা যাবে, এমন আশা এক রকম ছিল না। যাই হোক, অতি কষ্টে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে শরৎচন্দ্রকে ফটক থেকে উপরে সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একে তো শরৎচন্দ্র লাজুক মানুষ, তার উপর এই বিপুল জনতার ব্যূহ ভেদ করে দ্বিতলে এসে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সুখের বিষয়, সভার কার্য আরম্ভ হতে স্তব্ধতা বিরাজ করেছিল এবং সুশৃঙ্খলভাবে সভার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু যিনি সভাপতি—যাঁর জন্য এই বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছিল, তিনি যে ভাষণ দিলেন তা বড় কৌতুকপ্রদ। তাঁকে প্রায় দুদিক থেকে ধরে যখন সভাপতির ভাষণ দিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল, তিনি বললেন—

আপনারা এখানে সত্যেন্দ্রর জন্যে চোখে জল ফেললে কি হবে। তার বই পড়বেন, তবেই তার স্মৃতি বজায় থাকবে।

এই বলেই তিনি বসে পড়লেন। আমার বেশ মনে আছে, কবি শশাঙ্ক

মোহন সেন তাঁকে কৌতুক করে বলেছিলেন—শরৎবাবু, আপনার ভাষণই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। এটা তৈরি করতে আপনার ক'দিন লেগেছে?

শরৎচন্দ্র হেসে জবাব দেন, আমাকে জোর করে সভাপতি করার এই ফল—আমার কোন দোষ নেই।"

শরৎচন্দ্র ১৩৪২ সালে কোন্নগর পাঠচক্রের এক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেদিন তিনি ঐ সভায় প্রসঙ্গক্রমে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোক সভায় যে কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ করে বলেছিলেন—

"পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদছেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি। সেদিন বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন, কিন্তু জানেন কি যে, বারো বছরে তাঁর পাঁচ শ' খানা বই বিক্রি হয় নি। অনেকে বোধ করি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ, আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোক-সভায় উপস্থিত দুজনের লেখা থেকে এবং পরবর্তীকালে অন্য এক সভায় শরৎচন্দ্রের নিজের উক্তি থেকে, শরৎচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথের শোক-সভায় যা বলেছিলেন, এখন তার সমস্তটার একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।

[* মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যখন 'ভারতীর' সম্পাদক ছিলেন, সেই সময় তাঁরা ভারতীতে একটি বারোয়ারি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। বার মাসে বারটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন বারজন সাহিত্যিক। এই বারজন সাহিত্যিক হলেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই জন্যই শরৎচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথকে 'আমাদের বার ইয়ারের তিনি একজন ছিলেন' বলেছেন।]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখায়

শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য' নামে শরৎচন্দ্রের একটি মৌখিক অভিভাষণ মুদ্রিত হয়েছে। ঐ লেখাটির পাদটীকায় লেখা আছে—'১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।' সেই বক্তৃতার সারাংশটি এই—

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য

আমি বক্তা নই। কিছু বলতে আমি আদপেই পারি নে। ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি একমত ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্য-সেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে করতে পারচি নে। আমার নিজের কথা ছাড়াও সমস্ত দেশের সাহিত্যে কত অসত্য, কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে। সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ, সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়। তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিস দেবার যো নেই।

ইউরোপের কথা ধরুন, ওদের চার্চ আছে, নেভি আছে, আর্মি আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার যো নেই, ওদিক যাবার যো নেই, কোনদিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে। তারই মধ্যে যে একটু আধটু পাবে, সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

সাহিত্য স্বাধীনতার মানে অরাজকতা, এ নাকি নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাই নে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক

আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত বাঁধা, পা গুটানো আর থাকবে না, সেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্য-সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখা যে সভায় শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন একব্যক্তি হীরালাল দাশগুপ্ত সেই সভায় শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি সম্বন্ধে লিখেছেন—

"তখন স্বরাজ্য-পার্টি গঠিত হয়েছে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটা বিশেষ অধিবেশনে দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎবাবুও বরিশালে এসেছেন।···বক্তৃতা দিয়েছিলেন বরিশালের সাহিত্য পরিষৎ শাখায়। ওখানে শরৎবাবুর জন্য একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কিরণশঙ্কর, সুভাষবাবু, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ওখানে উপস্থিত ছিলেন।

শরৎবাবু অভ্যর্থনার জবাবে বললেন—

বড় সাহিত্যের জন্য দেশের তাগিদ আছে। লিখতে পারি কই! না আছে সামাজিক পরিস্থিতি, না আছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একটি বামুনের মেয়ে হ'ল ত কায়েতের ছেলের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া চলবে না। সমাজ আমার টুঁটি টিপে ধরবে। এদিকে রাজনৈতিক বিভীষিকা এমনি যে, সত্যি কথা প্রকাশ করা চলবে না। গলাধাক্কা খেতে হবে গভর্ণমেণ্টের। আপনারা আশীর্বাদ করুন সেই সুদিন আসবে। পরিস্থিতি অনুকূল হবে। তখন সত্যিকার বড় সাহিত্য সৃষ্টি হবে। তথাপি এত অসুবিধা নিগ্রহের ভয় সত্ত্বেও ত লিখছি। তা মন্দ লিখি নি। ভালই হয়েছে।

তুমুল হাস্যধ্বনি শরৎবাবুকে পুরস্কৃত করল।"—শারদীয়া দৈনিক বসুমতী, ১৩৬০।

এখানে হীরালালবাবুর লেখা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, কি উপলক্ষে শরৎচন্দ্র বরিশালে গিয়েছিলেন এবং আরও জানা গেল যে, সেই সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কে কে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্য সভায়

এই গ্রন্থের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটি আলোচনা আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা সেদিন তাঁদের কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্য সভার বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র প্রথমে নানা কথা বলে অরাজী হলেও, ছাত্রদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সভাপতি হতে রাজী হয়েছিলেন।

সেদিনের ঐ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদলের মধ্যে একজন ছিলেন চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। চারুবাবু বর্তমানে 'জরাসন্ধ' ছদ্মনামে একজন খ্যাতনামা লেখক।

সেদিনের কথা-প্রসঙ্গে চারুবাবু বলেন—

শরৎচন্দ্র শেষে বললেন—যাবো তো, কিন্তু কি বলতে হবে আমাকে?

আমরা বললাম—আপনার যা খুশী।

তিনি বললেন—বেশী ভীড়-টিড় হবে না তো?

আমি বললাম—ভীড় তেমন হবে না। শুধু তো আমরাই থাকব।

—আচ্ছা দাঁড়াও, তোমাদের মিটিং-এর তারিখটা টুকে রাখি।—এই বলে তিনি দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের গায়ে আমাদের নির্দিষ্ট দিনটি চিহ্নিত করে রাখলেন।

কিন্তু কার্যকালে এই ক্যালেণ্ডারের চিহ্ন আমাদের কোন কাজেই লাগে নি। কারণ আমরা সভার দিন স্থির করে, যখন নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করছি, সেই সময় বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য একদিন তাঁর বাড়ীতে যাই।

আমরা যাওয়া মাত্রই তিনি সরাসরি 'না' বলে বসলেন।

প্রতিশ্রুতির যে একটা মূল্য থাকা দরকার, তাও তিনি মেনে নিতে চাইলেন না। আমাদের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। আমরা রীতিমত মরিয়া হয়ে উঠলাম। প্রথমে অনুনয়-বিনয়, পরে আবেদন-নিবেদন এবং শেষ পর্যন্ত 'বিক্ষোভ প্রদর্শন' করে তবে জয়লাভ করা গেল।

নির্দিষ্ট দিনেও কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে কোন রকমে তাঁকে ধরে আনতে পেরেছিলাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্স থিয়েটারে সভা হয়েছিল। সভায় এত লোক হয়েছিল যে, তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ঝুল বারান্দাগুলো লোকের ভীড়ে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছিল।

সভার সকলেই যখন শরৎচন্দ্রের আগমনের আশায় উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, সেই সময় আমরা কয়েকজন শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে পিছনের ভীড় ঠেলে লম্বা টেবিলের পাশে এনে তাঁকে দাঁড় করাই।

শরৎচন্দ্র সভায় লোক সমাবেশ দেখে আমার শার্টের পাশটা ধরে আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন—এ করেছ কি? এত লোক!

চারুবাবু বলেন—শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে, আমি তখনই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ে গা ঢাকা দিই।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐ সময়কার আর একজন ছাত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক) সেদিনের সভা সম্বন্ধে লিখেছেন—ছাত্র ও অধ্যাপকে সেদিন ফিজিক্স থিয়েটার নামে বড় হলটিতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এবং শরৎচন্দ্র এসেছেন এই খবরটা বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় কলেজের সামনে রাস্তার উপরও লোকের খুব ভীড় হয়েছিল।—(রামধনু, ফাল্গুন ১৩৪৪)

শরৎচন্দ্র সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্য সভার বার্ষিক সম্মেলনে যে মৌখিক অভিভাষণটি দিয়েছিলেন, সেই অভিভাষণটি প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন ছাত্র সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়েছিলেন। সুশীলবাবুর সেই লেখাটি প্রেসিডেন্সী কলেজের তখনকার ম্যাগাজিনে (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) প্রকাশিত হয়েছিল। সভাটি হয়েছিল ৩০শে আগস্ট তারিখে।

শরৎচন্দ্রের সেদিনকার সেই অভিভাষণটি ছিল এই:—

"আমাকে আপনারা আজ এখানে আহ্বান করে পরম গৌরব দান করেছেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগে রবিবাবু এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

সেজন্ত সংকোচ বোধ করছি। আমি লিখে থাকি, কিন্তু বলতে আমি পারি না—সকলে সব কাজ পারে না। আমি কতকগুলি বই লিখেছি; কিন্তু বক্তৃতা আমার কাছে বেশী প্রত্যাশা করবেন না।

আমি সাহিত্যিক—কাজে কাজেই সাহিত্যের বিষয় বলাই আমার স্বাভাবিক। রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বাঙ্গলা সাহিত্য কেমন করে বড় হয়ে উঠল, সে ইতিহাস আমি ঠিক জানি না। দীনেশবাবু (দীনেশচন্দ্র সেন) সে বিষয়ে ঠিক বলতে পারবেন।

আজ দশ বৎসর পূর্বে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়াই। 'যমুনা' বলে একটা কাগজ ছিল। তার গ্রাহক সংখ্যা মোটে বত্রিশ—কেউ তাতে লেখে না। আমি তখন বর্মা থেকে এখানে এসেছিলাম। সম্পাদক বললেন—কেউ লেখা দিতে চায় না, তোমাকে লিখতে হবে। (কেউ লেখা দিতে চায় না বলে আমায় লিখতে হবে, সেটা আমার পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়।)

বললুম—ছেলেবেলায় লিখেছি বটে, কিন্তু তার পরে তো লিখি নি।

সম্পাদক বললেন—তাতেই হবে।

তারপর বর্মা ফিরে গেলুম। ক্রমাগত টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পেয়ে লিখতে হলো। সেই থেকে এই দশ বছরে এই বইগুলো লিখেছি। কিন্তু আগেই বলেছি—সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ জানি না। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য যাকে বলা হয় তা যখন রচনা করছি, তখন জানি না বললে, সেটা বোধ হয় অতিরিক্ত বিনয় হয়ে পড়বে। যদি কিছু অপ্রিয় সত্য বলে ফেলি তাহলে ক্ষমা করবেন।

আমি প্রথমেই দেখলুম—ছোট ছোট গল্প বড় দরকার। রবিবাবু আগে লিখে গেছেন, তারপর আর তেমন কেউ লেখেন নি। আমি লিখতে লাগলুম।

সম্পাদক বললেন—দেখ, প্রেম-ট্রেম না। ও একেবারে পুরোণো হয়ে গেছে। দুর্নীতি না থাকে এমন সব ভাল গল্প লেখ।

লিখলেম।(১)

তাঁরা বললেন—ভাল হয়েছে।

ক্রমশঃ সাহিত্যের মধ্যে যখন আসতে লাগলুম, দেখলুম—দুর্নীতি প্রচার করো না, প্রেমের গল্প লিখো না, এ করো না, ও করো না—এ সব বললে তো

চলবে না! তখন 'চরিত্রহীন' সুরু করি। সে বইটা বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। যখন লিখি তখন—মেসের ছাত্রদের চরিত্র থাকল না, দেশ দুর্নীতিতে ডুবে গেল, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হলো না প্রভৃতি অনেক গালাগালিই শুনতে হয়েছে। কিন্তু বর্মা চলে গেলুম—গালি ততদূর গিয়ে পৌছল না।

ভাবলুম—ভয়ে লিখবো না, সে তো ঠিক নয়। কেন না সব জিনিসই বদলায়। আজ যা সত্য, দশ বৎসর পরে তা আর সত্য থাকবে না। আজ যা অসত্য, আজ যা অন্যায়, হয়তো একশো বছর পরে তার স্বরূপ বদলাবে। যারা লেখক, তারা যদি পঞ্চাশ বছর, একশো বছরের কথা এগিয়ে কল্পনা করতে না পারে, তবে চলে না। আজ যাঁদের মনে হচ্ছে—লোক বিগড়ে যাবে, তখন তাঁদেরই আর সে কথা মনে হবে না। মানুষের 'আইডিয়া' ক্রমেই বদলে যাচ্ছে।

সাহিত্য সৃষ্টির কাজে দুই রকম লোক আছে। অনেকে লিখছেন না; কাজ করে যাচ্ছেন—জানছেন না—তাঁদের আমাদের মত সাহিত্য ব্যবসায়ীকে আঁকবার চরিত্র যোগাচ্ছে। আমরা আর একদল লিখি—এই সব চরিত্র সৃষ্টি করি। এ ছাড়াও আর একদল আছেন, যাঁরা শুধু যাচাই করেন। আমরা সমাজের বাইরে যাচ্ছি কিনা, দুর্নীতি প্রচার করছি কিনা—এই সব দেখেন।

রবিবাবু সেদিন বললেন—ও স্কুল মাস্টারের দল আমরা মানবো না। ওদের বিধিনিষেধ ঠেলে যা খুশী করব।

আমার কিন্তু মনে হয়—এ কথা বলা যায় না। তাঁদেরও চাই। তাঁদেরও বলবার 'রাইট' আছে। আমরা সকলে মিলেই ভাষাকে পর পর গঠিত করে যাচ্ছি।

আমি সেদিনও বলেছি(২) যে, আজকাল একটা রব উঠেছে—বঙ্কিমবাবুকে কেউ মানে না, তাঁর ভাষা লেখে না। আমার মতে বঙ্কিমবাবুর কাজ হয়ে গেছে, তাঁর ভাষাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে; তাঁর 'আইডিয়া'কে ছাড়িয়ে যেতে হবে। আমার বোধ হয়—তাঁর অনেক চরিত্রেই খুঁত আছে। অনেক চরিত্রে সামঞ্জস্য নেই। এইটা করা দরকার, এইটা মন্দ—এইভাবেই তিনি লিখে গেছেন।(৩) যাকে ভাল করেছেন—তাকে ভালই করেছেন; আর যাকে মন্দ করেছেন—তাকে মন্দই করেছেন। তার বেশী তিনি এগুতে পারেন নি। হয়তো দরকার হয় নি, কিংবা সমাজের মান রেখে বলতে পারেন নি, কিংবা

ফলাফল ভেবে বলেন নি—বলতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে তো আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু, এখন মনে হয়—চরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর অনেক ভুল আছে। আজকালকার দিক দিয়ে দেখলে—এখানে থেমে থাকা চলে না। সত্য কথা বলতে হয়।

সম্পাদক মহাশয় বললেন, আমি সত্য কথা সোজা করে বলবার চেষ্টা করেছি। বাস্তবিকই আমি দেখেছি—এ জিনিসটা দরকার। তাই এতে আমি কুণ্ঠা করি না। সাহিত্য গড়বার শক্তি হয়তো আমার নেই। কিন্তু গোটা কয়েক সত্য কথা বলবার চেষ্টা করেছি। অনেক রকম লোকের সঙ্গে মিশে যা দেখেছি শুনেছি—তাই লিখে যাচ্ছি, আমি তা বলতে ভয় করি না। কারণ আগেই বলেছি—একশো বছর পরে হয়তো মনে হবে এই সত্য, এ সব বোধ হয় কারো বলবার দরকার ছিল।

নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলেছি। সেটা দেখতে তেমন ভাল দেখায় না। আমি যা বলছিলাম, তাই বলব। আজকাল একটা তর্ক উঠেছে—আমরা দুর্নীতি প্রচার করছি। যা খারাপ, মন্দ তাই সব লিখছি। রবিবাবুও অনেক গালমন্দ খেয়েছেন। আমি তাঁর শিষ্য, আমিও বড় কম খাই নি। কেবল যুবক সম্প্রদায়ই বোধ হয় আমার পৃষ্ঠপোষক। যাঁরা আমার বয়সী কিংবা আমার চেয়ে প্রবীণ, তাঁরা রব তুলেছেন, আমি ক্ষতি করছি। আমি এমন জিনিস এনেছি, যা আগে ছিল না, যা নাকি অত্যন্ত নোংরা। অবশ্য আমি মনে করি না যে, সব সত্যই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। অনেক কুৎসিত ব্যাপার আছে, যাতে সাহিত্য হয় না। এ আমি বললুম, কারণ, এ নইলে অনেকে আমাকে ঠিক বুঝবেন না। কিন্তু আমি যে জিনিসটা দেবার চেষ্টা করেছি, সেটা ক্রমাগত সমাজের মধ্যে এসে পড়েছে, আমাদের চোখের উপর চলছে—সে সমাজের অঙ্গ, তাকে কুৎসিত বলে অস্বীকার করলে চলবে না। তাকে সাহিত্যে স্থান দিতে হবে।

আমি পাপীর চিত্র এঁকেছি। হয়তো পাপ তাঁরা করেছেন। তাই বলে খুনী আসামীর মত তাঁদের ফাঁসি দিতে হবে নাকি? মানুষের আত্মার আমি অপমান করতে কখনও পারি না। কোন মানুষকেই নিছক কালো মনে করতে আমার ব্যথা লাগে। আমি ভাবতে পারি নে যে একটা মানুষ একেবারে মন্দ, তার কোন 'রিডীমিং ফিচার' নেই। ভাল মন্দ দুই-ই সবার

মধ্যে আছে, তবে হয়তো মন্দটা কারো মধ্যে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঘৃণা তাকে কেন করবো? অবিশ্যি আমি কখনো বলি না যে পাপ ভাল। পাপের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই না। আমি বলি, তাঁদের মধ্যেও তো ভগবানের দেওয়া মানুষের আত্মা রয়েছে। তাকে অপমান করবার আমাদের কোন অধিকার নাই।

আমি এমন জিনিস অনেক সময় তাঁদের মধ্যে দেখেছি, যা বড় সমাজের মধ্যে নেই। মহত্ব জিনিসটা কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে না। তাকে সন্ধান করে খুঁজে নিতে হয়। মানুষ যখন মহত্বের সন্ধান করতে ভুলে যাবে, তখন সে নিজেকে ছোট করে আনবে। আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে যা ভাল, দেখাতে চেয়েছি; কারণ তাকে 'ডিস্‌কার্ড' করবার আমাদের 'রাইট' নেই। যেখানে বড় জিনিস আছে, তাকে সম্মান করতে হবে। জ্ঞান যদি প্রয়োজনীয় হয়, খারাপ জিনিসের মধ্যেও তাকে খুঁজতে হবে—ক্ষতির ভয় থাকলেও খুঁজতে হবে। তাছাড়া জানতে গেলেই যে আকৃষ্ট হতে হবে, তার মানে আছে?

আমি মনে করি, মানুষকে এ কথা বোঝানো দরকার যে খারাপের মধ্যেও মহত্বকে মনে মনে 'রেকগ্‌নাইজ' করতে হবে। পাপীর প্রতি ঘৃণা—এই যে একটা 'কন্‌ভেনশান' আছে, তা হয়তো আমি জানি। এই জন্য লোকে ভাবে, আমি এমন করলাম, যাতে যারা তরুণ, তাদের মন এমন খারাপ হয়ে যাবে যে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু আমি কেবল দেখাতে চেয়েছি যে, পাপীর প্রতি ঘৃণা মেনে নিলেও, তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল, সেটুকুর প্রতি যেন অন্ধ না করে। তাছাড়া যে কথাটি বার বার বলেছি, আজ যেটা নীতি, ভালমন্দের যে মাপকাঠি দিয়ে তাকে বিচার করা হচ্ছে, কাল যে সে বদলে যাবে না, তাই বা কে জানে? লেখাই যাঁদের পেশা, তাঁরাও যদি—কেবল সমাজে যা দেখেছি, যা হচ্ছে কেবল তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করেন, তবে সেটা ভাল মনে হয় না।

দেখুন, এক সময়ে বিধবা-বিবাহের কথা তুললে বড় খারাপ জিনিস মনে হ'ত। যাঁরা বলতেন বা সাহিত্যে লিখতেন, সমাজ তাঁদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠতো। আমার 'পল্লী-সমাজ' বলে একটা বই আছে। সে বিষয়ে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন—ওর নায়ক নায়িকার তো কিছুই করলেন না, ও কি

রকম হলো ?—আবার কেউ বলেন, আমার এই বইয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে খারাপ ভাব বেড়ে যাবে ও সমস্তের মন্দ ফল হবে।

আমি তার মধ্যে এই বলতে চেয়েছিলাম—এই পাড়াগাঁয়ের সমাজ, যাকে শহর থেকে মনে করছি—সেখানে পদ্ম ফুটছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগলি করছে, জ্যোৎস্না ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই সব। সেখানেও পুকুরে শালুক ফুটছে, বিলাতী কচুরীতে সব ছেয়ে গেছে, দলাদলির তো অন্তই নাই।

পল্লী-সমাজের বিধবা নায়িকা—রমা। তার বিবাহের ছ'মাস পরে তার স্বামী মারা যায়। সে তার বাল্যবন্ধুকে আগে থাকতেই ভালবাসতো। শেষে নায়ক জেল থেকে ফিরে এল। নায়িকা জ্বর হয়ে কাশী-টাশী চলে গেল। সমস্ত গল্পটাই ছন্নছাড়া হয়ে গেল। তাই অনেক বলেন—কিছু 'কনস্ট্রাকটিভ্' করলেন না। কোন সমস্যার পূরণ করলেন না। সব শেষে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে গেল।

আমি বলি—ও আমার কাজ নয়। আমি দেখালুম, গ্রামে নায়কের মত একটা মহৎ প্রাণ এলো, নায়িকার মত মহৎ নারী এলেন। সমাজ তাঁদের উৎপীড়ন করলে। সমাজের কি 'গেন্' হ'ল ? এই দুটি জীবনের যদি মিলন হতে পারতো, এ জিনিসটা যদি সমাজ নিতে পারতো, তবে তারা দশখানা গ্রামের আদর্শ হ'ত। আমরা তাদের 'রিপ্রেস' করলাম। দুটো জীবন ব্যর্থ করে দিলাম। সেই জন্য 'কনক্লুশান'ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

সোসাল রিফর্ম বা কনস্ট্রাকশান আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা। এই যে আগ বাড়িয়ে এরা দুজন দেখছে, সেটা সত্য হলে সমাজ লাভবান হ'ত, এই দেখাতে গিয়েছিলাম। যাঁরা একে অন্যায় ভাবেন, তাঁরা এর জন্য আমায় গালাগালি দিচ্ছেন। তাছাড়া আমার যাঁরা আত্মীয় তাঁরাও আমাকে বলেন—এ বিষয়ে অন্যায় করছো। যে বিধবা হ'ল, সে নিজের স্বামীকে ধ্যান করবে, তা না সে আর একজনকে ভালবাসছে ; এ তার উচিত হয় নি।

এর উত্তরে আমি কি বলবো ? সেই এক কথা বলবার আছে, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের স্টাণ্ডার্ড যুগে যুগে বদলে যায়। আর একটা জিনিস দেখতে হবে। দুর্নীতি প্রচার করছে বলে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি, দেখতে হবে সে কোন নূতন 'আইডিয়া' দিচ্ছে, না সত্যের অজুহাতে কতকগুলো নোংরা

জিনিস চালাচ্ছে। মিছামিছি কুৎসিত কথা তো টিকবে না। আমিও যদি সে রকম দিয়ে থাকি, আমার সে সব লেখাও ঝরে পড়ে যাবে। মোট কথা, সম-সাময়িক ভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না বলেই দুর্নীতিমূলক—এ কথা মনে করা ঠিক হবে না। যদি লোকে দেখে লেখকের কথাটা ভাবা দরকার তা হ'লেই তার কাজ হ'ল।

আজ যে এত কথা বলছি, কারণ, কেন জানি না, এ জিনিসটা আজকাল বড় ঘুলিয়ে উঠেছে। সেদিন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন আমাকে এ বিষয়ে মন্দ বললেন। এ রকম ডেকে নিয়ে গালাগালি দেওয়া—ব্যাপারটা মন্দ নয়। তাঁরা এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে নাকি কেবল দুর্নীতিমূলক নভেলের ছড়াছড়ি হচ্ছে, তাতে ছেলেদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। আর তার জন্য আমিই নাকি দায়ী! আমি বললাম—তা জিনিসটা বাস্তবিকই খারাপ হয়েছে। তা এক কাজ করুন—লাইব্রেরী তুলে দিয়ে একটা সংকীর্তনের দল খুলে দিন। বেশ নীতি প্রচার হবে।(১)

এ প্রসঙ্গের আর দরকার নেই। এই জিনিসটাই আমার বলবার ছিল যে, আপনারা আজ আমার বিষয় বলতে গিয়ে অনেক অত্যুক্তি করেছেন; কিন্তু যদি মনে করেন সাহিত্যকে সাহিত্যিকের দিক দিয়ে, সাহিত্যিকের প্রাণ দিয়ে—যে জিনিস কল্পনা দিয়ে সাহিত্যিক দেখতে পাচ্ছেন—সে রকম আমি দেখবার চেষ্টা করেছি, তবে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আমার আর নেই। আপনারাই দেশের আশাস্থল। সমাজে আপনারা অনেকেই গণ্যমান্য হবেন। আপনাদের প্রশংসাই আমার গৌরবের বিষয়।

আমি আজ ঠিক সুস্থ নই—তবে এইখানেই আলোচনাটা শেষ করি।"
—(প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন—১৯২৩ খ্রীঃ)

[(১) দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হওয়ার পর, বরিশালে যখন

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়, তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও বরিশালে গিয়েছিলেন। সেই সময় বরিশালের কয়েকজন এক সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাজনীতি ছাড়া সাহিত্য প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। সেদিন আলোচনাকালেও শরৎচন্দ্র এইরূপ কথাই বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঐ আলোচনাকারীদের মধ্যে হীরালাল দাশগুপ্ত নামে একব্যক্তি ছিলেন। হীরালালবাবু সেদিনের ঐ আলোচনার কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"সেবারে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে শরৎবাবুর সঙ্গে আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছিল।...কথা-প্রসঙ্গে বললেন—বিশ বছর বয়সের মধ্যে আমার অধিকাংশ বই (অধিকাংশ নয়, কয়েকটি মাত্র) লেখা হয়েছিল। তারপর বিশ বছর শুধু বেড়িয়েছি। দেশ-বিদেশ কত জনপদ-প্রান্তর। এমন জায়গাও দেখেছি, যেখানে যমে-মানুষে খেলার রঙ্গে মেতে ওঠে। এরা সাপ ধরে। সাপ নিয়ে ঘর করে। কোন একটা অন্ধকার বিশেষ তিথিতে—বোধ হয় অমাবস্যাতে, এরা পরস্পরের গায়ে বিষধর সাপ ছুঁড়ে মারে। সাপ নিয়ে এমন লোফালুফি ভাবতে পার?

বিশ বছর পরে যখন সেবারে বর্মা থেকে ফিরে এলাম, ঐ ফণি পাল আমাকে লেখার জন্যে ধরলে। ফণির বাপ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সুধাকেষ্ট বাগচী নামে একটি লোক দুটো মাসিক পত্রিকা একাই চালাতেন। ও-দুটো কাগজের নাম 'জাহ্নবী' আর 'যমুনা'। 'যমুনা' কাগজটা ফণি পাল কিনলে পাঁচ শত টাকায়।

সুধাকেষ্ট বলেছিল—ওর অন্যূন পাঁচশত গ্রাহক আছে। কাগজটা হাতে এলে দেখা গেল, অধিকাংশ গ্রাহকই বিনে পয়সার। ওতে শাঁস মাত্রও নেই। ফণি তো চৌদ্দ হাত জলে পড়েছে। কাগজটাকে চালাতেই হবে। বললে—এবারে কিছু লেখা দিন। কিন্তু একটা অনুরোধ জানালে—সনির্বন্ধ অনুরোধ। উপন্যাস আর লিখবেন না। ও অনেক হয়ে গেছে। আমি ওর অনুরোধ শিরোধার্য করে দুখানা বই লিখে দিলুম। ঐ বই দুখানা হ'ল 'বিন্দুর ছেলে' আর 'রামের সুমতি'।"

(২) এই বছরই ১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে শিবপুরে এক

সাহিত্য-সভায় শরৎচন্দ্র তাঁর 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামক লিখিত প্রবন্ধে বলেছিলেন—

"সম্প্রতি একটা রব উঠিয়াছে যে, আধুনিক উপন্যাস লেখকরা বঙ্কিম-সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম-সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশঙ্কা তাহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না। অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জনীয়।

ইহার একটা জবাব দেওয়া প্রয়োজন। আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য ব্যবসায় আজও আমার বয়স বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না।

অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহার সেই নির্ভীক কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্যাদা হানি করা নয়।"—(স্বদেশ ও সাহিত্য)

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এই মত কিন্তু অনেকেই সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ হিসাবে এই বইয়ের ১৯৯ ও ২০০ পৃষ্ঠার আলোচনাটি দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা তাঁদের কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্য সভার বার্ষিক সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি করবার জন্য অনুরোধ করতে গেলে, সেদিনও শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে আলোচনাকালে এই কথাই বলেছিলেন।]

প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতিতে

৫৩তম জন্মদিনে

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা তাঁদের কলেজে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি'র উদ্বোধন করেন ১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে। এ সম্বন্ধে ঐ সময়কার প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"গত ৬ই চৈত্র সোমবার এই সমিতির উদ্বোধন হয়ে গেছে।...শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভায় উপস্থিত থাকবেন কথা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি আসতে পারেন নি। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং যুবকদের সাধু প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে তিনি একটি পত্র লিখে পাঠান। সভাপতি মহাশয় উক্ত পত্র পাঠ করে তাঁর বক্তব্য বলেন।"

পর বৎসর ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের ৫৩তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররা তাঁদের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি'র এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্রকে এনে অভিনন্দিত করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই অভিনন্দন সম্বন্ধে ঐ সময়কার প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"বিগত ৩১শে ভাদ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে আমাদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়ে গেছে—এই কথা-শিল্পীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের ও মাননীয় সাহিত্যিকগণের উপস্থিতিতে সেদিনকার সভা খুব জাঁকালো হয়েছিল। মান্যবান শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁর গানের দ্বারা সকলকে মোহিত করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি শ্রদ্ধেয় অতিথিকে অভিবাদন করিবার পর ছাত্রদের অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়।...

মাল্যচন্দন ভূষিত করিয়া, আমরা আমাদের পূজ্য সাহিত্যিককে ভক্তির চিহ্নস্বরূপ একটি রৌপ্যপাত্রে আমাদের অভিনন্দন পত্র অর্ঘ্য দিয়াছি।"

ঐদিন শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে যে মৌখিক অভিভাষণটি দিয়েছিলেন তা হচ্ছে এই—

"আপনারা অভিযোগ করেছেন, আমি আসি না। তার কারণ, বক্তৃতা দিতে হবে মনে হ'লেই আমার হৃৎকম্প হয়। আমি কিছুই বলতে পারি না। কিছু লিখতে পারি, কিছু কিছু লিখেছিও। তাতে যদি খুশী হয়ে থাকেন সুখী হব। মুখে কিছু বলে উপদেশ দেবো—কোন বইয়ের সমালোচনা করব, কি নূতন কোন মানে প্রকাশ করব, সে শক্তি আমার নেই। যা আছে বইয়ের মধ্যেই আছে, সেখানে খুঁজুন, আমার বইয়ের সম্বন্ধে এর বেশী কিছু বলবার নেই।

আমি আসতে পারি বা না পারি, ছেলেদের আমি ভারী ভালবাসি। এই যে কতকগুলি ছেলে মিলে প্রতিষ্ঠান করেছে, যার নাম দিয়েছে—বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি—যার বিষয় আমাদের বইয়ের আলোচনা। এই আলোচনা হতে অন্যান্য দেশের উপন্যাস সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান জন্মাবে—তুলনামূলক সমালোচনার দ্বারা তোমরা সব বুঝতে পারবে। এই সমিতিকে আমি সমস্ত মন দিয়ে আশীর্বাদ করি। এই জিনিসটা চলুক, যাতে এটা পূর্ণ হয়—গড়ে উঠে, তোমরা তাই কর। যখন সময় পাব, আসব।

আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এই ৫৩ বৎসর হ'ল—৫৪ বৎসর হবে কিনা বলা যায় না। আমাদের বংশের রেকর্ড আমি নিয়েছি। আমার বেশ মনে আছে, ৪৪।৪৫ বৎসর বয়স হ'লে বাবা রোজ বলতেন—'৪৪ তো হ'ল, আর বেশীদিন বাঁচব না।' আমার মনে হয়, আমিও ঢের বেশীদিন বাঁচব না। ৫৪ বৎসর পেলাম না বলে দুঃখিত হয়ো না, পাই বা না পাই অন্তরের সঙ্গে এই আশীর্বাদ করছি, তোমরা বড় হও।

আমার শক্তি কম, তবু নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবেসেছি—এ কথার মধ্যে কোন প্রবঞ্চনা নেই—যথার্থ ভালবেসেছি। এর ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, এর জলবায়ু, এর দোষ-গুণ, ত্রুটি-দলাদলি বা যা কিছু বল বাস্তবিকই আমি ভালবেসেছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়ে, নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করে দেখবার চেষ্টা করলে তার ভিতর হতে অনেক জিনিস বের হয়, তখন তার দোষ-ত্রুটিতেও সহানুভূতি না করে থাকা যায় না।

অনেকে বলেন, যারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে আছে, তাদের উপর আমার সহানুভূতি বেশী। সত্যই তাই। তাদের বাইরের কার্যকলাপ এক রকম হয়ে পড়েছে, সেজন্য তারা দায়ী নয়। অনেক জায়গায় আসল জিনিস গোপন থেকে যায়, তা আমি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। সেইটে হয়ত তোমাদের ভাল লেগেছে।

বাড়িয়ে গল্প করতে আমি পারি নে। গল্প করতে, কথা বলতে খুব পারি। সভা-সমিতি হয়—বাধ্য হয়ে সেখানে যেতে হয়, কিন্তু তাতে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না, কাকেও জানতে পারা যায় না। আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করল না, সাহিত্যে আপনার পথ কেমন করে হ'ল? সকলেই বলেন, একটা বড় বক্তৃতা কর—যা হয় একটা কিছু বল। এই সমিতি যদি বাঁচে—আশীর্বাদ করি বাঁচুক,—এরা যদি কখনও আমাকে নিমন্ত্রণ করে, আসতে পারি।

অন্য বই সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নেই। নিজে লিখেছি বলে তার সম্বন্ধেও আমি বড় অথরিটি নই। অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়ে বিপদ—প্লট পায় না—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করতে হয় নি। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করে নিই, সেগুলিকে ফোটাবার জন্য যা দরকার আপনি এসে পড়ে। মনের পরশ বলে একটা জিনিস আছে, তাতে প্লট কিছু নেই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার। তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এনে যোগ করতে হয়, সে সব আপনি এসে পড়ে। আজকাল যাঁরা লিখছেন, দেখি প্লটের উপর তাঁদেরও কোন দৃষ্টি নেই। চরিত্রগুলি ফোটাবার জন্য তাঁদের মুখে নানা কথা বেরোয়—তাদের দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, আনন্দ এই ধারাতে এসেছে, গল্পাংশ যা আছে তা বাধা পায় না।

এ বিষয়ে তোমাদের যদি কিছু জানবার ইচ্ছা থাকে, আমি যা পারি বলব। তাতে ঢের বেশী আনন্দ পাবে, এবং সমিতির সত্যকার উদ্দেশ্যও তাতে সফল হবে।

বন্ধু নৃপেনবাবু* আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন—ভারী মিষ্টি লাগল। তাঁর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। তাঁর নিজের জীবনও অনেক রকম ব্যথার ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছে। প্রথম যখন তা সুরু হয়—পরীক্ষা যখন আরম্ভ হয়—তখন শিবপুরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর মধ্যে মধ্যে দেখা

হয়েছে। মনে হয়, বেশ মন দিয়ে তিনি আমার লেখা পড়েছেন। তোমাদের পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট শ্রীকুমারবাবু * অধ্যাপক। তিনি বললেন, আমরা বিদেশী সাহিত্যের ভিতর হতে ততখানি বল পাই না, যতখানি নিজের সাহিত্য থেকে পাই। বাস্তবিক, একটা জিনিস বুঝা, আর তার থেকে রস গ্রহণ করা—দুইটি আলাদা জিনিস। ইংরাজি সাহিত্য তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু রস গ্রহণ করা যাকে বলে, তা আর একটা জিনিস। আগাগোড়া প্রতি লাইনটি আমি বুঝতে পারি, তবু যে জিনিসটা নিজের জীবনে ঘা দেয় সে জিনিসটা হয় না। তুলনা দ্বারা অন্যান্য সাহিত্যের মীমাংসা তোমরা করতে পারবে।

অভিনন্দন সম্বন্ধে কি বলব। বেশ ভাল হয়েছে, আমাকে খুব বড় করে দিয়েছ। অনেক সময় লজ্জা বোধ হয়—এগুলি অত্যুক্তি। তবু মানুষের দুর্বলতা আছে, বলতে হয়—বেশ লাগে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি তা গ্রহণ করলাম। তোমাদের চেষ্টা যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, এই আমার প্রার্থনা।"
—স্বদেশী বাজার, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮।

[* নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃপেনবাবু তৎকালীন অবিভক্ত বাঙলায় গভর্ণমেণ্ট কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি কৃষ্ণনগর, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সী ও চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল, তখন তিনি সরকারী চাকরি ত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। নৃপেনবাবু দেশের কাজে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেছেন ও অন্তরীণ হয়েছেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রও যখন কংগ্রেসে যোগদান করেন, সেই সময়েই নৃপেনবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে শরৎচন্দ্রের এই জন্মোৎসব সভায় নৃপেনবাবু উদ্যোক্তাদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

✝ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।]

৫৪তম জন্মদিন উপলক্ষে

১৩৩৬ সালে শরৎচন্দ্র তাঁর জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তারিখে আসতে পারবেন না বলায়, কয়েকদিন পরে ৭ই আশ্বিন তারিখে 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে এনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিম-শরৎ সমিতি কর্তৃক এবারের শরৎ-বন্দনা সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"গত ৭ই আশ্বিন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রকে একটি অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলার এই মণীষীশ্রেষ্ঠকে বৎসরান্তে পুনর্বার অভিনন্দন প্রদান করিয়া আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেছি।"

এই বছর শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে যে অভিভাষণটি দিয়েছিলেন, সেটি পরদিন ৮ই আশ্বিন তারিখের 'দৈনিক বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের 'মাসিক বঙ্গবাণী' তখন ছিল না। মাসিক বঙ্গবাণী চলেছিল ১৩২৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩৩৪ সালের মাঘ পর্যন্ত।) এবং ক'মাস পরে ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি আবার ঐ সময়কার 'শনিবারের চিঠি'তেও উদ্ধৃত করা হয়েছিল। শনিবারের চিঠির সম্পাদক বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি উদ্ধৃত করবার আগে, নিজে শরৎচন্দ্রের অভিনন্দন সভার কিছুটা বিবরণ দিয়েছিলেন।

'বসুমতী' কাগজের জন্য শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি যিনি লেখেন, তিনি বঙ্গবাণীর প্রেরিত অনুলেখকের চেয়ে বিস্তৃতভাবে শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি লিখেছিলেন। তাই বসুমতীতে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি, বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণ অপেক্ষা দীর্ঘতর ও একটু ভিন্নতর।

এখানে প্রথমে শনিবারের চিঠি থেকে, পরে বসুমতী থেকে শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি উদ্ধৃত করছি।

শনিবারের চিঠিতে সেদিনের সভা সম্বন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছিল, তা এই—

"শরৎচন্দ্রের আক্ষেপ

জন্মোৎসব সভায় বক্তৃতা

শরৎচন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র সমিতি' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একটি অতি সুন্দর সভার আয়োজন করেন। এতদুপলক্ষে কলেজের ফিজিক্স হল গৃহকে আলপনা, মঙ্গলঘট, ধূপ, দীপ ও বিবিধ পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত কলেজের অন্যান্য বহু অধ্যাপক এবং ছাত্র ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬॥• ঘটিকার সময় শরৎবাবু উপস্থিত হইলে, একটি আবাহন সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করা হয়। তৎপর সমিতির সম্পাদক শরৎবাবুকে মাল্যদানান্তে একটি সুদৃশ্য হস্তলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন।

অভিনন্দন পত্রে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া কথা প্রসঙ্গে ইহারা বলেন—

'হায় সাহিত্যিক, বাণীর কমলকাননে আজ নিষ্করুণ পেষণ চলিতেছে। হীন লালসার ক্লেদে তরুণ গল্পীর লেখনী ভরিয়া উঠিল। হে সত্যদ্রষ্টা, কোথায় সেই মহামানব অথবা মহামানবী, যাহার সাধনোজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে নব-সাহিত্যের কুরূপ খসিয়া পড়িবে? হে ব্রাহ্মণ! তাহাকে জাগাও!

হে তারুণ্যপন্থী, তোমার জীবনের ক্ষেত্রে চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসরের মেলা বসিয়া গেল, তাহার সার্থক বৎসর কয়টি ইতিহাসে অমর হইয়া থাকুক। কিন্তু

যেদিন আজও আসিল না, সেদিনের দ্বারেও তোমার মানস সন্তানের শক্তিগর্ব অক্ষয় হোক্! ইহার বড় কামনা আমাদের আর নাই।'

শরৎচন্দ্রের প্রত্যুত্তর

তদুত্তরে শরৎচন্দ্র সমিতির উদ্যোক্তাগণকে যথাযোগ্যভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া কথা-প্রসঙ্গে আধুনিক তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপে অভিমত প্রকাশ করেন।

"অনেক দিন পূর্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বর্তমান সাহিত্যের ভাবধারা সম্বন্ধে একটু কঠোর ভাবেই তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন। তদুত্তরে আমি 'মাসিক বঙ্গবাণী'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। ইহাতে আমি রবীন্দ্রনাথের ঠিক প্রতিবাদ করি নাই, বরং সবিনয়ে তাঁহাকে জানাই—তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যতটা বলেছেন, ঠিক ততটাই সত্যি কিনা?

কিন্তু তাতে অনেকেই বললেন—আমি যতটা বলেছি, ততটা বলা ঠিক হয় নি। সে যাক্, তারপর বিভিন্ন মাসিকে বহু সাহিত্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সে সব আমি পড়েছি। তাই আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এ জিনিসটা অত্যন্ত গ্লানির বস্তু হয়ে উঠেছে।

আমি ছেলেদের ভালবাসি এবং আমার বিশ্বাস ছেলেরাও আমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করতে পারছি না যে, তারা বর্তমানে যে সাহিত্য গড়ে তুলছে, তাতে রস থাকে না, গ্লানি থাকে।

অবশ্য যৌবনে যা ভাল লাগে, বার্ধক্যে তা লাগে না। যৌবনের ধর্ম আলাদা, চিন্তা আলাদা, কর্ম আলাদা; কিন্তু এ ধর্মে আত্মনিয়োগ করতে হলেও মনশুদ্ধি সর্বাগ্রে চাই। তাই ভেবেছিলাম, তরুণগণ শুদ্ধ মন নিয়ে আন্তরিকভাবে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু আজ এক বৎসর পরে আমার পূর্ব মত পরিবর্তিত হয়েছে, মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। আজ চোখ মেলে চাইলেই দেখা যায়, মানুষের যত বৃত্তি আছে, তার মাত্র একটিরই বারবার আবৃত্তি এঁরা করেছেন। আমি এ বিষয় তরুণ সাহিত্যিকদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে তাঁরা বলেছিলেন—আমাদের অন্য কোন স্কোপ নেই, অন্য কোন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র আমরা পাই না।

আমি তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম—এ সমাজে অনেক দুঃখ, ত্রুটি আছে সত্য, কিন্তু এ জীবনে আরও বেদনা আছে। তা কি তোমরা দেখতে পাও না? আমাদের পরাধীনতা, অজ্ঞতা বা দারিদ্র্যের বেদনা কি তোমাদের প্রাণে জাগে না? আর সমাজেও তো অন্যবিধ গ্লানি আছে, তারও তো কই কোন আলোচনা হয় না? তোমাদের সাহস আছে মানি, কিন্তু যে স্থানে সাহস প্রকাশে বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেদিকে যেন তোমরা সমস্তই অস্বীকার করে চল।

তার উত্তরে তাঁরা বললেন—ওসব দিক সাহিত্যের নয়। তাছাড়া আমরা ওসব পারি-ও না।

আমাকে তাঁরা বলেছিলেন যে, আমি অন্য কাজে যাওয়ায় নাকি সাহিত্যের ক্ষতি হচ্ছে। অবশ্য কিছু ক্ষতি হয়ত হয়েছে। কিন্তু আমার দিনও শেষ হয়ে গেছে। তোমরা তরুণ, তোমরা এদিকে অগ্রসর হও না কেন? আমার তো অন্য দেশের সাহিত্য কিছু কিছু পড়া আছে। তাতেও দেখতে পাই, শুধু একটি দুঃখ বা একটি সমস্যা নয়, সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন দিকের, বিবিধ সমস্যার আলোচনা তাঁরা তো বেশ প্রাণস্পর্শী ভাবেই করে গেছেন। তোমরাই বা পারবে না কেন?

আমার এ অনুরোধ তাঁরা মানবেন কিনা জানি নে। কিন্তু আজ যাঁরা এখানে সমবেত আছেন, তাঁদের আমি বলব—আজকাল যে সাহিত্য হচ্ছে, তা সত্যই খারাপ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া করে এ কথা বলেছিলেন, তত কড়া করে বলবার ক্ষমতা আমার নেই। তা থাকলে সেরূপভাবেই আমি তার নিন্দা করতাম। এ সম্বন্ধে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে কতিপয় তরুণী আমাকে বলেছিলেন—দুঃখের বিষয় আমরা লিখতে পারি নে, যদি পারতাম তাহলে দেখাতাম, এই সকল গল্প পড়তে আমাদের কত লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। তাঁরা আমাকে এ অনুরোধও জ্ঞাপন করলেন যে, আমি যেন এ সম্বন্ধে সকল তরুণকে সাবধান করে দিই।

গত এক বৎসর তরুণদের সকল লেখা পড়ে আমার যে ধারণা হয়েছে, তাতে তাঁদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, তাঁরা প্রকৃত রসবস্তু কি তা লিখতে চেষ্টা করুন। অবশ্য তাঁদের ভাষা ও বর্ণনার ভঙ্গী খুব উঁচুদরের। আমার তো মনে হয়, আমাদের অনেকের চেয়েই এঁদের লেখার ভঙ্গী শ্রেষ্ঠ

ভাল। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যে রসবস্তু না থাকলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাঁদের সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে সাহস দেখালে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেদিকে সাহস দেখালেই এঁদের বীরত্ব প্রকাশ পেত, কিন্তু তা হচ্ছে না। যেন অনেকটা জেদের বশেই তরুণরা সাহিত্য রচনা করছেন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁরা সীমা অতিক্রম করে গেছেন।"

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক বঙ্গবাণী থেকে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করার পর, শেষে নিজে একটা মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সেই মন্তব্যটি ছিল এই—

"আশা করি আগামী বৎসর এমন সময় তরুণদের ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ভ্রান্তিও দূর হইবে।"

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটি ছিল এইরূপ—

"একটা মামুলী ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। সেটা শেষ করে আমার আজকের ইতিহাসটা বলে বিদায় নেব। এক বৎসর পর আবার আমার পুরাণো বন্ধুদের—যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তাঁদের দেখতে পাব মনে করে পীড়িত শরীরেও চলে এলাম।

অভিনন্দন উপলক্ষ করে আমার জন্মদিনে ছেলেরা আজ যা বললেন, তার সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলে শেষ করব।(১)

অনেক দিন পূর্বে, বোধ হয় আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণী'তে তাঁকে জানিয়েছি, যতটা রাগ করে তিনি বলেছেন, ততটাই সত্য কি না ?(২) তারপর থেকে দু-এক জনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, তখন নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে, মাসিক

পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরোচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েছি।

আমার সমালোচনার হয়ত বিশেষ কোন মূল্য নেই। কারণ, আমি সমালোচনা করতেই পারি না। শুধু ভাল-মন্দ লাগার ভিতর দিয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারি।

আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—জিনিসটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্য গড়ে তুলতে পারেন। আমি তাঁদের ভালবাসি এবং এই দিক থেকেই তাঁদের উৎসাহ বরাবর দিয়ে এসেছি। যাঁদের বয়স হয়েছে, তাঁদের মন অন্য রকম হয়ে গেছে। যৌবন জিনিসটা আমরা নিজেরা পেরিয়ে গেছি। তাই যৌবনের অনেক রচনা হয়ত আজ পড়তেও ভাল লাগে না, লিখতেও পারি না। এই জন্য মনে করি, বয়স যাদের কম, তাদের নূতন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য রচনা করবেন। সাহিত্যের উন্নতি করবেন। বাঙ্গলা ভাষার বড় জিনিস লিখে যাবেন, আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি দেখছি, আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না।

দু-তিনজন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এটা করছ কেন?

উত্তরে তাঁরা বললেন—এই জন্য করছি, আমাদের আর স্কোপ নেই। আমরা যখন যা ভাবি, বা করি, যৌবনে যা প্রার্থনা করি, সেদিক থেকে রস-রচনা বা সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই না—এই বলে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমি তাঁদের বললাম—কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ—এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কি আর কোন বস্তু

দেখতে পাও না? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এত পরাধীন জাতি, এ সব তো রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে—এ সব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল এক দিকে হ'লে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করছ, আমি মনে করি সেটা সাহসের অভাব। এদিকে তো শাস্তির ভয় নেই, কেউ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যে দিকে শাস্তির ভয় আছে, সে দিকে সত্য সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশে কত রকম অভাব আছে—নানান্ দিকে আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলেছ।

তার জবাব তাঁরা দিলেন—আমরা সাহিত্যিক মানুষ, সে সমস্ত সাহিত্যের দিক নয়। ওদিক দিয়ে আমরা পারি না, ইচ্ছাও করে না, অভিজ্ঞতাও নেই। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অনুযোগ করলেন—সাহিত্য ছেড়ে আমি যে ওদিকে যাচ্ছি, সেটা ভাল হচ্ছে না।(৩)

আমি তাঁদের বলেছিলাম—হয়ত সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্র নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং ওদিকে যাওয়া আমি ক্ষতি মনে করি না। আমি যদি ওদিকে একবার না যেতুম, তাহলে যত ক্ষতি হ'ত, গিয়ে যে ক্ষতি হয়েছে, তার তুলনায় তাকে ক্ষতি বলে মনে করি না। লাভ হউক, ক্ষতি হউক, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এল। ছাই-ভস্ম যা হউক, কিছু লেখা রেখে গেছি। তোমরা সবেমাত্র আরম্ভ করেছ। এদিকটাকে অস্বীকার করো না। অন্যান্য দেশের যে দু-চারখানা বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, এ জিনিসে তারা কখনও চোখ বুজে থাকে নি। এর জন্য তারা অনেক সহ্য করেছে, অনেক শাস্তি ভোগ করেছে। তোমরা তাই কর না কেন? তারা তা করবে কিনা, আমি জানি না।

এতগুলি তরুণ স্কুলের ছাত্র—যারা পড়ছে, সাহিত্য-চর্চা করছে, তাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলব, তাদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে খুব একটা উঁচু পর্দায় বা ধাপে উঠেছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যত কড়া করে বলেছেন, তেমন করে

বলবার শক্তি আমার নেই, থাকলে হয়ত তেমন করে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হ'লে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এ সব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলছি, কবিতার দিক থেকে নয়। এক দিকে চলেছে। সংবাদপত্র—মাসিক—যখনই পড়ি, কেবল মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

এক বন্ধুর বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ জন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন—দুঃখের ব্যাপার এই—আমরা লিখতে জানি না, সেই জন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়ত মনে করে, এসব জিনিস আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা সুযোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ সব জিনিস আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়, তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ করে কিছু লিখলে, তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে'সব আমরা সহ্য করতে পারব না। সেই জন্য সব সহ্য করে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়। আমাদের হয়ে এ কথা তাদের জানাবেন।

রাগের ওপর থেকে যে আমি বলছি, তা নয়। আমাকে যেন কেউ ভুল না করেন। ছেলেদের নূতন উৎসাহকে দমিয়ে দেবার ইচ্ছা করে যে এটা বলছি, তাও নয়। অনেকবার বলেছি, যৌবনের সাহিত্য আলাদা। সেটা ঠিক বুড়োদের মত হয় না। ১৭।১৮।১৯ বৎসর বয়সে আমি যা লিখেছি, আজ তা লিখতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না, চেষ্টা করলেও সেই ভাব আসে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দিকে হয়ত কিছু ভাল হতে পারে, কিন্তু ঠিক সে জিনিসটি যেন হতে চায় না। এই জন্য অনেক বার বলেছি, ছেলেদের সাহিত্য-সৃষ্টি বুড়োদের চোখ দিয়ে দেখলে চলবে না। সে বয়সের মধ্যে নিজেকে ফেলে দেখা দরকার।

আজ ৫৪ বৎসর বয়সে যা ভালবাসি, তার সঙ্গে মিলিয়ে হয়ত এঁদের লেখার অনেকখানি বুঝতে নাও পারি, মনে হতে পারে অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু

তৎসত্ত্বেও গত এক বৎসর তাঁদের বহু রচনা পড়ে, তাঁদের কিছু বলবার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েছি। আমি বলি—তাঁরা সংযত হউন। সত্যিকার রসবস্তু কি, কিসে মানুষের হৃদয়কে বড় করে, সাহিত্য কি—এ সব তাঁরা ভেবে দেখুন। তাঁদের লেখবার ক্ষমতা আশ্চর্য রকম বেড়ে গেছে, প্রকাশ করবার ভঙ্গী বাস্তবিক আমাকে মুগ্ধ করে। লেখবার ভঙ্গী ও ভাষার দিক থেকে অভিযোগ করবার কিছুই নেই। সে দিক থেকে আমি নালিশ করি নি। অন্য দিক থেকেই আমি বললাম। এটা আমার নিজের ভাল-মন্দ লাগার কথা নয়। তোমরা জানো, তরুণদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। তাদের সমস্ত চেষ্টায় আমি থাকি।

এইমাত্র যুব-সমিতির মিটিং(৪) করে এলাম। যথার্থ, বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলেছি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারম্বার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করি নি, কোনদিন করব বলে মনেও করি নি। সেদিন তাঁর কথা আমার না বললেও হ'ত। কারণ, অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আর আমি বলতে পারি নে।

আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে কথা উঠছে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেছে। অন্ততঃ আক্রোশের থেকে করছেন বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়, যেন তাঁরা বলছেন—বেশ করেছি, আরও করব। তোমরা বলছ, সে জন্য আরও বেশী করে করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। যেদিকে শাস্তির ভয় আছে, সেদিকে যদি এই পরিমাণ সাহস দেখাতে তাঁরা পারতেন, তাহলে মনে করতাম, আর কিছু না থাক, অন্ততঃ সত্যকার সাহস এঁদের আছে। অনেক সময় মনে হয়, জিদের জন্য করছে। এটাকে সাহস বলে মনে করি না। কিন্তু তা তো নয়, এ যেন 'বে-পরোয়া হয়ে কতটা যেতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি' জানানো।

তোমরা—যারা এখানে আছ, রাগ করে আমার কথা নিও না। এ সব আমি ভারি দুঃখের সঙ্গেই বলছি। বহুদিন সাহিত্য-চর্চা করে যা ভাল বুঝেছি তার থেকেই বলছি—সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ

—একটু-আধটু করেছ, তা নয়, অনেকখানি করেছ। একটু-আধটুর জায়গায় কোথাও কিছু হ'লে কিছু হ'ত না। এক্ষেত্রে তা একেবারে নয়। এ কথায় উত্তরে যদি তোমরা কেউ বল—আমিও তো এটা লিখেছি, রবীন্দ্রনাথও অমন লিখেছেন—হতে পারে আমরা লিখেছি। তাতে কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কাজ করেছ।

স্নেহের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে এবং তরুণ সাহিত্যিকদের মঙ্গল ইচ্ছা করে এ কথাগুলি বললাম। এই রকম সুবিধা ও অবসর কমই পাওয়া যায়। অনেকদিন ধরে বলব বলে মনে করেছিলাম। ভাল না লাগলেও কথা কয়টি বলে দিলাম।

আবার আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক বৎসর যদি বেঁচে থাকি, আবার আসব। না থাকি তো ভালই হয়। অনেক সময় মনে হয়, যাঁরা দীর্ঘজীবন কামনা করেন, তাঁরা বোধ হয়, ভাল কাজ করেন না। শরীর যখন অপটু হয়ে পড়ে, তখন আর ইচ্ছা হয় না, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর জীর্ণ শরীর টেনে নিয়ে বেড়াই। দুঃখভোগ যদি কপালে থাকে, আসছে বছর হয়ত আবার দেখা হবে।

[(১) শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত ছাত্রদের অভিনন্দন পত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, ছাত্ররা বলেছিলেন—

'হায় সাহিত্যিক, বাণীর কমল-কাননে আজ নিষ্করুণ পেষণ চলিতেছে। হীন লালসার ক্লেদে তরুণ গল্পীর লেখনী ভরিয়া উঠিল।'

শরৎচন্দ্র সেদিন ছাত্রদের এই কথার প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁর বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন।

(২) ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যে ধর্ম' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরই উত্তরে ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।]

৫৫তম জন্মদিনে

প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে তাঁর ৫৫তম জন্মদিনে অভিনন্দিত করবার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেবার দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে অভিনন্দন নিতে অসম্মত হয়েছিলেন। তবে তিনি অভিনন্দন না নিলেও সেদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের সভায় এসে যোগ দিয়েছিলেন।

সেদিনকার সভার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"বিগত ৩১শে ভাদ্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চপঞ্চাশতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে লইয়া আসা হইয়াছিল। বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীকে তাঁহার জন্মদিনে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দেশের সঙ্কটকালে তিনি অভিনন্দন গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতে, সে সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই।…

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাত্রদের পক্ষ হইতে বলেন যে অভিনন্দন না লইয়া শরৎচন্দ্র আরও বেশী শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরীনাথ ভট্টাচার্য বলেন—আমাদের মধ্যে তাঁর আসাতেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে। দেশের সুদিনে এসে তিনি যেন আমাদের কিছু শোনান।"

শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর ৫৫তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই—

ছেলেরা যখন বললে যে, আপনার সঙ্গে বৎসরান্তে মিলে আনন্দ পাই, দেশের এই দুর্দিনে ব্যক্তিগত সম্মানে আমি কুণ্ঠিত হলেও—ছেলেদের ভালবাসা অস্বীকার না করতে পেরে বললুম, আমি যাব, কিন্তু বেশী আয়োজন করো না।

সভাপতি মশায় বললেন যে, ৫৫ বৎসরে চাকুরি জীবনে একটু মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়।

আমার জীবনে শক্তির যে বিশেষ ক্ষয় হয়েছে, তা বলে মনে হয় না। কিন্তু এমন দুঃসময় পড়েছে, নূতন কিছু দেওয়া বড় অনিশ্চিত। কিছুই জোর করে বলা যায় না। কালের গর্ভে যা আছে তাই হবে। আমার আশা আছে যে, এ দুর্দিন থাকবে না। যদি বেঁচে থাকি এবং এ আঁধার যায়, ছেলেদের সব রকম ক্ষোভ আমি ঘুচিয়ে দেব। আজ কিছু গ্রহণ করতে কিন্তু আমি অক্ষম। ব্যক্তিগত সম্মানের দিন এ নয়—আনন্দের এ সময় নয়। মনের এই চঞ্চল অবস্থায় কিছু বিশেষ বলাও সঙ্গত হবে না। এ সময়ও সে নয়।

আমার পুরাণো বন্ধুদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষার জন্যে। ছেলেদের বলি যে, যেন তারা ক্ষোভ না রাখে। দেশের কথা নতুন করে বলবার কিছু নেই, তবে দেশের কথা মনে করলে ব্যথা চাপতে পারি নে। আমার মনের কথা পরে আমি বলব। ছেলেদের বলি তাদের সাহিত্য-চর্চা অক্ষুন্ন থাক। না বলতে পারায় যে আমার কত কষ্ট, সে তোমরা বুঝে নিও।
—'ভারতবর্ষ', কার্তিক ১৩৩৭।

[দেশের যে সঙ্কটময় অবস্থার জন্য শরৎচন্দ্র সেদিন অভিনন্দন নিতে অসম্মত হয়েছিলেন, দেশের তখনকার সেই সঙ্কট বা বিপদটা ছিল এই—

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের আমলে কোনও ভারতীয়ের নিজের প্রয়োজনের

জন্য সামান্য নুণ তৈরি করার অধিকারও ছিল না। নুণ ছিল গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব ব্যবসায় জিনিস।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ গান্ধীজী তাঁর সবরমতী আশ্রম থেকে ৮৯ জন সঙ্গীসহ পদযাত্রা আরম্ভ করে বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্র উপকূলে ডাণ্ডী নামক স্থানে যান। সেখানে গিয়ে সমুদ্র থেকে জল নিয়ে নুণ তৈরি করে গবর্ণমেণ্টের লবণ-আইন ভঙ্গ করেন।

গান্ধীজীর ডাকে তখন দেশের সর্বত্রই লবণ-আইন ভঙ্গ সুরু হয়। এই লবণ-আইন ভঙ্গ থেকে লোকে ক্রমে বিলাতী দ্রব্য বর্জন, মাদক বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনও সুরু করে।

আন্দোলন দমন করবার জন্য পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি ও গুলি চালাতে থাকে এবং দলে দলে লোককে গ্রেপ্তার করে। সরকার সারা দেশের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও বে-আইনী ঘোষণা করে।

দেশে যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে এইভাবে অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন চলছিল, ঠিক সেই সময়েই পূর্ব বাঙলার চট্টগ্রামে একদল বিপ্লবী বাঙালী যুবক সূর্য সেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করে কয়েকদিনের জন্য সেখানে 'স্বরাজ' স্থাপন করেন। পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেখানে বহু সৈন্য ও পুলিশ নিয়ে গিয়ে সেই বিপ্লবীদের দমন করবার জন্য তাঁদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং তাঁদের হত্যা ও ধরপাকড় সুরু করে।]

৫৬তম জন্মদিনে

১৩৩৮ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের ৫৬তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিম-শরৎ সমিতি ঐ ৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর) তারিখের আগে ও পরে কয়েকটা অধিবেশনে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ অধিবেশনগুলি সম্বন্ধে ঐ সময়কার প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"৭ই আগস্ট—

সমিতির প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'শেষপ্রশ্ন' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত, সুলিখিত এবং মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন।···

১৫ই সেপ্টেম্বর—

দ্বিতীয় অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।···

৬ই অক্টোবর—

তৃতীয় অধিবেশনে 'পথের পাঁচালী'র সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ-সাহিত্যে শিল্প-কৌশল' নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করেন।···"

৭ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির বিশেষ অধিবেশনটি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"১৭ই সেপ্টেম্বর—

সমিতির বিশেষ অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের ৫৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে শুভ জন্মোৎসবের আয়োজন হয়। ঐ উপলক্ষে সভাগৃহ প্রাচ্যরীতিতে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সমিতির পক্ষ হইতে একটি রৌপ্যাধারে সন্নিবিষ্ট রৌপ্য পুথির আকারে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।···

সভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং বহু সুপণ্ডিত অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। স্যার সি, ভি, রমণ একটি সুরসিকতাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলের আনন্দ-বর্ধণ করেন। বাঙ্গলার নটরাজ শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় একটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা দেশের বহু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গান গাহিয়াছিলেন।"

সেদিন অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র একটি ছোট লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন।

বঙ্কিম-শরৎ সমিতির ২য় অধিবেশনের জন্য প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটি ঐ সময় ইংরাজি 'লিবার্টি' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র লিবার্টিতে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটি পড়ে মূলতঃ তারই একটা দিক নিয়ে (বঙ্কিম-সাহিত্য) সেদিন অভিভাষণটি দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সেই লিখিত অভিভাষণটি তাঁর 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটির পাদটীকায় ভুলক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মদিনের অভিভাষণ লেখা আছে। ফলে ঐ দেখে, সকলেই এই অভিভাষণটি শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্মদিনের অভিভাষণ বলে লিখে যাচ্ছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে দেখছি, শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ লিখিত অভিভাষণ পড়ার পর, আলোচনা-প্রসঙ্গে মুখে কিছু বলেওছিলেন। এ সম্বন্ধে ম্যাগাজিনে লেখা আছে—

"শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের যথাযোগ্য উত্তর প্রদানের পর, আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—তাঁদের (আধুনিক সাহিত্যিকদের) মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্য রচনায় আর যাই কেন না হোক্, শ্লীলতার, শোভনতার রুচি ও মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাঙ্গলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক্, তাদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।"

একটি পারিতোষিক বিতরণী সভায়

শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। তাই তখন হাওড়া জেলার সব জায়গারই কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

সেই হিসাবে হাওড়া জেলার ডোমজুড় অঞ্চলের দক্ষিণ ঝাঁপড়দহের কংগ্রেস কর্মী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল।

শিবপ্রসাদবাবু এবং আশুবাবু এঁরা ঐ সময় এঁদের গ্রামের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার এই শিবপ্রসাদবাবু ও আশুবাবুর অনুরোধে এঁদের গ্রামের ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন।

শিবপ্রসাদবাবু বলেন—সেই পারিতোষিক বিতরণী সভায় আমরা গান, বাজনা, আবৃত্তি প্রভৃতির আয়োজন করেছিলাম। একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে সেদিন ঐ সভায় আমরা স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'স্বদেশ' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়েছিলাম।

পরাধীন ছিলাম বলে, ঐ কবিতাটি তখন আমাদের খুব প্রিয় ছিল। কবিতাটি তখন আমাদেরও মুখস্থ ছিল। এমনকি সেই কবিতার প্রথম দিকের অনেকগুলো লাইন আজও আমার মনে আছে। যেমন—

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়;—
এই যমুনা-গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মা ভরা চুণি মণি,
সাগর ছেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়।
এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া,

তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠি
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়।

শিবপ্রসাদবাবু আরও বলেন—সেদিন সেই ছেলেটির 'স্বদেশ' কবিতাটি আবৃত্তি খুবই সুন্দর হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র ছেলেটির আবৃত্তি শুনে তার খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং সেদিন তিনি তাঁর বক্তৃতাটি ঐ 'স্বদেশ' কবিতার উপর ভিত্তি করেই দিয়েছিলেন। আজও আমার বেশ মনে আছে, শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—

'স্বদেশ' এই কথাটির অর্থ স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ভাল করে বোঝান দরকার। এই বয়স থেকেই তাদের মনে স্বদেশীভাব বা স্বদেশের জন্য প্রেরণা এনে দেওয়া উচিত। এ কাজের দায়িত্ব গৃহে যেমন অভিভাবকদের, স্কুলে তেমনি শিক্ষক মশায়দের। যাঁরা স্কুল পরিচালনা করেন, তাঁদেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে। তাঁরা দেখবেন, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কিনা। যদি হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে, তাদের শিক্ষা সার্থক হচ্ছে।

দেশবন্ধু স্মৃতি-সভায়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে। তাঁর মৃত্যুতে কিছুদিন ধরে দেশের নানা স্থানে যখন শোকসভা হচ্ছিল, সেই সময় হাওড়া জেলার বালি শহরেও একটি বড় দেশবন্ধু স্মৃতি-সভা হয়েছিল। সেই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

বালির রিভারস্ টমসন স্কুলে (বর্তমান নাম শান্তিরাম বিদ্যালয়) দু-তলার রিপণ হলে ঐ সভা হয়েছিল।

সভার অন্যতম উদ্যোক্তা বালির রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালের বিখ্যাত গান্ধীবাদী ও গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকার বাঙ্গলা সংস্করণের সম্পাদক) সেদিনের ঐ সভার সম্বন্ধে বলেন—

সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য অনেকেই দেশবন্ধু সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। আমি দেশবন্ধু সম্বন্ধে একটি ছোট প্রবন্ধ পড়েছিলাম। আমার প্রবন্ধটি শুনে শরৎচন্দ্র আমায় ডেকে বলেছিলেন—লেখা ভাল হয়েছে।

শরৎচন্দ্র ঢালা ফরাসের উপর বসে সভাপতির অভিভাষণে, কথাবার্তা ও আলোচনার ভঙ্গীতে দেশবন্ধুর দেশসেবা ও ত্যাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। সে সব কথা আজ আর মনে নেই। তবে দেশবন্ধুর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সেদিনের একটি কথা আজও আমার হৃদয়ে জাগরূক হয়ে রয়েছে। সে কথাটি হচ্ছে এই—

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'একদিন দেশবন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি, তিনি ডাল মেখে, শুধু নারকেল ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছেন। আর কোনও তরকারি নেই। এই দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তাঁকে বললাম—আপনি নিজের একি দশা করেছেন!

দেশবন্ধু বললেন—শরৎবাবু, আমি তো ডাল ও নারকেল ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছি। আমাদের দেশের অনেকের যে তাও জোটে না!

উত্তরে আমি আর কি বলব। চুপ করে রইলাম।'

দেশবন্ধু স্মৃতি-সভার পর স্থানীয় 'বালি সাধারণ পাঠাগারে'র পরিচালক-বর্গের অনুরোধে শরৎচন্দ্র সেই পাঠাগারটি দেখতে যান। সেখানে কিছুক্ষণ বসেন ও কথাবার্তা বলেন।

শেষে আসার সময় শরৎচন্দ্র গ্রন্থাগারিকের অনুরোধে গ্রন্থাগারের একটি খাতায় নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখে দিয়ে আসেন—

আজ এই পাঠাগার দেখিয়া আমি অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। প্রার্থনা করি ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হোক। ইতি—

৭ই আষাঢ়, ১৩৩২ — শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের এই লেখাটি 'বালি সাধারণ পাঠাগারে'র সেই খাতায় আজও রয়েছে।

রামমোহন স্মৃতি-সভায়

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে রাজা রামমোহন রায়ের ৯৮তম মৃত্যু দিবস উপলক্ষে রামমোহন স্মৃতি-সভা হয়।

ঐ সভার আগের দিন ২৬শে সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা এই—

"রামমোহন স্মৃতি-বার্ষিকী

আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৫॥• টার সময় রামমোহন লাইব্রেরী হলে রাজা রামমোহন রায়ের অষ্টনবতিতম স্মৃতি সভা হইবে।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বক্তাগণ—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, মৌলবী ওয়ায়েদ হোসেন, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ কালিদাস নাগ।

সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।"

সেদিন ঐ সভায় শরৎচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—

আমি বক্তা নই। বক্তৃতা আমি দিতে পারি না। কিছু লিখতে হয়ত পারি। সভার আরম্ভে সভার উদ্যোক্তাদের একজন আমার পরিচয় দিতে উঠে বলেছেন—আমার গল্প নাকি আপনাদের ভাল লাগে। যাই হোক্, আমার গল্প যখন আপনাদের ভাল লাগে, তখন আপনাদের একটা গল্পই শোনাই—

আমি এখন পাড়াগাঁয়ে বাস করি। সেখানে আমার একটা মাটির বাড়ী আছে। বাড়ীটা দুতলা। ঐ গ্রামের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। তাই তাদের যদি কিছু উপকার করতে পারি, এই ভেবে আমি সেখানে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করে থাকি। চিকিৎসাটা অবশ্য বিনা পয়সাতেই।

একদিন রাত্রে আমি আমার ঐ বাড়ীর দুতলার ঘরে শুয়ে আছি। রাত্রি তখন তিনটে সাড়ে তিনটে হবে। ঘুম ভেঙে গেছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন আমার বাড়ীর উঠান থেকে চীৎকার করে আমাকে ডেকে বলছে—দাদাঠাকুর! আমার ছেলের কলেরা হয়েছে, তাকে বাঁচান!

এই শুনে আমি তখনই ঘুম জড়ানো চোখে উঠে পড়লাম। উঠে অন্ধকারে দরজাটা খুঁজতে গিয়ে একবার হাত পড়ল ঘরের বাক্সগুলোর উপর, একবার টেবিলটার উপর, একবার দেওয়ালের গায়ে। এইভাবে হাতড়াতে লাগলাম। যে লোকটা ডাকতে এসেছিল, সে এমনি সময়ে তার হাতের হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরায় আলোর একটা ছটা খোলা জানালা দিয়ে ঘরে এল। তখন সেই আলোর ছটায় আমি দরজা খুঁজে পেলাম ও বেরিয়ে এলাম।

রাজা রামমোহনেরও হয়েছিল অনেকটা এই আমারই মতন অবস্থা। কেন না, তিনি ধর্ম জগতে ধর্মগুরু হয়ে দেখা দেওয়ার আগে একবার শিক্ষা-সংস্কারে, একবার সমাজ-সংস্কারে, একবার রাজনীতি নিয়ে আমার সেই সেদিনের অবস্থার মতই হাতড়েছিলেন। তারপর ধর্মের আলোর ছটা যখন তিনি দেখতে পেলেন, তখন তিনি অতি সহজেই ধর্মজগতে বেরিয়ে এলেন।

কর্মীসংঘে

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী থাকলেও, তখনকার বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্টভাবে যোগাযোগ রেখে চলতেন। এমন কি তিনি এঁদের রীতিমত অর্থ সাহায্যও করতেন।

শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মিলে হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় 'কর্মীসংঘ' নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। অমরবাবু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কিছুদিন কারাভোগের পর সেই মাত্র জেল থেকে বেরিয়েছেন। বিপিনবাবু পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তখনও আত্মগোপন করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ঐ সময় অমরবাবু তাঁদের কর্মীসংঘের এক সভায় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যান। অমরবাবুর বাড়ী ছিল এই উত্তরপাড়াতেই।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সেদিন কাজী নজরুল ইসলামও কর্মীসংঘের সভায় গিয়েছিলেন। কাজী নজরুল সভায় কয়েকটা দেশাত্মবোধক গান গেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র সেদিন সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে সেদিনকার সভায় উপস্থিত কর্মীসঘের অন্যতম সদস্য উত্তরপাড়ার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

শরৎচন্দ্র প্রথমেই বললেন—আমি বক্তা নই। বক্তৃতা দিতে পারি না। তবে যখন এসেছি, তখন দু-একটা কথা যা পারি বলব।

সভায় একজন আমার সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বললেন। তাই এখানে রাজনীতির কথা কিছু না বলে, আমার সাহিত্যের কথাই দু-একটা বলি। রাজনীতির কথা আপনাদের কাছে আমি আর কি বলব?

আমি আমার কয়েকটা বই-এর শেষ দিকটা আগে লিখেছিলাম। পরে প্রথমটা লিখি। এ আমার একটা অভ্যাস আছে।

আর একটা কথা। আমি আমার বইএ সমস্যার জট পাকাই বটে, তবে ঘটনার মধ্য দিয়েই সে জট কাটিয়ে দিই। জলধরদার (ভারতবর্ষ-সম্পাদক) মত দৈব ঘটনার দ্বারা সমস্যার সমাধান করি না।

জলধরদা একবার তাঁর এক উপন্যাসে এমন জট পাকিয়ে ফেললেন যে, শেষ পর্যন্ত আর জট ছাড়াতে না পেরে, সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যু ঘটিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন। দাদার সঙ্গে দেখা হ'লে, জিজ্ঞাসা করলাম—দাদা, এটা কি হ'ল?

তিনি বললেন—কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না? সাপের কামড়ে কি লোক মরে না?

আর একটা কথা বলব। আমি কিছুদিন আগে ঢাকায় মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য সম্মিলনে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ফাঁকে কয়েকজন আমার কাছে এসে বললে—আপনার লেখা পড়লে আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু রবিবাবুর লেখা তেমন বুঝতে পারি না।

তারা হয়ত ভেবেছিল—এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ক'রে আমার প্রশংসা করলে, আমি খুশী হব। কিন্তু আমি তাদের বললাম—সে তো হবেই, কারণ আমি লিখি আপনাদের জন্য, আর তিনি লেখেন আমাদের জন্য। সেই জন্যই আপনারা তাঁর লেখা বুঝতে পারেন না।(১)

[(১) শরৎচন্দ্র সেদিন উত্তরপাড়ায় যে সব কথা বলেছিলেন, সেই কথাগুলি তিনি আগে এবং পরেও কয়েকবার কয়েক জায়গায় বলেছিলেন। যেমন—উপন্যাসের শেষাংশ আগে লেখার কথা নিয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঘটিয়ে জলধর সেনের সমস্যার সমাধান করার কথা তিনি 'প্রচারকে' তাঁর এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন। 'পরিচয়'

পত্রিকায় প্রকাশিত দিলীপকুমার রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' নামক পত্রের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র ঐ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য লেখেন—এ কথাটা তিনি বহুবারই বহুজনের কাছে বলেছেন। ১৩৩৩ সালে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে শরৎচন্দ্রের সভাপতি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল (শেষ পর্যন্ত যান নি)। এই সম্পর্কেই সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু নামে এক ব্যক্তি একদিন শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে গেলে, সেদিন তাঁকেও তিনি কথা-প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন। ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোলে' সত্যেনবাবু এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

শরৎচন্দ্র বললেন—

"হাওড়া কি অন্য কোথায় ঠিক মনে নেই, একটা ছোট মতন সাহিত্য সম্মিলনে আমাকে একজন বললেন, আপনি যা লেখেন, তা বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, আর বেশ ভালও লাগে। কিন্তু রবিবাবুর লেখার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না—কি যে তিনি লেখেন, তা তিনিই জানেন।—ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন, তাঁর এই কথা শুনে নিজেকে অনুকৃত মনে করে আমি খুশী হব।—আমি উত্তর দিলুম—রবিবাবুর লেখা—তোমাদের তা বুঝবার কথা নয়। তিনি তো তোমাদের জন্যে লেখেন না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্যে রবিবাবু লেখেন। তোমাদের মত যারা পাঠক, তাদের জন্যে আমি লিখি।"]

প্রবর্তক সংঘে

মতিলাল রায় প্রতিষ্ঠিত চন্দননগরের 'প্রবর্তক সংঘ' ১৩৩১ সালে তাঁদের ৮ম বার্ষিক অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যান। সেদিন প্রবর্তক সংঘ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালে, শরৎচন্দ্র তার উত্তরে বলেছিলেন—

আমার অনেক দিন থেকে প্রবর্তক সংঘে আসবার কল্পনা ছিল; কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় ও নানা কাজের ভিড়ে কখনও আসতে পারি নি। তখন তবু কাছে (বাজে শিবপুরে) ছিলাম, এখন তো অনেক দূরে (সামতাবেড়ে) চলে গেছি। এঁদের কাছ থেকে প্রতিবারই আহ্বান পেয়েছি—কোন বারই আসতে পারি নি। এইবার এসেছি।

আজ প্রবর্তক সংঘ যে অভিনন্দন দিলেন, বিনয় করে যদি বলি—এর কোনও দাবী আমার নেই, সেটা সত্য কথা হবে না। সাহিত্য-সেবা করে বঙ্গবাসীকে কিছু দান করেছি, তার জন্য দাবী একটা আছে। শক্তির চেয়ে বড় পুরস্কারই পেলাম। সেইটা দুহাত পেতে নিলাম।

আমার এই ক্ষেত্রে কিছু বলা দরকার—কিন্তু বলবার শক্তি ভগবান আমাকে একেবারে দেন নি। সকলে বোধ হয়, আমার কথা শুনতেও পাচ্ছেন না। এ সম্বন্ধে আপনারা কিছু আশাও করবেন না।

আমার একমাত্র বলবার বিষয় এই যে, অল্প সময়ের মধ্যে এখানে এসে যা দেখলাম, তা আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। এঁদের মূল কথা এই—মানুষকে মানুষ করে তোলা। ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের লোকেরা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছে। এঁদের উদ্দেশ্য—ভারতকে সেই হীনতা থেকে রক্ষা করা। ধর্মের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে, শিল্পের দিক দিয়ে যে ভারতবর্ষ একদিন বড় ছিল, তাকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মতিবাবু এই আশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাঁরা এই আশ্রমের কাজে নিযুক্ত আছেন—বিশেষ করে মতিবাবু—তাঁরা আমার চেয়ে বেশী জানেন, কি করে এই উদ্দেশ্য সফল করা যেতে পারে। তিনি যৌবন থেকে এই কর্মে ব্রতী। বহুদিন নানা কর্মের মধ্যে

থেকে, অনেক ভেবে ভেবে যে যে উপায় তিনি নিজের বুদ্ধিমত আবিষ্কার করেছেন, সেইটা কাজে লাগিয়ে তাঁর স্বপ্ন সফল হোক। আমার প্রার্থনা—আমি বেঁচে থাকতেই যেন তা দেখে যেতে পাই।

আর একটি কথা। দেখছি, আশ্রমের প্রতি এখানকার লোকের সহানুভূতি আছে। তাঁরা ভালওবাসেন। আমি এই প্রার্থনা করি—সকলে মিলে যেন এই প্রতিষ্ঠানকে সার্থক ও জয়যুক্ত করতে পারেন।

৭টা বাজে, আমার যাবার সময় হ'ল। সাহিত্য-সভা হ'লে কিছু হয়ত বলতে পারতাম। মতিবাবুকে আশীর্বাদ করছি। আজ পরমানন্দ নিয়ে বাড়ী চললাম। আমি বলতে কিছু পারি না, মামুলী কিছু একটা বলবার কথা—তাই কিছু বললাম। বলবার শক্তি ভগবান আমাকে দেন নি। একটা কথা বলে গেলাম—এখানে বা আর কোথাও যদি একটা সভা হয় তা হ'লে এবার কিছু লিখে নিয়ে আসবো। তাই পড়ে আপনাদের শোনাব। আজ এই পর্যন্ত। ('প্রবর্তক'—বৈশাখ ১৩৩৭)

বেলুড় মঠে

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

"১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের দিন বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভা আহূত হয়। ঐ সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র সুভাষবাবুর সহিত একত্রে আসিয়া তাঁহার পাশেই বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকটে বসিয়া শরৎচন্দ্রের সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলাম। এই সময় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সভাপতিকে অনুরোধ করিলে শরৎচন্দ্র আমাকে দেখাইয়া সুভাষবাবুকে বলেন—এই গিরীনবাবু, আমার রেঙ্গুনের পরমবন্ধু ও ভূ-পর্যটক, বেশ বক্তৃতা করিতে পারেন।

তখন সভাপতি মহাশয় আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— আশা করি আজিকার এই সভায় ভূ-পর্যটক গিরীনবাবু স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছু বলিবেন।

আমি সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বামীজী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

আমার বক্তৃতা শেষ হইলে সভাস্থ সকলের অনুরোধে শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত সন্ন্যাসীবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ! সকলেই জানেন, আমি বক্তা নই। বক্তৃতা আমি কোনদিনই দিতে পারি না। আমাকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এটি ধর্মসভা, কিন্তু আমি ধার্মিক নই, কোনদিন ধর্মচর্চা করিনি। সে কথা আমার লেখার মধ্যে চাইলেই আপনাদের চোখে পড়বে। মঠের সন্ন্যাসীদের কাজকর্মের উপর আমার বিশেষ আস্থা নাই। মঠের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনতে পাই—সেগুলোকে মনে করে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হ'লে অনেক সময় লাগবে, আর তার দরকারও নাই। আমার বিশ্বাস

উপস্থিত মঠের কাজগুলি ঠিক পরমহংসদেবের ভাবানুযায়ী বা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী কিছু হচ্ছে না।"

গিরীনবাবু এরপর লিখেছেন, বেলুড় মঠের স্বামী বিজয়ানন্দ, শরৎচন্দ্রের এই বক্তৃতার প্রতিবাদ করে সেদিন বলেছিলেন—শরৎবাবুর অনুজ স্বামী বেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তবুও শরৎবাবুর মত প্রতিভাবান লেখক এই মঠ ও মিশনের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ না জেনে এরূপ বলায়, আমরা বড়ই দুঃখিত।

বেলুড় মঠে শরৎচন্দ্রের সেদিনের ঐ বক্তৃতাটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের স্নেহাস্পদ সাহিত্যিক আশীষ গুপ্ত বলেন—

"শরৎচন্দ্রের মুখে ঐ সভার কথা আমি একাধিকবার শুনেছি। তিনি বলতেন—সুভাষ একরূপ জোর করেই আমাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যায়। অবশ্য মঠের সন্ন্যাসীদের আগ্রহেই সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি সুভাষকে বলেছিলাম—আমি তো গিয়ে উল্টো কথা বলব! আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছ?

সুভাষ বলেছিল—তা হোক্, তাঁরা বলেছেন, আপনি গিয়ে তাঁদের তিরস্কার করলেও, তাঁরা শুনবেন।

এরপর আর কি বলি! সুভাষের কথাও এড়াতে পারি না। অগত্যা গেলাম। গিয়ে মঠের সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করে বলেছিলাম—আপনারা এখন আর রামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী কার করছেন না।

আমি যখন এই কথা বলি, তখন দেখলাম—সুভাষ যেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে এবং আমাকে নিরস্ত করবার জন্য আমার জামার খুঁট ধরে টানছে।

আমার বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীদের বললে—মিশনের কাজে আরও প্রেরণা ও উৎসাহ আনবার জন্যই শরৎবাবু আপনাদের এই কথাগুলো বললেন। অন্য কিছু ভেবে বলেন নি।

আমি তখনই আবার দাঁড়িয়ে সুভাষের কথার প্রতিবাদ করে বললাম—না, না, সুভাষ। আমি যা বলেছি, তা ঠিকই বলেছি। ওর মধ্যে আর অন্য কোন অর্থ নেই। আমি পরিষ্কারই বলেছি।

এরপর অবশ্য সুভাষ আর কিছু বল্‌ল না।"

লাহোরে অভিনন্দন সভায়

শরৎচন্দ্র বহু বৎসর হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে যোগ দিতে শরৎচন্দ্র লাহোর যান। তিনি লাহোরে গেলে সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীরা এক বিশেষ সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সেদিন অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

বাস্তবিক এত দূরে এসে মনে করি নাই যে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আমার এক বন্ধু এখানে প্রফেসার ছিলেন, নাম অক্ষয়কুমার সরকার (হাওড়ার বাজে শিবপুরের অধিবাসী)। তাঁর কাছে শুনতাম, এখানে অনেক লোক আছেন, যাঁদের বাঙ্গলার সঙ্গে সম্পর্ক কম—যাঁরা একেবারে প্রবাসী হয়ে পড়েছেন। এত দূরে বাঙ্গলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কঠিন। তবু যে আপনারা বাঙ্গলার সঙ্গে পরিচয় রাখেন, তা স্পষ্টই দেখতে পেলাম।

দেখুন! আপনারা যে সব কথা বললেন, তাতে অনেক অতিরঞ্জন আছে। সাহিত্যের দিক দিয়ে কিছু করেছি বটে, কিন্তু যা করেছি তাতে জোচ্চোরি করি নাই—মানুষের কাছে বাহবা পাবার জন্য কিছু করি নাই।

আমি বড় বেশী বয়সে লিখতে আরম্ভ করি। কেরাণী ছিলাম। এখন বয়স তিপান্ন। লেখার মধ্য দিয়েই আমার অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। প্রথম যখন আরম্ভ করি তখন গালিগালাজের বান ডেকে গেল। যখন 'চরিত্রহীন' লিখি তখন পাঁচ-ছ বছর ধরে গালাগালির অন্ত ছিল না। তবে মনের মধ্যে আমার এই ভরসা ছিল যে, সত্যি জিনিসটা আমি ধরেছিলাম।

সত্য আর সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বনেদ, কিন্তু সেইটাই সব নয়। সাহিত্য একটা শিল্প—যেমন করে সাজালে মানুষের মনে একটা দাগ ফেলতে পারে, যা অনেকদিন থাকে। সত্যের দিক দিয়ে গেলে আর যাই

হউক, ভাল সাহিত্য হয় না। এই বিষয়ে আমি অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ করি নাই। এই করে আপনাদের এই স্নেহ পেলাম, এই আমার বড় আনন্দ।

একেবারে কিছু দাঁড়িয়ে বলা আমার হয় না। একটা হৈ-হৈ হয়, যা আমার ভাল লাগে না। বক্তৃতা আমি করতে পারি না। আমি অনেক সময় বলি, আমাকে তোমরা বক্তৃতা করতে ডেকো না। যে কৌতূহল তোমাদের মনে উঠেছে, সেই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। দেখুন, আপনাদের মাঝে আমার মনে হয়, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেন—আমিও কিছু বললাম—পরস্পর আদান-প্রদান হ'ল—সেই জিনিসটা আমি বড় মনে করি।

বাঙ্গলার গ্রন্থকার বলে আপনারা আমাকে ভালবাসেন জানালেন, সেইটাই আমি এখান থেকে নিয়ে যাব। রাজনীতি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি বলে সেইটাই আমার সব নয়। আমার শক্তি-সামর্থ্য এই দিক দিয়েই চলে—এই সাহিত্যের দিক দিয়ে। আমার সঙ্গীদের বলেছিলাম—এইখানে যদি একটু সাহিত্যের আলোচনা হ'ত—আমি মনের একটা তৃপ্তি সেই দিক দিয়ে পেতাম। অকস্মাৎ আপনাদের নিকট এইখান থেকে তাই পেয়ে গেলাম। বাস্তবিক আমি কৃতার্থ মনে করছি। যে সব বাঙ্গালী এইখানে আছেন, তাঁরা যে আমাকে ভোলেন নি, নানা কাজের ভিতর দিয়ে যাঁরা বাঙ্গলাতে যেতে পারেন না, তবু বাঙ্গলার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে—তাঁদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি বাঙ্গলা ভাষার দিকে যা দেখেছি, সেইটে নানা ভাবে দেখাই, আপনারাও তা দেখতে পান। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—সত্যই প্রার্থনা করুন, যেন এত বড় ভাষাকে—যাকে রবীন্দ্রনাথ এত বড় করে তুললেন, তাকে যেন আরও বড় করা হয়। খুব বেশী বয়সেই আমি লেখা আরম্ভ করি। অনেকগুলো বইও লিখলাম। গালিগালাজও হ'ল। তার মধ্যে যে কিছু আছে, তার প্রমাণ আজ আপনারা দিলেন।

পৃথিবীর সবাই আজ স্বীকার করছে, ভাষার দিক দিয়ে আমরা কিছুতেই ছোট নই। আগে যাঁরা বাঙ্গলা পড়তেন না, তাঁরাও আজ বাঙ্গলা পড়েন। এই ভাষা যে আজ কত বড় হয়েছে, তার আর তুলনা আছে? একটা দিক বাঙ্গালীর আছে, যেখান দিয়ে সে দাঁড়াতে পারে।

আমার বয়সও হ'ল, আর কতদিনই বা চলবে। তবে যেটা রইল, সেটা জমা হয়ে রইল, সেইটাকে যেন বরাবর বড় করবার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের স্বাধীনতা নেই, তার জন্ত আমরা লজ্জিত হয়ে থাকি। চোখে দেখি, গৃহস্থ ভদ্রলোক, তাদের কত দুর্দশা। সমাজের অপব্যবহার আমরা ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করতে পারি। ধরুন, এই বিয়ের ব্যাপার—কত করুণ ব্যাপারই না এই দিক দিয়ে ঘটছে। এই রকম এক একটা ব্যাপার বললে কত বলতে হয়। বলতে গেলে মাথা নীচু হয়। তবে একটা জিনিস আমাদের আছে, যেখানে আমরা গর্ব করতে পারি। ভাষা আমাদের কত বিরাট, কত গৌরবময়ী। চোখ বন্ধ করে আমি তাই অনুভব করি।

একটা বই লিখলাম 'পথের দাবী'—সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলে। তার সাহিত্যিক মূল্য কি আছে না আছে দেখলে না। কোথায় গোটা দুই সত্য কথা লিখেছিলাম, সেইটাই দেখলে।

এক, সমাজ দেখুন, তার মধ্যে পরস্পর মেলামেশা নেই। এক বাড়ীর মধ্যে ভাব নেই। মনের প্রত্যেক ভাব নিজেদের সংবরণ করতে হয়। অন্য জাতের এ সব বালাই নেই। জীবনে আনন্দের দিক দিয়ে তারা কত স্বাধীন। হয়ত তাতে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, কিন্তু তাতে দাগ হয় না। আমরা ঝগড়া করে অনেক কিছু বলতে পারি বটে, কিন্তু জীবনকে তারা বড় করে নিয়েছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তারা সেই সব প্রকাশ করছে। তাদের 'আর্মি', তাদের 'নেভি', তাদের 'চার্চ'—কত দিক দিয়ে তাদের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। আমাদের সমাজের দিক দিয়ে মনে হবে এটা বিশ্রী। আমাদের সাহিত্যিক নীতিটা আলাদা। সব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না। কতক বাইরে থেকে বাধা এসে পড়েছে, কতক নিজেদের সৃষ্টি। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাঁদের এই জন্য দোষ দিতে পারি না। আমারই কত গোলমাল হয়েছে। তবে ভগবানের ইচ্ছায় আজ বুঝতে পারছি যে, স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে অনেক 'অব্‌সোলিট' হবে তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। দেশের সাহিত্য স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে পারবে। উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি বাধা এসে পড়তে পারে। যে জিনিসটা হবে—ভরসা করি যেন হয়—তখন এই সাহিত্য প্রকাণ্ড হবে। যাঁরা আমার

বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁরা যদি এইটা করতে চান, তাঁরা যেন এইটা মনে রাখেন যে, সকল দিকে স্বাধীনতা না থাকলে এইটাকে বড় করা যায় না।

গর্ব করবার জিনিস আমাদের একমাত্র আছে—এই ভাষা। এইটা যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে—সহানুভূতির দিক দিয়ে হউক বা অন্য যে কোন দিক দিয়েই হউক—যেন তা না হয়। আমি অনেক জায়গায় বলি, যেন এটা না হয়। একটু ধৈর্যের সঙ্গে যা নীতি-বন্ধন আছে তার মধ্য দিয়েই সাহিত্য প্রচার হোক। কোন কাজে কোন অবহেলায় এই জিনিস যেন ছোট না হয়ে যায়। প্রবাসী আপনারা, এই জিনিসটা মনে করে রাখবেন।

সকলের মন এক নয়। একটা কথা যেন 'প্রিন্সিপিল'-এর মত মনে থাকে, যেন আমার কাজের মধ্যে এ না ছোট হয়। কোন একটা জাতের জাগরণ ভাষার মধ্য দিয়েই করতে হয়। যার ভাষা দুর্বল, তার উঠবার আশা নেই। যখনি দেখা যায় কোন জাতি উঠেছে, তখনি দেখা যায়, তার সাহিত্যও বড় হয়েছে। আপনারা শুধু এইটে দেখবেন, যেন ভাষা না ছোট হয়—দেখবেন আপনাদের সব কিছুই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আপনারা বাঙ্গলাতেই থাকুন, আর প্রবাসেই থাকুন, সবই এক—ভাষার সঙ্গে যতদিন পরিচয় রাখবেন, ততদিন সবই এক।

আমি বাস্তবিক বড় কৃতার্থ হলাম। এই যে মালা দিলেন, এই আমার বড় সৌভাগ্য। এর চাইতে সম্মান আমি চাই না—চাইলেও থাকবে না। এই মালাই আমার খুব বড়। এইটি মাথায় করে নিয়ে গেলাম।—'উত্তরা', আষাঢ় ১৩৩৭।

পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরে

১৩৩৫ সালের ৯ই বৈশাখ রবিবার তারিখে পুরুলিয়ায় 'হরিপদ সাহিত্য-মন্দির' নামক একটি পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন সুরু হয়। ঐ অধিবেশন কয়েকদিন ধরে চলেছিল। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র।

কয়েকদিন পরে ১৫ই বৈশাখ (ইং ২৮-৪-২৮) তারিখের দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় ঐ সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল দেখছি, তা হচ্ছে এই—

"পুরুলিয়ায় শরৎচন্দ্র

সাহিত্য মন্দিরে বক্তৃতা

পুরুলিয়া, ২৬শে এপ্রিল—গত রবিবার হইতে স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় সাহিত্যে অস্পৃশ্যদের কোন অধিকার না থাকার কথা উল্লেখ করেন এবং যাহাতে তাহারা সাহিত্যের চর্চা করিতে পারে, তাহার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্ণেল মুখার্জির কথা সমর্থন করেন এবং 'পথের দাবী'র প্রণেতারূপে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, যখন সময় আসিবে তখন তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন। তাহার জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে না।

অধিক রাত্রিতে সভা ভঙ্গ হয়।"

[শরৎচন্দ্রের মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সোমেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের এই পুরুলিয়া যাওয়ার কথা-প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেছিলেন—

"শরৎদার পুরুলিয়া যাওয়ার গল্প আমি এবং আমার মেজকাকা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় ছেলে রবি, আমরা একদিন আমাদের ন'সেজ কাকা সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলাম। সে কাহিনীটা এই—

ন'কাকা ঐ সময় পুরুলিয়ায় অ্যাসিস্টাণ্ট সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি সেই কিছুদিন মাত্র পুরুলিয়ায় বদলি হয়ে এসেছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তখনও তাঁর ভাল পরিচয় হয়নি। আর শরৎদা যে তাঁর ভাগ্নে হন, এ কথাও স্থানীয় কেউ জানতেন না।

সভার আগের দিন ন'কাকা সভার একটি নিমন্ত্রণ পত্র পান। শরৎদা যে পুরুলিয়ায় আসছেন, ঐ নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েই ন'কাকা প্রথম জানতে পারেন। এর আগে তিনি এ খবর জানতেন না।

শরৎদা কখন কোন্ ট্রেনে আসবেন, এ কথাটা ন'কাকা সভার উদ্যোক্তাদের একজনের কাছ থেকে জেনে নিলেন, কিন্তু সভার সভাপতি যে তাঁর আত্মীয় এ কথাটা আর তাঁকে বললেন না।

ন'কাকা শরৎদার আসবার সময়টা জেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্টেশনে গেলেন।

যথাসময়ে ট্রেন এলে, শরৎদা ট্রেন থেকে নেমে ন'কাকাকে দেখেই বলে উঠলেন—সত্য! তুই এখানে!

ন'কাকা বললেন—আমি তো, কদিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছি।

—তবে চল্, তোর ওখানেই যাই। উঃ, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা!

এদিকে শরৎদাকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য সভার উদ্যোক্তাদের অনেকেই স্টেশনে এসেছিলেন। উদ্যোক্তাদের যিনি শরৎদাকে তাঁর সামতা-বেড়ের বাড়ী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন, তিনি স্টেশনে আগত তাঁর দলের সকলকে দেখিয়ে শরৎদাকে বললেন—এঁরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এসেছেন।

তখন আগত উদ্যোক্তারা সকলেই শরৎদাকে নমস্কার করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—আপনার থাকার জন্য আমরা একটা সুন্দর বাড়ীতে ব্যবস্থা করেছি। অন্যান্য সাহিত্যিক অতিথিরাও এসে সেখানে থাকবেন।

শরৎদা ন'কাকাকে দেখিয়ে তাঁদের বললেন—ইনি আমার মামা এবং বাল্যবন্ধু। মামার বাড়ীর চেয়ে এখানে আমার থাকার আর ভাল জায়গা হতে পারে না। অতএব তোমরা যাও। আমার থাকার জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না।

এই বলে শরৎদাই একরূপ জোর করে ন'কাকাকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে এলেন। কেন না, সভার উদ্যোক্তারা পাছে কিছু মনে করেন, এইজন্য ন'কাকা তখন একটু ইতস্ততঃ করছিলেন।

অগত্যা সভার উপস্থিত উদ্যোক্তারা সকলেই এঁদের সঙ্গে সঙ্গে ন'কাকর বাসায় এলেন। তাঁরা এলে শরৎদা আবার তাঁদের বললেন—তোমরা যাও, তোমাদের সভার সময় গেলেই তো হ'ল!

শরৎদার এই কথায় এবার তাঁরা ফিরে গেলেন।

সভা আরম্ভের অনেক আগে থেকেই শরৎদাকে ন'কাকার বাড়ী থেকে আনতে গেলেও, শরৎদা যাচ্ছি, যাচ্ছি করে সভার অনেক পরে সভায় গিয়েছিলেন। তাও খানিকটা সময় থেকেই চলে এসেছিলেন।

ওঁদের ঐ সভা কয়েকদিন ধরে চলেছিল। প্রতিদিনই সভায় শরৎদার উপস্থিত থাকবার কথা। কিন্তু তিনি ঐ যা একদিন কিছুক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন, তারপর আর একবারও সভায় যান নি।

শরৎদা পুরুলিয়ায় গেলে, তখন সেখানকার আরও অনেক প্রতিষ্ঠান, তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি কোথাও যান নি।

ন'কাকার বাড়ীতেই তিনি কদিন ছিলেন। কোথাও যেতেন না—ন'কাকার সঙ্গেই গল্প নিয়ে মেতে থাকতেন।"

পুরুলিয়ার কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জী চিকিৎসক ও খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা এবং দেশবন্ধুর বৈবাহিক।

নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন, পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও দেশসেবক।]

কালিয়ায় 'বাণীমন্দিরে'

১৩৪১ সালের কার্তিক মাসে শরৎচন্দ্র একবার যশোহর জেলার বিখ্যাত কালিয়া গ্রামে 'বাণীমন্দির' নামক একটি লাইব্রেরী ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়েছিলেন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠিতেও এই কালিয়া যাওয়ার কথা দেখছি। ১৩৪১ সালের ৯ই কার্তিক তারিখে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদবাবুকে লিখেছিলেন—'কালিয়া (যশোর) থেকে পরশু রাত্রে ফিরেচি…।'

যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের এই কালিয়া যাওয়ার কথা এবং সেখানে গিয়ে তাঁর বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা-ই এখানে বলছি—

কালিয়ার দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বিখ্যাত বিপ্লবী সুশীলকুমার দাশগুপ্তর দাদা বিনয়কুমার দাশগুপ্তও একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। বিনয়বাবু কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের বিশেষ পরিচিত ও স্নেহাস্পদ ছিলেন।

বিনয়বাবু জানতেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কিরণবাবুর খুব সৌহার্দ্য। তাই বিনয়বাবু, শরৎচন্দ্রকে দিয়ে তাঁদের গ্রামের বাণীমন্দির নামক লাইব্রেরীর নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করানোর প্রস্তাব, একদিন কিরণবাবুর কাছে করেন।

কিরণবাবু শুনে বিনয়বাবুর হাতে শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখে দেন। চিঠিতে তিনি কালিয়ায় যাওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানান।

শরৎচন্দ্র তখন কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে বাস করছিলেন। বিনয়বাবু কিরণবাবুর চিঠি নিয়ে একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন।

শরৎচন্দ্র কিরণবাবুর চিঠি পেয়ে এবং বিনয়বাবুকে নিজেদের রাজনৈতিক দলের ও বিপ্লবী সুশীলবাবুর দাদা জেনে বললেন—আমি সাধারণতঃ সভায় যাই না। তা বেশ তোমাদের সভায় যাব, মত দিচ্ছি।

শরৎচন্দ্রের মত পেয়ে বিনয়বাবু কালিয়া চলে গেলেন। তারপর যথাসময়ে সভার চিঠিপত্র ছাপানো হ'ল।

ঐ সময় বিনয়বাবুর মায়ের হঠাৎ খুব অসুখ হওয়ায়, তিনি আর শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় আসতে পারলেন না। তিনি তাঁর আসার অসুবিধার কথা এক পত্রে জানিয়ে কালিয়ার অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী নামে এক যুবককে, শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

অশ্বিনীবাবু তখন কলকাতায় এম-এ পড়তেন। শরৎচন্দ্র কালিয়ায় যাবেন বলে যেদিন বিনয়বাবুকে মত দিয়েছিলেন, সেদিন অশ্বিনীবাবুও বিনয়বাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

কালিয়ার সভা ছিল, দুর্গাপূজার বিজয়ার ঠিক পরেই। তাই ঐ সময় পুজোর ছুটি থাকায় অশ্বিনীবাবু কলকাতা থেকে কালিয়ায় বাড়ী চলে গিয়েছিলেন। তিনি কালিয়া থেকেই শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় এলেন।

অশ্বিনীবাবু সভার আগের দিন সকাল ১০টা নাগাদ শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে বললেন—আজ রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে ট্রেন। আমি সন্ধ্যার পর এসে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

শরৎচন্দ্র অশ্বিনীবাবুকে বললেন—আরে, রাখ রাখ তোমার সভা। তুমি এখন এখানে নাও, খাও। নাইবা গেলাম! কি হবে গিয়ে!

অশ্বিনীবাবু শুনে বললেন—সর্বনাশ! আপনি না গেলে আমাকে আর গ্রামে ঢুকতে হবে না।

—ট্রেনের তো এখন অনেক সময় আছে। সে পরে দেখা যাবে। তুমি এখন তো নাও-খাও।

—না, আমি এখানে কিছু খাব না। আমাকে কিছু কেনা-কাটা করতে হবে। আমি এখন যাই, সন্ধ্যার সময় আসব।

—আচ্ছা, এস।

অশ্বিনীবাবু চলে এলেন এবং পরে যথাসময়ে সন্ধ্যার পরই শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন।

অশ্বিনীবাবুকে দেখেই শরৎচন্দ্র এবার বললেন—শরীরটা ভাল নয়। যেতে পারব না।

অশ্বিনীবাবু শরৎচন্দ্রের সকালের কথা শুনেই সারাদিন চিন্তায় কাটিয়েছেন, এখন আবার এই কথা শুনে হতাশ হয়ে পড়লেন।

অশ্বিনীবাবু কালিয়া থেকে আসবার সময় বিনয়বাবু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন —শরৎবাবু না আসবার জন্য নানা কথা বলবেন ও অনেক রকম কৈফিয়ৎ দেখাবেন। তুমি তাঁর কোন কথাতেই ভুলবে না। তুমি তাঁর বাড়ীতে 'হত্যে' দিয়ে পড়ে থেকেও তাঁকে আনবে।

বিনয়বাবুর এই কথা অশ্বিনীবাবুর মনে ছিল। তাই তিনি শরৎচন্দ্রের কথায় ততটা না দমে বললেন—আপনি না গেলে, আমি হত্যে দিয়ে আপনার বাড়ীতে পড়ে থাকব।

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—একান্তই যেতে হবে ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—আচ্ছা, কিভাবে কোথা দিয়ে যেতে হবে, পথের বিবরণটা একটু দাও।

অশ্বিনীবাবু যাত্রাপথের বিবরণ দিলে, শরৎচন্দ্র বললেন—তুমি তাহলে কিছু খেয়ে-টেয়ে নাও।

—আমি খেয়ে এসেছি।

—তবে বোসো, আমি দুটি খেয়ে নিই।

এই সময় শরৎচন্দ্র তাঁর ভৃত্য যামিনীকে ডেকে বললেন—ওরে যামিনী, আমার সঙ্গে তোকেও যশোর যেতে হবে। যা, চাট্টি খেয়ে নে এখুনি।

শরৎচন্দ্র খেতে গেলে, অশ্বিনীবাবু সেই ফাঁকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এলেন।

এই সময় শরৎচন্দ্র একটা সাদা রঙের কলারহীন চায়নিজ কোট গায়ে দিয়ে তার উপর একটা চাদর নিয়ে উপর থেকে নেমে এলেন।

শরৎচন্দ্র বাড়ী থেকে রওনা হবেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী এসে তাঁকে প্রণাম করলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী যামিনীকে বললেন—মনে করে বাবুকে বলিস্, আসবার সময় যেন একটা যাঁতি কিনে আনেন। শুনেছি যশোরে ভাল যাঁতি পাওয়া যায়।

(অশ্বিনীবাবু বলেন—শরৎচন্দ্র কালিয়া থেকে ফেরবার সময় আমি তাঁকে একটা ভাল যাঁতি কিনে দিয়েছিলাম।)

শরৎচন্দ্র ভৃত্য যামিনীকে নিয়ে অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেই ড্রাইভারকে বললেন—কুত্তা-উত্তা দেখ্‌কে যাও।—তারপর চুরুট ধরিয়ে হেলান দিয়ে বসে চুরুট টানতে লাগলেন।

স্টেশনে এসে অশ্বিনীবাবু শরৎচন্দ্রের জন্য ১টি প্রথম শ্রেণীর এবং যামিনীর জন্য ১টি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনলেন। তিনি আসবার সময় রিটার্ন টিকিট কিনে এসেছিলেন। তাই অশ্বিনীবাবু শরৎচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে এবং যামিনীকে সার্ভেন্টস্ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিয়ে, নিজে পাশের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠলেন।

শিয়ালদহ থেকে যশোহর জেলার কালিয়ায় যেতে হ'লে, খুলনা মেলে খুলনা পর্যন্ত যেতে হয়। তারপর খুলনা থেকে স্টীমারে কালিয়া যেতে হয়।

শিয়ালদহ থেকে খুলনা যাওয়ার পথে আগে যশোহর, তারপর অনেকগুলো স্টেশন বাদে খুলনা পড়ে।

রাত্রি প্রায় দেড়টা নাগাদ ঐ ট্রেন যশোহর স্টেশনে এসে পৌছল। গভীর রাত্রে ট্রেন স্টেশনে এলে, স্টেশনে রেলওয়ের লোক যখন যাত্রীদের জানাবার জন্য 'যশোর, যশোর স্টেশন' বলে ডেকে উঠল, তখন ঐ ডাক শুনেই যামিনী তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে যে জিনিসপত্র ছিল, তা নিয়ে নেমে পড়ল।

যামিনী যে এখানে নেমে পড়ল, শরৎচন্দ্র বা অশ্বিনীবাবু কিছুই জানতে পারলেন না।

যামিনী নেমে ভেবেছিল, তার মনিবও নিশ্চয়ই নেমেছেন। তাই সে তার মনিবের কামরার কাছে না গিয়ে নিজের সঙ্গের জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে ধীরে সুস্থে গুছিয়ে নিচ্ছিল এবং একজন কুলীর সন্ধান করছিল।

এদিকে ট্রেন স্টেশনে দু-এক মিনিট থেকেই ছেড়ে দিল। ক্রমে স্টেশনের লোকও পাতলা হয়ে এল।

যামিনী তার মনিবকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেল না।

প্রভু যে কেন নামলেন না, যামিনী তা কিছুই বুঝতে পারলো না। গভীর রাত্রে দূরদেশে অচেনা জায়গায় পড়ে যামিনীর তখন কান্না আসবার উপক্রম হ'ল।

যামিনীর কাছে ট্রেনের টিকিট ছিল না। সকলেরই টিকিট ছিল অশ্বিনী বাবুর কাছে।

স্টেশনের টিকিট-কালেক্টর যামিনীর কাছে টিকিট চাইতে গিয়ে টিকিট

পেলেন না। তখন তিনি যামিনীকে স্টেশন মাস্টারের কাছে ধরে নিয়ে গেলেন।

স্টেশন মাস্টার যামিনীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন যে, সে তার মনিব বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে আসছিল। তার মনিব যশোরে সভা করতে আসছিলেন। তার নিজের টিকিট তার মনিবকে যিনি সঙ্গে করে আনছিলেন, তাঁর কাছেই আছে।

এদিকে ঠিক সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলনা মেল খুলনায় এসে পৌঁছল।

অশ্বিনীবাবু তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে এলেন। অশ্বিনীবাবু এলে শরৎচন্দ্র ট্রেন থেকে নামলেন। নেমেই অশ্বিনীবাবুকে বললেন—যামিনীকে ডাক। সে হয়ত এখনও ঘুমুচ্ছে।

অশ্বিনীবাবু সার্ভেণ্টস্ কম্পার্টমেণ্টে যামিনীকে ডাকতে গিয়ে দেখেন, যামিনী নেই। ভাবলেন, হয়ত আগেই নেমে পড়েছে। এই ভেবে তিনি স্টেশনের এদিক-ওদিক খুঁজে দেখলেন। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলেন না। তখন অশ্বিনীবাবু বেশ একটু চিন্তিত হয়েই শরৎচন্দ্রের কাছে এসে বললেন—তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না!

এই শুনেই শরৎচন্দ্র বললেন—সে কি! কোথায় গেল সে? আশেপাশে খুঁজে দেখেছ?

—আজ্ঞে, আমি স্টেশনের অনেকটা দূর পর্যন্তই ঘুরে ঘুরে দেখলাম, কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলাম না।

—সর্বনাশ! সে তাহলে কোথায় হারাল? আমি ফিরে গিয়ে তার মাকে কি বলব? বিধবার সে একমাত্র ছেলে!—শরৎচন্দ্র এই কথাগুলো বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলে যেতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্রের এই অবস্থা দেখে অশ্বিনীবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শরৎচন্দ্রকে কি বলে যে তিনি শান্ত করবেন, কিছুই ভেবে পেলেন না।

ঠিক এই সময়ে অশ্বিনীবাবুর পরিচিত একটি যুবক সাইকেল নিয়ে স্টেশনে বেড়াতে এসেছিল। তার বাড়ী কালিয়ায় হলেও সে তার বাপ-মার সঙ্গে খুলনাতেই থাকত। তার বাবা খুলনায় কাজ করতেন।

অশ্বিনীবাবু তাকে দেখতে পেয়ে মনে একটু বল পেলেন। তাকে ডেকে তিনি একান্তে সংক্ষেপে সব কথা বললেন।

এরপর দুজনে মিলে শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনি স্টেশনে ওয়েটিং রুমে একটু বসুন, আমরা তাঁর খোঁজ করে দেখছি।

—দেখ, তাকে যে করেই হোক্ খুঁজে বার করতেই হবে। তা না হ'লে আমি ফিরে গিয়ে তার মাকে কি বলব ?

অশ্বিনীবাবু ও তাঁর বন্ধুটি দুজনে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ওয়েটিং রুমে বসালেন।

অশ্বিনীবাবুর ঐ বন্ধুটির সঙ্গে খুলনার স্টেশন মাষ্টারের পরিচয় ছিল। তিনি অশ্বিনীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশন মাষ্টারের কাছে গেলেন। গিয়ে সমস্ত কথা তাঁকে বললেন। তারপর তাঁকে বললেন—আপনি দয়া করে এখান থেকে কলকাতার দিকে বড় বড় স্টেশনগুলোয় টেলিগ্রাম করে জানুন, কোন স্টেশনে শরৎবাবুর ভৃত্য নেমে পড়েছে কিনা।

শরৎচন্দ্রের বিপদ শুনে খুলনার স্টেশন মাষ্টার তখনই খুলনা থেকে পর পর স্টেশনগুলোয় টেলিগ্রাম করে জানতে লাগলেন। এইভাবে টেলিগ্রাম করতে করতে যশোহরের স্টেশন মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করলে তিনি জানালেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে একজন লোক নেমে পড়েছে। সে বলছে যে, সে শরৎবাবুর চাকর। শরৎবাবু যশোরে সভা করতে এসেছেন, সে তাঁর সঙ্গে এসেছে। আমি তো এখানে অনেক খোঁজ নিয়ে দেখলাম, কই শরৎবাবু তো যশোরে আসেন নি।

যশোরের স্টেশন মাষ্টারের কথার উত্তরে খুলনার স্টেশন মাষ্টার জানালেন—শরৎবাবু কালিয়ায় সভা করতে যাচ্ছেন। তিনি এখন এখানে আছেন। আপনি দয়া করে পরের ট্রেনে তাঁর চাকরকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

যামিনীর খোঁজ পাওয়া গেলে অশ্বিনীবাবু তখনই ছুটে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে খবরটা দিলেন।

শরৎচন্দ্র খবর পেয়ে নিজে স্টেশন মাষ্টারের কাছে এলেন। এসেই বললেন —বেঁচে আছে তো ?

স্টেশন মাষ্টার সশ্রদ্ধচিত্তে শরৎচন্দ্রের কথার উত্তরে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সে পরের ট্রেনেই এখানে এসে যাচ্ছে, যশোরের স্টেশন মাষ্টার নিজে তাকে ট্রেনে তুলে দেবেন বলেছেন।

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—যাক্, ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন।—এই বলে স্টেশন মাষ্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শরৎচন্দ্র খুলনার ষ্টেশন মাষ্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে এসে অশ্বিনীবাবুকে বললেন—যেখানে ওয়েটিং রুমে বসেছিলাম, ঐখানেই বসি গিয়ে। যামিনী আসুক, সে এলে তাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাব। তোমাদের কালিয়ায় আর যাব না।

শরৎচন্দ্র কালিয়ায় যাবেন না শুনে, অশ্বিনীবাবু আবার এক ভাবনায় পড়লেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলে, শুধু বললেন—স্যার, পরের ট্রেন আসতে অনেক দেরি, দুপুরের সময় সে ট্রেন আসবে। আপনি ততক্ষণ এখানের ডাকবাংলোয় চলুন, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করবেন।

কারও বাড়ীতে যেতে হবে না শুনে শরৎচন্দ্র রাজী হলেন। বললেন—তাই চল। ট্রেন আসার সময় হ'লে তুমি এসে যামিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অশ্বিনীবাবু ও তাঁর বন্ধুটি দুজনে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ডাকবাংলোয় গেলেন। সেখানে একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরে শরৎচন্দ্রের থাকার ব্যবস্থা করলেন। শরৎচন্দ্র ঘরের ইজিচেয়ারে বসেই অশ্বিনীবাবুকে বললেন—অশ্বিনী, একটু তামাকের ব্যবস্থা করতে পার?

শরৎচন্দ্রের এই কথায় অশ্বিনীবাবু ও তাঁর বন্ধু দুজনে মিলে, থেলো হুঁকো, কল্‌কে ও সুগন্ধি তামাক কিনে এনে, তামাক সেজে শরৎচন্দ্রকে দিলেন।

তামাক পেয়ে শরৎচন্দ্র এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানতে লাগলেন।

এই অবসরে অশ্বিনীবাবু তাঁর বন্ধুকে নিয়ে খুলনার পোষ্ট অফিসে গেলেন। উদ্দেশ্য—শরৎচন্দ্র যে কালিয়ায় যেতে চাইছেন না, সেই সংবাদটা টেলিগ্রাম করে কালিয়ায় বিনয়বাবুকে জানিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে তখনই খুলনায় চলে আসতে বলা।

খুলনার পোষ্ট মাষ্টারকে সমস্ত কথা খুলে বললে, তিনি তখনই টেলিগ্রাম করে দিলেন।

পোষ্ট অফিস থেকে বেরিয়ে অশ্বিনীবাবু তাঁর বন্ধুকে বললেন—তুমি এবার

বাড়ী যাও। বাড়ী গিয়ে শরৎবাবুর দুপুরের খাবারটা তোমাদের বাড়ীতে রান্নার ব্যবস্থা কর। রান্না হলে খাবারটা নিয়ে চলে এস।

অশ্বিনীবাবু বন্ধুকে বিদায় দিয়ে ডাকবাংলোয় ফিরে এসে দেখেন—ডাক বাংলো লোকে-লোকারণ্য। শরৎচন্দ্র খুলনায় এসেছেন, এসে ডাকবাংলোয় উঠেছেন—এই কথাটা কিভাবে লোকের মুখে মুখে প্রচার হওয়ায় খুলনার অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ নরনারী ডাকবাংলোয় এসে জমা হয়েছে।

অশ্বিনীবাবু সেই লোকারণ্যের মধ্য দিয়ে কোন রকমে পথ করে নিয়ে শরৎচন্দ্রের কাছে এসে দেখেন, শরৎচন্দ্র ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে কয়েক জনের সঙ্গে গল্প করছেন এবং খুলনার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

দুপুরের দিকে শরৎচন্দ্রের খাবার এলে, তিনি স্নানাহার করলেন।

তারপর তামাক টানতে টানতে একটু বিশ্রাম করতে থাকলে, সেই সময় অশ্বিনীবাবু যামিনীকে আনবার জন্য স্টেশনে গেলেন।

ট্রেন এসে পৌছলে অশ্বিনীবাবু যামিনীকে খুঁজে বার করলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে পথে দোকানে খাইয়ে ডাকবাংলোয় ফিরে এলেন।

শরৎচন্দ্র যামিনীকে দেখে শুধু বললেন—তোর কোন দোষ নেই। যশোর যাব চল—বলে আমিই ভুল করেছিলাম। তোকে তখনই সব খুলে বলা উচিত ছিল। কিছু খেয়েছিস্ ?

—আজ্ঞে, অশ্বিনীবাবু আমাকে পথে এক দোকানে খাইয়ে এনেছেন।

—অশ্বিনীর সব দিকেই বেশ নজর আছে দেখছি। নে যামিনী তামাক সাজ।

যামিনী তামাক সেজে দিলে শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্ত হয়ে তামাক টানতে লাগলেন।

এই সময় বিনয়বাবুও কালিয়া থেকে ডাকবাংলোয় এসে গেলেন।

শরৎচন্দ্র বিনয়বাবুকেও বললেন—আর কালিয়ায় যাব না। বিকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাব।

বিনয়বাবু বললেন—আপনি যাবেন ব'লে, কালিয়ার স্টীমার ঘাটে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য কয়েক হাজার লোক সকাল থেকে অপেক্ষা

করে ছিল। মেয়েরা শাঁখ হাতে করে এসেছিল। লাজ-বর্ষণ করবার জন্য তাদের অনেকের হাতে ছিল খই-ভর্তি থালা। কত লোক ফুলের মালা এনেছিল। সুসজ্জিত ব্যাণ্ডপার্টি ছিল, আর আমরা তো ছিলামই। আমি সকলকে বলে এসেছি—হাতে-পায়ে ধরে যে করেই হোক, তাঁকে নিয়ে আসবই। আপনি না গেলে আমাকে আর কারও কাছে মুখ দেখাতে হবে না। বিরাট সভামণ্ডপ, সভার আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শরৎচন্দ্র সব শুনে বললেন—আচ্ছা যাব, চল। তা না হ'লে তোমাকে একটু হেয় হতেই হবে বটে।

শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার দিকে সদলে খুলনা থেকে স্টীমারে কালিয়া রওনা হলেন। অনেকটা রাত্রেই স্টীমার কালিয়ায় এসে পৌছল। সকালের মত না হলেও, তখনও কিন্তু অনেক লোক স্টীমার ঘাটে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিল।

শরৎচন্দ্র কালিয়ায় গিয়ে তিন দিন ছিলেন। একদিন তিনি লাইব্রেরীর নতুন বাড়ীর উদ্বোধন করেছিলেন। সেদিন ঐ নিয়ে এক সভা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন তাঁর আগমন উপলক্ষে স্থানীয় নাট্যদল রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সে অভিনয় দেখেছিলেন। তৃতীয় দিন শরৎচন্দ্র কালিয়ার অনেকের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে বেড়িয়েছিলেন।

বিনয়বাবু বলেন, লাইব্রেরীর নতুন বাড়ীর উদ্বোধন সভায় শরৎচন্দ্র যে মৌখিক অভিভাষণটি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই—

আমি বক্তৃতা করতে পারি না। বক্তৃতা শুনবার জন্য আমাকে যদি এনে থাকেন, তাহলে বলব, আপনারা ভুল করেছেন। আমি বক্তা নই, এমন কি ঠিক সাহিত্যিকও নই। কেননা আমি বঙ্কিমচন্দ্রের মত চাঁদ বা নদী নিয়ে পাতার পর পাতা লিখতে পারি না। আমি বরং একজন বৈজ্ঞানিক। অবশ্য পদার্থ-বিজ্ঞানী নই। আমি মনোবিজ্ঞানী। আমি মানুষের মনের খবর রাখি। এবং তাই নিয়েই কারবার করি। মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, ভালবাসা ও মানসিক দ্বন্দ্বকেই আমি আমার সাহিত্যে ফোটাবার চেষ্টা করে থাকি। সেই দিক থেকে আমি একজন বিজ্ঞানী অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানী।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে

১৩৪১ সালের পৌষ মাসে কলকাতার টাউন হলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন হয়। ঐ সম্মিলনে সাহিত্য শাখার অধিবেশনে শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি সভায় বলেছিলেন—

আপনারা এখানে এসেছেন নানা স্থান থেকে। এসে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল, আলাপ পরিচয় হ'ল। আগে যে সমস্ত সভা-সমিতিতে আমি যোগ দিয়েছি, এই আক্ষেপই করেছি যে, সভায় যোগ দিলাম বটে, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল না।

এটা একটা উন্নত সাহিত্য-সভা। সাহিত্য আমার পেশা, জীবিকাও এই। এই জিনিসটা আরম্ভ করে আমি কতটা কি করতে পেরেছি না-পেরেছি, তা আপনারা পাঁচজনেই জানেন।

আপনারা আমায় বলেন, বক্তৃতা করতে। প্রথমতঃ আমি বলতে পারি নে। গলাও নেই, কথাও খুঁজে পাই না। তবুও আপনারা মনে করেন কতকটা কাজ হয়েছে—এবং নিজের আত্মবিশ্বাসই বলুন বা আত্মসম্ভ্রমই বলুন, আমি মনে করি আমি চেষ্টা করেছি।

সাহিত্যের ব্যাপারে গোড়া থেকেই বলেছি, যেন আমি কখনও মিথ্যার আশ্রয় না নিই। অবশ্য সত্যি জিনিসটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার আছে, যা সত্যি কিন্তু সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সত্যিটা যেন বনেদের মত মাটির নীচে থাকে এবং তাহলে তার উপর যে সৌধটা গড়ে তুলবো কল্পনা দিয়ে—সেটা সহজে ডুবে যাবে না।

আমার জীবনে আমি কয়েকবার দেখেছি—আমার লেখা পড়ে অনেকে বললেন, 'এটা ভারী অস্বাভাবিক।' পাঁচজনে পাঁচ রকম ভাবে কত কথাই বললেন। সেটা যদি সত্যিকার জ্ঞানের উপর না দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সংশয় আসে, পাঁচজনে যখন বলছে, তখন দিই বদলে। কিন্তু মানুষে ভুল করুক আর যাই করুক—যখন আমি জানি যে এর ভিত্তি আছে সত্যের উপর, তখন

মনে কোন সংশয় আসে না যে এটা বদলাই। সেই জন্য আমার লেখায় যা হয়, একেবারেই হয়ে যায়, উত্তরকালে আর কাটাকাটি করি নে।

আপনাদের যার যেখানে সন্দেহ আছে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর দিই। তাতে সাহিত্যিক সম্মিলনের যা বড় উদ্দেশ্য, তার সার্থকতা হবে। এই যে 'রিজিডিটি' ভাব, এটা একটু বদলানো দরকার। অনেকে সাহিত্য-সভায় যোগদান করেন; কিন্তু চলে যাবার সময় তাঁরাই মনে করেন এই যে, এত খরচ করে এত দূর থেকে এলাম, কি এমন কাজ করলাম। প্রবন্ধ যে পড়া হয়, বার আনা লোক তা শোনেই না, আর যদি বা শোনে তখনি ভুলে যায়।

তাই আমি বলছিলাম, যদি কেউ আমার সঙ্গে পরিচয় করতে চান, কারও যদি কোন সংশয় থাকে, তবে আসুন কথাবার্তার মেলামেশায় আমরা আলোচনা করি, ইহাই আজকের সন্ধ্যার অনুষ্ঠান। ('বাতায়ন'—৪ঠা মাঘ, ১৩৪১)

কবি অতুলপ্রসাদের শোক-সভায়

১৩৪১ সালের পৌষ মাসে কলকাতায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের শেষ দিন (১৪ই পৌষ) দুপুরে, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্যতম কবি অতুলপ্রসাদ সেনের অকাল মৃত্যুতে যে শোক সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। সেদিন সভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন আমার ভারী বন্ধু ছিলেন। আপনারা আমাকে এই সমস্ত মৃত্যুর পরে শোক-সভায় বক্তৃতা করার জন্য কেন ডাকেন? মানুষে জানে আমি বক্তৃতা করতে পারি নে; তবুও আমাকে ডেকে এনেছেন আজকের দিনে আপনাদের কিছু বলবার জন্যে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—অনেক আলাপ-পরিচয় সেদিন তিনি করলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁর পরলোক গমনের খবর পাওয়া গেল—আমি বিস্মিত হলাম এই পর্যন্ত, কোন রকম দুঃখ বা শোক আমার এল না। মানুষের একটা বিশেষ বয়সের পরে মানুষ যখন যায়, তখন সেটা এমন নিশ্চিত জিনিস মনে হয় যে, সেটা আমার কাছে আনন্দের আকারে দেখা দেয়।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন ভারী ভক্ত এবং ভগবৎ-প্রেমে তাঁর মন পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর দয়া, দান, দাক্ষিণ্য জানাবার লোক এ সভায় নেই,—তাঁরা অত্যন্ত গরীব—অখ্যাত, অজ্ঞাত, অজানা লোক। তাঁরা যদি আসতে পারতেন, তাহলে বলতেন কত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে অতুলপ্রসাদ দিয়েছেন এবং তাঁদের বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন।

তাঁর গান বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে যেখানে যেখানে বাঙালী আছেন, সেখানে পৌঁছেছে। তাঁর জীবনটিও ছিল ঐ রকম ধরণের। সংসারে থাকতে হ'লে দুঃখ, আনন্দ, ব্যথা সবই আছে; তিনি তার বাইরে ছিলেন না। তারপর তাঁর দিন এল—ডাক পড়ল—তিনি চলে গেলেন। বয়সে যাঁরা কম,

তাঁরা এই নিয়ে অশ্রুপাত করতে পারেন ; কিন্তু আমাদের দিন এসে পড়েছে— সেই দিক দিয়ে—আমার অতুলপ্রসাদের জন্য শোক বোধ হয় না। মনে হয় এই নিয়ম, এই রকমেই মানুষ যায়—দুদিন আগে আর দুদিন পরে। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, তিনি কখনও কারও ক্ষতি করেন নি—সকলের ভাল করে গেছেন।

গানের ভিতর দিয়ে, কাব্যের ভিতর দিয়ে তিনি বাঙলা ভাষার অনেক উন্নতি করেছেন। তাঁর গানের মত ছিল তাঁর জীবন। এমনি করে এই ধারা ধরে—বাঙলা সাহিত্যকে যাঁরা বড় করেছেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে একজন।

আমিও একজন লেখক—বাঙলা ভাষার সেবক। আমার তাই মনে হয় —এমনি করে আরও কিছুদিন তিনি দিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর দিন এসেছিল। তিনি চলে গেলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে, ব্যথার সঙ্গে এই কথাই মনে করছি—তিনি আমাদের মধ্যে নেই।

আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করি—আমাদের মাঝে থেকে আমাদের বন্ধু সরে গেলেন, তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক, এই আমার আজকের দিনের প্রার্থনা। ('আনন্দবাজার পত্রিকা'—১৬ই পৌষ, ১৩৪১)

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনে

১৩৪২ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত 'শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনে'র দ্বাদশ অধিবেশনে শরৎচন্দ্র মূল সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তা এই—

প্রথম কথা আমি বক্তা নই। কিছুদিন থেকে মাথাধরায় ভুগছি, শান্তিপুরে আসতে পারব এমন আশা ছিল না। কিন্তু আপনাদের সাদর আহ্বান ঠেলতে পারলাম না। নানা অসুবিধাকে অবহেলা করে তাই আসলাম।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের অভিভাষণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। শান্তিপুরকে অনেকদিন থেকেই জানি, বঙ্গ-সাহিত্যে এ দেশের দানের কথাও অবিদিত নয়। লক্ষ্মীকান্তবাবুর অভিভাষণে এ দেশটিকে আবার নতুন মূর্তিতে দেখলাম। এখানকার বর্তমান সাহিত্য-সাধনার ও সাহিত্য-পরিষদটির নানা পরিচয় পেলাম।

লক্ষ্মীকান্তবাবু আইনজীবি, তা সত্ত্বেও তাঁর অভিভাষণে তিনি ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। শান্তিপুর বহু জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতের স্থান। বাঙ্গলার এমন এক দেশ থেকে আপনারা আদর করে আমাকে ডেকেছেন—এর জন্যে আমার মনটা বড় হয়ে ওঠে। আমি ভাবি, আমার মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্যে আপনারা আমাকে এত দরদ দিয়ে ডাকলেন। নিজের রচনা সম্বন্ধে আমি কখনো আলোচনা করি নে। আমি পাড়াগাঁয়ের লোক, এই সাহিত্য-সাধনার মহাতীর্থে এসে আপনাদের আমি কতটুকু দিয়ে যেতে পারব, তা জানি নে।

যখন আমি পেশাদার ঔপন্যাসিক হই নি, যখন কিছুই জানতাম না যে, কিসে সমাজের ভাল হয়। সেই সময় প্রথম যৌবনে 'বড়দিদি', 'দেবদাস' প্রভৃতি লিখি। তারপর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সে বন্ধুদের তাড়াতে আবার যখন লিখতে আরম্ভ করি, তখন আমার সন্দেহ হয়, আমি সাহিত্যিক কি না; বাস্তবিক নিজের থেকে লিখছি, না, বাইরের তাগিদে লিখছি। আমি যা

লিখেছি, তার ভালমন্দের বিচার আপনারাই করবেন। অস্বীকার করি না, দেশের ওপর সাহিত্যের প্রভাব খুবই বেশী।

আমারও সন্দেহ হয়, সাহিত্য কোন্ পথে চলেছে। সত্যিই সাহিত্য যা-তা হয়ে যাচ্ছে। যখন অন্য কোন কাজ থাকে না, তখন কি করে নাম করা যায়, টাকা পাওয়া যায়—এই চিন্তা নিয়ে অনেকে সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু যাঁরা তা করেন না, যাঁরা সত্যিই সাহিত্যিক, তাঁদেরও আজ ভাববার প্রয়োজন হয়েছে—সাহিত্য কোন্ পথে যাওয়া উচিত। ফরমাশ দিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার বলে নতুন ধারা দিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ধারা আজও চল্‌ছে। এখন ভাববার সময় হয়েছে কি করব। যাঁরা বলেন আর্ট ফর আর্টস সেক, আমি সে দলে নই। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, যুবকেরা বেকার, মেয়েদেরও দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই—এ অবস্থায় লেখার ধারা কোন্ পথে চলবে—তা চিন্তা করার দিন এসেছে। আমি আমার লেখার ভিতর দিয়ে কোন সমাধান করিনি, শুধু গলদগুলো দেখিয়েছি। আমি সাহিত্য সাধনার ব্রত নিয়েছি দুঃখের ভেতর দিয়ে। সোজা কথায় গলদ ও দুঃখকে ব্যক্ত করেছি। আশা করি নতুন লেখকেরা এই ব্যথার স্থানগুলোকে ভাল করে তুলে ধরবেন, সত্যিকারের সমাধানের জন্য চিন্তাধারা দেবেন।

আমার কদিন আর বাকি আছে জানিনে। সাহিত্য আজ কোন্ পথে চলেছে, তা আমি লক্ষ্য করেছি। এখন আমার ইচ্ছা, একটা নতুন ধারায় সাহিত্যকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। আগেই বলেছি আমি বক্তা নই। যা আজকাল ভাবি, তা আপনাদের সামনে অকপটে বললাম। এখানে এসে আমার খুব ভাল লেগেছে। শান্তিপুর এবং তার সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আপনারা যে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বর্ধনা দিয়েছেন—তা বেঁচে থাকা পর্যন্ত মনে থাকবে। আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নমস্কার।

[শরৎচন্দ্রের এই মৌখিক অভিভাষণটি ১৩৬৩ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'সাহিত্য-সাধনার ব্রত' নামে ছাপা হয়েছে। লেখাটির পরিচিতি হিসাবে প্রথমেই লেখা আছে—

শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলন—২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৪৩ সালের ১২শ অধিবেশনে মূল সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত অভিভাষণ 'সাহিত্য বার্ষিকী' পত্রিকা হ'তে শ্রীঅজয়কুমার মিত্র কর্তৃক সংগ্রহীত।'

এখানে ভুলক্রমে ১৩৪২ সালের পরিবর্তে ১৩৪৩ সাল লেখা হয়েছে। কেননা ১৩৪২ সালের ১লা আষাঢ়ের আনন্দবাজার পত্রিকায়ও এই শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন যে বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা এই—

"গত ২৫শে ও ২৬ জ্যৈষ্ঠ শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশন মহা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূল সভার এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৫শে তারিখে অপরাহ্নে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুল হলে মূল সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর সভাপতি বরণকার্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এম, এ, বি, এল, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, এম, এল, •এ, মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। কুমারী গীতা সেনগুপ্তার একটি সঙ্গীতের পর সভাপতি শরৎচন্দ্র তাঁহার মূল্যবান অভিভাষণ ব্যক্ত করেন। ইহার পর যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান ও সঙ্গীতের পর ঐদিনকার কার্য শেষ হয়।

২৬শে তারিখ প্রাতে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ ভবনে সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শান্তিপুর-রত্ন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক পরলোকগত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র উন্মোচন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রবাবু এই সভার সভানেতৃত্ব করেন। এই সভায় দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতাপাঠ ও বক্তৃতাদি হয়। এইদিন অপরাহ্নে স্কুল হলে সম্মিলনের সাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন··· ।"]

কোন্নগর পাঠচক্রে

১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে হুগলী জেলার কোন্নগরে সেখানকার পাঠচক্রের এক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র। এই সভায় বিশিষ্ট বক্তা দিলেন, বাঙলা দেশের পাঠাগার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়। শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেছে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে রকম উন্নত, সে রকম অবস্থা আমাদের দেশে কবে হবে —তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চারদিক থেকে অভিযোগ ওঠে আমাদের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই,—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন।

কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে? এই অতি-নিন্দিত গল্পলেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয়, সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে তা না বলাই ভাল। অনেকের হয়ত ধারণাই নেই যে, এই সব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়।

বিলাতে কিন্তু গল্পলেখকদের অবস্থা অন্য রকম। তারা ধনী। তাদের এক একজনের আয় আমরা কল্পনা করতে পারি নে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়। কারণ ওদেশে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক থেকেও লোকে বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ওদেশে বাড়ীতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনার অভ্যাস আছে। না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়ত কর্তব্যের ত্রুটি ঘটে।—আর অবস্থাপন্ন লোকদের ত কথাই নেই। তাঁদের

প্রত্যেকেরই বাড়ীতে এক একটা বড় গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না থাকুক—গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগা জাত আমরা। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও পুস্তকের প্রচলন নেই। অনেকে হয়ত মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সমালোচনার ছলে শুধু গালি-গালাজের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। যদি খোঁজ নেন ত দেখতে পাবেন, তাঁদের অনেকেই মূল বইখানা পর্যন্ত পড়েন নি।

আমি নিজেও একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। অনেক বড়লোকের বাড়ীতে আমি গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একান্তই আছে, তাঁরা কয়েকখানা চকচকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু বাঙ্গলা বই মোটেই কেনেন না।

তাই বাঙ্গলায়—যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলছেন—সে হয় না। কারণ বিক্রি নেই। বিক্রি হয় না বলেই প্রকাশকেরা ছাপতে চান না। তাঁরা বলেন, ও সবের কোন চাহিদা নেই—নিয়ে এস গল্প। লোকে ভাবে, গল্প লেখাটা বড়ই সোজা। শুভানুধ্যায়ী পাড়ার লোকে যেমন অক্ষম আত্মীয়কে পরামর্শ দেয়—তোকে দিয়ে আর কিছু হবে না, যা তুই হোমিও-প্যাথি করগে যা। অথচ হোমিওপ্যাথির মত শক্ত কাজ খুব কমই আছে। এর কারণ হচ্ছে, যে জিনিসটা সকলের চেয়ে শক্ত, তাকেই অনেকে সবচেয়ে সহজ ধরে নেয়। ভগবান সম্বন্ধে কথা বলা যেমন দেখি, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে কারও কখনো বিদ্যে বুদ্ধির অভাব ঘটে না।

গল্পলেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভাল ভাল কল্পনা—কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল,—একটা উচ্চাশা ছিল যে 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়ে আমি একটা 'ভল্যুম' তৈরি করব। যেমন—সত্যের মূল্য, মিথ্যের মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য—এই রকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে 'নারীর মূল্য' লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে। পরে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই 'দ্বাদশ মূল্য' আর শেষ করতে পারি নি, তার কারণ—অভাব।

আমার জমিদারী নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দু-বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না। প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন ওসব চলবে না। তুমি যা তা করে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও,—তবু হাজারখানেক কাটবে।

আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন—বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন কি যাঁদের সঙ্গতি আছে—তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি? অথচ আজ অন্তঃপুরের যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তা এই গল্পের ভেতর দিয়েই।

কত বড় বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেন নি। পরলোক-গত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদছেন। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সেদিন বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন, কিন্তু জানেন কি যে বারো বছরে তাঁর পাঁচ'শখানা বই বিক্রি হয় নি। অনেকে বোধ করি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।

আমাদের বড়লোকেরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়—এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে, তবে ত তাঁরা জ্ঞানগর্ভ বই লিখতে পারবেন।

রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর একটা বেশী কথা আমাদের নজরে পড়ে যে, ও-দেশর যা কিছু হয়েছে, তা করেছে ও দেশের জনসাধারণ। তারা মস্ত লোক। তাদেরই মোটা মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগালি দিই। কিন্তু এই আমাদেরই দেশবন্ধুর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরল কতটুকু? তিনি দেশের জন্যে কত করেছেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে কত আবেদনই না বেরুল। কিন্তু সে ভিক্ষাপাত্র আজও আশানুরূপ পূর্ণ হ'ল না। অথচ ইংলণ্ডে 'ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি'র এক কোণে যখন ফাটল ধরে, সেখানকার ডীন কুড়ি লক্ষ পাউণ্ডের জন্যে এক আবেদন করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এত টাকা এল যে শেষে তিনি সেই ফাণ্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ দাতারা নাম বাজাবার জন্যে যে দান করেন

নি তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ কাগজে কারোরই নাম বেরোয় নি। এতটা সম্ভব হয় তখনই, যখন লোকের মধ্যে স্বদেশ সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ মন গড়ে ওঠে।

আমার প্রার্থনা, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবি হোন। তাঁর এই প্রারব্ধ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী-আন্দোলনের জন্যে তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর ঘটবে না। কিন্তু আশা হয়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ, যাঁরা বয়সে ছোট—তাঁরা নিশ্চয়ই এ কাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।

'কোন্নগর পাঠচক্রে'র চেষ্টায় এই যে সব মূল্যবান কথা শোনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম —শিক্ষা পেলাম, মনের মধ্যে ব্যথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগা দেশ! যুগ-যুগান্তের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত কোন আশা দেখি না।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ সভায়

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কলকাতায় টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যে বিরাট জনসভা হয়েছিল, তাতে উদ্বোধন বক্তৃতা দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের সেই বক্তৃতাটি ছিল লিখিত বক্তৃতা।

ঐ সভার কয়েকদিন পরেই কলকাতায় এলবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আবার যে প্রতিবাদ সভা হয়, তাতে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন সভায় যে মৌখিক অভিভাষণটি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই—

নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—এত বড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। অনেকে হয়ত এই মনে করবেন যে, এই অবিচারের প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং এই মনে করেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তা সত্য নয়; যদি এই অন্যায়কে রোধ করবার ক্ষমতা কারও থাকে, সে আমাদেরই আছে।

নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্যসেবা করে এসেছি,—যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়;—এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন হতে চলেছে যে, আমার ভয় হয়—হয়ত দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের আর এক যুগ এসে পড়বে;—হয়ত রবীন্দ্রনাথ সেদিন থাকবেন না, আমিও হয়ত তত দিন আর থাকব না। তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

বাঙ্গলা-সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর; কেউ বলছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার কর; আবার কেউ বা

বলছেন, এতগুলি 'উর্দু' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ,—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ীর সমস্ত জিনিস কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ।

তার পর এত বড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হ'ল, এ তাঁরা জেনেও নীরব হয়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল—একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই; তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে, এও কি তাঁরা ভাবেন না। এ রকম করে ত আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে না—এটাও ত তাঁদের জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না,—গ্রহণ করার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হ'ল—একাদন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আমার মুসলমান ভায়েদের বলছি, তোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো, আর ছোট ছেলের মত ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।

আমার মতে অন্যায় স্বীকার করতে নেই, যথাসাধ্য প্রতিকার করতে হয়। তাই দিয়েই মানুষ মানুষ হয়ে উঠে। এই যে অন্যায়টা আমাদের উপর হয়েছে, তার প্রতিকার করতেই হবে, যদি না পারি, তা হ'লে দশ বৎসর পরে—বাঙ্গালী আজ যা নিয়ে গৌরব করছে—তার আর কিছুই থাকবে না। তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি পারি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো, কারণ, এই অন্যায় যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে দেশে না হিন্দুর না মুসলমানের, না কারো কখন মঙ্গল হবে।—'বাতায়ন,' ১৫ শ্রাবণ ১৩৪৩।

'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র প্রস্তুতি সভায়

১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭০ বছর পূর্ণ হয়। কবির বয়স ৭০ বছর পূর্ণ হওয়ায় এই বছর পৌষ মাসে বড়দিনের ছুটির সময় কলকাতায় টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় দেশবাসীর পক্ষ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক অমল হোম একজন সঙ্গীসহ বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন এই কবি-সম্বর্ধনার প্রস্তাব নিয়ে সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে যান।

শরৎচন্দ্র সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করে সেদিন তাঁদের বলেছিলেন—তবে আমাকে কমিটি-টমিটিতে রেখো না, ও-সব আমি পারব না। আমি তোমাদের পেছনে থাকব। আর দেখ, বক্তৃতা-টক্তৃতা আমার দ্বারা হবে না, ও-সবে আমাকে ডেকো না।

অমলবাবু সেদিন তাই হবে, বলে চলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শরৎচন্দ্রের কথা রাখেন নি। এমন কি শরৎচন্দ্রও নিজের ঐ কথা রাখতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্র টাউন হলে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি লিখিত প্রবন্ধ তো পাঠ করেছিলেনই, এমন কি ২রা জ্যৈষ্ঠ কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে তিনি একটি প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে একটি ছোট মৌখিক বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। আর ঐ ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি করে যে জয়ন্তী-উৎসব পরিষদ গঠিত হয়েছিল, তাতে তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতি হতেও সম্মত হয়েছিলেন।

ঐ রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রস্তুতি সভায়—'এই সভার মতে, কবিবরের সমগ্র দেশবাসীর সকল সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্যে তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা ও একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য'—এই প্রস্তাবটি চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ উপস্থাপিত করেন।

এই প্রস্তাবটিই সমর্থন করতে উঠে শরৎচন্দ্র সেদিন মুখে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সেদিনের সেই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে অমলবাবু লিখেছেন—

"প্রস্তাবের অনুমোদনে উঠলেন শরৎচন্দ্র। ঠিক পনের দিন আগে তিনি কোনও সভায় বক্তৃতা করতে পারবেন না, এই কথা জানিয়েছিলেন; কিন্তু চমৎকার একটি ছোট বক্তৃতা করলেন।...তাঁর সে-বক্তৃতার একটি কথা আজও আমি ভুলি নি। তিনি বলেছিলেন—

'আমি জানি আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হোলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় সে খেয়াল তা আমাদের ভুললে চলবে না। তাই বলি, অনুষ্ঠান করুন, আনন্দোৎসব করুন, কিন্তু আসুন কিছু টাকা তুলে দেশের লোক আমরা তাঁর হাতে দিই। তিনি এই বুড়ো বয়সে বিশ্বভারতীর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ লজ্জা আমাদের।' "

শরৎচন্দ্রের এই কথা অনুযায়ী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদ বিশ্বভারতীর সাহায্য-কল্পে সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথকে একটি টাকার থলি উপহার দেওয়া স্থির করেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কাজ যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল, সেই সময় বর্ষাকালে প্রবল বন্যায় উত্তর বঙ্গের প্রচুর ক্ষতি হয়।

রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে তাঁকে টাকার থলি উপহার দেওয়া হবে জানতে পেরে, ঐ সময় অমল হোমকে লিখেছিলেন—

"অমল, জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমাকে পার্স দেবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সে টাকা তোমরা বন্যার্তদের দিও। আমি শরৎকে লিখলুম।"

কবি শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—

"শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশে এমন দারুন দুর্দিন, এ সময়ে অন্য কোনও ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও, তবে

সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখহরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে সেজন্য চেষ্টা করছি···।"

কবির সম্বর্ধনা-সভায় কবিকে একটি টাকার থলি দেওয়া হয়েছিল। কবি সে টাকা বন্যার্তদের দিয়েছিলেন।

দেশবাসী একটা মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথকে দেয় নি বলে, শরৎচন্দ্র বরাবরই দুঃখ প্রকাশ করতেন।

সিনেট হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সভায়

শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে ১৩৩৯ সালের ১লা আশ্বিন* তারিখে বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীদের 'ছাত্র-ছাত্রী উৎসব পরিষদ' কলকাতায় সিনেট হলে (সিনেট হলের স্থানে বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু-তলা লাইব্রেরী বিল্ডিং হয়েছে) এক শরৎ-বন্দনার আয়োজন করেছিলেন।

সেদিন ছাত্র-ছাত্রীরা শরৎচন্দ্রকে যে অভিনন্দন পত্রটি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা বলেছিলেন—

পরম শ্রদ্ধাভাজন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

হে বন্ধু, তোমার সপ্ত-পঞ্চাশৎ জন্মদিনে বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রণাম গ্রহণ কর।

যখন বয়স অল্প ছিল, তখনই বীণাপাণি তোমাকে আপনার একান্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাকাল, বর্তমানকে গোপনে ভাবীকালের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহার বিচারে তোমার কিরণ-লেখা ভবিষ্যতের প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। পঞ্চাশৎ বৎসরেরও পূর্বে তোমার জন্ম, তোমার আয়ুষ্কাল সমগ্র কালকে বেষ্টন করিয়া আছে। হে শরৎচন্দ্র, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি কীর্তিমান হইয়াও খ্যাতিতে আসক্ত নও, তেজস্বী হইয়াও নিরভিমানী, শ্রদ্ধার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও নিরহঙ্কারী। সত্যভাষণে তোমার কুণ্ঠা নাই, দৃষ্টিতে আবিলতা নাই, দেশবাসীর প্রিয় হইবার গ্লানিকর চেষ্টা হইতে তুমি আপনাকে মুক্ত করিয়াছ। হে দেশবাসীর বরপুত্র, আমরা তোমাকে অভিনন্দন করিতেছি!

যে বিচিত্র জীবনের সন্ধান তোমার লেখনীতে বাঙ্গলার তরুণ পাইয়াছে, তাহারই আহ্বানে সে আজ দুঃখের অভিসার-যাত্রায় জগৎ সমাজে তাহার পথের দাবী লইয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রগতির সঙ্গে তোমার এই নাড়ীর যোগ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, তাহাই প্রার্থনা করি।

হে নবজীবনের হোতা! তোমার আশীর্বাদ আমাদের নব-দীক্ষায় দীক্ষিত করুক। তোমার সত্য-দৃষ্টি, সত্য-ভাষণ ও সত্য চিন্তা, আমাদের দৃষ্টি, কথা ও চিন্তাকে সমস্ত রকম অসত্যের মায়া থেকে মুক্ত করুক।

হে ঋষি! আজ বাঙ্গালীর সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে, কৃষ্টিতে নূতনের ভাববিপ্লব উপস্থিত। তোমার লেখনী এই জাতীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আবার কোন নূতন পথের সন্ধান দিবে, তাহার আশায় সমগ্র ছাত্রসমাজ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের এই অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

আমার তরুণ বন্ধুগণ, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ আমি আজ লাভ করলাম—আমি তোমাদের চিত্তলোকে স্থান পেয়েছি, তোমরা আমাকে ভালবেসেছ। আমার সাহিত্য-সেবার এর চেয়ে বড় পুরস্কারের কথা কল্পনা করতে পারি নে। যে তরুণশক্তি যুগে যুগে, কালে কালে পৃথিবীকে নূতন করে গঠন করে, দৃষ্টি যাদের প্রসারিত, অন্যায় বন্ধন যারা মানে না, বড় মন নিয়ে সর্বত্যাগের বাণীকে অবলম্বন করে যারা যে কোনও মুহূর্তে হাসিমুখে পৃথিবীর বন্ধুরতম পথে যাত্রা করতে পারে, তারা আজ আমাকে তাদের আপনার জন বলে স্বীকার করেছে, এ আনন্দের স্মৃতি আমার চিরজীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল।

আমার সাহিত্য-সাধনার মূল্য নির্ধারণ করবার ভার আমি তোমাদের উপর দিয়েছি। ভরসা আছে, আর যে যাই বলুক, তোমরা কোনাদন আমাকে ভুল বুঝবে না। দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেছি, তা স্থির করবার ভার রইল ভাবী কালের সমাজের উপর। বহু বার বহু স্থানে যে কথাটি আমি বলেছি, তোমাদের কাছে আজ সেই কথারই পুনরুল্লেখ করতে চাই। মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার ক'রো না ;—সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ—যদি পরম দুঃখের পথও হয়, তা হ'লেও সে দুঃখ-বরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ ক'রো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে।

তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি, জীবন তোমাদের সার্থক হোক, সাধনা তোমাদের সফল হোক এবং আরও যে ক'টা দিন বাঁচি, তোমাদের দিকে চেয়ে আমিও যেন বল লাভ করতে পারি।

[* শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তারিখে কলকাতায় টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানোর পরে, সিনেট হলে ছাত্র-ছাত্রীরা শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাবেন স্থির ছিল। কিন্তু ৩১শে তারিখে টাউন হলে একটা জঘন্য দলাদলির কারণে শরৎ-বন্দনা সভা বন্ধ হয়। তাই শরৎচন্দ্র সেদিন আর ছাত্র-ছাত্রীদের সভাতেও আসেন নি। ছাত্র-ছাত্রীদের সভা হয়েছিল পরদিন ১লা আশ্বিন, আর টাউন হলে দেশ-বাসীর পক্ষ থেকে শরৎ-সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল ২রা আশ্বিন।]

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে

১৩৪০ সালের ১৩ই মাঘ ফরিদপুরে যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে মূল সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেই সভায় শরৎচন্দ্র একটি ছোট লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র সেবার ফরিদপুরে গেলে সেখানকার রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্ররা এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন অভিনন্দনের উত্তরে ছাত্রদের বলেছিলেন—

তোমাদের এই বিদ্যামন্দিরে এসে আমার নিজের অধ্যয়ন জীবনের কথাই আজ বার বার মনে পড়ছে। আমারও একদিন তোমাদের মতই উচ্চশিক্ষার আশা নিয়েই এমনি করে ছাত্রজীবন সুরু হয়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবী কালকে স্মরণ করে কত আশার মুকুলই না রচনা করেছিলাম। কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হলাম। বিধাতা যে এমন বঞ্চনা আমার জন্য রেখেছিলেন, ভাবতে পারি নি।

বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হলাম। এমনি করেই আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেছি।

এ জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে সে-ফাঁকি এক সময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলবো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে। তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়। তোমরা আমার ভালবাসা নাও। (বঙ্গশ্রী—মাঘ ১৩৬০)

আশুতোষ কলেজে সাহিত্য-সম্মিলনে

১৩৪২ সালের ২১শে ফাল্গুন তারিখে শরৎচন্দ্র একবার আশুতোষ কলেজের সাহিত্য সম্মিলনে এসেছিলেন। তাঁর সেই আসার ইতিহাসটা এই—

আশুতোষ কলেজের ছাত্ররা সেবার স্থির করেন, তাঁদের কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্য সম্মিলনে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি করবেন।

ছাত্ররা তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা কলেজের পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মশায়কে জানালে, তিনি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীকে বললেন—কুমুদবাবু, আপনি তাহলে শরৎবাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে বলে সমস্ত ব্যবস্থা করে আসুন।

রমাপ্রসাদবাবু যখন 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকা বার করেছিলেন, তখন কুমুদবাবু এই পত্রিকার প্রধান কর্ম-সচিব ছিলেন এবং প্রধানতঃ তিনিই শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত 'পথের দাবী' উপন্যাসের কপি আনতে যেতেন। সেই সূত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কুমুদবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর কলকাতার বাড়ীতে আছেন জেনে, কুমুদবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেন। গিয়ে তিনি ছাত্রদের অভিলাষের কথা বললেন।

শরৎচন্দ্র শুনেই বললেন—আমাকে আবার কেন? আমি তো মোটেই বক্তৃতা দিতে পারি না।

কুমুদবাবু ছাড়লেন না। তিনি শেষে রমাপ্রসাদবাবু ও তাঁর ভাইদের কথা বলে কোন রকমে শরৎচন্দ্রকে রাজী করালেন এবং শরৎচন্দ্রের সুবিধামত একটা দিনও ঠিক করে এলেন।

শরৎচন্দ্র আসবেন কথা দেওয়ায়, যথাসময়ে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপানো হ'ল এবং পত্র বিলি হ'ল। সভার আগের দিন শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে সভার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসাও হ'ল।

এবার সভার দিন। শরৎচন্দ্র আসছেন শুনে শুধু কলেজের পরিচালকবর্গ, অধ্যাপক ও ছাত্ররাই নয়, পাড়ার মেয়ে এবং পুরুষরাও বিশেষ করে মেয়েরা সভা আরম্ভের অনেক আগে থেকেই কলেজে এসেছিলেন। এমন কি শরৎচন্দ্র আসছেন, জানতে পেরে পথের বহুলোকও সভায় এসে জমেছিল।

সভা আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টা আগে কলেজের কয়েকজন ছাত্র গাড়ী নিয়ে শরৎচন্দ্রকে তাঁর বাড়ী থেকে আনতে গেলেন। ছাত্ররা গেলে শরৎচন্দ্র তাঁদের বললেন—আমাকে আবার নিতে এসেছ কেন? আমি নিজেই তো যেতে পারি। তোমরা যাও, আমি যাচ্ছি।

ছাত্ররা বললেন—আমরা গাড়ী নিয়ে এসেছি, আমাদের সঙ্গেই চলুন না।

—না, না, তোমরা যাও, আমি এখনি যাচ্ছি।

শরৎচন্দ্র এখনি আসবেন, এই আশা নিয়ে ছাত্ররা ফিরে এলেন।

এদিকে এখনি ছেড়ে, সভার নির্দিষ্ট সময় পার হয়েও ক্রমে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল, তবুও শরৎচন্দ্রের আর দেখা নেই। অবশেষে রমাপ্রসাদবাবু কুমুদবাবুকে বললেন—আপনি নিজে একবার গাড়ীটা নিয়ে যান।

রমাপ্রসাদবাবুর কথায় কুমুদবাবু তখনই মোটর নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র দিব্যি তাঁর বৈঠকখানায় বসে নিশ্চিন্তমনে গড়গড়ায় তামাক টানছেন। তাঁকে যে একটা সভায় যেতে হবে এবং সে সভার সময় যে পার হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে তাঁর কোন খেয়ালই নেই।

কুমুদবাবু বললেন—একি, আপনি এখনও বসে আছেন? ওদিকে যে সভার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে!

—তাই নাকি! আচ্ছা বোস। আমি তাহলে উপর থেকে কাপড় জামাটা বদলে আসি।

কুমুদবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—আপনি কাপড় বদলান, আমি ততক্ষণে এই কাছ থেকে যতীনবাবুকে নিয়ে আসি।

—কে যতীনবাবু?

—কবি যতীন বাগচী।

—আচ্ছা যাও।

কুমুদবাবু যতীনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে মোটরে নিয়ে শরৎচন্দ্রের

বাড়ীর দিকে আসতে থাকলে, যতীনবাবু প্রশ্ন করলেন—এদিকে আবার কোথায়?

কুমুদবাবু বললেন—শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে।

শরৎচন্দ্রের নাম শুনে, যতীনবাবু চম্‌কে উঠে বললেন—অ্যাঁ, আমি মোটরে আসছি, তিনি জানেন?

—জানেন, তাঁকে বলেই আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

—তাই নাকি!

(১৩৩৯ সালে শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মতিথিতে দেশবাসী কলকাতার টাউন হলে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করবার ব্যবস্থা করলে, সেই সময় কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী তাঁর দলের কয়েকজন কবি সহ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন—মহাত্মা গান্ধী অনশন করবেন কথা হচ্ছে, অতএব শরৎচন্দ্রের অভিনন্দন সভা বন্ধ করে দেওয়া হোক্।—এই জন্যই যতীনবাবু সেদিন শরৎচন্দ্রের কথায় এইভাবে একটু সঙ্কুচিত হয়েছিলেন।)

কুমুদবাবু মোটরে যতীনবাবুকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর দোর গোড়ায় এলেন। যতীনবাবু মোটরে বসে রইলেন, নামলেন না।

কুমুদবাবু মোটর থেকে নেমে শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলেন—শরৎচন্দ্র কাপড়-জামা না বদলে তেমনি বসে বসে তামাক টানছেন।

কুমুদবাবু বললেন—কই নিন! যতীনবাবুকে এনেছি, তিনি গাড়ীতে বসে আছেন।

—ওকে যেতে বল।

কুমুদবাবু অগত্যা ড্রাইভারকে বললেন—যতীনবাবুকে পৌছে দিয়ে তুমি মোটর নিয়ে এখনি ফিরে এস।

ড্রাইভার তাই করল।

গাড়ী ফিরে এলে, কুমুদবাবুর অনেক অনুরোধ ও তাড়ায় শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কাপড়-জামা বদলে মোটরে এসে বসলেন।

শরৎচন্দ্র যখন সভায় এলেন, তখন সভার নির্দিষ্ট সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। এদিকে সভা আরম্ভ হতে যত দেরি হয়েছে, সভায় লোকও তত জমেছে। তাই কোথাও তিল ধারণের জায়গা ছিল না। রাস্তায় ফুটপাথের উপরও শরৎচন্দ্রকে দেখবার জন্য বহুলোক জমেছিল।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র সভায় এসে সভাপতির আসনে তো বসলেন। সভায় গান-বাজনা, আবৃত্তি প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অন্ততঃ দু-তিন ঘণ্টার প্রোগ্রাম।

কিছুক্ষণ কাটবার পরই শরৎচন্দ্র কুমুদবাবুকে ডেকে বললেন—কুমুদ, একটু তামাকের ব্যবস্থা করতে পার?

—এখানে সভায় কিভাবে তামাকের ব্যবস্থা করব? আপনাকে সভায় বসে তামাক খেতে দেখলে লোকে কি বলবে?

—লোকে আমাকে জানে। তাতে তোমার ভয়ের কারণ নেই। তুমি বরং এখানে পাশে কারও বাড়ীতে গড়গড়া পাও কিনা একবার দেখ।

কুমুদবাবু অগত্যা কলেজের আশপাশের বাড়ীগুলোতে খোঁজ করে একটা বাড়ীতে গড়গড়া পেলেন। শরৎচন্দ্র তামাক খাবেন শুনে, গড়গড়ার মালিক কল্‌কেয় ভাল দামী তামাক সেজে নূতন নল লাগিয়ে গড়গড়া পাঠিয়ে দিলেন। কুমুদবাবু সেই গড়গড়া এনে শরৎচন্দ্রের আসনের পাশে রাখলেন। শরৎচন্দ্র সভায় বসে দিব্যি গড়গড়া টানতে টানতে সভাপতিত্ব করতে লাগলেন। *

শরৎচন্দ্র সেদিন আশুতোষ কলেজে ছাত্রদের সভায় সভাপতি হিসাবে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই—

আজকাল যে সমস্ত সাহিত্য-সম্মিলন হয়, প্রায়ই দেখতে পাই যে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে খুবই নিন্দাবাদ হয়। আমি অতি-আধুনিক সাহিত্যের যে প্রশংসা করছি, তা নয়। আমার বক্তব্য এই যে, এই ধরণের আলোচনা না হওয়াই ভাল। কারণ এই ভাবে লেখা উচিত বা এই ভাবে লেখা উচিত নয়—এ কথা বললে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। যাঁর যে রকম শিক্ষা, যাঁর যে রকম দৃষ্টি, যাঁর যে রকম শক্তি, যাঁর যে রকম রুচি —তিনি তারই অনুপাতে সাহিত্য গড়ে তোলেন। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি থাকবার তা থাকবে এবং যা না থাকবার তা লোপ পাবে।

সাহিত্য গড়ে ওঠে যুগধর্মে—সমালোচনা অথবা সহযোগিতা দ্বারা গড়ে ওঠে না। সমস্ত জিনিসেরই একটা ক্রমোন্নতি আছে, নাই শুধু সাহিত্যের ব্যাপারে। কালিদাসের পরে শকুন্তলাকে যদি আরও ভাল করার শক্তি থাকত, তা হ'লে যত লোক এ বই পড়েছেন, যত লোক অনুকরণ করেছেন, যত

লোক একে ভাল বলেছেন—তাঁরা শকুন্তলা হতে উৎকৃষ্টতর নাটক রচনা করতে পারতেন, কিন্তু তা হয় নি। মহাকবি কালিদাস যা লিখে গেছেন, তা-ই বড় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা ও এই অনুকরণের মধ্যে আসমান জমি প্রভেদ।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন, নূতন সাহিত্য সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ মত পোষণ করি—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আমি কালের উপর নির্ভর করে বসে আছি। আমি যা লিখেছি, তার যদি কোন মূল্য থাকে, তবে ভবিষ্যতে তা টিকে থাকবে, আর যদি টিকবার না হয়, তবে ঝরে পড়বে। মানুষের ভাল অথবা মন্দ লাগার উপর কোন সাহিত্যই নির্ভর করে না—সে তার প্রয়োজনে আপনা হতেই নেমে যায়। সমাজের মধ্যে, জীবনের মধ্যে পরবর্তীকালে মানুষ যদি এটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে না করে, তবে তা আর থাকবে না। সুতরাং এই জাতীয় আলোচনায় কোন লাভ নেই, শুধু তাতে সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব এসে পড়ে। ফরমাস দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। তার চেয়ে বলা ভাল—তোমাদের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে রইলাম। যাতে বাঙ্গলা সাহিত্য বড় হয়ে উঠে, নিজেদের বুদ্ধি এবং বিদ্যা দিয়ে তাই কর।

[* শরৎচন্দ্র যে সভাপতির আসনে বসেই ধূমপান করতেন, এখানে তার আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবর্তক' পত্রিকায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একব্যক্তি তাঁর 'মায়াবী শরৎচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—"শরৎচন্দ্রকে আবার দেখিলাম টাউন হলে ৺অতুলপ্রসাদ সেনের শোক-সভায়। সে সভায় তিনি ছিলেন সেদিন সভাপতি। নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া বিরাট জনসভার দিকে উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্বিকারভাবে পাইপ টানিতেছেন।"

শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ধূমপায়ী জেনে তাঁর কোন কোন সম্বর্ধনা সভায় উদ্যোক্তারা তাঁকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ধূমপানের সাজ-সরঞ্জামও উপহার দিতেন। যেমন—তাঁর ৫৩তম জন্মতিথিতে দেশবাসীর পক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল, তাতে উদ্যোক্তারা তাঁকে সোনার দোয়াত কলম প্রভৃতির সঙ্গে রূপার আলবোলাও উপহার দিয়েছিলেন।]

ঢাকায়

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমাবর্তন উৎসব হয়, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। যেমন—বাঙলার তৎকালীন গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ও ভারতীয় আইন সভার প্রেসিডেণ্ট স্যার আবদার রহিমকে 'ডক্টর অব্ ল', আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য পি, সি, রায়কে ডি, এস-সি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার মহম্মদ ইক্‌বাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার যদুনাথ সরকারকে ডি, লিট্ উপাধি দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে গবর্ণর ছাড়া, স্যার যদুনাথ, আচার্য পি, সি, রায় ও শরৎচন্দ্র সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র সেবার ঢাকায় গিয়ে অনেকগুলি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভাগুলির মধ্যে, দশম বার্ষিক মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতি হিসাবে কেবল তিনি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সমিতিতে, কামরুন্নেষা গার্লস কলেজে, মিলন পরিষদে ও 'শান্তি' সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

শরৎচন্দ্র যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি, লিট্ উপাধি নিতে ঢাকায় যান, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হল নামে তিনটি হল বা ছাত্রাবাস ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই এই তিনটি হলের যে কোন একটি হলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হ'ত। যারা ছাত্রাবাসে না থেকে বাড়ী থেকে এসে পড়ত, তাদেরও যে কোন একটি হলের সঙ্গে নাম যুক্ত করে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হ'ত। ছাত্রীদের থাকার জন্য অবশ্য আলাদা হোষ্টেল ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও ঐ তিনটি হলের যে কোন একটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হ'ত।

ঐ তিনটি হলে তিনটি পৃথক ছাত্র ইউনিয়ন ছিল। ঐ তিনটি ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও একটি ইউনিয়ন ছিল। তার নাম ছিল—ঢাকা ইউনিভার্সিটি ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন।

শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেলে ঐ চারটি ছাত্র ইউনিয়নই পৃথক পৃথক ভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তখন ইউনিভার্সিটি ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন ও জগন্নাথ হল ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়ন—এই দুটির সভাপতি ছিলেন। তাই তিনি ঐ দুটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেই শরৎচন্দ্রকে দুটি পৃক্ক নিমন্ত্রণ পত্র দিয়েছিলেন। অপর দুটি ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও আলাদা নিমন্ত্রণ পত্র এসেছিল।

রমেশবাবু বলেন—জগন্নাথ হলের পক্ষ থেকে আমি শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলাম—জগন্নাথ হলে আপনি মামুলি কিছু না ব'লে, সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবেন। আর ছেলেরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

রমেশবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শরৎচন্দ্র জগন্নাথ হলে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার কিছু কি আপনার মনে আছে? তাহলে বলুন।

রমেশবাবু বললেন—সেদিনের সে বক্তৃতার কথা আজ আর কিছুই মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে, শরৎচন্দ্র বক্তৃতা দিয়ে বসলে, সভার এক মুসলমান ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—আপনি হিন্দু সমাজ নিয়ে যেমন উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি মুসলমান সমাজ নিয়েও লেখেন না কেন?—এই কথার উত্তরে শরৎচন্দ্র তখন বলেছিলেন—আমিঠিক করেছি, এবার মুসলমান সমাজ নিয়েও উপন্যাস লিখব।

১৩৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বুলবুল' মাসিক পত্রিকায় মীজানুর রহমান নামে একব্যক্তি তাঁর এক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন—"হিন্দু সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁর সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছা-প্রণোদিত



১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত

এমন ধারা কশাঘাতও মুসলিম সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে, তা জোর করে বলতে পারি। বাঙলার কথা-সাহিত্য সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"

ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশম বার্ষিক মুসলিম-সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্র যে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, সেই অভিভাষণের এক স্থানে দেখছি, শরৎচন্দ্র মীজানুর রহমানের ঐ কথাগুলি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

"সে দিন জগন্নাথ হলে আমার অভিনন্দনের প্রতিভাষণে এ কথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করেন, এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্বে আমি দেখে যাবো। সে যাই হোক্, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে, কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর একজনের 'পরে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর।"

রমেশবাবুর উল্লেখিত সভার সেই মুসলমান ভদ্রলোকই মীজানুর রহমান কিনা কে জানে? কেননা মীজানুর রহমানের বাড়ীও ঐ অঞ্চলেই।

শরৎচন্দ্র 'ঢাকা হলে' যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ সময়কার ৩১শে জুলাই-এর ইংরাজী 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণটির বাঙলা এই—

মিঃ শরৎ চ্যাটার্জী

ঢাকা, ২৯শে জুলাই

মিঃ শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী গতকাল এখানে এসে পৌঁছলে ঢাকা হলের অধ্যাপক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে এক সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। এই অভিনন্দনের উত্তরে মিঃ চ্যাটার্জী বলেন যে, তিনি তাঁর বাকি জীবন মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখায় নিয়োগ করবেন। কেননা বাঙলা দেশের সমাজে মুসলমান সমাজ একটা বড় অংশ।—(এসোসিয়েটেড প্রেস)

শরৎচন্দ্র অবশ্য ঢাকা হলে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বাঙলাতেই।

শরৎচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতাটি তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় লিখে নিয়েছিলেন। ক্ষিতীশবাবু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পাস করে সেখানে 'ল' পড়ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই বক্তৃতাটি তিনি এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশ করেন নি, নিজের কাছে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতাটি তাঁর কাছে পেয়েছি। ক্ষিতীশবাবু বর্তমানে (১৯৬৬ খ্রীঃ) পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতি শরৎচন্দ্রকে সেদিন তাঁদের সমিতির আজীবন সদস্য ক'রে নিয়ে একটি মানপত্র দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সভায় শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি ছিল এই—

আজ আমার শরীরটা অসুস্থ। যে গলায় বলব, সে গলাটা বিগড়ে গেছে। সুতরাং আমার বলার ইচ্ছা থাকলেও অল্পক্ষণেই আপনাদের অব্যাহতি দেব, দিতে বাধ্য হব। দু-চারটে কথায় এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার নিজের কথাটা ব্যক্ত করব।

নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘটতে পারে নি। তাঁর হয় নি অন্য কারণে, আমার অন্য কারণে। দুজনের কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারি নি। একজনকে এক পথ দিয়ে, অন্য জনকে অন্য পথ দিয়ে চলতে হয়।

অকস্মাৎ একদিন আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ভাইস্-চ্যান্সেলার' (ডাঃ এ, এফ, রহমান) যখন চিঠি দিলেন—সর্বোচ্চ উপাধি 'ডক্টরেট ডিগ্রী' আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি—আমার আনন্দের চেয়ে এক ভারি বিস্ময় বোধ হয়েছিল। বিস্ময় এই জন্য যে, বোধ হয় একদিনও মনেও করি নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এই রকম একটি শিক্ষার কেন্দ্র থেকে—যাঁরা জ্ঞানচর্চা, শিক্ষালোচনা এই নিয়ে থাকেন, তাঁরাও এদিক দিয়ে তাঁদের চোখ দিয়েছেন; সত্যই বিস্মিত হয়েছিলাম।

আমি ভাইস্-চ্যান্সেলারকে জানালাম—আমি যাব ঢাকাতে, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে আসব।

আমার যে ব্যক্তিগত জীবন সেটা কেন্দ্রভ্রষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশুনা করেছে, শিক্ষা নিয়েছে, তাদের সঙ্গে আমার জীবনের ভারী তফাৎ। আমার বিশ্ববিদ্যালয় যদি কিছু থাকে, এই ছড়ানো পৃথিবী, যা পড়ে আছে। এই আমাকে যা প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছে। কোনও গুরুর কাছে শিক্ষা পাই নি। কোনও বই থেকে যে সাহায্য হয়েছে, তাও হয় নি। অবশ্য পরবর্তীকালে কতকগুলো বই পড়তে হয়েছে—যেগুলো না পড়লেও হয়তো চলতো। কারণ, যেগুলো নিজের চোখ দিয়ে দেখেছি, তাদের চেয়ে যে বড় জিনিস আছে, তা মনে হয় না—এই জিনিসটা আমি স্বীকার করে নিয়েছি।

এমনও হতে পারে—এই যে ব্যাপ্ত বিস্তৃত দুনিয়া পড়ে আছে, নানা রকমের নানা জাতির এই যে নরনারী, এই সব সকলের সংস্পর্শে যিনি এসেছেন ও তাদের জানবার চেষ্টা করেছেন, সেই জ্ঞানটাকে যাঁরা সবচেয়ে বড় মনে করেন, নিশ্চয়ই তাঁরা মনে করেছেন, এ জ্ঞানও বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের সমতুল্য। যাঁরা এ রকম করে লিখেছেন, তাঁদেরও 'রেকগ্‌নাইজ' করা চলে—আগে এ রকম হতো কিনা জানি না। তবে অন্যক্ষেত্রে হতো—যারা বিষয় ও ব্যবসায়ে সম্পত্তিশালী।

আমি দরিদ্রলোক, লেখক—আমাকে যে টেনে বের করেছেন, সেজন্য সত্যই কৃতজ্ঞ ও গর্ববোধ করছি। যাঁরা এমন করে সম্মানিত করলেন আমাকে তাঁদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন। আমি তাঁদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই যে উপাধি পেলাম, এটা পাব কোনদিন মনেও করি নি, লোভও করি নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যাঁরা, তাঁরা প্রসন্ন মন নিয়েই আমাকে এটা দিয়েছেন। এই থেকে মনে হয় যে, আগেকার যে সব ব্যাপার ছিল, তা থেকে মানুষের চিন্তাধারা বদলে গেছে।

এই যে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস্‌ ইউনিয়ন, আমি এমন কথা বলি নি, সকলেই আমার মত ভবঘুরে হয়ে পড়ুক। তা নয়। কিন্তু এই জিনিসটা জোর করেই বলব, যারা বই-এর পাতা থেকে শিক্ষালাভ করেছে, সে এক জিনিস, কিন্তু বাইরের জগতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও এক বড় জিনিস। তা থেকে বঞ্চিত হওয়া শুধু মূঢ়তাই নয়, নিজেকেও বঞ্চনা করা। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন—কি করে তোমার দ্বারা এই সাহিত্য-সৃষ্টি হ'ল?

কোনদিন তুমি কিছু লেখ নি, পড় নি—কি তুমি দেখেছিলে ? এটা যদি তুমি তোমার জীবন-স্মৃতির মত করে বল, তাহলে অনেকের কৌতূহল পরিপূর্ণ হয়।

আমি বললাম—আমার ইচ্ছা হয় না।

তিনি বললেন—আমাদের মৃত্যুর পর, অনেকে অনেক কথা বলবে—অনেকটা সত্য, অনেকটা মিথ্যা। তুমি কোন্‌দিক দিয়ে গিয়েছিলে—কেমন করে গড়ে তুললে ?

আমার নিজের একটা বাতিকই হোক্ আর যাই হোক্, হলো কি—মিথ্যার উপর দিয়ে যাব না। যেটা আমার মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে—হ'তে পারে সেটা ভ্রান্ত—তাকে আমি অস্বীকার করব না। তাকে আমি প্রকাশ করব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বলব—জীবনটাকে সকল দিক হতে সার্থক করতে হলে, কেবল ফাঁকি দিয়ে, বঞ্চনা করে হয় না। লোকে কে কি বলবে, শুধু লজ্জিত হবার ভয়ে, সত্যের কাছে এগুতে পারলাম না—এ রকম তোমরা কোনদিনই করবে না। এ রকম যদি না কর, একদিন সার্থক হতে পারবেই। আমি সর্বান্তঃকরণে বলব, আমি তাই করেছি।•

আমার সাহিত্য-চর্চা এখন যা মনে হয়, কেবল একদিকে গিয়েছে। এতবড় মুসলমান সমাজের সুখ দুঃখের কথা আমি না চিন্তা করে দেখেছি, না ভেবে দেখেছি। এখন মনে হয়, আমার এরূপ করা উচিত হয় নি। এটা আমার মনের ভিতর দাঁড়িয়েছে—এটা করা উচিত, আমি নিশ্চয়ই করব। তার ফল যাই হোক্।

এখানকার পড়াশুনা তোমাদের শেষ হয়ে আসবে, সংসারে প্রবেশ করবে। দেশকে বড় করবার, সার্থক করবার নানা দায়িত্ব তোমাদের উপর এসে পড়বে—কি হিন্দু, কি মুসলমান।

এটা করা উচিত কি না উচিত, সন্দেহেতে মন যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন কেবল আমার পরামর্শ এই যে, মনে করবে কোন্‌টা সত্য—চেপে না থাকলে প্রকাশ করলে সত্য হবে। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, তোমাদের উপর ভগবানের আশীর্বাদ পড়বে। সেই সত্যপথ ধরে চলবে, সফলতা আসবে।

নানা কারণে আমরা বিচ্ছিন্ন, পরস্পরকে বিদ্বেষের চোখে দেখি। অনেক দিন ধরে এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। নিজেদের ভিতর মিলনসূত্র নেই; তার ফল এই। এমনও তো হয়—একটা আমড়া গাছ নিয়ে মোকদ্দমা করে

দুই ভাই সর্বস্বান্ত হয়, টাকা পায় উকিল মোক্তারেরা—এই সংঘর্ষের ফলে আমাদের দৈন্য, চরিত্রের দৃঢ়তা কমে গেছে।

আমি বক্তা নই, আমি লেখক। যা কিছু সম্মান, আত্মীয়তা আমার লেখার জন্য। কোনও কিছু গোপন না করে অকপটে বলাই আমার ধর্ম। ডিগ্রী পাওয়া ছাড়াও যে রকম করে আমি তোমাদের কাছ থেকে সম্মান পেলাম—তার পথও একটা আছে। তোমাদের দিয়ে সেদিকেও পৌছানো গেল।

আমি যখন এখানে আসি, উদ্দেশ্য ছিল, এটা মুসলমান সমাজের একটা বড় কেন্দ্র। যতটা সম্ভব লোকের সঙ্গে পরিচিত হব। নিজেদের বিরোধের ব্যাপারটা যাতে চলে যায়, আবার এক হয়ে ভাই যেমন ভাই-এর সঙ্গে মেলে তেমনি করে মিলনের যদি একটা সূত্রপাত করতে পারি, তাহলে মনে করব এখানকার আসাটা সার্থক হয়েছে।

আবার বলি, তোমরা যারা সংসারে প্রবেশ করবে, তারা আমার কথাটা মনে করবে। যেমন করেই হোক্, আমাদের বাঙ্গালী জাতকে এক হতে হবে—সব দিক দিয়ে।

আমাকে এই যে লাইফ্-মেম্বারসিপ্ ও অভিনন্দন দেওয়া হ'ল, ও আরও কত যে কী পেলাম! এখানকার লোকেরা আমাকে এত ভালবাসে, এ আমি জানতাম না। এ জিনিসটা আমি চিরকাল মনে রাখব। একটা জায়গা রইল—যেখানে বিশ্রাম নিতে পারব। যার ওপর নির্ভর করতে পারব।

আমি আর একবার আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা আমাকে মনে রাখবেন। আমি যে ক'টা দিন বাঁচবো, আপনাদের সঙ্গে এই সব দিনগুলোর স্মৃতি মনের মধ্যে খুব বড় করে লালন করব।

শরৎচন্দ্র ইউনিভার্সিটি স্টুডেণ্টস ইউনিয়নে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার কিছুটা ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঐ সময়কার 'শান্তি' মাসিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবরণটাও এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র সম্মিলনী কর্তৃক শরৎ-সম্বর্ধনা

গত ৩১শে জুলাই সন্ধ্যার সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র সম্মিলনী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। এই উপলক্ষে সুপ্রশস্ত কার্জন হলটি দর্শকবৃন্দে ভরিয়া যায়।

উদ্বোধনে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটি ছাত্রী একটি সঙ্গীত করেন। তৎপর সম্মিলনীয় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আবদুল কাসেম অভিনন্দন পাঠ করেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'প্রকৃতি' এবং 'সমাজের' পাঠ হইতেই তিনি তাঁহার উপন্যাস রচনায় প্রেরণা পাইয়াছেন।

তিনি তাঁহার পুস্তকে মুসলমান সমাজকে বাদ দেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে মুসলমান সমাজ লইয়া লিখিবেন বলিয়া তিনি ভরসা দিয়াছেন।

সঙ্গীতের পর সভাভঙ্গ হয়।"

মুসলিম হলের ছাত্র ইউনিয়ের সভায় শরৎচন্দ্র কি বলেছিলেন, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেও, কিছুই জানতে পারলাম না। তাঁরা সকলেই বললেন—আজ আর কিছুই মনে নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমিতি এবং ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলের ছাত্র সমিতিতে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাগুলিতে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র সর্বত্রই বলেছিলেন —মুসলমান সমাজ নিয়ে এবার উপন্যাস লিখব।—অতএব মুসলিম হলের ছাত্র সমিতিতেও যে তিনি একথা বলেছিলেন, তা অনুমান করা যেতে পারে।

তবে মুসলিম হলে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার একটা কথা শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। রবীনবাবু বলেন—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ফিসারীজ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর মিঃ এস, এল, হোরার পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট মিঃ রহমানের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে আমার পরিচয় হয়েছিল। একদিন কথায় কথায় শরৎচন্দ্র যে আমাদের আত্মীয় এবং আমার বাবার বাল্যবন্ধু একথা তিনি জানতে পেরে তখন বলেছিলেন—

"শরৎচন্দ্র যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, লিট্, উপাধি নিতে ঢাকায়

যান, সেই সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং মুসলিম হলে থাকতাম। আমার বাড়ী ঢাকার বিক্রমপুর। আমি ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পাস করে, সেখানে বি, টি, পড়ছিলাম। মুসলিম হলে যে ছাত্র সমিতি ছিল, আমি ছিলাম তার কর্ণধার। আমিই গিয়ে শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করে আমাদের মুসলিম হলের সভায় এনেছিলাম। আসার সময় পথে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি পড়ি। আমি বলেছিলাম—বি, টি, পড়ি। মনে হয়, আমার ঐ বি, টি, পড়ার কথা শুনেই শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এক জায়গায় বলেছিলেন—

শুনলাম, এখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বি, টি,ও পড়েন। বি, টি, পড়ার আসল উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে ভাল করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

আমার একটি ছোট্ট ভাইঝি আছে। অবশ্য সে নিতান্তই ছোট। তাকে একদিন কলকাতায় আমাদের পাড়ার একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। তা মেয়েটি বাইরে এত লাজুক ছিল যে, সে স্কুলে ক্লাসে কারও সঙ্গে কথা বলত না, এমন কি শিক্ষয়িত্রীরা তাকে কোন প্রশ্ন করলে সে তারও উত্তর দিত না। এইজন্য একদিন এক শিক্ষয়িত্রী তাকে আচ্ছা করে বকুনি দেন এবং বলেন—এই রকম মেয়ে ক্লাসে থাকলে, এ তো অন্য মেয়েদেরও বিগ্ড়ে দেবে। একে স্কুলে রাখা চলবে না।

আমার ভাইঝি তো বকুনি খেয়ে এসে আমার কাছে কাঁদে, আর বলে—আর স্কুলে যাব না।

একটা ছোট্ট লাজুক মেয়েকে মজার গল্প বলে, হাসিয়ে, কথা বলিয়ে কিভাবে যে ক্লাসে চালিয়ে নিতে হয়, শিক্ষয়িত্রীর সে শিক্ষা ছিল না। তাই তিনি তাকে অমন করে বকুনি দিয়েছিলেন।

এখানের যাঁরা বি, টি, পাস করে শিক্ষক হতে যাচ্ছেন, আমার মতে তাঁরাও শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের মারধর না করে, তাদের স্বভাবের পরিচয় আগে নেবেন। তাহলেই তাঁরা ছাত্রদের ঠিক মত শিক্ষা দিতে পারবেন।"

ঢাকা থেকে প্রকাশিত ঐ সময়কার 'চাবুক' কাগজের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র

সাহা একদিন আমাকে বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র •ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র সম্মিলনীর সভায় বলেছিলেন—আমি জীবন ভোর বিজ্ঞানের বই পড়ে আসছি।—শরৎচন্দ্রের এই কথাটাকে ভিত্ত করেই আমি তখন আমার কাগজে একটা গাঁজার কলকে হাতে শরৎচন্দ্রের এক কার্টুন ছবি ছেপেছিলাম।'

শরৎচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান চর্চার কথা কি মুসলিম হলের ছাত্র সমিতিতে বলেছিলেন? যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের বিজ্ঞানের বই পড়া যে কিরূপ সত্য ছিল, বঙ্কিমবাবু তা জানতেন না বলেই, ঐরূপ ছবি ছেপেছিলেন।

ঐ সময়কার 'শনিবারের চিঠি'তেও দেখছি, এই নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'ও তখন শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেছিলেন। শনিবারের চিঠি লিখেছিলেন—

"ঢাকায় এবার অনেক কিছুই খোলা হইয়া গেল। শরৎচন্দ্রকে অশিক্ষিত ভাবিয়া যাঁহারা তাঁহার লেখাকে খেলো ভাবিতেন, তাঁহাদের মুখে চুণ কালি পড়িয়াছে।

শরৎচন্দ্র দীর্ঘ জীবন ধরিয়া বিজ্ঞান চর্চা করিয়াছেন, আবার ছবিও আঁকিয়াছেন। দেউলটিতে কবে 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শরৎচন্দ্রের নাচের দল বাহির হইবে, আমরা কিছুকাল তাহারই প্রতীক্ষা করিব।

কালাচাঁদেই এই, গোরাচাঁদে না জানি কি হইবে।"—ভাদ্র, ১৩৪৩

'দেউলটি' ছিল শরৎচন্দ্রের রেল স্টেশন। 'বি, এন, আর'-এর (বর্তমান নাম সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে) এই স্টেশন হয়েই শরৎচন্দ্র তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন।

শরৎচন্দ্র আফিং খেতেন বলে শনিবারের চিঠি বলেছেন, কালাচাঁদেই এই।

শনিবারের চিঠির এই লেখা থেকেও বুঝা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র ছাত্রদের সভায় প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁর বিজ্ঞানের বই পড়া ও ছবি আঁকার কথা বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে সত্যই ছবি আঁকতেন ও বিজ্ঞানের বই পড়েছিলেন, শনিবারের চিঠির লেখক তা জানতেন না। তাই তিনি ঐরূপ লিখে ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ছবি আঁকা ও বিজ্ঞানের বই পড়া সম্বন্ধে আমি আমার 'শরৎচন্দ্র'

১ম খণ্ড জীবনী গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। শরৎচন্দ্রের আঁকা ছবিও ঐ গ্রন্থে প্রকাশ করেছি।

কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, শনিবারের চিঠিতে বেনামে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কে এই কথাগুলি লিখেছিলেন? সম্পাদক সজনীকান্ত দাস না শনিবারের চিঠির পৃষ্ঠপোষক ও লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার? কেননা মোহিতবাবু ঢাকায় শরৎচন্দ্রের সব বক্তৃতা সভাতেই উপস্থিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের বিজ্ঞানের বই পড়ার বিরুদ্ধে সজনীবাবু লিখুন আর নাই লিখুন, কিন্তু তিনি তো জানতেন যে, শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানের বই কিরূপ পড়তেন!

সজনীবাবু এক সময় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে কমিশন লাভে স্টাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর বই বেচতেন। সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার সজনী-বাবুর কাছ থেকে অনেক টাকার বিজ্ঞানের বই কিনেছিলেন। সজনীবাবু তাঁর 'আত্ম-স্মৃতি' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের এই বিজ্ঞানের বই কেনা সম্বন্ধে লিখেছেন—

"সেই আস্ত রেঙ্গুন লাইব্রেরী গিলিয়া খাওয়ার গল্প আরও সরস করিয়া বলিলেন এবং এক সেট বহুমূল্য বিজ্ঞানের বই নগদ দামে খরিদ করিয়া আমাদের বিদায় দিলেন।"

কামরুন্নেসা গার্লস কলেজে

শরৎচন্দ্র ঢাকার কামরুন্নেসা গার্লস কলেজের আমন্ত্রণে সেখানেও গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কলেজে ঢুকেই একজনকে প্রশ্ন করেছিলেন—এখানে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা কত?

উত্তরে তিনি বলেছিলেন—শতকরা পাঁচজনের বেশী নয়।

এই শুনে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন—তবে কলেজের এমন বিভ্রান্তিকর নাম কেন?

এবার একজন শরৎচন্দ্রকে বুঝিয়ে বললেন—মেয়েদের একত্রে স্কুল ও

কলেজের জন্য এই বিরাট প্রাসাদটি যিনি দান করেছেন, সেই কামরুন্নেসা বিবির নামেই এই বিদ্যায়তনের নামকরণ হয়েছে। কামরুন্নেসা বিবি ছিলেন, ঢাকার নবাব পরিবারের একজন দানশীলা মহিলা।

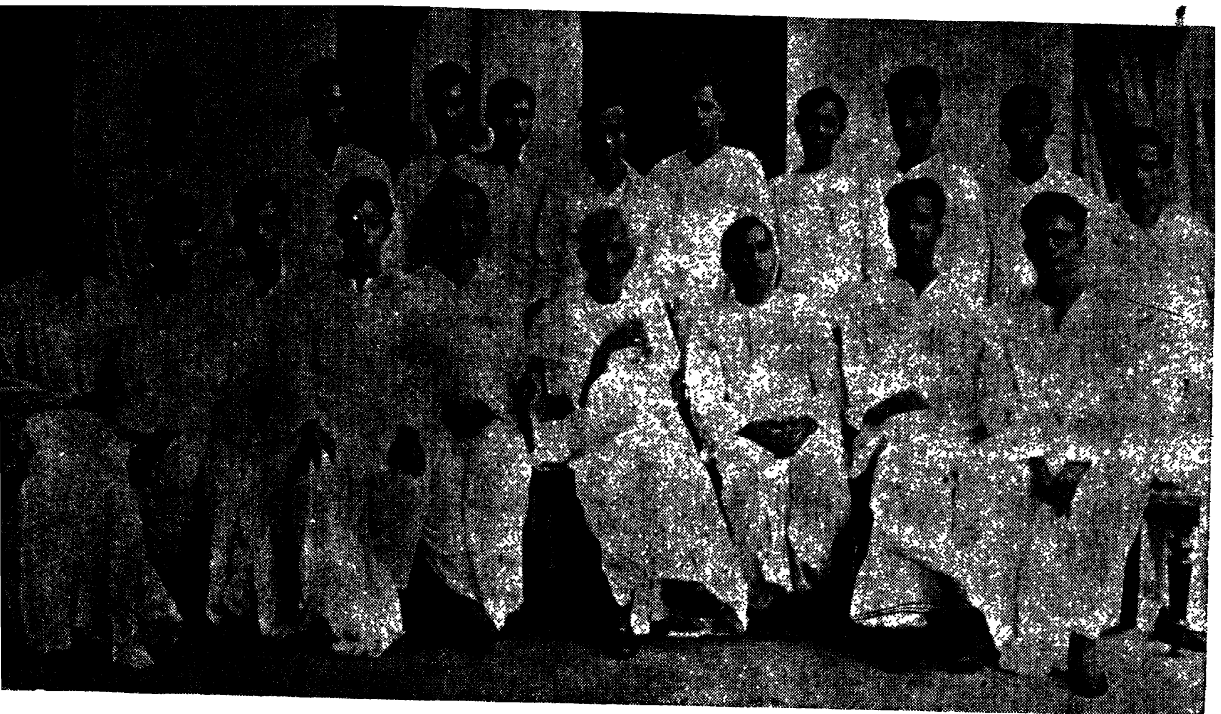
কলেজের অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

কলেজে ছাত্রীদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা হ'ল এই—

কল্যাণীয়া ছাত্রীগণ, তোমরা আমায় 'মানব-দরদী হৃদয়বান কথা-শিল্পী' বলে অভিনন্দন জানিয়েছ। অনেকে আমায় ঐ আখ্যায় ভূষিত করে থাকেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে, আমি মানুষকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। আমি দেখেছি, কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানুষের বিচার করতে গেলে আমারা ভুল করে থাকি। মেয়েদের ক্ষেত্রেই আমাদের এই বিচার-বিভ্রম বেশী ঘটে থাকে। আমাদের এই সনাতন সমাজের বিচারে কোন মেয়ে যদি 'সতী' হয় তবে তার সাত খুন মাফ। অথচ আমি নিজে দেখেছি, সমাজ পঞ্চ মুখে 'সতী' বলে যে সব মেয়ের প্রশংসা করে, তাদের কারো কারো ভেতর স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার অন্ত নেই। এদের কারো কারো চুরি বিদ্যাটিও যে জানা আছে, এ তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর যারা অবস্থাচক্রে বা সাময়িক দুর্বলতার বশে সতী ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তাদের ভেতরেও যে মহত্ত্ব বা হৃদয়ের ঔদার্য্য থাকতে পারে, সে আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আমাদের সমাজে আবার অনেক নারী বিনাদোষে নির্যাতিতা হয়। অন্নদা দিদির মত নারী আমাদের সমাজে নেই, এ কথা তো বলা চলে না।

তোমাদের কাছে আমি শুধু এই কথাটা বলে বিদায় নিতে চাই যে, সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর নারীদের ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? সতীত্ব সেই মনুষ্যত্বের একটি মাত্র দিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাটি নয়। আর আদর্শ তো শুধু মেয়েদের বেলায় নয়, পুরুষের বেলায়ও এ আদর্শ প্রয়োজ্য। তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা দৃষ্টিভঙ্গীকে



'শাস্তি' সাহিত্য সম্মিলনীতে শরৎচন্দ্র

[ছবিটি 'শান্তি'র সহ-সম্পাদক

স্বচ্ছ রেখো, সত্যের আলোকে মানুষের বিচার কোরো, সংস্কার মুক্ত মন ও সহানুভূতিশীল হৃদয় নিয়ে মানুষকে দেখো, এই আমার উপদেশ।

মিলন পরিষদে

ঐ সময় ঢাকায় 'মিলন-পরিষদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল ঢাকার সাহিত্যিকদের একটি মিলন তীর্থ।

শরৎচন্দ্র মিলন পরিষদের আমন্ত্রণে সেখানেও গিয়ে ছিলেন। সেদিন মিলন পরিষদ তাঁদের সভার আয়োজন করেছিলেন, ময়মনসিংহের অন্তর্গত 'ধলা' গ্রামের জমিদারের 'ধলা হাউস' নামক বাড়ীতে। সভা হয়েছিল, ঘরোয়া বৈঠকের মত। সভায় ফরাস, তাকিয়া ও আলবোলার ব্যবস্থা ছিল।

শরৎচন্দ্র সেদিন তামাক খেতে খেতে গল্পের ছলে তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন।

সভার শেষ দিকে একজন শ্রোতা শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—অনেকে বলেন 'শ্রীকান্ত' নাকি আপনারই আত্ম-চরিত? এ কথা কতদূর সত্য?

শরৎচন্দ্র এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নি। বরং একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং প্রশ্নকর্তাকে সামান্য তিরস্কারও করেছিলেন। পরক্ষণেই তিনি প্রসন্ন মুখে বলেছিলেন—তবে 'শ্রীকান্তে'র গহর কিন্তু আমার দেখা চরিত্র, রিয়েল ক্যারাক্টার।

'শান্তি'-সাহিত্য সম্মিলনীতে

শরৎচন্দ্র ডি, লিট্ উপাধি নিতে ঢাকায় গেলে ঢাকার 'শান্তি সাহিত্য সম্মিলনী' ৩০শে জুলাই তারিখে 'রূপলাল হাউসে' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 'শান্তি' পত্রিকার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাস শরৎচন্দ্রকে মাল্য-ভূষিত করে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেছিলেন।

এরপর 'শান্তি'র লেখক-লেখিকাদের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়েছিল। অভিনন্দন পত্রটি পড়েছিলেন কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। এই অভিনন্দন পত্রের এক জায়গায় ছিল—

"সেইদিন আপনি যাহাতে বাঙ্গলায় হিন্দুর প্রতিবেশী বিরাট মুসলমান সমাজ লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারেন—তজ্জন্য আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন। আমারা সমস্ত অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার সাধু সংকল্প সফল ও জয়যুক্ত হউক। সাহিত্যের পরিপূর্ণতা ব্যতীত বাঙ্গলার রাষ্ট্রনৈতিক কল্যাণও ইহাতে সাধিত হইবে।

এ অধিকার কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। শক্তিমান রসশিল্পী এ অধিকার আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আপনাকে ভালবাসি বলিয়াই আমাদের একটু ভয় আছে। আপনার সংকল্প কঠিন-সাধ্য—ইহার জন্য যে গভীর সহানুভূতি ও শক্তি আবশ্যক তাহাও আপনার আছে। মুসলমান সমাজ লইয়া যাঁহারা আজ পর্যন্ত লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনেতিহাস আলোচনায় অনেক অপ্রীতিকর স্মৃতি, এই সতর্কতা আপনে আমাদের বাধ্য করিতেছে এবং এজন্যই হয়ত মুসলমান সাহিত্যিকগণও হিন্দু নায়ক-নায়িকা লইয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যেখানে বিবাদ ও বাধা সেখানেই শক্তিমানের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র। আমরা সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি জয়যুক্ত হউন, নূতন পথ প্রদর্শন করুন, বাঙ্গলার সাহিত্য-বস্তুর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলুন।"

শরৎচন্দ্র দশম বার্ষিক মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনের সভায় বলেছিলেন—

'সেদিন খেতে বসে হিজ এক্সেলেন্সী আমাকে এই প্রশ্নই (মুসলমানদের নিয়ে গল্প লেখা) করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে—চাই উভয় সমাজের আশীর্বাদ। ঠিক সমাজ নয়—চাই উভয় সমাজের সাহিত্য-সেবকদের আশীর্বাদ।'

শরৎচন্দ্র সেদিন, 'শান্তি সাহিত্য সম্মিলনী'র সভায় শান্তির লেখক-লেখিকাদের পক্ষ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়েছিল, মূলতঃ তারই উপর ভিত্তি করেই তাঁর বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই বক্তৃতায়

একটি সারাংশ সেই সময়কার শান্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সেই বক্তৃতার সারাংশটি এই—

"লাটসাহেব বললেন, মুসলমানদের নিয়ে গল্প লিখবে। এ কাজ যদি করতে পার তা হ'লে অত্যন্ত ভাল হয়। সাহিত্য নিয়ে আমি কোনদিন ছেলেখেলা করি নি—অন্য ব্যাপারে হয়ত কথা রাখতে পারি। ১৯১৬ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসি; স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা, বললেন, তুই না কি লিখিস্? আমায় দিস্ ত দু-একখানা বই।

আমি বললাম—ও কিছুই নয়।

তিনি বললেন—ভাখ্, তোকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তাহলে আমায় বলে দিবি। ভাখ্, কাগজ চালাতে গিয়ে যাদের গালাগালি দেওয়া উচিত নয়, তাদেরও গালাগালি দিতে হয়েছে। তুই ত আমার কাছে পড়েছিস্—যা নিজের জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্যি হয়ে উঠবে—অবিশ্যি কল্পনা থাকবে, তাই হবে সাহিত্য বস্তু। নিজের আয়কে অতিক্রম করে ব্যয় করতে যেয়ো না।

আমি বললাম—আশীর্বাদ করুন।

তিনি বললেন—আশীর্বাদ নয়, এই আমার আদেশ।

লোকে বলতে পারে, পাঁচকড়ি বাঁড়ুজ্যে লোক ভাল ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন সমালোচনা করেছিলেন, যা হয়ত তাঁর ইচ্ছে ছিল না।

ঐ দুটো কথা—কখনও আয়কে অতিক্রম ক'রে চলো না, আর নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখবে। সাহিত্য সত্যও নয়, পুলিশ-রিপোর্টও নয়। প্রথম যখন লোকে বলেছে, ঐ-সব অস্বাভাবিক, হয় না—৩৫।৩৬ বছর বয়সে প্রথম 'চরিত্রহীন'-সমালোচনা দেখে দেখে বুঝলাম, প্রত্যেক পাঠক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। আর আমি ওটা কতবার দেখেছি, আর তোমরা একবার পড়েই সমালোচনা করলে।

আমায় যে লোকে ভালবাসল তার প্রধান কারণই হচ্ছে এই, লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার কথাগুলো মেলে। মানুষ সত্যি ছোট নয়। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার দরুণ অনেক কথা জানতে পেরেছিলাম। যেটা বাইরে থেকে জানা যায় না।

এক সময় মুসলমান-সমাজ পেছিয়ে পড়েছিল, গভর্ণমেণ্টই একরকম দাবিয়ে দিয়েছিল। 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে ডাকা হয়েছিল। এক ভদ্রলোক বলেছিলেন. 'হোয়াই আর ইউ অ্যাফ্রেড্ অফ্ দীজ্ মহমেডান্ পিপ্‌ল? উইদাউট হিন্দুস্ হেল্‌প দে কেন্ নট গো অন্, দে হ্যভ্ টু টেক্ ইট'। এখন ওরা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে নিজেদের কথাটা বুঝেছে।

আমার বিশ্বাস, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার গর্কি প্রভৃতিকে ভাল লাগে—তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নাই, তবু তাঁদের 'অ্যাপ্রিসিয়েট' করি। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ আমি নিজে একটা গড়ব। এ ছাড়া আমাদের সত্যি পথ নেই—আমি মুসলমানদের ঐ কথাটা অনেকবার বলেছি।

মুসলমান ছেলেরা আমার কাছে একখানা বই রাখলে, উপরে লেখা—'শ্যালক বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী।' (১)

বললাম—অপমান করবার জন্যেই কি এসেছ? একজন মৃত ব্যক্তিকে অপমান করা ঠিক নয়। বঙ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন। তখন ওরা ছিল অত্যন্ত নির্জীব। কিন্তু সমস্ত 'অ্যাক্‌শান্'-এরই 'রিঅ্যাক্‌শান' আছে।

'বঙ্কিম দুহিতা' বলে একখানা বই—অনেক নোংরা কথা তাতে আছে, এগুলো হতে বাধ্য। জাহানারা একদিন বললে, একটা লেখা দিতে হবে। আমার 'বর্ষবাণী' বেরুচ্ছে। তার আগে এখানের কাজী মোতাহর হোসেন বললেন—আপনারা কি আমাদের একঘরে করে রেখে দেবেন? (২)

রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমার উপরে এদের অনেকগুলো চিঠি এসেছে। আমায় চিঠি দিয়েছে, আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি কতকগুলো তুলে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—না, ও-সবের মধ্যে আমি আর যেতে চাই না। (৩) ভোলানাথ যখন মারা গেল তার অপরাধটা কি? (৪) আক্রাম খাঁর ছেলেই কাগজ চালায়। তাদের 'স্পিরিট'-এর একটি দৃষ্টান্ত দিই। নরেন দেবের কাছে লেখা চাইতে গেছে, বলে, 'বাঙ্গলা থোড়া বহুৎ সমঝ্‌তে হেঁ, বোল্‌নে নেই সাক্‌তে।'

আমাদের আশঙ্কা ওরা প্রথমে বাঙ্গলাটাকে নষ্ট করবে। ওরা যখন বাঙ্গলাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করে না। (৫)"

[(১) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে একাধিক মহৎ মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বাঙ্গলার দরিদ্র মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে লিখেছেন। তিনি তাঁর রাজসিংহ উপন্যাসে 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' বলেছেন—"হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।"

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তাঁর কোন কোন উপন্যাসে কোন কোন চরিত্র প্রসঙ্গত মুসলমানদের সম্বন্ধে অপ্রীতিকর উক্তি করায় বা তাঁর কোন কোন উপন্যাসের মুসলমান পাত্র-পাত্রী সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকায়, বাঙ্গলা দেশের অনেক মুসলমান বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট নন। এই অসন্তুষ্ট মুসলমানদেরই কেউ কেউ সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ করেছিলেন।

(২) কাজী মোতাহর হোসেন ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। শরৎচন্দ্র ঢাকায় যাওয়ার আগে থেকেই এঁর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। কাজী সাহেব কলকাতায় এলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে যেতেন। গিয়ে অনেক সময় দুজনে দাবা খেলতেন। একদিন এইরূপ গেলে, সেদিন শরৎচন্দ্র অসুস্থ থাকায় খেলা আর হ'ল না, হ'ল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা।

সেদিন উভয়ের মধ্যে যে সব কথা হয়েছিল, সেই কথাগুলোই শরৎচন্দ্র পত্রাকারে জাহান-আরা চৌধুরীর 'বর্ষবাণী' (১৩৪২ সাল) কাগজে লিখে পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই লেখাটি ছিল এইরূপ—

"কিছুকাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আজও আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে,

তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ-গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হ'লে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম—এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছ?

তিনি বললেন—উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম—এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ।

তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবেন, আমরা ভীতু, তোমরা বীর। তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও, তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায়, তখন দেখবে, তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ সবচেয়ে বেশী।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন—এমনি 'নন-কো-অপারেশান'ই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম—না, চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা, তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে, অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।"

(৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁর পর্বত প্রমাণ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কবিতায় ও প্রবন্ধে কোথাও কোথাও আওরঙ্গজেবের কথা বলেছেন। যেমন—তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কাব্য গ্রন্থের 'মানী' কবিতার প্রথমেই বলেছেন—

আরঙজেব ভারত যবে
করিতেছিল খান খান,

এই কবিতায় কিন্তু আরঙজেব 'ক্ষত্রকুল-সিংহ-শিশু' সিরোহিপতি সুরতানের সম্মান বজায় রেখে নিজ হৃদয়ের উদারতারই পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বীর গুরু' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"নানকের পর পঞ্জাবে আটজন গুরু জন্মিয়াছেন, আটজন গুরু মরিয়াছেন। নবম গুরুর নাম তেগ্ বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন নিষ্ঠুর আরঞ্জীব দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। রাম রায় বলিয়া তেগ্ বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট, তেগ্ বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঞ্জীবের লোক যখন তেগ্ বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময় তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ। তাহাকে বলিলেন—তুমিই শিখদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক আমাকে যদি বধ করে তো ...ইহার প্রতিশোধ তুমি লইয়ো।"

এরপর কবি লিখেছেন—তেগ্ বাহাদুর দিল্লীতে গিয়ে শির দিলেন, কিন্তু 'সির' বা গুপ্তকথা দিলেন না।

বালক গোবিন্দ পরে বড় হয়ে শিখ সৈন্য সংগ্রহ করে যখন মুকতসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেন, সেই সময়কার কথায় কবি লিখেছেন—

"সম্রাট আরঞ্জীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ, শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।...তুমি হিন্দুদিগকে

মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখিকে শিখাইব বাজপাখিকে কী করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়। পাঁচজন শিখের হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচজন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাত পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন, তবে সম্রাট তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।”

এখানেও দেখা যাচ্ছে, কবি আরঙ্গজীবের চরিত্রের খারাপ দিকের কথা বললেও, তাঁর চরিত্রের ভাল দিকের কথাও বলেছেন।

(৪) কলকাতার বিখ্যাত বই-এর দোকান 'সেন ব্রাদার্স'এর অন্যতম মালিক ভোলানাথ সেন। ইনি এবং এঁদের দোকানের আর দুজন কর্মী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক পি, সি, ব্যানার্জীর ছোটভাই) ও সুরেন্দ্রনাথ সরকার (স্যার নীলরতন সরকারের খুড়তুতো ভাই) দুজন সশস্ত্র মুসলমান যুবকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত হয়েছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ভোলানাথবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বিভূতি ভূষণ সেন বলেন—

“সে সময় 'প্রাচীন কাহিনী' নামে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য আমাদের একটা ইতিহাস ছিল। বইটার লেখক ছিলেন আমার কাকা ভোলানাথবাবুই। সেটা বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ডি, পি, আই, কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত বই ছিল। তখন ডি, পি, আই, ছিলেন বট্‌মলী সাহেব।

ঐ বইয়ে যেখানে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মোহম্মদের কথা আছে, সেই অধ্যায়ে একটা ছবি ছাপা হয়েছিল। ছবিটি ছিল এই—মসজিদের মধ্যে মোহম্মদ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সামনে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত হচ্ছেন। ছবির নীচে লেখা ছিল—'জিবরাইল, রসুল অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন।'

এই ছবিটি প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন ইংরাজির বিখ্যাত অধ্যাপক

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (যাঁর পিতা ঈশানচন্দ্র ঘোষের নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষায় ঈশান স্কলারশিপ আছে) বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে তাঁদের অনুমতি নিয়ে এনেছিলেন। ছবিটি একটি পারসীয়ান আর্ট। ওটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। ঐ ছবি ছেপে আমরা ছবির নীচে ছবির পরিচয় হিসাবে বাঙ্গলায় যে কথাগুলো লিখেছিলাম, মূল ছবিতে ছবির মাথায় পারসী ভাষায় ঐ লেখাগুলোই আছে। আমাদের বই-এ ছাপা ঐ ছবিতে সেই পারসী লেখাটাও ছিল।

ঐ 'প্রাচীন কাহিনী' বই ডি, পি, আই, কর্তৃক অনুমোদিত বলে তখন কেউ কোন আপত্তি করেন নি।

কিন্তু ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলের এক মুসলমান জমিদার, তাঁর সেখানে এক সভা করে বই-এর ঐ ছবি সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন। তিনি নাকি বলেছিলেন—ঐ ছবি ছেপে নিরাকারবাদী মুসলমান সমাজের অপমান করা হয়েছে।—এই বলে তিনি কিছু মুসলমানকে উত্তেজিত করেন।

আমরা এর কিছুই জানতাম না। কোন মুসলমান আপত্তি করেছেন জানতে পারলে, আমরা তখনই ঐ ছবি বাদ দিতাম।

মূলতঃ সেই মুসলমান জমিদারই কলকাতায় এসে দুজন পাঞ্জাবী মুসলমান যুবককে দিয়ে আমার কাকা ভোলানাথ সেনকে ও আমাদের দোকানের আর দুজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারীকে হত্যা করিয়েছিলেন। সেদিনটা ছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে। তাঁরা সেই সবে দোকান খুলে দোকানে এসে বসেছেন। এমন সময় ঐ পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক দুটি হঠাৎ এসে তীক্ষ্ণ ছোরা নিয়ে তাঁদের আক্রমণ ক'রে গুরুতররূপে আঘাত করে। পরে ঐ আঘাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

দোকানেব অন্যান্য কর্মচারীরা তখনই আততায়ীদের ধরে ফেলে এবং পুলিশে দেয়।

ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন রসবার্ক। তিনি বিচারে আসামীদের দুজনকেই হত্যাকারী ঘোষণা করে কেস হাইকোর্টে সেসনে পাঠিয়ে দেন। আসামীদের যিনি প্ররোচনা দিয়েছিলেন, সেই ঢাকার জমিদারের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁর কিছুই হয় নি।

হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ট উইলিয়ম সেসনের বিচারে রসবার্কের রায়ই বহাল রেখেছিলেন। ফলে আসামীদের দুজনেরই ফাঁসি হয়েছিল।

'অচেনা-আকাশ' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক সেকালের বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন—"১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন স্বদেশী করে আলিপুরে প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম, সেই সময় ভোলানাথ সেন ও তাঁদের দোকানের অপর দুজন কর্মীর হত্যাকারী মুসলমান যুবক দুটিও ঐ প্রেসিডেন্সী জেলে ছিল। আমরা তখন দেখতাম, রোজই বহু মুসলমান নারী-পুরুষ জেলে তাদের দেখতে যেত। গিয়ে তারা ঐ দুজনের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা জানিয়ে আসত। ঐ যুবক দুটি মরে মুসলমান সমাজে শহীদের সম্মান পেয়েছিল।"

(৫) আক্রাম খাঁ, এঁরা পূর্বে হিন্দু ছিলেন। এঁদের পদবী ছিল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা হিন্দু থেকে মুসলমান হন। আক্রাম খাঁর এক ভাই মুসলমান থেকে আবার হিন্দু হয়েছিলেন। এঁদের বাড়ী ছিল ২৪ পরগণা জেলায়। অতএব আক্রাম খাঁর ছেলে যাই বলুন না কেন, এঁদের মাতৃভাষা বাঙ্গলাই।]

রূপলাল হাউসে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, ঢাকার 'চাবুক' নামক অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সাহা প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

রূপলাল হাউসে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার দু-একদিন পরেই 'চাবুক' কাগজে তাঁর ঐ বক্তৃতার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সমালোচনা বেরোয়। বঙ্কিমবাবু বলেন—ঐ লেখাটা আমার নয়, ওটা মোহিতবাবু লিখেছিলেন। ও-রকম লেখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

চাবুকে এইরূপ বিরূপ সমালোচনা বেরুলে, 'শরৎচন্দ্রের উপর অযথা আক্রমণ' এই হেডিং দিয়ে শান্তির সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাস তখন ১৩৪৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'শান্তি'র সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—

"কোন কোন সম্পাদক আছেন, তাঁহারা প্রসিদ্ধ লোকদের গালাগালি

দিয়া নিজেদের জাহির করিতে চান। ইহারা প্রায়ই ভুঁইফোড় সম্পাদক। ইহারা 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' দলভুক্ত। ঢাকার এইরূপ একটি ভুঁইফোড় সম্পাদক রূপলাল হাউসে শরৎবাবু যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অযথা বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন।

এই ভুঁইফোড় পত্রিকা-সম্পাদকের লেখা সমালোচনা করাও আমরা সম্মানের হানিজনক মনে করি। পাছে শরৎবাবু ঢাকার শিক্ষিত জনসাধারণকে ভুল বুঝেন, এই জন্যই এ বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইল। ঢাকার শিক্ষিত জনসাধারণ শরংবাবুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। শরৎবাবু এই ভুঁইফোড় পত্রিকাকে ঢাকার মুখপত্র মনে করিয়া ঢাকাবাসীদের—বিশেষভাবে ঢাকার ছাত্রবৃন্দকে ভুল না বুঝেন, এই আমাদের অনুরোধ।…"

রূপলাল হাউসে প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার বিরুদ্ধে চাবুকে মোহিতবাবুর লেখাটি দেখতে পেলাম না। বঙ্কিমবাবু বললেন—এখন আর সে সংখ্যাটি খুঁজে পাচ্ছি না।

ঐ সময়কার 'শনিবারের চিঠি'তে ঢাকায় শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার বিরুদ্ধে একটা মন্তব্য দেখছি। শনিবারের চিঠির লেখাটিও মোহিতবাবুর কিনা বলা যায় না। কেননা, মোহিতবাবু তখন শনিবারের চিঠিরও একজন প্রধান লেখক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যাই হোক্, শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠি তখন কি লিখেছিলেন, এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

১৩৪৩ সালের ভাদ্র মাসের 'শনিবারের চিঠিতে লেখা হয়েছিল—

"অতঃপর বাকী জীবন মুসলমান সমাজ লইয়া লিখিবেন বলিয়া শরৎচন্দ্র যে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিতেছি আমাদের মত অনেকেই তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতায় ও ঢাকায় কয়েকটি মুসলমান সভা-সমিতি শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইহারা শরৎচন্দ্রের এত বড় একটা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাঁহাকে বরণ করিতেছেন না কেন জানি না। আমরা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছি অন্য কারণে। শরৎচন্দ্রের লেখার যে বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি নিজেই ঢাকায় দু-একটি সভা-সমিতিতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই যে,

তিনি জীবনে এমন কিছুই লিখিতে পারেন নাই, যাহা তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রসূত নয়। বালীগঞ্জে বাড়ী ফাঁদিয়া বাঙ্গলার অবজ্ঞাত মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা, বাগবাজারে বসিয়া লণ্ডন করেস্‌পণ্ডেণ্ট হওয়ার চাইতেও কঠিন কাজ। শরৎচন্দ্র পারিবেন না, তাঁহার সে বয়স নাই।"

শরৎচন্দ্র 'চাবুক' ও 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর বিরুদ্ধে এই লেখা দুটিই দেখেছিলেন। তাই কিছুদিন পরেই হাওড়াবাসীরা হাওড়া টাউন হলে তাঁর ৬১তম জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালে, সেদিন তিনি ঐ লেখা দুটির উত্তরে কিছু বলেছিলেন। পরে বাতায়ন-সম্পাদকের অনুরোধে তিনি সেই কথা-গুলোই আবার, যেন অন্য লেখকে লিখছেন, এইভাবে 'শরৎচন্দ্রের উভয়-সংকট' নাম দিয়ে প্রবন্ধ আকারে বাতায়নে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই লেখাটি এই—

"শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিতে গত শনিবার (৩রা আশ্বিন) হাওড়া টাউন হলে এক সভার অধিবেশন হয়।

সম্বর্ধনার উত্তরে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি যখন বাহির হইতে প্রথমে বাঙ্গলা দেশে আসেন, তখন হাওড়াতেই অবস্থান করেন। তারপর বহু গ্রন্থও হাওড়ায় আসিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন। হাওড়া তাঁহার অতি প্রিয় স্থান। হাওড়াবাসীর নিকট হইতে তিনি বহু বার সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং প্রিয়জনের পুনর্বার সম্বর্ধনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

জীবনের অবশিষ্টাংশ মুসলমান-সমাজের চরিত্র অঙ্কনে ব্রতী থাকিবেন বলিয়া ঢাকায় তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখপূর্বক ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁহার এই কথা বলিবার একটা বড় কারণ রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে করি না কেন, মুসলমানগণ আমাদেরই প্রতিবেশী; বাঙ্গলা ভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়া যদি তাহাদের সহিত কথা বলি, তবে তাহারা শুনিতে বাধ্য। কারণ, তাহারাও ত মানুষ।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, অল্পদিনের মধ্যে বহু শিক্ষিত মুসলমানের

সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছে। তাহারা তাঁহার নিকট এই অভিযোগ করিয়াছে যে, বাঙ্গলা সাহিত্য অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক, কারণ উহাতে নাকি শুধু হিন্দু সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না, সাহিত্য সার্বজনীন ব্যাপার। হিন্দু ও মুসলমানের আর্থিক স্বার্থ এক—এই আর্থিক ভিত্তিতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া কত দিনে হইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। যাঁহারা অর্থনৈতিক প্রশ্ন লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে যাহা করিবার আছে, তাঁহারা তাহা করুন, তবে তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছেন যে, অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া (দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে) একটা বোঝাপড়া করা যাইতে পারে। বহু হিন্দু ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন তাঁহার সাহিত্যে মুসলমান সমাজ-চরিত্র অঙ্কন না করেন, কারণ ইহাতে তাঁহার একটা বিপদ ঘটিতে পারে। আবার বহু মুসলমানও তাঁহাকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি মুসলমান-সমাজের অনেক কিছুই জানেন না, কাজেই তাঁহার পক্ষে এ কাজে হাত দেওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং দুই দিন পূর্বে বা পরে মরিলে তাঁহার আক্ষেপের কিছু নাই।

উপসংহারে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, হিন্দুদের অনেক কিছুই সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদের মনে যে গভীর ক্ষত হইয়াছে, সেই ক্ষতকে উস্কে তুলে দিলে সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। তিনি মনে করেন যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার চেষ্টা তিনি করিবেন, তাহা যদি তিনি সমস্ত মন দিয়া করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্যার আশু সমাধান হইবে।" ('বাতায়ন'—৯ই আশ্বিন, ১৩৪৩)

আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' আবার 'প্রসঙ্গ কথা'য় 'শরৎচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন—

"১৯২৬ সালের ইংরেজি ৬ই অক্টোবরের বুধবার তারিখে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই সুস্থ ও সজ্ঞান ছিলেন এবং তাঁহার বয়স এখন ষাটের ঊর্ধ্বে হইলে দশ বৎসর

পূর্বে নিশ্চয়ই তিনি শিশু ছিলেন না। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ঐ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

'মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের 'পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে-আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই।···

হিন্দু-নারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয়, অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।' (বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা)

'···স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সত্যনিষ্ঠ শিষ্যের উপযুক্ত কথা বটে। ঢাকায় গিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শুধু যে হৃদয়ই খুলিয়াছে তাহা নয়, ভাষারও বদল হইয়াছে। যথা—এ 'দুনিয়া' থেকে বিদায় নেবার পূর্বে···। এই ষাট বছর বয়সে নিজেকে অনুপযুক্ত 'বেকুফ' ইত্যাদি···। আমার 'সালাম' গ্রহণ করুন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শুধু সত্যনিষ্ঠ নন, কৌশলীও।···

মোট কথা ১৯২৬ ও ১৯৩৬ এই উভয় সনের শরৎ চট্টোপাধ্যায় যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভূতপূর্ব মহামহোপাধ্যায় এবং অধুনা

মৌলানা। আমরা মহামহোপাধ্যায় মৌলানা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রীকে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করিয়া বহুত বহুত সালাম কবুল করিতেছি। 'চুম্বন' 'আলিঙ্গন' লইয়া রসিকতা করা চলে জানিতাম, কিন্তু মুসলমানদের মত গম্ভীর ব্যাপার লইয়াও যে রসিকতা করা যায় এবং তাহাও 'হিজ্ এক্সেলেন্সী'র সঙ্গে খাইতে বসিয়া—ইহা নূতন দেখিতেছি'।"

'দুনিয়া', 'বেকুফ' ও 'সালাম' এই শব্দগুলি শনিবারের চিঠি, দশম বার্ষিক মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীতে শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক প্রবন্ধে এক স্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—'আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইএর মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না।'

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে 'চুম্বন'ও আছে, 'আলিঙ্গন'ও আছে। এই কারণেই শনিবারের চিঠি এ কথা লিখেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ডি, লিট্, উপাধি নিতে ঢাকায় গেলে, সেবার ঢাকায় বহু প্রতিষ্ঠানই শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। কিন্তু ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের একদল ছাত্রের আপত্তিতে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে পারে নি।

কেন যে ঐ ছাত্ররা আপত্তি করেছিল, ১৩৪৩ সালের ২০শে শ্রাবণ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের 'যৎকিঞ্চিৎ'এর মন্তব্য থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা 'যৎকিঞ্চিৎ'এ লিখেছিলেন—

"ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে মানপত্র দানের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য 'ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন' বা ছাত্র সংঘের একটি সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় মুসলমান ছাত্ররা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করাতে উহা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুসলমান ছাত্রদের অভিযোগ নাকি এই যে, যেহেতু শরৎবাবু একজন রাজনীতিক, অতএব তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা যাইতে পারে না। সভাপতি

ছিলেন একজন মুসলমান অধ্যাপক। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও মুসলমান ছাত্রদের এই অন্যায় মনোভাব দূর করিতে পারেন নাই। মুসলমান ছাত্রদের আসল অভিযোগ যে 'রাজনীতিক' শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে নহে, 'হিন্দু' শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎবাবুকে 'ডক্টর' উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের যদি এ বিষয়ে কিছু হাত থাকিত, তবে তাহারা কখনই শরৎবাবুকে এই উপাধি দিতে সম্মত হইত না।"

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ বলেন—

শরৎচন্দ্র ডি, লিট্, উপাধি নিতে যখন ঢাকায় যান, ঠিক সেই সময়ে মুসলমান সম্পাদিত কোন কোন কাগজ, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' নামক প্রবন্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছিলেন, সেই সব প্রকাশ করেছিল। তারই ফলে, কিছু সংখ্যক মুসলমান ছাত্র ঐ সব প'ড়ে শরৎচন্দ্রের উপর কিছুটা বিরূপ হয়েছিল। তাই তারা শরৎচন্দ্রকে 'রাজনীতিক' আখ্যা দিয়ে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকৃত হয়েছিল।

ওদুদ সাহেব আরও বলেন—শুধু ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের মুসলমান ছাত্ররাই নয়, ঐ সময় আমরা শরৎচন্দ্রকে সভাপতি করে ঢাকায় যে দশম বার্ষিক মুসলিম সাহিত্য সম্মিলন করেছিলাম, তাতেও কিছু সংখ্যক মুসলমান আমাদের ঐ সভার বিরোধিতা করেছিল।

রসচক্রে

শরৎচন্দ্র ডি, লিট্, উপাধি পেলে 'রসচক্রে'র সদস্যরা শিল্পী অর্ধেন্দু গাঙ্গুলীর বনহুগলীস্থ বাগান বাড়ীতে এক উদ্যান সম্মিলনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেদিন অভিনন্দন সভায় রসচক্রের সদস্যদের পক্ষ থেকে নীচের লেখাটি পঠিত হয়েছিল—

"আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন—গঙ্গাতীরের সর্বশ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীকে বুড়ীগঙ্গাতীরের বিদ্বৎসমাজ ডি, লিট্, উপাধির দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। একদিন বঙ্গের কবিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মান দান করিয়া নিজের সম্মানই রক্ষা করিয়াছিল। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র রবির আলোকে বিলুপ্ত—সে সম্মানে আমরা সম্মানিত মনে করি নাই। শরৎচন্দ্রের এই সম্মানেই নক্ষত্রেরা আজ সম্মানিত।

শরৎচন্দ্রের প্রতি এই মর্যাদা দান রস-সরস্বতীরই উপাসনা—রসের উদ্দেশে জ্ঞানের অর্ঘ্যদান—শিল্পের বেদীতে তত্ত্বের প্রণিপাত। রস-সরস্বতীকে যশোলক্ষ্মী বহুদিন আগেই বরণ করিয়াছে—আজ ঐশ্বর্যমদগর্বিতা ইন্দ্রাণী যে তাহার রত্নকিরীট অবনত করিল—তাহাতে রস-সরস্বতীর সেবক মাত্রই বিজয় গৌরব অনুভব করিবে। নগণ্য সেবক হইলেও আজ আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। কাক যদি কোকিলতা প্রাপ্ত হয়—তবে কোন্ কোকিলের না আনন্দ হয়? কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অরসজ্ঞ কাক চোষে জ্ঞাননিম্ব ফলে,
রসজ্ঞ কোকিল বুলে প্রেমাম্র-মুকুলে।

কাক যদি জ্ঞাননিম্ব ফল ত্যাগ করিয়া একদিনের জন্যও প্রেমাম্র-মুকুলে বিলাস করে—তবে মুকুল কুঞ্জের কোন্ কোকিল আনন্দ অনুভব না করে? রসিক চিরদিনই রসের মর্যাদা বুঝে—তাহাতে নূতন করিয়া উল্লাসের কিছু নাই। কিন্তু যেখানে রসজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না, সেখান হইতে মর্যাদা আসিলেই উল্লাসের কারণ ঘটে।

'ওল্ড টেস্টামেণ্টে'র 'প্রডিগ্যাল সন'-এর উপাখ্যানের কথা মনে পড়ে, অনুগত সন্তানের আনুগত্যের জন্য উৎসবের প্রয়োজন হয় নাই—প্রডিগ্যাল সন যেদিন ফিরিয়া আসিল, সেইদিন হইল মহা-মহোৎসব।

যাহারা সাহিত্যের খবর রাখে, সাহিত্যের জন্মকোষ্ঠী রচনা করে, যাহারা তাহার ঘটককারিকা ও কুলুজির ভাণ্ডারী—যাহারা সাহিত্যের ঘর সংসারের তদারক করে এবং শেষ পর্যন্ত তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করে—আমাদের বিদ্বৎ-সমাজ চিরকাল তাহাদেরই সম্মানিত করে, কিন্তু যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে কোন সম্মান দেওয়া, তাহার রীতিনীতি বিরুদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ রীতি না মানিয়া প্রীতির বশে যাহা করিয়া ফেলিল —তাহা ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের চেয়ে বৈজ্ঞানিক, দর্শনের শিক্ষকের চেয়ে দার্শনিক ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাতার চেয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক যে বড়, এ দেশের বিদ্বৎসমাজ এ কথা স্বীকার করিলেও, সাহিত্যের অধ্যাপকের চেয়ে যে সাহিত্য স্রষ্টা ঢের বড়, এ কথা স্বীকার করে না। এই কথা স্বীকার করাইতে হইলে সাহিত্য-স্রষ্টাকে মরিতে হয়—বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার নমস্য হইবার উপায় নাই। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি খঞ্জ নন, অন্ধ নন, জরাজীর্ণ নন, হাসপাতালে শয্যাগত নন—এমন একজন সুস্থ, সবল, জীবন্ত সাহিত্যিককে মর্যাদা দান করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্যাদা দান করিয়া নিজের মর্যাদাই বহুগুণে বৃদ্ধি করিল। শরৎচন্দ্রের গৌরবদ্যুতি নূতন করিয়া কি বাড়িবে জানি না। শরৎচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত হইয়া উপাধিই গৌরবান্বিত হইল বলিয়া মনে করি।

আজিকার এই উদ্যান সম্মিলনে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আমাদের পরম ভক্তিভাজন শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই—আমরা কোন মামুলি বচন বিলাসের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়া করিয়া আনি নাই —আমরা অভিনন্দন পত্র রচনা করি নাই, আমরা ফুলের মালা পর্যন্ত পরাই নাই—আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু

জানাইতেছি। রসস্রষ্টা হইতে পারা বহুজন্মের সাধনার ফল, রসস্রষ্টা হইতে না পারি, যেন রসের পরিপূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করিয়া রসচক্র নাম সার্থক করিতে পারি—এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।”

এই অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন—

আমার বই সাধারণ লোকেই পড়ে। তাদের অনেকেই হয়ত খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তারা আমার লেখা ভালবাসে। তাই তারা আমার বই কেনে ও পড়ে। আমি তাদের কাছ থেকে টাকা ও ভালবাসা দুইই পেয়েছি।

পণ্ডিত ব্যাক্তিরা অর্থাৎ খুব বেশী লেখাপড়া জানা লোকেরা আমার বই পড়েন বলে মনে হয় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটা উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে আমার সাহিত্য সাধনার জন্য এই যে স্বীকৃতি, এটা আমার পক্ষে কম গৌরবের নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো আমাকে কোন উপাধি দিল না। তবু তো ওরা দিল। আমার সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য ওদের এই যে স্বীকৃতি, এতে বিশ্ববিদ্যালয় বা উপাধি নয়, আমিই বরং কৃতার্থ হয়েছি।

স্কটিশ চার্চ কলেজে

১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের ৬২তম জন্মদিনে স্কটিশ চার্চ কলেজের 'বাঙ্গলা সাহিত্য সমিতি' শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানান। ঐ শরৎ-বন্দনা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন—ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর সেন।

শরৎচন্দ্র অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন বলেছিলেন—

আজ দেশের বড় দুর্দিন। আজ আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ।* আজকের দিনে আমার ইচ্ছে ছিল না জন্মদিনে এইরূপ আনন্দ করা। কিন্তু তোমাদের ডাক, তোমাদের সম্পাদকের আবদার আমায় রাখতে হ'ল। কবে আছি, কবে নেই—হয়ত আজকের ৩১শে ভাদ্র আর ফিরে আসবে না, সেই জন্য আসতে হ'ল, তোমাদের ডাককে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ৬১টা ত চলে গেল—কিছুই করতে পারলাম না। জানি না ৬২টা কি রকম ভাবে যাবে। যদি আবার ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে ত তোমাদের কাছে নিশ্চয় আসব।

তোমাদের কাছে আজকে দুটি কথা বলতে এসেছি। বাঙ্গালী বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে। আগে দেখতাম, বাঙ্গালীরা সব উঁচু উঁচু পদে রয়েছে, কিন্তু আজ আর সে দিন নেই। আগে ছিল বাঙ্গালীর সম্প্রসারণের যুগ, আর আজ বাঙ্গালীর সঙ্কোচনের যুগ। বাঙ্গালী আজ জীবন-সংগ্রামে হটে যাচ্ছে—বাঙ্গালী আজ বিপর্যস্ত।

তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমরা দেশের গুণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দিগকে সর্বদা সম্মান দিতে কোন দিন যেন কার্পণ্য না কর। এই কথাটা সব সময় মনে রেখ যে, এতে কেবল তাঁদিগকে সম্মান করা হয় মাত্র, তা নয়; পরন্তু এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে দেশের ব্যক্তিদিগের গুণের সমাদর করা হয়, আর দেশবাসীকে তাঁর গুণ সম্বন্ধে সচেতন করবার সুযোগ ঘটায়। কোন ব্যক্তিকে সমালোচনা করা আমি আদৌ নিন্দনীয় মনে করি না। এতে বরং সমালোচনার পাত্রটিকে নানা বিষয়ে অবহিত হতে সাহায্য করে। উপযুক্ত

সমালোচনা সর্বদাই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচনা করতে গিয়ে যদি তাঁকে নানারূপে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, তা হলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর নেই। এ রকম আক্রমণে পরশ্রীকাতরতাই দেখান হয়। আজকাল বাঙ্গলা দেশে বিশেষ এই পরশ্রীকাতরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দিনে দিনে পরশ্রীকাতরতার বিষময় ফল বাঙ্গালী সমাজকে পঙ্গু করে তুলছে।

তোমাদের কাছে আমার আবার অনুরোধ, এইরূপ মনোভাব যেন তোমরা না পোষণ কর।

আজকে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিই।

[* কবির এই অসুখ সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

"একদিন সন্ধ্যার পর সকলের সহিত কথাবার্তার মধ্যে কবি হঠাৎ হতচৈতন্য হইলেন (২৫শে ভাদ্র। ১০ সেপ্‌)।...দুই দিন হতচৈতন্য থাকিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড)]

বিদ্যাসাগর কলেজে

১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্রের ৬২তম জন্মদিনে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজও শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের সভার পর বিদ্যাসাগর কলেজে যান। জলধর সেনও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর কলেজে অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—

আমার জন্মদিন উপলক্ষে কলেজের কর্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় নিজে বসে আছেন। তোমরা ছাত্র-ছাত্রীরা আছ। তোমরা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করলে, আমাকে আনন্দ দেবার জন্য আমারই বই থেকে নাটকের কিছু কিছু অংশ অভিনয় করলে। এর জন্য তোমাদের সকলকে আমার স্নেহ, ভালবাসা জানাই।

আমাকে আনন্দ দেবার জন্য আজ তোমরা অনেক রকম আয়োজন করেছ—তোমাদের সমস্ত আয়োজন অন্তরে গ্রহণ করছি। কিন্তু অসুস্থ শরীরে, আর এই বৃদ্ধকালে তোমাদের সব ব্যাপারে যোগ দেওয়ার জন্য বেশীক্ষণ বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই তোমাদের অভিনয়ের মাঝখানে বলতে হ'ল—আমাকে ছেড়ে দাও। তিনটায় বেরিয়েছি, বড় 'স্ট্রেন' হচ্ছে, শরীর অত্যন্ত খারাপ। যখন বয়স বাড়ে তখন স্থিরতা থাকে না। কোন্‌দিন কে আছে, কে নাই। আজ যখন সুযোগ হ'ল, যখন তোমরা বললে—৩১শে ভাদ্র আমাকে আসতে হবে বিদ্যাসাগর কলেজে, আমি রাজী হলাম এই জন্য যে, আসছে বছর এ রকম সুযোগ হবে কিনা জানি না।

তোমাদের কাছে আমার আবেদন বল, নিবেদন বল এই—তোমরা যখন বড় হবে, তখন আমাদের নাম তোমাদের সামনে থাকবে কি না-থাকবে জানি না। হয়ত দেশের রুচি তখন এমন বদলে যাবে, তোমরা সেগুলি পড়বে না—এটা আশ্চর্য নয়। জগতে এ রকম অনেক হয়, হয়েছে। সেগুলি পুরণো লাইব্রেরীতে থাকে, লোকে প্রশংসা করে কিন্তু পড়ে না। বাঙ্গলা দেশের

অনেক বড় গ্রন্থকারের ভাগ্যে এ রকম ঘটেছে। হয়ত আমাদের ভাগ্যেও সে রকম হ'তে পারে। যদি হয়, আমি তাকে দুর্দিন মনে করব না। আমি মনে করব দেশের সাহিত্য এত বড় হয়েছে, এত ভাল হয়েছে, এগুলি তার কাছে অকিঞ্চিৎকর।

বাঙ্গলা দেশের দু-এক জনের ব্যক্তিগত জীবনই বড় নয়। বড় হচ্ছে—জাতীয় সাহিত্য ও ভাষা। সে সম্বন্ধে আমার যতটুকু চেষ্টা করেছি, তাকে যতটুকু বাড়াতে পেরেছি—হয়ত পেরেছি, নইলে এত লোক আমাকে ভালবাসত না—করেছি, তা যদি না থাকে,—ধর আরও কুড়ি বৎসর পর—তা হ'লে সেটা যে ভাষার পক্ষে দুর্দিন, তা বলব না। সে যাই হোক্, নিজের যতটুকু শক্তি ছিল করেছি, যতটা আয়ু ছিল বেঁচেছি। তোমাদিগকে আশীর্বাদ করি এবং বলি, বাঙ্গলা—যে ভাষাতে জ্ঞান হওয়া অবধি কথা বলতে আরম্ভ করেছ, সেটা তোমাদের মাতৃভাষা। এর উপর যেন কোনদিন তোমাদের অশ্রদ্ধা না হয়। এটা যেন তোমরা বাড়িয়ে তুলতে পার। বহু লোকের চেষ্টায় একটা জিনিস বাড়ে, তার মধ্যে একজন উঁচু হয়ে ওঠে। বহু লোক সাহিত্যকে ভালবেসেছে, তার সাধনা করেছে, করে তারা এখন অনেকে মাটির নীচে চাপা পড়েছে। তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে, কিন্তু শত জমির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্ভবপর হয়েছে, আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়। সকলেরই কারণ থাকে, তোমাদের মধ্যে যার মনে হয়—আমি কিছু করতে পারব, আমার দ্বারা কিছু হয়ত হ'তে পারে, তারা যেন এর চর্চা না ছাড়ে। যেন প্রাণপণে তারা মাতৃভাষাকে বড় করতে চেষ্টা করে, তা নইলে মানুষ বড় হবে না। ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় চিন্তা করা যায় না। ইংরেজীতে লিখতে পার, কিন্তু মাতৃভাষাকে বড় করে না তুললে চিন্তা চিরদিন ছোট হয়ে থাকবে।

আমি বক্তা নই, বলতে আমি পারি না—সে ভাষাও আমার নাই। যেটুকু মনে হ'ল জানালাম। আব কলেজ কর্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় যাঁরা বসে আছেন, আর আমার দাদা জলধরদা যদিও তিনি অতিথি, তথাপি বলি—এই বয়সে আমার জন্য এসে সমস্তক্ষণ বসে আছেন। আর যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব সাহিত্যিক এসেছেন, তাঁদের সকলকে সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সকলকে আমার স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা জানালাম। আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায়!

শরৎ-শর্বরী অনুষ্ঠানে

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ দিকে, কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কয়েক বৎসর তাঁদের স্টুডিওতে ৩১শে ভাদ্র সন্ধ্যায় শরৎ-জন্মোৎসব পালন করতেন। তাঁরা তাঁদের এই অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন—'শরৎ-শর্বরী'।

বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাঁদের এই অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রকেও নিয়ে যেতেন।

১৩৪১ সালে শরৎচন্দ্র তাঁর ৫৯তম জন্মদিনে শরৎ-শর্বরীতে গিয়ে অভিনন্দনের উত্তরে যা বলেছিলেন, তা এই—

বর্ষে বর্ষে ভাদ্রের শেষ দিনে—আমার জন্মদিনে—'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং'-এর কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন পাই তাঁদের সস্নেহ আহ্বানে। শুভকামী, শুভভাষী বন্ধুজন এসে সমাগত হন তাঁদের স্টুডিও হল-এ। আমাকে যে তাঁরা ভালবাসেন, এই কথাটি শুধু আমাকেই নয়, বেতার প্রতিষ্ঠানের সহযোগে ও সৌজন্যে দেশের সর্বত্র এ বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁরা আনন্দ লাভ করেন। আজকের দিনে অন্তরের কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁদের জানিয়েই আমার কর্তব্য সমাপন হয় না, অদৃশ্যে অলক্ষ্যে বসে যাঁরাই এ কথা আমার শুনছেন, আজ তাঁদের কাছেও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

কিন্তু এই সম্মাননা শুধু আমার ব্যক্তিত্বকে মাত্র অবলম্বন করে নেই। আমার মধ্যে যিনি বাণীর সাধক, এ সমাদর তাঁর এবং আরও অনেকের—আমার মতোই যাঁরা মানুষের সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও ব্যথা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপে-রসে সমুজ্জ্বল করে ভাষার মধ্যে দিয়ে তাঁদেব কাছেই প্রকাশিত করার সাধনা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আজকের এই বিশেষ উপলক্ষটিকে যদি আমার নিজের বলেই মনে না করি ত সহজেই বলা যায়, বেতার প্রতিষ্ঠানের এই আয়োজন দেশের সাহিত্য-সেবারই আয়োজন। তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

বৎসরকাল পূর্বে এই উপলক্ষে যেদিন এসেছিলাম, আজ সে দিনের কথা আমার মনে পড়ে। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে কত বিচিত্রভাবে একটা

বছর কেটে গেছে। সেদিন যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁদের চিনি নে, তবু জানি তাঁরা আমার আপন জন। তাঁদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ নেই, হয়ত মৃত্যু এসে তাঁদের অপসারিত করেছে; আবার হয়ত কত নূতন জন এসে তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন। এমনিই জগৎ। এমনি আমিও একদিন আসবো না, সেদিন একত্রিশে ভাদ্রের জন্মতিথি অনুষ্ঠান বন্ধ হবে। আবার নূতন কোন সাহিত্য-সেবকের জন্মদিন উৎসব আজকের শূন্য স্থান ভরিয়ে তুলবে। বেতার প্রতিষ্ঠান চিরজীবি হোক—নূতন আবির্ভাবের শুভ বার্তা যেন তাঁরা এমনি করেই সেদিনও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করেন।

আমার কণ্ঠস্বরে আমার কথা যাঁরা আজ শুনতে বসেছেন, তাঁদের দেখতে পাই নে বটে, কিন্তু মনে হয় যেন নেপথ্যের অন্তরাল থেকে তাঁদের নিঃশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাই। কেহ দূরে, কেহ কাছে—তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ-চিত্তের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ('বেতার-জগৎ'—২৯শে আশ্বিন, ১৩৪১)

৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে

১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর ৬২তম জন্মদিনে বেতার-প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে তাঁদের 'শরৎ-শর্বরী' অনুষ্ঠানে যেতে পারেন নি। পরদিন ১লা আশ্বিন তারিখে গিয়েছিলেন। সেদিন বেতার-প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শরৎ-শর্বরীর অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালে, অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

বেতার প্রতিষ্ঠানের স্নেহাস্পদ বন্ধুদের আমন্ত্রণে বৎসরে বৎসরে আমি এই প্রতিষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমার জন্মতিথি উপলক্ষে বন্ধুরা এই আয়োজন প্রতি বৎসর করে থাকেন। এবারেও তাই ৬২ বৎসর বয়সে পা দিয়ে, আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—যিনি আজ রোগশয্যায়—তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্বাদ, এটি আমার নয়, প্রতি

সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্বাদ আমি আজকের দিনে, তিনি শুনতে না পেলেও চেয়ে নিলাম।

এখানে যে সব বন্ধুরা এসে উপস্থিত হয়েছেন, শুধু সাহিত্যের জন্ত নয়, পরস্পরের অন্যান্ত আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাকে বাস্তবিক ভালবাসেন। আমি তাঁদের স্নেহ করি, তাঁরা আজ আমাকে আশীর্বাদ করবার জন্য সমবেত হয়েছেন।

আপনারা শুনলেন যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যদি আমি বাঙলা দেশকে কিছু দিতে পেরে থাকি, তার জন্ত এবং আমাকে ভালবাসার জন্ত আমার দীর্ঘজীবন তাঁরা কামনা করলেন। আজ ৬২ বৎসরের গোড়ায় ভাবি যে, এই দীর্ঘজীবন সত্যি মানুষের কাম্য কি না! যাঁরা আমার দীর্ঘজীবন আজ কামনা করেছেন, তার মধ্যে শুধু একটিমাত্র সাহিত্যিককে বলতে শুনেছি, তিনি হেমেন্দ্র রায়—তিনি আমার সাহিত্যক দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন, কেবল মাত্র আমার দীর্ঘজীবন তিনি কামনা করেন নি। এ জিনিসটা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। হাঁ, যদি সাহিত্যিকের মতো হয়ে এই বাঙলা দেশকে কিছু দিতে পারি, সে শক্তি ভগবান যদি রাখেন এবং তার সঙ্গে যদি দীর্ঘজীবন দেন আপত্তি নেই। কিন্তু সে যদি না থাকে, যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে সেই জীবন কারুরই কাম্য নয়—বিশেষ করে সাহিত্যিকের তো নয়ই।

আপনারা শুনেছিলেন যে, কিছু দিন পূর্বে আমি কঠিন রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সে অবস্থা এখন আমার নেই, তা হ'লেও স্বাস্থ্য একেবারে চিরদিনের মত ভেঙে গেল এবং আশা করতে পারি না যে, বৎসরে বৎসরে এই সব বেতার-প্রতিষ্ঠানের বন্ধুদের আমন্ত্রণে আসতে পারবো।

আমার নিজের সাহিত্য-সাধনার ব্যাপার নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকুই ইঙ্গিতে বলতে পারি যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছি। কোন দিনই মনে করি নি যে, আমি সাহিত্যিক হবো বা কোন বই আমার কোনদিন প্রকাশিত হবে। এমন কি, যা লিখেছি তাও সঙ্কোচে, দ্বিধায় পরের নামে। তার কোনও মূল্য আছে কি না ভাবতে পারি নি। তারপরে দীর্ঘকাল—বোধ হয় ১৫।১৬ বৎসর, সাহিত্য-চর্চার ধার দিয়েও যাই নি। ভুলেও মনে হ'ত না যে, আমি কোনদিন লিখি।

তারপরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে আবার এই জীবন, এইটিই হয়ত সত্যকার জীবন। অন্ততঃ ভগবান বোধ হয় এই জীবনটা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে আবার এরই মধ্যে এই একষট্টিটা বৎসর কাটাতে হ'ল।

সত্যি আমি আপনাদের মাঝখানে বেশী দিন থাকি বা না থাকি, আমার এ কথাটা হয়ত আপনাদের মাঝে মাঝে মনে পড়বে যে, তিনি বলে গেছেন যে, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে তাঁর এই সাহিত্য-সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে চলেছিল। এর মধ্যে যাঁরা আমার কথা শুনছেন, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ সাহিত্য-চর্চা করেন, অন্ততঃ সাহিত্যকে যদি তিনি অবলম্বন করেন, এই যদি তাঁর মনের বাসনা থাকে এবং সঙ্কল্পও যদি তাঁর স্থায়ী থাকে, তবে এই জিনিসটাকে তাঁকে নিশ্চয়ই প্রতিদিন মনে রাখতে হবে যে, এ হঠাৎ কিছু একটা গ'ড়ে ওঠবার জিনিস নয়।*

এই অনুষ্ঠানে আমাকে আহ্বান করে যাঁরা এনেছেন, তাঁদের প্রতি-বৎসর যেমন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, শ্রদ্ধা জানিয়েছি, এবারেও তাঁদের তেমনি ভালবাসা জানাই। যে-সব বন্ধু, আত্মীয় এই সভায় এসে আজ উপস্থিত হয়েছেন, প্রয়োজন না থাকলেও আর একবার করে আমার শ্রদ্ধা, আমার স্নেহ তাঁদের জানাই যে, এই থেকে কোনদিন তাঁরা আলাদা না হন, এই যে-জিনিসটা তাঁদের কাছ থেকে আমি পেলাম, এই যেন তাঁরা যতদিন বাঁচি দিয়ে যান। এমনি করে যেন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়ে আমাকে ধন্য করে যান।

যাঁরা শুনছেন আমার কথা, তাঁদের কাছেও আমার প্রার্থনা যে, হেমেন্দ্র রায় যে কথা বলেছেন, সেইটেই যেন সফল হয়—আমার সাহিত্যিক দীর্ঘজীবন যেন পাই। তা না হ'লে শুধু শুধু দীর্ঘজীবন যেন আমার বিড়ম্বনার মতন না এসে জোটে।

[* শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটির এই পর্যন্ত বেতার প্রতিষ্ঠানে রেকর্ড করা হয়েছিল।]

বেতার প্রতিষ্ঠানের 'শরৎ-শর্বরী'তে এই বক্তৃতা দিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই বেতারের তৎকালীন লাইসেন্স ইন্সপেক্টর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ শরৎচন্দ্রকে আদালতে অভিযুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন। সে এক মজার কাহিনী। সেই কাহিনী সম্বন্ধে তখনকার 'বেতার জগৎ' পত্রিকার অন্যতম কর্মী, শরৎচন্দ্রের স্নেহাস্পদ নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে যা লিখেছেন, এখানে তাই বলছি—

কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বাড়ীতেই তখন রেডিও লাইসেন্স ইন্সপেক্টরের অফিস ছিল। এঁদের মুখ্য কাজ ছিল, যাঁরা বিনা লাইসেন্সে বেতার গ্রাহক যন্ত্র ঘরে রাখেন, তাঁদের আদালতে অভিযুক্ত করা। এজন্য লাইসেন্সের একটি বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা স্মারক লিপি প্রেরণ করতেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে।

তখনকার দিনে লাইসেন্স ইন্সপেক্টর যিনি ছিলেন, তাঁর নাম পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। পূর্ণবাবু খাসা ভদ্রলোক, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। সাহিত্য, দর্শন, গান, বাজনা এসব কিছুরই ধার ধারতেন না। তিনি বুঝতেন তাঁর কাজ, কর্তব্য-কর্ম। স্পষ্ট কথা বলতেন, স্পষ্টভাবে চলতেন।

একদিন এই পূর্ণবাবু 'বেতার জগৎ'-এর অফিস কক্ষে এসে নলিনীবাবুকে বললেন—আপনাদের জন্যে মশায়, চাকরি তো থাকবেই না, মান-সম্ভ্রম বজায় রাখাও দায় হবে।

নলিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ'ল পূর্ণবাবু?

পূর্ণবাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন—আরে মশায়, একটা লোকের রেডিওর লাইসেন্স ফুরিয়েছে তিন মাস আগে। রিমাইণ্ডার দিলে উত্তর দেয় না। শেষ পর্যন্ত নিজে গেলাম সেখানে। সে কি এখানে? পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে। গিয়ে ধরলাম তাকে। সে আপনার নাম করলে, আর বললে—তাকে আমি চিঠি দিয়ে সব ঠিক করে নেব। আমার লাইসেন্সের জন্য আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আরও অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। শুনলাম, লোকটা খবরের কাগজে লেখে।

—কি নাম বলুন তো?

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ওকে আমি আদালতে ফাইন করাবোই মশায়।

নলিনীবাবু শুনে চমকে উঠলেন। বললেন—সে কি পূর্ণবাবু! এই সেদিন তাঁকে আমাদের স্টুডিওতে এনে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে মালা পরালাম, আর আপনি ফাইন করাবেন?

পূর্ণবাবু বললেন—এই দেখুন রিপোর্ট।

—ছিঁড়ে ফেলুন, ছিঁড়ে ফেলুন!

নলিনীবাবু তারপর পূর্ণবাবুকে বুঝিয়ে বললেন—শরৎচন্দ্র সুরসিক ব্যক্তি। আপনার ধাত বুঝতে পেরে আপনাকে নিয়ে একটু মজা করেছেন। আপনি ভাববেন না। কালই হয়ত খবর পাবেন, তিনি লাইসেন্স করেছেন।

পূর্ণবাবু মুখ ভার করে শেষে রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেললেন।

সংযোজন

আলাপ-আলোচনা

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সহিত আলোচনা

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে শরৎচন্দ্র খুব স্নেহ করতেন। ভূপেন বাবু তাঁর আরও কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধুকে নিয়ে 'বেণু' নামে একটা মাসিক পত্রিকা বার করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এঁদের এই বেণু কাগজে লিখতেন। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি তিনি এই বেণুতে ধারাবাহিকভাবে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। উপন্যাসখানির ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বেণুতে প্রকাশিত হ'লে পুলিশের আক্রমণে 'বেণু' বন্ধ হয়ে যায়। (পরে এই বিপ্রদাস আবার গোড়া থেকে 'বিচিত্রা'য় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।)

বেণুতে বিপ্রদাস বেরুতে থাকলে তখন বড় বড় মাসিক পত্রিকার মালিকরা শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন—বেণু আপনাকে লেখার প্রত্যেকটি 'ইন্‌স্টলমেণ্ট'এ কত করে দেয়? ওদের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—ওরা আমায় দেবে কোত্থেকে! আমারই বরং ওদের কিছু দেওয়া উচিত। ওরা যে আমার বড় আপন।

শরৎচন্দ্র ভূপেনবাবু ও তাঁর বন্ধুদের বলতেন—কাগজটা বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা কর। জেলে যাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু জেলকে ফাঁকি না দিতে পারলে কিছুই গড়তে পারবে না। গড়াটাই কঠিন। তোমরা একটা ভাল দেখে বাড়ী ভাড়া নাও। আমি সপ্তাহে ২।৩ দিন ওখানে গিয়ে উঠব। দেখো বাঙ্গলা দেশের সকল সাহিত্যিক তোমাদেরও বন্ধু হয়ে উঠবেন। এঁদের সহায়তায় কাগজ অতি সহজেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য সম্পাদক ভূপেনবাবুর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একবার তিন মাসের জেল হয়।

ঐ সময় ভূপেনবাবুর বন্ধুরা তাঁর 'চলার পথে' গল্পের বইটা ছেপে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে সেই বইএর একটা ভূমিকা লিখিয়ে নেন।

ভূপেনবাবু জেল থেকে বেরিয়ে একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বললেন—তোমার 'চলার পথে' বইখানার ভূমিকা আমি লিখে দিয়েছি। ও বইএর মারফতে তুমি বাঙ্গলার মেয়েদেরও বিপ্লববাদিনী

হবার জন্যে ডিরেক্ট 'অ্যাপিল' করেছ। কিন্তু তুমি সত্যি করে বলতো, তুমি কি বিশ্বাস কর যে ছেলেদের মত মেয়েরাও ওসব কাজ করতে পারে?

ভূপেনবাবু বললেন—বাঙ্গলার মেয়েদের আমার চেয়ে অনেক ভাল করেই আপনি চেনেন। আপনিই বলুন না?

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখ, এ দেশটাকে আমি ভাল করে দেখেছি। এর মানুষগুলো আমার পরিচিত। শুধু বাঙ্গলা নয়, এই ভারতবর্ষ কবে থেকে মরতে বসেছে জান? যেদিন থেকে এর পুরুষগুলো হয়েছে স্বার্থপর। এরা ষড়যন্ত্র করলো মেয়ে জাতটার বিরুদ্ধে। মেয়েদের ভক্তি করা শুরু করলে এরা কথায়, কিন্তু ঘৃণা করতে আরম্ভ করল কাজে। ফলে কল্পনার জগতে নারী পেল 'দেবী'র আসন, কর্ম জগতে স্থান হ'ল তার হেঁসেলে। ও দুটার কোনটাই নারীর অর্জিত বস্তু নয়, পুরুষের ইচ্ছানুরূপ পদবী লাভ। পুরুষ রচনা করল শাস্ত্র, পুরুষ বানাল বিধান। সেই শাস্ত্র ও বিধান অপৌরুষেয় আদেশ হয়ে বেঁধে ফেলল নারীকে ন্যুব্জ করে। পুরুষ রচিত পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে নারীও সেদিন গর্ববোধ করল তার দেবী-মাহাত্ম্যে। সেদিন থেকে নাভিশ্বাস উঠে গেছে জাতির।

এ প্রশ্নটাই একদিন উঠেছিল বাঙ্গলা দেশে। 'চরিত্রহীন' লিখে অপাংক্তেয় হয়েছিলাম সুধী সমাজে, এইটাই তোমরা জান। কিন্তু এ-তো তোমরা জান না, 'গৃহদাহ' রচয়িতার বিরুদ্ধেও ক্ষমাহীন অভিযোগ যে, তিনি নাকি ভক্তির পাত্র যে নারীজাতি, তার মর্যাদাহানি করেছেন।

এ অভিযোগে ক্ষোভ নেই আমার। সত্যি দেবী জ্ঞানে মেয়ে জাতকে ভক্তি আমি করিনে। আবার সামান্য অপরাধেই তাদের কাউকে ঘৃণাও করিনে। তা করিনে বলেই তো তাদের দেখতে চেয়েছি আমি মানুষী দরদ ও মানুষী সহানুভূতি নিয়ে। তাদের দুঃখে আমার মন কাঁদে, যেমন কাঁদে যে কোন নিপীড়িতের জন্য।

সেই আদিমকাল থেকে কী অত্যাচারই না তোমরা করে আসছ এই মেয়েদের ওপর। চরিত্রহীন পুরুষকে ভোট দিয়ে কাউন্সিল এসেম্বলিতে প্রতিনিধি করে পাঠাতে তোমাদের লজ্জা নেই, পূজোপার্বণে সে শ্রেণীর পুরুষদেরই সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ নেই, সমাজের বিধান দেবার অজুহাতে তাদেরই আহ্বান জানাতে কুণ্ঠা নেই, এমন কি অমন পাত্রের হাতেই সজ্ঞানে

মেয়ে তুলে দিতেও শঙ্কা নেই। অথচ 'অভয়া'র জন্য আমার সহানুভূতি নাকি সমাজদ্রোহিতা, 'সাবিত্রী'র রূপ-রচনায় সতীসাধ্বীদের নাকি অপমান ঘটেছে, 'রাজলক্ষ্মী'কে পরিত্যাগ না ক'রে ভারতীয় নারী আদর্শের শুভ্রতায় শ্রীকান্ত নাকি কলঙ্ক লেপে দিয়েছে।

তোমার সমাজ-ধ্বজীরা মেয়েদের ভক্তি করেন, দেবীর মর্যাদায় তাদের চিনেছেন—কাজেই শিশু বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনে তাঁরা শতমুখ, কুষ্ঠী-স্বামীকে নিজের কাঁধে বহন করে পতিতালয়ে দিয়ে এল যে নারী তার সতীত্ব মাহাত্ম্যে বিগলিত চিত্ত। ফলে, আত্মমর্যাদাহীন এই নারীদের সন্ততি যে ভারতীয়ের দল—তারাও হারাল আত্মসম্মান জ্ঞান। এবং অধিকার সমর্থ যে ইংরেজ প্রভু, তার পাদুকা মাথায় বহন করে, তারাও পেল আজ রাজভক্তের শ্রেষ্ঠ তিলক।

অনেক পণ্ডিত বলেন, মেয়েরা কঠিন কাজে পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। 'কনষ্টিটিউশনালি' তারা নাকি 'আনফিট'। আচ্ছা, এত বড় একটা বানানো কথা সত্য বলে তোমরা মানতে চাও? ইংরেজ তোমাদের কিছু না দেবার জন্য ঐ একই কথা বলে তো? দু শ বছর তোমায় নিরস্ত্র করে রেখে, আজ সে বলছে—তোমাদের হাতের নিশানা হয় না। তোমরা অসামরিক জাতি। ঠিক তেমনি—মেয়েদের ঘোমটা পরিয়ে, হেঁসেলে ঢুকিয়ে রেখে মূর্খ নারীকে হঠাৎ একদিন বার করলে পথে চলতে। বন্ধুর পথে পারলো না সে তোমার সঙ্গে একই তালে পা ফেলতে, তখন তুমি ফতোয়া দিয়ে বললে—মেয়েরা কঠিন কাজ পারবে না, তারা 'কনষ্টিটিউশনালি আনফিট'। ইংরেজ নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে মিথ্যে কলঙ্ক দেয় ভারতবাসীকে। ঐ একই মনোবৃত্তি থেকে পুরুষও মিথ্যে কলঙ্কে হেয় করে আসছে নারীকে যুগ যুগ ধরে।

[ভূপেনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলি ভূপেনবাবুর মুখে শুনেছি। তাছাড়া 'বাটানগর রিক্রিয়েশান ক্লাব ম্যাগাজিনে' ভূপেনবাবুর একটি লেখাতেও পড়েছি।]

নলিনীকান্ত সরকারের সহিত আলোচনা

শরৎচন্দ্রের তখন কয়েকটা বই বেরিয়েছে, এবং তাঁর লেখা নিয়ে সারা বাঙলা দেশে একটা সাড়া জেগেছে।

সেই সময় একবার নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারকে বলেন—শরৎচন্দ্রের একটা বই এনে আমাকে দিও তো, পড়ে দেখব।

ক্ষীরোদবাবুর কথায় নলিনীবাবু শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' বইটি নিয়ে ক্ষীরোদবাবুকে পড়তে দেন।

বই হাতে নিয়ে ক্ষীরোদবাবু প্রথম গল্পের প্রথম পাতাটি মাত্র পড়েই নলিনীবাবুকে বই ফেরৎ দিলেন। এতে নলিনীবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বই ফেরৎ দিলেন যে ?

উত্তরে ক্ষীরোদবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন—এই বুড়ো বয়সে আর ওসব নোংরামি ঘাঁটিয়ো না ভাই !

—কী বলছেন আপনি ! এ খাসা বই ! একটি বার পড়ে দেখুন !

—যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' প্রবন্ধে শরৎবাবুর গল্প আর উপন্যাসের চরিত্রগুলির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতেই বুঝে নিয়েছি, তাঁর লেখা কি রকম !

—এটা কিন্তু অত্যন্ত ভাল বই।

—তা হোক্, পড়ব না। তুমি নিয়ে যাও।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে নলিনীবাবু একদিন ক্ষীরোদবাবুর কলকাতার বাড়ীতে গেলে, ক্ষীরোদবাবু তাঁর বালিশের নীচে থেকে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসখানি বার করে নলিনীবাবুকে বললেন—এ বই পড়েছ ?

নলিনীবাবু বললেন—দু'বার পড়েছি।

—তবে আর একটিবার আর একটু কষ্ট কর। আমি পড়ি তুমি শোনো। শুনে দুপুরে এখানে খেয়ে বাড়ী যাবে।

এই কথায় নলিনীবাবু তো অবাক! তিনি ভাবলেন, যিনি 'বিন্দুর ছেলে' নোংরা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কিনা 'দত্তা' পড়ে শোনাবেন! ক্ষীরোদবাবুর হ'ল কী!

ক্ষীরোদবাবু বললেন—কি বই-ই লিখেছে হে! চরিত্রগুলো একেবারে জীবন্ত। আর তেমনি ডায়ালগ।

এই ব'লে ক্ষীরোদবাবু সেদিন নলিনীবাবুকে দত্তা পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এরও কিছুকাল পরের ঘটনা। ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আর একদিন নলিনীবাবুর দেখা। ক্ষীরোদবাবু সেদিন নলিনীবাবুকে বললেন—ওহে, তোমার সঙ্গে শরৎ চাটুজ্যে মশায়ের দেখা হয়?

—হয়। কেন বলুন তো?

—দেখা হ'লে বোলো, ক্ষীরোদবাবু আপনাকে নারায়ণ-জ্ঞানে প্রণাম জানিয়েছেন। সম্প্রতি শরৎবাবুর 'দেনা-পাওনা' পড়লাম। পড়েই মনে হ'ল, দেখা হ'লে শরৎবাবুকে প্রণাম করে অভিনন্দিত করতাম।

এরপর একদিন নলিনীবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে, ক্ষীরোদবাবুর 'বিন্দুর ছেলে' ফেরৎ দেওয়া থেকে 'দেনা-পাওনা' পড়া পর্যন্ত সমস্ত কথাই শরৎচন্দ্রকে বললেন।

শুনে শরৎচন্দ্র চম্‌কে উঠলেন। 'বিন্দুর ছেলে' সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবুর মন্তব্য সম্পর্কে শুধু বললেন—দেখ ভায়া, মানুষে মানুষের কত বড় অনিষ্ট করতে পারে। যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁর 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা'য় আমার বই-এর সমালোচনা করে আমার কী ক্ষতিই না করেছে! ক্ষীরোদবাবুদের মত ভাল লোকদেরও বিগড়ে দিয়েছে।

এর কিছুদিন পরে নলিনীবাবু একদিন ক্ষীরোদবাবুকে বললেন—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন? তাহলে বলুন ব্যবস্থা করি।

—কোথায়?

—আমাদের 'বিজলী' পত্রিকা অফিসে।

—হ্যাঁ, তুমি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করে দিনক্ষণ স্থির করে এস।

নলিনীবাবু গেলে শরৎচন্দ্র বললেন—না ভাই, আমি যাব না। ও-সব নারায়ণ-জ্ঞানে পেন্নাম-টেন্নাম আমার ভাল লাগে না। ক্ষীরোদবাবু আমার

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, শেষ পর্যন্ত একটা নাটকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। না ভাই, ওটা থাক।

নলিনীবাবু কিন্তু ছাড়লেন না। তিনি দিনক্ষণ স্থির করে একদিন বিকালে তাঁদের বিজলী পত্রিকার অফিসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ক্ষীরোদবাবুর সাক্ষাৎ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

ঐ সাক্ষাৎ-পরিচয়টির সম্বন্ধে নলিনীবাবু লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র এলে ক্ষীরোদবাবু একেবারে জড়িয়ে ধরলেন শরৎচন্দ্রকে। ধরে রইলেন তো ধরেই রইলেন—ছাড়বার নামটি নেই।

কিছুক্ষণ পরে আলিঙ্গন-পাশ মুক্ত হয়ে শরৎচন্দ্র এসে বসলেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। ক্ষীরোদপ্রসাদও আসন গ্রহণ করলেন। তারপর আরম্ভ হ'ল পরস্পরের প্রতিভার প্রতি পরস্পরের সমাদর জ্ঞাপন।

তারপরেই 'নারায়ণ'-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ লিখতে সুরু করলেন 'পতিতার সিদ্ধি' উপন্যাস।"

নলিনীবাবু তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—

"একবার আমাকে তিনি একটি অযাচিত উপদেশ দিয়েছিলেন, যেটি আমার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে পরম সহায়ক হয়েছিল।"

নলিনীবাবুকে শরৎচন্দ্রের উপদেশ দেওয়ার কারণটা ঘটে ছিল এই—

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে নলিনীবাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। নলিনীবাবু শিশিরবাবুর 'নাট্য মন্দিরে' প্রায়ই যেতেন। ঐ সময় শিশিরবাবু একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' নাটকে চিরঞ্জীবের ভূমিকায় নলিনীবাবুকে দিয়ে স্থায়ীভাবে অভিনয় করাবেন বলে মনস্থ করেন।

কলকাতারই অন্য একটি রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ এই খবর পেয়ে তাঁরা নলিনীবাবুর এক বন্ধুর মারফৎ তাঁদের রঙ্গালয়ে যোগ দেবার জন্য নলিনীবাবুকে অনুরোধ জানান। তাঁরা একথাও বলেন যে, তাহলে তাঁরা নলিনীবাবুকে মাহিনা ছাড়া, এককালীন একটা মোটা রকমের টাকা দিতেও প্রস্তুত আছেন। এগ্রিমেণ্ট মাত্র ১ বছরের।

নলিনীবাবু এই কথা শিশিরবাবুকে শোনালে, শিশিরবাবু শুনে বললেন—

এ প্রস্তাব ছাড়বেন না। আপনি এখনি চলে যান ঐ থিয়েটারে। ১ বছর পরে এগ্রিমেন্ট শেষে তখন না হয় আমার এখানে চলে আসবেন।

শিশিরবাবুর উপদেশ মত নলিনীবাবু সেই থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে তাঁর সম্মতির কথা জানালে, তাঁরা শর্তানুযায়ী নলিনীবাবুর এককালীন চার শ টাকার মধ্যে দু শ সত্তর টাকার একটা চেক দিয়ে তাঁকে অভিনেতা হিসাবে নিযুক্ত করলেন।

নলিনীবাবু নিয়মিত থিয়েটারে যান। কিন্তু তিনি যে কোন্ নাটকে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবেন, সে সম্বন্ধে কেউই কোনদিনই উচ্চবাচ্য করেন না। মাসের শেষে মাইনে চাইলেন, মাইনেও পেলেন না। এই ভাবে তিন মাস কেটে গেল।

ঐ সময় নলিনীবাবু একদিন তাঁর এক বন্ধুর মুখে শুনলেন—থিয়েটার-ওয়ালারা বলেছে, ওকে আমরা বহাল করিনি, মাইনে আবার কিসের? বরং ওকে আমরা দু শ সত্তর টাকা ধার দিয়েছি।

নলিনীবাবুর আর এক বন্ধু তাঁকে বললেন—আমি জানি, শিশিরবাবুর থিয়েটারের লোক ভাঙ্গিয়ে নেবার জন্য ওরা এইরূপ কিছু টাকা খরচ করে।

নলিনীবাবুর নিযুক্তি-পত্র ছিল না। তাই টাকা ধার দিয়েছে শুনে তিনি একটু চিন্তায় পড়লেন। শেষে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য তাঁর এক উকিল বন্ধুর কাছে গেলেন। উকিল বন্ধু সব শুনে, থিয়েটারওয়ালাদের বিরুদ্ধে মামলা করবার জন্য নলিনীবাবুকে উপদেশ দিলেন। এবং এও আশ্বাস দিলের যে, নিযুক্তি-পত্র না থাকলেও নলিনীবাবুকে মামলায় জিতিয়ে দেবেন, আর এক বছরের মাইনেও আদায় করে দেবেন।

এই সময়েই নলিনীবাবু একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। সেদিন এই মামলার প্রসঙ্গ নিয়েই শরৎচন্দ্র নলিনীবাবুকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সেই উপদেশ দেওয়া সম্বন্ধে নলিনীবাবু লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্র আমাকে দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন—হাঁ হে, তুমি নাকি থিয়েটারে ঢুকেছ?

আমি বললাম—ঢুকেছিলাম। এখন মামলা করতে হচ্ছে।

—সে কি? কী হলো আবার?

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করলাম শরৎচন্দ্রের কাছে।

সব শুনে তিনি বললেন—দু শ সত্তর টাকা তারা দিয়েছে তো? মনে করে নাও—প্রতি মাসে নব্বুই টাকা হিসাবে তিন মাসের মাইনে পেয়েছ।

আমি শরৎচন্দ্রকে বললাম—না দাদা, নব্বুই টাকা মাইনেও নয়, আর ও টাকার সঙ্গে মাইনের কোন সম্বন্ধ নেই। ওটা শর্তানুযায়ী এককালীন পাওনার টাকা।

শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন—তা হোক্, মোদ্দা কথা মামলা করতে যেও না তুমি।

আমি বললাম—না শরৎদা, উকিল বলেছে যে, মামলায় আমি জিতবই। আমার কেবল একটু ত্রুটি আছে—আমি নিযুক্তি-পত্র নিই নি। তা সত্ত্বেও উকিল ভরসা দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—উকিলের কথা শুনে মামলা করতে যেয়ো না নলিনী। তাদেরও উকিল আছে, এটা মনে রেখো। আর সে উকিলও তাদের মামলা জিতিয়ে দেবার ভরসা দেবে নিশ্চয়ই।

তাই তো, শরৎচন্দ্র একটু ভাবিয়ে দিলেন বই কি!

শরৎচন্দ্র আবার উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন—আদালত কি বস্তু তুমি জানো না। ধরো আদালতে গিয়ে থিয়েটারওয়ালারা যদি বলে—লোকটা ভাল বলে আমরা তাকে আমাদের থিয়েটারে মোটা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু লোকটা বদ্‌মায়েশ, দুশ্চরিত্র বলে আমরা তাকে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

আমি বললাম—বললেই হলো!

শরৎদা হেসে বললেন—শুধু বললেই হবে কেন? সাক্ষী আনবে তারা। থিয়েটারের দু-চারটে অভিনেত্রীকে এনে সাক্ষ্য দেওয়াবে। আর তারা আদালতে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বলবে যে, তুমি তাদের সম্ভ্রম হানি করেছ।

—বলেন কি? এতটা করবে তারা?

শরৎচন্দ্র বললেন—তাদের উকিল তাদের একথা বলতে শিখিয়ে দেবে যে। মামলায় জিততে তো হবে তাদের। তাই বলছি, মামলা করতে যেও না। আদালতের কেলেঙ্কারি খবরের কাগজে বেরোবে, তখন তুমি ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না।

শরৎচন্দ্রের উপদেশ শিরোধার্য করে বাড়ী ফিরলাম।"

অনাথগোপাল সেনের সহিত আলোচনা

যশোহর জেলার কালিয়ার বিনয়কুমার দাশগুপ্ত বলেন—

"আমি যখন কংগ্রেসের কাজ করতাম, তখন ঐ সূত্রেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল।

আমি একদিন শরৎচন্দ্রের কলকাতায় বাড়ীতে গেছি। তিনি বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

এমন সময় 'টাকার কথা' বই-এর লেখক অনাথগোপাল সেন এসে শরৎচন্দ্রকে বললেন—কই আমার বইটা সম্বন্ধে আপনার অভিমত তো লিখে জানালেন না!

শরৎচন্দ্র বললেন—না জানানো হয়নি। তা তুমি নিজেই যখন এসেছ, তোমার বই সম্বন্ধে আমার অভিমতটা তোমার নিজের কানেই শুনে যাও। তোমার বইএ তুমি অনেক কথাই আলোচনা করেছ সত্য, কিন্তু ইংরাজদের লুঠের টাকার কথাটা আলোচনা করনি। ইংরাজরা এদেশ থেকে চাকরি, পেন্‌সন ইত্যাদি বাবদে যে কোটি কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে, তার আলোচনা তুমি করনি। তাই তোমার বই আমার তত ভাল লাগে নি।

দেখ, আমি যখন হওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকতাম, তখন সেখানে অক্ষয় কুমার সরকার নামে আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি ইকনমিক্‌স ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে, অর্থনীতি সম্বন্ধে অনেক বই তখন কিনে পড়েছিলাম। অতএব অর্থনীতি আমি যে একেবারে জানি না, তা নয়।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত ফাইনান্স সেক্রেটারী বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত (ইনিও কালিয়ার লোক) একদিন আমার কাছে বলেছিলেন—"১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি এবং হিন্দু হোস্টেলে থাকি। আমাদের হিন্দু হোস্টেলে তখন প্রতি বৎসর ছাত্রদের একটা করে বার্ষিক সম্মেলন হ'ত। সেবার বার্ষিক সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি করব মনস্থ করে আমরা

কয়েকজন মিলে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে তাঁকে অনুরোধ করতে যাই। গিয়ে দেখি, শরৎচন্দ্র এক সাহেবের লেখা 'এ ট্র্যাক্ট অন মণিটারী রিফর্ম' নামে একটা অর্থনীতির বই পড়ছেন।

বইটা সেই মাত্র কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। আমি ইকনমিক্সের ছাত্র ছিলাম। তাই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে সদ্য প্রকাশিত ইকনমিক্সের ঐরূপ একটা জটিল বই পড়তে দেখে আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম।"

অনাথবাবু তাঁর 'টাকার কথা' বইএর ভূমিকা লিখিয়েছিলেন, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)কে দিয়ে। এই বই বেরুলে অনাথবাবু একখানা বই পড়বার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দেন এবং বই সম্বন্ধে তাঁর একটা অভিমত চান। রবীন্দ্রনাথ বই পড়ে বইএর প্রশংসা করে লিখেছিলেন—'টাকার কথা' বইখানি বিশেষ সমাদরের যোগ্য। ইত্যাদি।

অনাথবাবু তাঁর এই বই শরৎচন্দ্রকেও একখানা দিয়েছিলেন এবং একটা লিখিত অভিমত চেয়েছিলেন। অনাথবাবু ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের অভিমত দুটি, তিনি তাঁর বইএর প্রথমে জুড়ে দেবেন। (অনাথবাবুর বইএর প্রথমেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই ব্লক করে ছাপা আছে।)

অনাথবাবু তাঁর বইএ 'ভারতে মুদ্রানীতি' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে একস্থানে লিখেছেন—"ইংরাজ আমলাতন্ত্রের ও গোরা সৈন্যবাহিনীর মাহিনা, ভাতা, পেন্সন, ভারতীয় রেল ও পূর্ত বিভাগের জন্য ধার করা টাকার সুদ, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস ও হাই কমিশনার অফিসের খরচাদি বাবদ এই টাকা আমাদিগকে দিতে হয়। ইহা ভারতের পক্ষে নিছক ক্ষতি কিংবা ইহার বিনিময়ে আমরা যাহা পাই, তদ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ হয়, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। যাঁহারা টাকা দেন, তাঁহাদের একমত এবং যাঁহারা টাকা পান, তাঁহাদের অবশ্য অন্য মত। যাহা হউক, বর্তমান প্রবন্ধে এই বিরাট ও বিরোধী বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রয়োজন নাই।"

ইংরাজ আমলাতন্ত্র ইত্যাদি বাবদ ভারতের দেওয়া টাকাটা, শরৎচন্দ্রের মতে ছিল 'ভারতের পক্ষে নিছক ক্ষতি।' তাই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই শরৎচন্দ্র অনাথবাবুকে ঐ কথা বলেছিলেন।

হাস্য-পরিহাস

পিলে

শরৎচন্দ্র ১৩৪১ সালে কৃষ্ণনগরে এক সভায় সভাপতিত্ব করতে যাওয়ার সময় দিলীপকুমার রায়কেও সঙ্গে নিয়ে যান।

দিলীপবাবু সেদিন সভায় 'শরৎ-সাহিত্যে আদর্শবাদ' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। এছাড়া তিনি ঐ সভায় শরৎচন্দ্রের উপর নিরুপমা দেবীর লেখা—'বাহিরের নও তুমি আমাদেরি, আমাদেরি একজন'—এই গানটিও গেয়েছিলেন।

সভার শেষে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট উকিল ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। শরৎচন্দ্রকে বসানো হয়েছিল মাঝখানে, মখমলের উপরে। তাঁর পাশেই বসেছিলেন দিলীপবাবু।

খাওয়া হচ্ছে, নানা রকমের কথাও হচ্ছে।

এমন সময় ললিতবাবু বললেন—দিলীপ, তোমার গান বড় চমৎকার!

আর একজন বললেন—দিলীপবাবু আপনার প্রবন্ধটিও সুন্দর হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন বললেন—দিলীপবাবুর আবৃত্তিও খুব ভাল।

এই সব শুনে শরৎচন্দ্র হঠাৎ বলে উঠলেন—থামো! মণ্টুর (দিলীপবাবুর ডাক নাম) গান চমৎকার, আবৃত্তি চমৎকার, উচ্ছ্বাস চমৎকার—সবই চমৎকার হতে পারে, কিন্তু ওর যেটি সব চেয়ে চমৎকার, সেটি তোমরা কেউ জানোনা। আমি একাই জানি।

শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

শরৎচন্দ্র বলতে আরম্ভ করলেন—ওর সব চেয়ে চমৎকার হ'ল ওর পিলে—সাধু ভাষায় যাকে বলে লিভার! বৃন্দাবনে, দিল্লীতে, আগ্রাতে ওর সঙ্গে আমি একত্রে ছিলাম। আমি যা-ই খাই হয় অম্বল; ও যা-ই খায় হয় সম্বল। ইয়া ইয়া বেলুনের মত পরোটা, ইটের মত মালাই, পাহাড় প্রমাণ পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, সিক্‌কাবাব—কিছু কি ও ফেল্‌ল কোথাও! আর কিছুতেই কি ওর বদহজম হ'ল! তাই বলছি—ওর সব চেয়ে বড় সম্পদ ওর গান নয়, লেখা নয়, আবৃত্তি নয়—ওর পিলে।

হরিণবাড়ী

দিলীপকুমার রায় সেবার ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী কংগ্রেসে যোগ দিতে বন্ধু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দিল্লী গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র আগেই দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের আসার সময় জেনে নিয়ে শরৎচন্দ্র স্টেশনে তাঁকে আনতে গেলেন।

শরৎচন্দ্র স্টেশনে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দিলীপবাবুকেও দেখে বলে উঠলেন—এ কী! মণ্টুলাল তুমি!

দিলীপবাবু ম্লান হেসে বললেন—সুভাষ ছাড়ল না, কি করি বলুন!

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ওর পাল্লায় পড়লে তুমিও শেষে! কথা শোন বাপু, ফিরতি ট্রেণে আজই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তোমাকে বলছি, মণ্টু, মামার বাড়ী(১), হরিণবাড়ীর(২) চেয়ে ঢের ভালো!(৩)

[(১) দিলীপবাবু এই সময় কলকাতায় তাঁর মামার বাড়ীতে থাকতেন।

(২) হরিণবাড়ী হ'ল জেলখানা। এটা ছিল প্রাচীন কলকাতার প্রসিদ্ধ জেলখানা। কলকাতায় কলুটোলার কাছে হরিণবাড়ী লেন নামে একটা সরু রাস্তা আছে বটে, কিন্তু চার্লস মুর-এর লেখা 'শেরিফস্ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম ফ্রম্ ১৭৭৫ টু ১৯২৬' গ্রন্থে দেখছি, গড়ের মাঠে রেস কোর্সের পূর্বদিকে একটা জায়গায় এই জেলখানাটি ছিল। মনে হয়, হরিণবাড়ী জেল তখন খুব নামকরা জেল ছিল বলে, তারই নামানুসারে একটা গলিরও এই নাম হয়েছিল।

(৩) সুভাষচন্দ্রের দলে মিশলে কারাবরণ করা স্বাভাবিক, তাই শরৎচন্দ্র এই পরিহাসটি করেছিলেন।]

পাণ্ডা

বাঙলা দেশের অনেক কংগ্রেস নেতা ও ডেলিগেটের ন্যায় সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার রায় এঁরাও সেবার দিল্লী কংগ্রেসে গিয়েছিলেন।

দিল্লীতে গিয়ে এঁরা একদিন বিকালে ঐখানকার একটা মজার কুয়ো দেখতে গিয়েছিলেন। কুয়োটা ছিল ৮০ ফিট গভীর।

সেখানে একজন পাণ্ডা দর্শকদের কাছ থেকে একটা করে টাকা নিয়ে এক টাকার বদলে একবার করে সেই গভীর কুয়োয় ঝাঁপ দিত। সেই ঝাঁপ দেওয়াটা ছিল একটা লোমহর্ষক ব্যাপার। দেখলে আতঙ্কে দর্শকের গা শির শির করে উঠত।

এঁরা গেলে পাণ্ডা এঁদের কাছ থেকে একটা টাকা চাইল। সুভাষচন্দ্র একটা টাকা দিলে, পাণ্ডা ঝাঁপ খেল।

ঝাঁপ খেয়েই লোকটি একটা দড়ি ধরে আবার উপরে উঠে এল। উঠে এসে সে দিলীপবাবুকে বললে—একটা টাকা দিলে আবার ঝাঁপ খাব।

দিলীপবাবু বললেন—না। ঝাঁপ দেওয়া দেখেছি, দেখলে ভয় করে।

পাণ্ডা তখন কিরণবাবুকে গিয়ে ধরল। তিনিও না করে দিয়ে বললেন—দেখেছি তো একবার।

এই সময় শরৎচন্দ্র এগিয়ে এসে তার হাতে একটা টাকা দিলেন। এবং বললেন—আমি ফের দেখব, ঝাঁপ দাও।

সে ঝাঁপ দিল।

এই সময় সুভাষচন্দ্র সবিস্ময়ে শরৎচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ফের টাকা দিলেন কেন? ও ঝাঁপ দিল, এই তো খানিক আগে দেখলেন!

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন—কে জানে, ঝাঁপ দিতে গিয়ে চোট লেগে যদি ডুবেটুবে যায়, তা হ'লে একটা পাণ্ডা তো কমবে! সে-লাভের কাছে একটা টাকা এমন কি আর লোকসান!

সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে হেসে উঠলেন।

চাঁটি

দিলীপকুমার রায়ের এক মামা খগেন্দ্রনাথ মজুমদার দিলীপবাবুর গানের নানা তালফের এত ভালবাসতেন যে, তিনি দিলীপবাবুর সঙ্গতকার বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তবলার তালিম নেওয়া সুরু করেছিলেন।

বিশ্বনাথবাবুর ডাকনাম ছিল পটলবাবু। শরৎচন্দ্র একাধিকবার দিলীপ বাবুর গান শুনবার সময় এই পটলবাবুর তবলা বাজানো দেখেছেন। তিনি পটলবাবুকে বলতেন—পটলবাবু বোল তুলছেন চমৎকার, কেবল দেখবেন ভুলেও নিজের নামটি যেন আঙুলে তুলবেন না, খুব সাবধান।

একবার দিলীপবাবুর এক বন্ধুর বাড়ীতে দিলীপবাবুর গানের আসর। সেই আসরে শরৎচন্দ্র এবং দিলীপবাবুর মামা খগেনবাবুও উপস্থিত।

দিলীপবাবু গান ধরেছেন। পটলবাবু সেদিন খগেনবাবুর নতুন কেনা দামী বাঁয়াতবলা নিয়েই দিলীপবাবুর গানের সঙ্গে সঙ্গত করছেন। পটলবাবুর হাতে যেন বোলের ফুলঝুরি ফুটছে, আর বাঁয়ার উপর সে কী প্রচণ্ড চাঁটি! দেখতে দেখতে ঘর সরগরম হয়ে উঠল।

দিলীপবাবুর গান থামলে শরৎচন্দ্র বললেন—মণ্টু! কী নিষ্ঠুর তুমি! তোমার এমন সদাশিব মামার এ-হাল করতে হয়?

শরৎচন্দ্রের এই কথায় সকলেই শরৎচন্দ্রের দুষ্টুমিভরা চোখের দিকে তাকালেন।

দিলীপবাবুর মামা বললেন—সদাশিব মামাটি কি রুদ্রমূর্তি ধরেছিল?

শরৎচন্দ্র বললেন—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না ভায়া। তোমার সবে কেনা বাঁয়া-তবলা। পটলবাবু প্রাণের মায়া ছেড়ে বাঁয়ার উপর দুর্দান্ত চাঁটি দিচ্ছিলেন ব'লে সবাই তাঁকেই দেখল, কেবল একা আমি দেখলাম তোমার ফ্যাকাশে মুখ—এই বুঝি নতুন বাঁয়ার বাঁয়া-লীলা সাঙ্গ হ'ল।

এরপর শরৎচন্দ্র দিলীপবাবুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন—তুমি তো চেয়ে দেখ নি মণ্টু, কিন্তু আমি দেখেছিলাম, পটলবাবুর প্রতিটি প্রচণ্ড চাঁটি পড়ছিল, বাঁয়া-তবলার উপর তো নয়, তোমার মামার পাঁজরার উপর।

মচ্ছরচ্চন্দ্র

কবি কালিদাস রায় একদিন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে একটা লেখা দিতে গেছেন। গিয়ে দেখেন, সেখানে শরৎচন্দ্র এসেছেন।

শরৎচন্দ্র কালিদাসবাবুকে দেখেই বলে উঠলেন—আচ্ছা, কালিদাস তুমি কবে সাবালক হবে বল তো?

কালিদাসবাবু বললেন—কেন দাদা? কি আবার করলাম?

শরৎচন্দ্র বললেন—আরে সেদিন তোমাদেরই একজন কবি—তাঁর লেখা একটা কবিতার বই নিয়ে আমার সেই সামতাবেড়ের বাড়ী পর্যন্ত গেছে। গিয়ে আমার হাতে বইটা দিয়ে বললে—একটু অভিমত লিখে দিতে হবে। বইটা নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলেই দেখি, লেখা আছে—শ্রীমচ্ছরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে। বললাম—এ কার নাম হে? আমি চট্টোপাধ্যায় বটে, কিন্তু মচ্ছরচ্চন্দ্র তো নয়।

সে তখন হাত জোড় করে বললে—আজ্ঞে শ্রীমৎ শরৎচন্দ্র এই কথাটাকে সন্ধি করে লিখেছি।

বললাম—ও! তাই বল! তা যাই হোক্, আমি তো বাপু কবিতা-টবিতা ভাল বুঝি না। তুমি কেন কালিদাস রায়ের কাছে গেলে না। সে পড়ে একটা অভিমত লিখে দিত।

লোকটি বললে—আজ্ঞে তাঁর কাছে গেস্‌লাম, তিনি একটা অভিমত লিখে দিয়েছেন। এই যে আমার কাছেই আছে—বলে তোমার লেখাটা দেখালে। তারপর সে বললে—কালিদাসবাবুই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাই বলছিলাম, তোমার কবে জ্ঞানগম্য হবে।

সব শুনে কালিদাসবাবু বললেন—দাদা, আমি কারও কারও বইয়ের সম্বন্ধে অভিমত লিখে দিই বটে, কিন্তু কাকেও তো আপনার কাছে পাঠাই নি।

—তবে যে বললে, তুমি পাঠিয়েছ।

—কি জানি দাদা, সে কেন বল্‌ল বুঝতে পারছি না।

সত্যই কেউ তাঁর বইএ এই 'মচ্ছরচন্দ্র' লিখে শরৎচন্দ্রকে উপহার দিয়েছিলেন কিনা, ঠিক বলা যায় না।

এমনও হতে পারে—কালিদাসবাবু যে অনেকেরই বই সম্বন্ধে অভিমত লিখে দেন, এ কথা শরৎচন্দ্র জানতেন। আর কালিদাসবাবু স্কুলে বাঙলার শিক্ষক এবং বাঙলা ব্যাকরণও লিখেছিলেন বলে, তাঁর সঙ্গে এইভাবে 'শ্রীমৎ শরৎচন্দ্রকে' সন্ধি করে ও অভিমত লেখার প্রসঙ্গ এনে পরিহাস করছিলেন।

'মচ্ছরচন্দ্র' কথাটা শরৎচন্দ্র অনেক আগে থেকেই জানতেন।

শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এবং তাঁর আর এক মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আমি শুনেছিলাম—

শরৎচন্দ্রের আপন ছোট মামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় যখন পাটনায় সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন, সেই সময় তিনি পাটনা থেকে ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রকে যে চিঠি লিখতেন, তাতে তিনি লিখতেন—শ্রীমচ্ছরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র ঐ সময় ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়ীতে থাকতেন। বিপ্রদাসবাবু সংস্কৃত জানা ও খুব প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন, তাই তিনি শরৎচন্দ্রের নামটা ঐরূপ লিখতেন।

হিন্দীতে 'মচ্ছর' মানে মশা। ভাগলপুর পোষ্ট অফিসের পিওন প্রথম এইরূপ মচ্ছরচন্দ্রের নামে চিঠি পেয়ে, তাকে অনেক ভাবতে হয়েছিল, মশা কার নাম হতে পারে। শেষে সে অনেককে জিজ্ঞাসা করে, চিঠির আসল মালিককে আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

ছড়া কেটে পরিহাস

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কথায় কথায় শরৎচন্দ্রের পরিহাস ও রসিকতার কথা উঠলে রবীনবাবু বললেন—"শরৎদা অনেক সময় ছড়া কেটেও মজা করতেন। তাঁর ঐ ধরণের দুটো ছড়ার কথা আজও আমার মনে আছে। সে দুটো হচ্ছে এই—

(১) আমার বাবা ভাগলপুরে দুর্গাচরণ বয়েজ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। আমরা দেখেছি, ঐ স্কুলের কোন ছাত্র বাড়ীতে দুষ্টুমি করলে বা ভাল পড়াশুনা না করলে, সেই ছাত্রের অভিভাবক তাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার কাছে এসে হাজির হতেন। এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাকে শাস্তি দেবার জন্য বাবাকে অনুরোধ করে যেতেন।

একবার এইরূপ এক ছাত্রের বাবা ছেলেকে সঙ্গে করে এনে বাবাকে বললেন—মাষ্টার মশায়, আমার এই ছেলেটি আজকাল পড়াশুনা আদৌ করছে না। দিন দিন এর দুষ্টুমিও বেড়ে যাচ্ছে। এটি এখন একটি আস্ত গরু হয়েছে। আপনি দয়া করে একে মানুষ করবার একটু চেষ্টা করবেন।

সেদিন ঐ ভদ্রলোক তাঁর ছেলের সম্বন্ধে ঐ কথাগুলো যখন বাবার কাছে বলছিলেন, তখন দৈবক্রমে শরৎদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে চলে গেলে, শরৎদা বাবাকে বললেন—দেখ সুরেন, লোকটা তার ছেলের সম্বন্ধে একটু ভুল বলে গেল। ভুলটা হচ্ছে এই—

বাবা বলে নরু,
তুই আস্ত গরু।
রোজ রোজ খাবি কানমলা।
নরু বলে বাবা,
আমি অতি ছোট
উচিত ছিল বাছুর বলা।

শরৎদার এই কথা শুনে বাবা হেসে উঠলেন। আমরা যাঁরা সেখানে ছিলাম, আমরাও শুনে হাসতে লাগলাম।

(২) আমার বাবা ছিলেন শরৎদার আপন মামার খুড়তুতো ভাই। তাঁর আপন দুই মামা আমার ঠাকুরদাদের আমলের মূল বাড়ী ছেড়ে সামান্য একটু দূরে গিয়ে পৃথক বাড়ী করেছিলেন। আমাদের বংশের কেউ কেউ বাড়ীতে স্থানাভাববশতঃ এইভাবে মূল বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেও, বাড়ীতে ঠাকুরদাদের আমল থেকে যে জগদ্ধাত্রী পুজো চলে আসছিল, সেই পুজো কিন্তু এই মূল বাড়ীতে হ'ত।

সেবার শরৎদা জগদ্ধাত্রী পুজোর একদিন আগে সকালে এসে ঘোড়ার গাড়ী থেকে সবে নামছেন, এমন সময় তাঁর ছোট মামা বিপ্রদাসবাবু—আমার ছোট জ্যাঠামশায়—গঙ্গা-স্নান করে জগদ্ধাত্রী পুজো সম্বন্ধে কি কথা বাবাকে বলবার জন্য আমাদের বাড়ীতে আসছিলেন। শরৎদা তাঁকে দেখতে পেয়েই প্রণাম করতে গেলেন।

ছোট জ্যাঠামশায় কিন্তু, থাক, থাক, ক'রে প্রণাম না নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। বললেন—তোমার প্রণামে আর কাজ নেই, যথেষ্ট হয়েছে!—এই ব'লে তিনি ঘুরে আমার বাবার কাছে এসে তাঁর বক্তব্য বলে চলে গেলেন।

ছোট জ্যাঠামশায় চলে গেলে, শরৎদা এতক্ষণ পরে ছড়া কেটে বললেন—

সিংহের মামা ভোম্বল দাস,
আমার মামা বিপ্রদাস।

এরপর শরৎদা বাবার কাছে এসে বললেন—ছোট মামা মাসখানেক আগে একটা চিঠি লিখে আমার লেখা বইগুলো চেয়েছিলেন।—আচ্ছা স্বরেন, তুমিই বল তো আমার ঐ 'চরিত্রহীন' মার্কা বই আমি নিজে কখন হাতে করে মামাকে পড়তে দিতে পারি? বিশেষ করে আমার ঐ নীতিবাগীশ মামাকে! এই বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি বলেই, আমার উপর মামার এত রাগ। আমার প্রণামটা পর্যন্তও নিলেন না!"

রাগিয়ে দিয়ে পরিহাস

শরৎচন্দ্র মিছামিছি অনেককে রাগিয়ে দিয়েও মজা উপভোগ করতেন। শরৎচন্দ্রের এই মানুষকে ক্ষ্যাপানোর কথা উল্লেখ করে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন—

"শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এ সময়ে তিনি ভারি হাল্কামি করতেন। চিঠিপত্রেও। এ ভঙ্গী হ'ল ফরাসি-প্রকৃতিতে :··· অর্থাৎ কিনা নিপুণ ভঙ্গীতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ চেনে না, তারা স্বতঃই ওঠে চটে—ভাবে কত কি ভুল কথা। এই জন্যই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে।···এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি হাসতেন।"

মানুষকে ক্ষ্যাপিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দুটি গল্প এখানে বলছি।

(১) সাহিত্যিক আশীষ গুপ্ত একদিন আমার কাছে বলেছিলেন—

"শরৎচন্দ্র আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি শেষ বয়সে যখন তাঁর কলকাতার বাড়ীতে থাকতেন, তখন আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।

ঐ সময় আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে (বর্তমান নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরী) খুব পড়তে যেতাম। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে তখন শঙ্কর আয়ার নামে এক তেলেগু-ভাষী ভদ্রলোক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিান ভাল বাঙ্গলা জানতেন। লাইব্রেরীতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি কিভাবে জেনেছিলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তাই তিনি একদিন আমাকে বললেন—মিঃ গুপ্ত, আমি শরৎচন্দ্রের কিছু বই তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করতে চাই। আপনি শরৎচন্দ্রের কাছে একদিন আমায় নিয়ে যাবেন?

আমি সানন্দে রাজী হয়ে এক রবিবার সকালে মিঃ আয়ারকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি তাঁর বৈঠকখানায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। আমি মিঃ আয়ারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলাম এবং আয়ারের আসার কারণটাও বললাম।

শরৎচন্দ্র আমার কথা শুনে মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে আয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে সোজা প্রশ্ন করলেন—আপনার কপালে ওটা কিসের তিলক ?

আয়ারকে এই কথা বলেই শরৎচন্দ্র আমাকে বললেন—দেখ আশীষ, তোমার এই আয়ারের কপালে মোটা দাঁড়ি তিলক দেখছ তো। ওদের আর এক রকমের তিলক আছে, সেটা ত্রিশূল। এই দাঁড়ি তিলকধারী আর ত্রিশূল তিলকধারী—এরা পরস্পর দেখা হলেই হাতাহাতি সুরু করে দেয়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

আয়ার শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে বললেন—আপনি এ সব কি বলছেন ? আপনার এ কথা মোটেই সত্য নয়।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, না, আমি ঠিকই বলছি।

আয়ার শরৎচন্দ্রের উপর গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আর বেশী তর্ক করলেন না। শুধু বললেন—আপনাকে হয়ত এ বিষয়ে কেউ ভুল খবর দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র বললেন—না, কেউ ভুল খবর দেয় নি। ও আমি জানি।

যাই হোক্, আমি শরৎচন্দ্রকে বললাম—মিঃ আয়ার জানতে চান, আপনার বই তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করলে, বই প্রতি কত টাকা আপনাকে দিতে হবে ?

শুনেই শরৎচন্দ্র আয়ারকে বললেন—আপনাকে এজন্য একটা পয়সাও দিতে হবে না। আপনি যত পারেন, অনুবাদ করবেন। তবে অনুবাদটা যাতে ঠিক হয়, সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আমি তো আর তেলেগু জানি না।

এরপর শরৎচন্দ্র আমাদের জলযোগে আপ্যায়িত করে বললেন—চল আশীষ, আয়ারকে পৌঁছে দিয়ে আসি।—ব'লে তিনি তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে মোটরে করে আয়ারকে এবং আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

শরৎচন্দ্র আয়ারকে রাগিয়ে দিয়ে পরে তাঁকে জল করবার জন্য বা আয়ার তাঁর বই তেলেগুতে অনুবাদ করবেন বলায়, তাঁকে মোটরে করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসেন নি। হাতে সময় থাকলে শরৎচন্দ্র এইরূপ প্রায়ই তাঁর কাছাকাছির দর্শনার্থীদের মোটরে করে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"একদিন সকালে শরৎদার বাড়ীতে গেছি। গিয়ে বৈঠকখানায় বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি। এমন সময় একটি ১৫।১৬ বছরের কুমারী এসে শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করল।

শরৎদা তাকে থাক্ থাক্ বলে প্রশ্ন করলেন—কোথা থেকে আস্‌ছ?

মেয়েটি বললে—ভবানীপুরে রসা রোডে আমাদের বাড়ী।

—কি প্রয়োজনে এসেছ?

মেয়েটি একটি অটোগ্রাফের খাতা বার করে শরৎদার হাতে দিয়ে বললে—এতে আপনার একটি বাণী লিখে দিতে হবে।

—আমার বাণী নিয়ে কি করবে? বলে শরৎদা মেয়েটির খাতায় কি লিখে দিলেন। তারপর আমাকে দেখিয়ে মেয়েটিকে বললেন—ইনি সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। এঁর বাণী নেবে না?

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হয়ে আমাকে বললে—কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। আপনিও একটা কিছু লিখে দিন—বলে খাতাটি আমার হাতে দিল। আমি কিছু লিখে দিলাম।

এবার মেয়েটি তার বাড়ী ফিরবার জন্য আমাদের প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে, শরৎদা বললেন—থাম, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মেয়েটি বললে—আমি একাই যেতে পারব। আপনি কেন অকারণে কষ্ট করবেন।

—তা হোক্, অতদূর থেকে তুমি একাটি এসেছ।—এই বলে তিনি তাঁর ড্রাইভারকে ডেকে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে মেয়েটিকে তার বাড়ীর কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেন।"

(২) শরৎচন্দ্র তখন কলকাতায় বাস করছেন। যতীন দাস রোডে শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়ীতে সে সময় প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় 'রসচক্রে'র বৈঠক বসত।

শরৎচন্দ্রের বাড়ী কাছেই ছিল, সেই জন্য তিনি প্রায়ই রসচক্রে যেতেন এবং গিয়ে নানা রকমের গল্প-সল্প করে আসতেন।

সেদিন রসচক্রের এক বিশেষ অধিবেশন। আমোদ-আহ্লাদ, খানাপিনার প্রচুর আয়োজন। চক্রের বাইরের বহু লোকও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

· অতিথিরা আসতে সুরু করেছেন। শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বেই এসে গেছেন। এমন সময় চক্রের এক সদস্য মুটবিহারী মুখোপাধ্যায় এসে পৌছলেন। জুতো খুলতে খুলতে বললেন—পথের ধারে একতলার ঘরে সভা। বারান্দার ওপর এত লোকের জুতো অমনি পড়ে থাকা তো ঠিক হবে না। রাস্তা দিয়ে কত রকমের লোক যাচ্ছে আসছে, এদিকে এসে একজোড়া নিয়ে পালালেই তো হ'ল। এখানে একজন চাকর-বাকর কাউকে বসিয়ে রাখলে ভালো হ'ত।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঠিক বলে'ছিস, মুরারি। এখানে একজন চাকর বসিয়ে রাখার এখুনি ব্যবস্থা কর।

মুটবিহারীবাবু চেঁচিয়ে বললেন—শরৎদা, আপনি আবার আমাকে মুরারি বলছেন! কতদিন আপনাকে বলেছি আমার নাম মুটবিহারী, মুরারি নয়। তবুও আপনি আমাকে মুরারি বলে ডাকবেন?

—আচ্ছা মুরারি, তুই কি সত্যিই মুরারি বললে চটে যাস?

—চটব না? মুরারি না হয়েও মুরারি ডাক শুনতে কার ভাল লাগে বলুন? কি জানি মশায়, আপনাদের বড়লোকের খেয়াল, কিছু বোঝা দায়। একে তো আমার এই চেহারা, হয়তো বাড়ীতে মুরারি নামে কোন চাকর-বামুন ছিল, মরে গেছে অথচ ভুলতে পারছেন না। তাই, সেই নামের ভূত এখন হয়তো আমার কাঁধে এসে ভর করেছে!

—নারে মুরারি! তোকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো ভালবাসি, তুই তার কি বুঝবি! কেষ্ট ঠাকুরের মতন তোর এই রঙ, তার ওপর ঐ গোলগাল চেহারা, এইজন্যই তোকে মুরারি বলি। আয়, বোস এসে আমার কাছে।

কাছে গিয়ে মুটবিহারীবাবু বললেন—সত্যি শরৎদা, ঠিক বলছেন তো? না অন্য কোন কারণ আছে?

—নারে, না!

শরৎচন্দ্র ও মুটবিহারীবাবুর এই বাদানুবাদ শুনে সকলে হাসতে লাগলেন।

বৈঠকী গল্প

রসচক্রে ভূতের গল্প

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের অন্যতম মালিক অজিত বসু একদিন আমাকে বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বলা একটা ভূতের গল্প দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের কাছে আমি শুনেছিলাম। গল্পটা সব আজ আমার ঠিক মনে নেই। তবে আমি দুর্গাপ্রসাদবাবুর ঠিকানা দিচ্ছি, আপনি ইচ্ছা করলে, তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন।

অজিতবাবুর কাছ থেকে দুর্গাপ্রসাদবাবুর ঠিকানা নিয়ে আমি দুর্গা-প্রসাদবাবুর সঙ্গে দেখা করি। ইনি বর্তমানে (এই প্রবন্ধ লেখার সময়) কলকাতার শেরিফ।

আমি দুর্গাপ্রসাদবাবুকে শরৎচন্দ্রের বলা ভূতের গল্পটার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—ঐ গল্পটা আমি রসচক্রের একজন সদস্যের মুখে শুনেছিলাম। শরৎচন্দ্র গল্পটা নাকি রসচক্রের এক বৈঠকে বলেছিলেন। আমি নিজে কিন্তু শরৎচন্দ্রের মুখে এ গল্প শুনিনি।

যাই হোক্, দুর্গাপ্রসাদবাবু গল্পটা যা শোনালেন, সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই—

শরৎচন্দ্র তখন সামতাবেড়ে থাকেন। সেই সময় একদিন তিনি তাঁর সামতাবেড়ের বাড়ী থেকে কলকাতায় আসেন, তাঁর একটা বই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে। প্রকাশক শরৎচন্দ্রকে কিছু টাকা অগ্রিম দেন।

শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফেরার সময় বড়বাজারের কাছে গঙ্গার ধার থেকে একটা ইলিশ মাছ কিনে নিলেন। যাওয়ার সময় খুব ঝড়-বৃষ্টি সুরু হয়।

ঝড়-বৃষ্টির জন্য ট্রেন ছাড়তে বেশ দেরী করল। শরৎচন্দ্র দেউলটি স্টেশনে গিয়ে যখন নামলেন, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। আর সে রাতটা ছিল যেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তেমনি তখনও ঝড়-বৃষ্টি চলছিল সমানে।

শরৎচন্দ্র স্টেশনে একজনের কাছ থেকে কেরোসিনের একটা আলো চেয়ে নিলেন। তারপর আলো হাতে নিয়ে গ্রামের মেঠো রাস্তা ধরে বাড়ী চললেন।

অনেকক্ষণ যাবার পর শরৎচন্দ্র রাস্তার ধারে মাঠের মধ্যে একজনের বাড়ীর খামারে দেখলেন, কয়েকজন লোক বসে আছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তারা সাপে-কামড়ানো এক মড়াকে পোড়াবার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র ঐখানে একটু দাঁড়িয়ে ভাবলেন, এটা তো নিতাই মণ্ডলেরই বাড়ী। দেখি নিতাই বাড়ীতে আছে কিনা?—এই ভেবে একটু ঘুরে নিতাইএর বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে জোরে কড়া নাড়তে লাগলেন। কিন্তু কারও কোন সাড়া পেলেন না। তখন তিনি আবার চলতে সুরু করলেন। এই সময় ঝড়ে তাঁর আলোটাও গেল নিভে।

বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর তিনি হঠাৎ ভাবলেন—তাই তো অনেকক্ষণ ধরে তো পথ চলছি, পথ শেষ হচ্ছে না কেন? আর এ পথটাও তো ঠিক চেনা বলে যেন মনে হচ্ছে না। নিশ্চয়ই ভুল পথে হাঁটছি। এই ভেবে তিনি যে পথে আসছিলেন, সেইপথেই আবার ফিরে যেতে লাগলেন।

কিছুটা গেছেন, এমন সময় তাঁর মনে হ'ল, সামনে অন্ধকারে একটা লোক যেন ডান দিক থেকে এসে বলল—আমাকে সাপে কামড়েছে বটে, কিন্তু আমি মরি নি।—এই বলে ছুটে বাঁ দিকের মাঠে মিলিয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র এবার সেখানে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আবার হাঁটতে সুরু করলেন।

একটু পরেই তিনি দেখতে পেলেন, ভোর হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। এবার ভোরের সেই ফরসা আলোয় তিনি নিতাই মণ্ডলের বাড়ীটা ভাল রকম দেখতে পেলেন। নিতাইএর বাড়ীতে গিয়ে নিতাইকে ডাকতেই সে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এল।

শরৎচন্দ্র তাকে বললেন—কি নিতাই, তুমি রাত্রে কোথায় ছিলে? তোমায় এত ডাকলাম, সাড়া পেলাম না কেন?

নিতাই বললে—রাত্রে তো কোথাও যাই নি দাদাঠাকুর! বাড়ীতেই ছিলাম। সারারাত তো একরূপ জেগেই আছি! আপনি কখন ডেকে ছিলেন?

রাত্রে ব্যাপারটা যা ঘটেছে, সেটা যে একটা ভৌতিক ব্যাপার, শরৎচন্দ্র

এটা বুঝে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বললেন না। শুধু বললেন—নিতাই এক ছিলিম তামাক সেজে আন।

নিতাই তামাক সেজে আনলে, শরৎচন্দ্র কলকেটা নিয়ে হাতে করেই তামাক টানতে লাগলেন। তারপর সকাল হয়ে এলে, বাড়ী রওনা হলেন।

গল্পটা শুনে আমি দুর্গাপ্রসাদবাবুকে বলেছিলাম—গল্পটা কিন্তু খুব জমাটি নয়।

তার উত্তরে দুর্গাপ্রসাদবাবু বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের মুখের এই গল্পটা আমি আর একজনের মুখ থেকে শুনেছি। তাই শরৎচন্দ্রের মুখের গল্প, তাঁর মুখে আবার কিছু পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়েছে কিনা বলতে পারি না। তবে এক ঝড়জলের রাত্রে রসচক্রের এক বৈঠকে শরৎচন্দ্র যে এমনিই একটা ভূতের গল্প বলেছিলেন, সে কথা রসচক্রের আর এক বিশিষ্ট সদস্য রাধেশ রায়ও আমাকে বলেছিলেন।

ভক্ত

প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় শরৎচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাছাড়া প্রবর্ত্তক সংঘের অনেক কর্মীর সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাই শরৎচন্দ্র কলকাতার বাড়ীতে থাকার সময় মাঝে মাঝে বহুবাজারে প্রবর্ত্তক সংঘের অফিসে এসে মতিবাবু এবং সংঘের কর্ম্মীদের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র এইরূপ একবার এসেছেন। এসে সেদিন তিনি মতিবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন। কথায় কথায় বাঙ্গলার তৎকালীন নেতাগিরির কথা উঠলে তিনি হেসে বললেন—সব ফাঁকির কারবার। মতিবাবু, আপনার মত নির্বোধ আজকাল আর দেখা যায় না। সব কিছুই আপনি নিজে ক'রে ছেলেদের করতে শিক্ষা দেন। কেনরে বাপু, চারটের সময় এক প্রহর রাত থাকতে আপনি উঠতে যাবেন। নিয়ম করে দিন, শিষ্যরা তা করুক গে, আর আপনি মজা করে এই শীতে বিছানায় পড়ে আরাম করুন। আমি হ'লে তো তাই করতাম। হিটলারের খোঁজ নিন, সেও তাই করে।

পরে শরৎচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বললেন—শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ, সাহিত্য সর্ব ক্ষেত্রেই যারা একটু বুদ্ধিমান, তারা দেশের বোকা লোকগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে মজা করছে। আর কেনই বা দুঃখ ভোগ করবে! ক'দিনই আর এ জীবন! খাও, দাও স্ফুর্তি কর—ব্যস! আর কি চাই? তবে আপনাদের মত দুঃখব্রতী যাঁরা, তাঁরা তো ইচ্ছা করেই দুঃখ পান। বুঝি না আপনারা অন্যের দুঃখই বা দূর করবেন কি করে? আর তা করতেই বা যাবেন কোন্ দুঃখে?

এরপর শরৎচন্দ্র আরও গম্ভীর হয়ে মতিবাবুকে সম্বোধন করে বললেন—মতিবাবু, মনে করবেন না শুধু আপনারই ভক্ত আছে, আমারও ঢের ভক্ত আছে। একটা সত্য গল্প বলি তবে শুনুন—

আমি তখন হাওড়ায় বাজে শিবপুরে থাকি। একদিন দুপুরে ইজি-

চেয়ারটায় চোখবুজে শুয়ে আছি। এমন সময় পথে মোটরের হর্ণ বাজার শব্দ পেলাম। পরে আমার উঠানে জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ।

চেয়ে দেখি, সামনে এক ফিট্‌ফাট ভদ্রলোক। সুশ্রী সুন্দর চেহারা। বয়স বছর চল্লিশেক। দেখেই মনে হয় যেন বড়লোক ও ভদ্রঘরের। সে এসে আমাকে প্রণাম করল।

সামনের চেয়ারে তাকে বসতে বলায় সে আসন গ্রহণ করে বললে—আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আমার বাড়ীতে আপনাকে একবার পদধূলি দিতে যেতে হবে। আমার স্ত্রী আপনার পরম ভক্ত। গেলে তা বুঝতে পারবেন। তার আকুল অনুনয় আমি আর ঠেলতে না পেরেই আপনার কাছে এসেছি। কবে যাবেন বলুন—আমি এসে নিয়ে যাব।

একটু ভেবে একটা দিন ও সময় নির্দিষ্ট করে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে ভদ্রলোক এসে হাজির হ'ল। কিন্তু শরীরটা অসুস্থ ব'লে আমার সেদিন যাওয়া হ'ল না।

এমন বারবার তারিখ দিলাম, কিন্তু বারবারই যাওয়া হ'ল না। শেষে পাঁচবারের পর আর ফেরাতে পারলাম না। যেতেই হ'ল।

কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী। গেটে বন্দুক হাতে দরোয়ান। ভিতরে ঢুকেই দেখি, উপরে উঠবার সিঁড়ির দুপাশে দুটো কলাগাছ, তারই গোড়ায় আম্রশাখা ও ডাবসহ মঙ্গলঘট। মার্বেল নির্মিত সিঁড়ির সুরু থেকে নতুন কাপড় বিছানো। ভাবলাম, কোন পুজো আশ্রয় হয় তো আছে।

যাই হোক, ভদ্রলোকের পিছন পিছন গিয়ে উপরের একটা ঘরে বসলাম। বসতেই পাশের ঘর থেকে একটি মেয়ে এসে গললগ্নাঞ্চলে ভূনত বন্দনা করলে। বয়স বছর পঁচিশেক। সুস্নিগ্ধ দেবী মূর্তি। কৃতার্থতার হাসি হেসে বললে—'বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ আমার পূর্ণ হ'ল। আপনি আসবেন, এ সৌভাগ্যের কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি।

আমার শত আপত্তি সত্ত্বেও মেয়েটি আমার পা ধুইয়ে দিয়ে, তার আঁচল দিয়েই পা মুছে দিল। তারপর নিজের হাতে রান্না করে আমাকে খাইয়ে তার কি তৃপ্তি! অমন আহার বৈচিত্র্যও আমার কল্পনার অতীত ছিল। আহারের সে কি আয়োজন!

আহার ও বিশ্রামের পরে, মেয়েটি পাশের একটি ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে

গেল। ধূপ-দীপে সুশোভিত যেন কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করলাম। সবচেয়ে বিস্মিত হয়ে দেখলাম—আমার বইগুলো সে অতি যত্নে বাঁধিয়ে বেদীর উপর সাজিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, এগুলি তার নিত্য পূজ্য ও পাঠ্য, আঁধারে আলো।

নিরালা ঘরে শুধু সে আর আমি। অকপটে সে তার জীবনের সব কথা খুলে বললে। লক্ষ্য করলাম, এই বলার মধ্যে সে যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললে। জানলাম, সে ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে, ঐ ভদ্রলোকের রক্ষিতা।

তা হোক্‌গে। আমার সাহিত্য-সৃষ্টি যে সার্থক হয়েছে—এই আমার জীবনের বড় সান্ত্বনা।

গল্পটা শেষ করেই শরৎচন্দ্র কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে পড়লেন। নিঃশেষিত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, আর একটা ধরিয়ে আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিলেন। তারপর চোখ বুজে কয়েকবার অভ্যাস বশতঃ মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বললেন—মতিবাবু, যে যাই বলুক, আমিও কিন্তু আপনাদের মতই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচারী। তবে এমনটা হতে পারে না যে, উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করব, অথচ কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকবে না। তবে সামর্থ্যহীনের দল সখ করে চার আনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে নিজেরাও পাঁকে চুবান খায় আর অন্যকেও খাওয়ায়। আমি আজীবন পাঁকের মধ্য দিয়ে চলেছি, কিন্তু পাঁক আমার গায়ে লাগাই নি।

মতিবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যখন এই কথাবার্তা হয়, তখন 'প্রবর্তক' পত্রিকার পরিচালক (পরে সম্পাদক) রাধারমণ চৌধুরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'প্রবর্তক শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা'য় রাধারমণবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে এই কথাগুলি সবই লিখেছিলেন।

পরিশিষ্ট

এই বইএর ভূমিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে, তাঁর স্নেহভাজন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর একটি লেখা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে, শরৎচন্দ্র একই ঘটনা বা কাহিনীকে সামান্য অদল-বদল করে এক একজনের কাছে এক এক ভাবের রঙে রাঙিয়ে বলতেন।

সেই হিসাবে ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠার 'একটি গল্পের উপসংহার' এই আলোচনাটিও যে শরৎচন্দ্রেরই, তা সত্য বলেই মনে হয়। কেননা ১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন তারিখে শরৎচন্দ্র কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে, তাঁর লিখিত ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে এই ধরণেরই একটা গল্প বলেছিলেন। সে গল্পটা এই :—

"আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের একটি ছোট গল্প আছে। তার প্লট অত্যন্ত সংক্ষেপে এইরূপ—নায়ক একজন বড়লোক জমিদার। 'হিরো', অতএব হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উচ্চ, নৈতিক-বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম। কলকাতায় তাঁর একটা মস্ত বড় বাড়ী আছে। ভাড়া খাটে, দাম প্রায় লাখো টাকা। এক তারিখে বাড়ীটা মাস খানেকের জন্যে একজন ভাড়া নিলে। বাড়ীওয়ালা জমিদার, পাশের বাড়ীতেই থাকেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি ঐ বাড়ীটার ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। দিন দুই পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাড়ীটার মধ্যে ভ্রূণ-হত্যা হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়ীভাড়া না দিয়েই পালিয়েচে। তাদের ঠিকানা জানা নেই, পাপের দণ্ড দেওয়া অসম্ভব। তাই তিনি হুকুম দিলেন—বাড়ীটা ভেঙ্গে-চুরে মাঠ করে দাও। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অত বড় লাখো টাকার বাড়ী ভেঙ্গে মাঠ হয়ে গেল।

গল্প এইখানেই সমাপ্ত হ'ল। প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন ইংলিশ-এর প্রবীণ অধ্যাপক এই গল্প পাঠ করে সাশ্রুনেত্রে বারবার বলতে লাগলেন—জীবনে এমন শিক্ষাপ্রদ সুন্দর গল্প আর পড়েন নাই এবং এমন গল্প বাঙ্গলা সাহিত্যে যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

এমন গল্প আমিও যে বেশী পড়িনি, সেকথা অস্বীকার করিনি। এবং বাড়ী যখন আমারও নয়, অধ্যাপকেরও নয়, গ্রন্থকারেরও নয়, তখন যত ইচ্ছে ভেঙ্গে চুরে মাঠ করে দিলেও আপত্তি নেই ; কিন্তু আর্ট ও সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁর মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছে, সে শুধু তিনিই জানেন।"

৩৪২-৪৩ পৃষ্ঠার 'চাকরি' গল্পটা আমি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তর কাছে শুনেছি। শরৎচন্দ্র একদিন নন্দগোপালবাবুর কাছে এই গল্পটা বলেছিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র 'স্মৃতিকথা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি ১৩৩২ সালের আষাঢ় মাসের দেশবন্ধু স্মৃতি-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে দেখছি, তিনি এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে এই গল্পটারই সামান্য বদল করে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"আমার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল। সে বেচারা বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়াও চাকুরি পায় নাই। বড়বাবুর কাছে আবেদন করায়, তিনি রাগিয়া বলিয়াছিলেন—যাকে চাকরি দিয়েছি, তার ক্যোয়ালিফিকেশন বেশী। সে বি, এ, ফেল।

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল—আজ্ঞে একজামিন দিলে কি আমি তার মত ফেল করতেও পারতাম না?"

১৬৩-৭০ পৃষ্ঠায় 'বই উৎসর্গ' গল্পটার শেষে বলেছি—এই গল্পটা সত্য বলেই মনে হয়। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় কর্তৃক, লেখকদের বই ছাপাতে টাকা দেওয়ার কথা, এখানে আর একটা বলছি—

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

"শত শত গ্রন্থকারকে ইনি (যোগেন্দ্রবাবু) আর্থিক সাহায্য দান

করিয়াছেন। তাঁহার এই অজস্র দান হইতে বর্তমান লেখকও বঞ্চিত হন নাই। আমার 'বেহুলা', 'গৃহশ্রী' ও 'ওপারের আলো' এই তিনখানি বহির প্রথম সংস্করণের ছাপার সমস্ত খরচ ইনি বহন করিয়াছেন।"

রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের অতিথি-সেবা সম্বন্ধেও দীনেশবাবু লিখেছেন—

"…'ভাল না খাইবে আর ভাল না পারিবে' মহাপ্রভুর এই উপদেশ যেন মূর্তি ধরিয়া আমাকে দেখা দিল। কিন্তু নিজের প্রতি যিনি এইরূপ কঠোর বিধান করিয়াছেন, অপর সম্বন্ধে তাঁহার মুক্তহস্তে ভোজনের ব্যবস্থা। তথাকার দরিদ্র ও অতিথিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন।"

১৭৩-৭৭ পৃষ্ঠায় 'মানপত্র' নামে একটা গল্প আছে। ঐ গল্পে প্রকৃত যাঁকে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল, তাঁর নামটা উল্লেখ না করে শুধু '…সিংহ' লিখেছি।

এই সিংহ মশায়ের সঙ্গে পরে একদিন আমি দেখা করেছিলাম এবং তাঁকে শুধু বলেছিলাম—আপনার সঙ্গে কি শরৎচন্দ্রের খুব আলাপ-পরিচয় ছিল? তাহলে তার কিছু গল্প বলুন না শুনি?

আমার এই কথায় তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দু-একটা টুকরো কথা বলেই খুব আগ্রহের সহিতই বললেন—শরৎদার উপস্থিতিতে রসচক্র একবার আমাকে মানপত্র দেবার ব্যবস্থা করেছিল। বিশ্বপতি চৌধুরী মানপত্রের নামে একটা মানকচুর পাতা এনেছিল এবং শরৎদাসহ সকলের ফটো তোলার সময় বিশ্বপতি চৌধুরী ঐ মানকচুর পাতাটা আমার মাথার উপরে ধরেছিল।

আমি বললাম—রসচক্রের সদস্যদের কাছে, এ গল্পটা শুনে আমার বইএ লিখেছি। তবে আপনি কিছু মনে করবেন বলে, আপনার নামটা দিই নি।

—মনে করবার কি আছে! রসচক্র আমাকে নিয়ে রঙ্গ করেছে, এই তো? জীবনটাই তো রঙ্গ! আপনি কোন কিছু না ভেবে দিয়ে দেবেন আমার নাম। পারেন তো ফটোটাও ছেপে দেবেন।

তাই এখানে সিংহ মশায়ের নামটা দিয়ে দিলাম। তাঁর নাম—শ্রীহরেন্দ্র নাথ সিংহ কবিভূষণ। আর সেই ফটোটাও দিলাম।

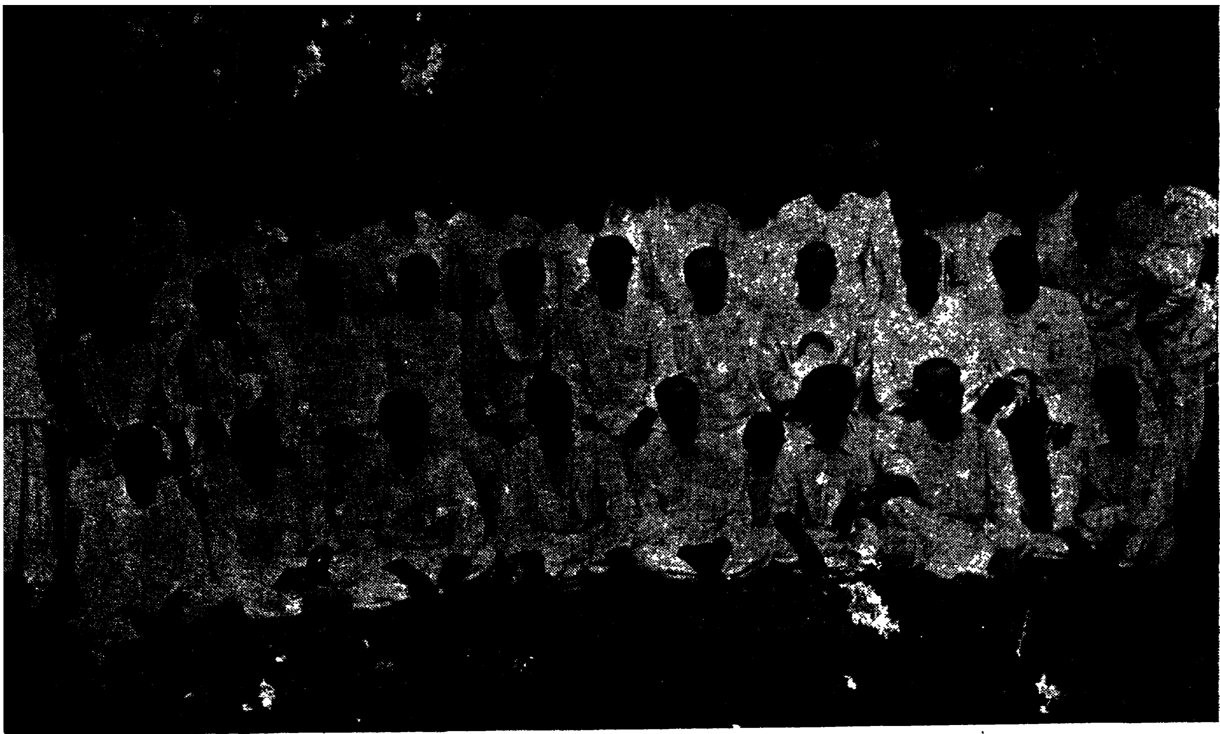
রসচক্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কবি কালিদাস রায় এবং আরও একজন রসচক্রের সদস্যের কাছে শুনেছিলাম—হরেনবাবুকে নিয়ে ফটো তলার সময় সেই গ্রুপ ফটোর মধ্যে শরৎচন্দ্রও ছিলেন। পরে হরেনবাবুও একথা বলেছিলেন। কিন্তু ফটোটা দেখবার জন্য আমি বহু খুঁজে খুঁজে শেষে রসচক্রের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য কালিদাসবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধেশ রায়ের বাড়ীতে পেয়ে দেখলাম—গ্রুপ ফটোয় রসচক্রের সকল সদস্যই আছেন এবং হরেনবাবুর মাথার পিছনে মানকচুর পাতা ধরা আছেও সত্য, কিন্তু শরৎচন্দ্র নেই। খুব সম্ভব, এইরূপ একটা রসিকতার মধ্যে শরৎচন্দ্র নিজেও ছিলেন, তার জাজ্বল্য প্রমাণ হয়ে থাকবেন না বলেই, তিনি ফটো তোলার সময় সকলের সঙ্গে বসেন নি।

১৩৮ পৃষ্ঠায় হাস্য-পরিহাস অধ্যায়ে 'দাড়ি সাদৃশ্য' নামে শরৎচন্দ্রের একটি পারিহাস আছে। ঐ পরিহা..টিতে আছে, রবীন্দ্রনাথের মতই দাড়ি ছিল, এমন তাঁর এক বন্ধু একবার বিলাত গেলে, সেখানকার অনেকে তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐ বন্ধু হলেন, প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। মিথ্যা-পরিহাস হ'লেও বইএ রামানন্দবাবুর নাম উল্লেখ না করে, রবীন্দ্রনাথের কোন বন্ধু বলে গেছি। কিন্তু এখন দেখছি, আমার মত অনেকেই এই গল্পটা জানেন। তাই এখানে রামানন্দবাবুর নামটাই বলে দিলাম।

শরৎচন্দ্রের এই পরিহাসটি জানেন, এমন একব্যক্তি সাহিত্যিক আশীষ গুপ্ত একদিন আমাকে বলেছিলেন—

"শরৎচন্দ্রের মুখে এই পরিহাসটি আমি অন্ততঃ বার চারেক শুনেছি। প্রথমবার শুনি তাঁর কলকাতার বাড়ীতে। সেদিন আমি যখন তাঁর বাড়ীতে যাই, তখন তিনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি যেতেই



বাঁদিক থেকে পঞ্চম চেয়ারে উপবিষ্ট ভবানীনাথ সিংহ। তাঁর বাঁদিকে কালিদাস রায়। কালিদাসবাবুর পিছনে দাঁড়িয়ে বিশ্বপতি চৌধুরী।

আমাকে বসতে ব'লে, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা আশীষ, রবীন্দ্রনাথের 'পারস্য-ভ্রমণ' প্রবাসীতে না বেরিয়ে 'বিচিত্রা'য় যে বেরুচ্ছে, তার কারণ তুমি কিছু জান? দেখ, রামানন্দবাবু তাঁর বড় ছেলে কেদার চাটুজ্যেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্যে পাঠালেন, শুধু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে 'পারস্য-ভ্রমণ' লেখাটা পাবার আশাতেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ লেখাটা প্রবাসীতে না দিয়ে, দিলেন কিনা বিচিত্রায়। অগত্যা রামানন্দবাবু আর কি করেন, ছেলে কেদার চাটুজ্যেরই লেখা 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ভ্রমণ' প্রবাসীতে ছাপছেন।

রবীন্দ্রনাথ একটা কারণে রামানন্দবাবুর উপর ভীষণ চটে গেছেন, সেইজন্যই তিনি লেখাটা প্রবাসীতে দিলেন না। কবির সেই চটার কারণটা তোমরা জান না। বলি তবে শোন।—ব'লে তিনি জেনেভা সম্মেলনে রামানন্দবাবুর বিলাত যাওয়া থেকে আরম্ভ করে, দাড়ি ছোপাতে বলা পর্যন্ত এই গল্পটা বলেছিলেন।"

আশীষবাবু আমাকে আরও বলেছিলেন—"আমি শেষবার শরৎচন্দ্রের মুখে এই গল্পটা শুনি বেহালায় মনীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়ীতে। সেদিন সেখানে অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন।

আমি সেদিন শরৎচন্দ্রকে বলেছিলাম—আপনি এই দাড়ি ছোপাতে বলার গল্প কার কাছে শুনেছেন? কবি শুনলে কি ভাববেন বলুন তো?

শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরে বললেন—কেন, আমি তো এই উপীনের কাছে শুনেছি।

অত লোকের মধ্যে শরৎচন্দ্র এই কথা বলায় উপেনবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি বললেন—সে কি শরৎ! আমি আবার তোমাকে কবে বললাম?

—কেন, তোমার মনে নেই! সেই যে একদিন বাজে শিবপুর থেকে আসবার সময় হাওড়া ব্রিজের উপর তুমি আমাকে বললে!

—না, কখখনো না।

—তুমি ভুলে গেছ উপীন! তোমার মনে পড়ছে না। আমার কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে, হাওড়া ব্রিজের উপরেই তুমি এই গল্পটা আমাকে

বলেছিলে। যাক্, তোমার মনে নেই যখন, তখন এ কথা আর থাক্।—এই বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিলেন।"

এটা শরৎচন্দ্রেরই একটা বানানো গল্প। এ সবাই জানেন। উপেনবাবু শরৎচন্দ্রকে এ গল্প মোটেই বলেন নি।

আমি অবশ্য শরৎচন্দ্রের এই পরিহাসটি প্রথমে উপেনবাবুর মুখেই শুনেছিলাম।